প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৯

প্রচ্ছদপট
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

রেখাচিত্র
শ্রীগণেশ বসু

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা - ৯

প্রচ্ছদ ও গ্রন্থ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা - ৯।

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৬৭, মার্চ ১৯৬০ সন

নিবেদন

ই এম ফরস্টারের (এডওয়ার্ড মরগ্যান ফরস্টার) জন্ম হয় ১৮৭৯ সালের লণ্ডন শহরে। তিনি পাঠ্যজীবন শুরু করেন টন্‌ব্রিজ স্কুলে এবং পরে কেম্‌ব্রিজের কিংস কলেজে। কিংস কলেজের সঙ্গে ফরস্টারের সম্পর্ক কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি। এ সম্পর্ক ছিল আজন্মব্যাপী। ফরস্টারের ছেলেবেলা কেটেছে অন্তঃপুরের প্রমীলা সমাজের শাসনাধীনে। উত্তরকালের বলিষ্ঠ এবং আত্মপ্রত্যয়ী লেখক ফরস্টারের সঙ্গে এই অন্তঃপুরলালিত ছেলেবেলার কোন মিল নেই। ছাত্রজীবনে ফরস্টারের কল্পনাশ্রয়ী মনটি নিবদ্ধ ছিল ভাবলোকে। দুটি বিষয়ে তাঁর তীব্র অনুরাগের কথা আমরা জানি। ইতিহাস ও ক্লাসিক সাহিত্য পাঠ এবং সঙ্গীতচর্চা। পরবর্তীকালেও তাঁর এই অনুরাগ ক্ষুণ্ণ হয় নি। একদিকে তন্ময় ইতিহাস পাঠ তাঁর কল্পলোক বিন্যস্ত করেছিল, অন্যদিকে সঙ্গীতের ভাবরূপ তাঁকে অতিক্রম করে নিয়ে গিয়েছিল জীবন-যাপনের তুচ্ছতা এবং অবিশ্বাস থেকে। কেম্‌ব্রিজে পড়াশোনার সময় থেকেই, তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। কেম্‌ব্রিজই তাঁকে প্রথম প্রথম শেখায় যে তিনি সমাজ বহির্ভূত নন। তাঁর প্রধান দায়বদ্ধতা মানুষের কাছে। তাই পাঠ্যজীবন শেষ হবার কয়েক বছরের মধ্যেই কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে যায়। কেম্‌ব্রিজের পাঠ্যজীবন থেকেই শুরু হয় তাঁর উপলব্ধির কাল।

ফরস্টার ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এসেছিলেন দুবার। প্রথমবার ১৯১২-১৩ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯২১ সালে হিন্দু রাজ্য দেওয়ানের মহারাজার দেওয়ান রূপে। এই দুবারের ভারত ভ্রমণ থেকে 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' উপন্যাসের পটভূমি তাঁর মনোজগতে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এই ভারত-বোধ কতটুকু কাল্পনিক কতটুকু প্রকৃত তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর মানসিকতা যথার্থ বোঝার জন্য একটু আগের কথা জানা দরকার। ব্রিটিশ শাসকদের মনোদর্পণে ভারতবর্ষ অনেক রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নানা পথ বেয়ে ভারতবর্ষ এসে পেঁৗছেছে তাদের মনের দোর গোড়ায়। তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল যে ভারতবর্ষ নামক দেশটা বর্বর কালা মানুষদের দেশ। এরা অনাচারী এবং পৌত্তলিক। পরবর্তী যুগে দিল্লী আগ্রার বিলাসবহুল নবাবীয়ানা তাদের চোখে মধ্যযুগীয় বিলাসিতার ক্ষয়িষ্ণুরূপ বলে মনে হয়েছিল। তখন বহিরাগতদের চোখে আঙুল দিয়ে যা দেখান হতো তা শুধু 'তাজমহল'। যেন 'তাজমহল' ছাড়া ভারতবর্ষের দেখাবার কিছু নেই এবং তাও নাকি এক ইতালীয় স্থপতির তৈরি। ভারত-বর্ষের এই দরিদ্র নিঃস্বরূপ দেখে রাজপুরুষদের দৃষ্টি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এই অভ্যস্ত দৃষ্টি প্রথম চমক খেল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। সহসা এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো যেন। শিল্পে, সঙ্গীতে, কাব্যে, ধর্মবোধে এক বর্ণময় রঙিন ভারতবর্ষের ছবি ভেসে উঠল শাসকদের মনের আয়নায়। তারা স্তম্ভিত হয়ে দেখলো এই রঙিন ছবিটি এঁকেছেন তাদেরই স্বজাতিরা। বস্তুত পাশ্চাত্যবাসী চিন্তানায়কদের প্রেরণাতেই ভারতবর্ষ যেন বিশ্বের কাছে নবাবিষ্কৃত হয়েছিল তখন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং আনন্দকুমার স্বামী। শিল্প ও সাহিত্য জগতের এই দুজন বরেণ্য

ভারতীয়কে ইতিমধ্যেই বরণ করে নিয়েছিল পাশ্চাত্যদেশগুলি। তাদের দেওয়া জয়মাল্য গলায় পরে এঁরা সেদিন যা বলেছিলেন তা শুনতে অনাগ্রহী হয় নি ইংরেজ রাজপুরুষ তথা ইওরোপ। ভারতবর্ষের ধর্মচেতনা, তার শিল্প সঙ্গীত এবং কাব্যবোধ এক নতুন মাত্রা নিয়ে উন্মোচিত হলো ইংরেজের চোখের সামনে। ফরস্টার যখন ভারতবর্ষে এলেন তখন এই মাত্রার জন্ম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করে পশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাব্যে উদাত্ত হলো ভারতাত্মার বাণী। কিন্তু ফরস্টার প্রভাবিত হলেন কেন? হ্যাভেল, কুমারস্বামী, অ্যানি বেসান্ত ও রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল এ কথা ঠিক। কিন্তু কেন? 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' প্রতীকী অর্থে ভারতাত্মার সন্ধানে। এই অন্বেষা কি ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদ?

প্রথম মহাযুদ্ধ এবং তার বিভীষিকা মানুষের সঙ্গে মানুষের সাবেকি সম্পর্ককে অত্যন্ত নির্মমভাবে উপহাস করেছিল। পশ্চিমের তৈরি করা এই মূল্যবোধ প্রধানত উনবিংশ শতকের মানসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আদিম প্রবৃত্তি এই মানসিকতা সম্পূর্ণ নড়বড়ে করে দিয়েছিল। পশ্চিমের চোখে প্রাচ্যদেশ তখন মহাঘোরের মধ্যে নিমজ্জিত। জীবনে জীবন মেলানোর কোন বিশেষ বাণী যে প্রাচ্যের থাকতে পারে পশ্চিমের গরিমাদীপ্ত মানুষ তা মানত না। পূব এবং পশ্চিম যে পৃথক অস্তিত্ব, সাদা কালোর মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান আছে—এই বশংবদ ধারণাটি মেনে নিয়ে আত্মতৃপ্ত ছিল পাশ্চাত্যের মানুষ। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎস হানাহানি চাক্ষুস করে পশ্চিমের সুস্থ মানুষ পাশ্চাত্য বশীকরণের উপর আর যেন নির্ভর করে থাকতে পারল না। তারা বাধ্য হয়েই পূর্বের দিকে চোখ ফিরিয়েছিল একটা সান্ত্বনা খুঁজতে। নিছক ভালবাসা না হলেও প্রাণের দায়েই তারা তাকিয়েছিল এ দিকে। প্রাচ্যের দাওয়ার উপর হাই তোলা নিস্তেজ প্রদীপটি উসকে তারা খুঁজতে বেরিয়েছিল কোন এক পথ যা মানুষে মানুষের সম্পর্ককে আরও সহজ অন্তরঙ্গ এবং নিবিড় করে তুলতে পারে। ফরস্টারের ভারতভূমি পরিদর্শন এই প্রয়াসেরই ইঙ্গিত জানায়। এ দেশের মাটিতে পা দিয়ে, এখানকার আকুল করা বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন ফরস্টার। তাঁর মনে হয়েছিল জীবনে জীবন মেলানোর প্রয়াসটি সার্থক হবে ভারতবর্ষের মাটিতেই। আশ্চর্য এই দেশ আর তার প্রকৃতি ও মানুষ। এখানকার বাতাসে বৈরাগ্য, এদের আচরণে নির্মোহ। পার্থিব কোন কিছুতেই যেন আঁট নেই। কখন সংসার ঘরদোর ছেড়ে পথের টানে বেরিয়ে পড়ে কেউ জানে না। যখন সাধনায় বসে তখন গাত্রাবরণ তো তুচ্ছ 'পৈতাগাছটিও' খুলে রাখে পাছে সাধনার ব্যাঘাত হয়। ফরস্টার গভীরভাবে এই বিবাগী মনটি উপলব্ধি করেছিলেন। আকুল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কি গভীর এই আত্মনিবেদন? মিলনের যথার্থ মনোভূমি তো দেশেই প্রতিষ্ঠিত? পশ্চিম হলো কম্ব্যাটিভ। কিন্তু তার সংগ্রাম ঐহিক স্বার্থপুষ্ট। ভারতের সংগ্রাম আত্মিক উন্নতির সংগ্রাম। পশ্চিম থেকে ভারতবর্ষ অনেক কিছু নিতে পারে। কিন্তু দিতে পারে। কিন্তু দিতে পারে

এমন এক বস্তু যা কোথাও মেলে না। এটি তার অধ্যাত্মবাদ। ফরস্টারকে আকর্ষণ করেছিল প্রাচ্যের এই নির্মোহ অধ্যাত্মবাদ। উপন্যাসের এক মুখ্য চরিত্র ফীলডিং। ফীলডিং ঈশ্বর বিশ্বাসী নয় কিন্তু অবিশ্বাসী নাস্তিকও সে নয়। কাঁধের লুকানো ডানা মেলে দিয়ে মানুষ যখন হঠাৎ পথ সম্বল করে বেরিয়ে পড়ে, তখন ফীলডিং অভিভূত হয়ে যায়। তার মনে হয় এমন ভার-মুক্ত জীবনযাপন করতে পারে শুধু ভারতবর্ষেরই মানুষ। যুগে যুগে এদেশে পাঠান মোগল ইংরেজ খ্রীশ্চান এসেছে। কিন্তু সবাই মিলে গেছে ভারতবর্ষের আত্মার মধ্যে।

তথাপি মিলন হলো না। পূর্ব ও পশ্চিমের দুস্তর ব্যবধান প্রাচীর আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। দু টুকরো হয়ে পড়ে আছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। ফীলডিং-এর বাড়ানো হাত ধরল না আজিজ। এ মিলন পৃথিবী চাইল না, আকাশ চাইল না। সবাই উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, 'না। এখনো সময় হয় নি।' দুঃসময়ের কাল কি কোনদিন উত্তীর্ণ হবে না? সাদা কালোর দ্বন্দ্ব ছেড়ে কোনদিনই কি মিলিত হতে পারবে না ইস্ট এবং ওয়েস্ট? 'নো, নট ইয়েট. কি কোন ব্যর্থতার ইঙ্গিত অথবা আগামী দিনের কোন উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি বহন করে আনবে এই বাণী? জটিল এবং দুর্বোধ্য এই অনুসন্ধানই বোধহয় 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' উপন্যাসের মূল আশ্রয়।

তবে মূলত এটি উপন্যাস এবং ঔপন্যাসিক ফরস্টার. পাঠকের কাছেই প্রধানত দায়বদ্ধ। পাঠকের ভাল লাগা মন্দ লাগার উপরেই সাহিত্যসৃষ্টির সাফল্য নির্ভর করে। তাই অন্যান্য সার্থক উপন্যাসের মতন এই উপন্যাসেরও প্রধান অবলম্বন গল্পরস। শুধু আকর্ষণীয় ভাবে গল্প বলা নয়, একটি নির্দিষ্ট বক্তব্যে পৌঁছানর রীতিটিও ফরস্টারের অজানা নয়। সুন্দর একটি রহস্য-গল্পের উপাদান আছে কাহিনীর মধ্যে এবং আছে কয়েকটি অসাধারণ চরিত্র-চিত্রণ। শুধু জীবন্ত নয়, হালকা ব্যঙ্গের মোচড়ে চরিত্রগুলি আমাদের কত চেনা। তারা কেউ ভারতীয় কেউ ব্রিটিশ। কিন্তু হুলটি কোথাও নিষ্ঠুর হয়ে ক্ষতবিক্ষত করে নি। একটা কাল ছিল যখন সাম্রাজ্য স্বার্থ-বিরোধী রচনা বলে তীব্র নিন্দিত হয়েছে এই উপন্যাস। শোনা যায় শিক্ষানবিশ ব্রিটিশ রাজপুরুষরা হাতে নিয়োগপত্র ও 'প্যাসেজ' নিয়ে জাহাজে উঠত। কিন্তু পাঠ শেষে হবু শাসকরা এত রেগে যেত যে. সেটি জলে ফেলে না দেওয়া অব্দি স্বস্তি পেত না তারা। ফরস্টারকে তারা রাজভক্ত সাম্রাজ্যবাদী লেখক-রূপে দেখতে চাইত 'প্যাসেজ' উপন্যাসের মধ্যে। অন্যদিকে ভারতবর্ষেও উপন্যাসটির যথাযথ মূল্যায়ন হয় নি কারণ উপন্যাসটি পোলিটিক্যাল হয় নি। জালিয়ানওয়ালা বাগের নৃশংস হত্যালীলা অনুষ্ঠিত হবার পরে প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাস। অথচ উপন্যাসের কোথাও এতবড় বাস্তব ঘটনার উল্লেখ নেই। উল্লেখ নেই গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব প্রস্তুতির কথা। এই অনুল্লেখ কি ইচ্ছাকৃত? লেখক ফরস্টার কি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করতেই এই তঞ্চকতা করেছিলেন? হয়ত এই সব কারণের জন্যেই পাঠকের কাছে দায়বদ্ধ ফরস্টার নিজের সম্বন্ধে কোন উচ্চাশা পোষণ করেন

নি। ফরস্টার নিজেকে কখনও গ্রেট নভেলিস্ট মনে করতেন না। অশীতি বর্ষের জন্মদিন উপলক্ষে বি-বি-সি-র সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন সে কথা। ফরস্টার বলেছিলেন, 'আমি গ্রেট নভেলিস্ট নই। আমি লিখি দুটো কারণে। খানিকটা জীবন ধারণের প্রয়োজনে রুজি রোজগার করতে। আর খানিকটা সেইসব মানুষের শ্রদ্ধা ভালবাসা পেতে যাদের কথা ভালবেসে লিখি।' কিন্তু ফরস্টার যথার্থই গ্রেট নভেলিস্ট। শুধু পাঠক সমালোচকের দৃষ্টিতে নয়, কালের নিরিখেও ফরস্টার চিরায়ত আশাবাদী লেখক। অন্তত তাঁর সৃষ্টি 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' উপন্যাসটি এই আশ্বাসই প্রমাণ করেছে। তাঁর কোন আক্ষেপ নেই, সাম্রাজ্যবাদ হারাবার আশংকা নেই। 'নেভার দি টোয়েন শ্যাল মীট' এ আক্ষেপ তিনি প্রকাশ করেন নি। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' উপন্যাসের ষাট বছর কেটে গেছে। এক নতুন মাত্রার সংযোজন হয়েছে ইতিমধ্যে। শুধু ইংল্যাণ্ড বা ইওরোপ নয়, মুক্তিকামী সারা বিশ্ব চেয়ে আছে এই 'প্যাসেজের' দিকে। উপন্যাসটির সার্থকতা এখানেই। সমকালীন পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসে এক আধুনিক ক্লাসিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' উপন্যাস। সম্প্রতি বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ডেভিড লীন উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়ন করেছেন। ইতিমধ্যেই বিদেশে সমাদৃত হয়েছে এর চলচ্চিত্র রূপ। এইসব কারণেই উপন্যাসটি নিয়ে এ কালের পাঠকের যথেষ্ট কৌতূহল দেখা দিয়েছে।

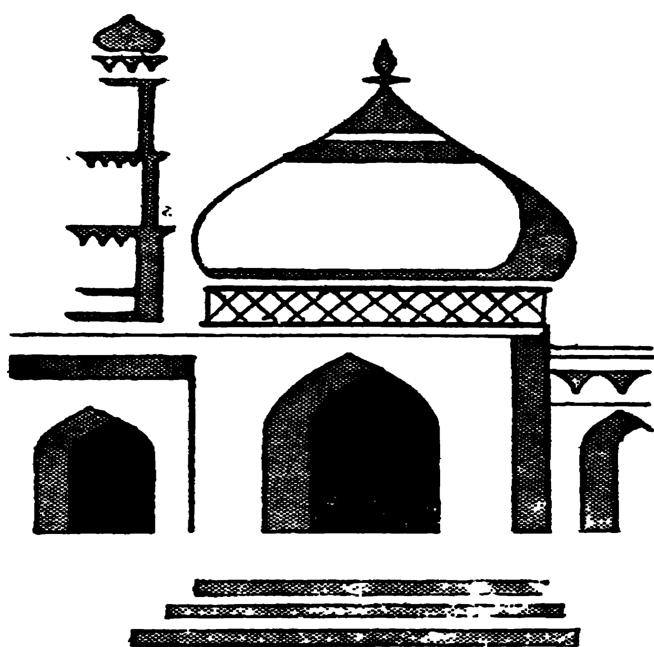
'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' ছাড়াও ফরস্টার আরও পাঁচটি বিখ্যাত উপন্যাসের রচয়িতা। সেগুলি যথাক্রমে 'হাওয়ার্ডস এণ্ড,' 'দি লংগেস্ট জার্নি,' 'এ রুম উইথ এ ভিউ', 'হিলস্ অফ দেবী' 'হোয়ার এঞ্জেলস ফীয়ার টু ট্রেড (Tread)।' অনেকগুলি ছোটগল্পের লেখক তিনি। গল্পগুলি আছে একটি সংকলন গ্রন্থে। (কলেক্টেড্ শর্ট স্টোরিস) লিখেছেন দুটি জীবনী গ্রন্থ এবং একটি ভ্রমণ গ্রন্থ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধকালীন রেডক্রশের কাজে তাঁকে আলেকজান্দ্রিয়া সফরে যেতে হয়েছিল। এই স্বল্পকালীন প্রবাস জীবনের উপর লেখা এই ভ্রমণ গ্রন্থটি। সম্প্রতি এই মহান লেখকের জীবনাবসান হয়েছে। ষাট বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু যাত্রা সম্পূর্ণ হয় নি। হয়ত ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু অখণ্ড সত্তা নিয়ে নয়। দেশ খণ্ডিত হয়েছে জীবনে জীবন মেলেনি। ব্যবধান আরও দুর্লঙ্ঘ্য হয়েছে। তাই কি অশীতিপর প্রবীণ লেখক যাত্রা সফলের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন পরবর্তী কালের পৃথিবীর উপর—বিবেকহীন আমাদের উপর? অলমতি বিস্তরেণ।

রবিশেখর সেনগুপ্ত

এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া

মসজিদ

প্রথম অধ্যায়



১

বিশ মাইল দূরে অবস্থিত মাড়াবার গিরিগুহা ছাড়া চন্দ্রপুরের আর কোন আকর্ষণ নেই। শহরের ধার ছুঁয়ে গেছে গঙ্গা। বেশ কয়েক মাইল ধরে প্রবাহিতা হয়েছে নদী এবং অকৃপণ উদারতায় নদীতীরে আবর্জনা ফেলেছে। ফলে নদীতীরের আলাদা সতীত্ব নেই। গঙ্গায় কোন স্নানঘাট নেই, কারণ গঙ্গা এখানে পতিতপাবনী নয়। নদীর কোন সৌন্দর্য নেই। চন্দ্রপুর বাগানের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে নদীর দুপাশের বিস্তীর্ণ দৃশ্যাবলী। শহরের রাস্তা সরু। কয়েকটা মন্দির আছে বাগানের মধ্যে। কিন্তু বিগ্রহ না থাকায় সেগুলোর ব্যবহার হয় না। সুন্দর কয়েকটা বাড়ি আছে। কিন্তু চট করে নজরে পড়ে না। হয় গাছ-গাছালির আড়ালে ঢাকা পড়েছে, নয়তো জমে থাকা আবর্জনার পচা গন্ধ পেরিয়ে কেউ সেখানে পৌঁছয় না। চন্দ্রপুর কখনই বড় বা সুন্দর শহর ছিল না। এখনও তার কৌলিন্য নেই। তবে উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত অব্দি যে রাজপথটা চলে গেছে শহরের অবস্থান তারই ধারে। দুশো বছর আগে এই সড়কের ধারে চন্দ্রপুর শহরটা কিছুটা সম্ভ্রম আদায় করতো। বাড়িগুলো সে আমলেই তৈরি। তখন থেকেই সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে রাখার ঝোঁক কমে গিয়েছিল। তাছাড়া গণতান্ত্রিক উপায়ে সব অঞ্চল সমান-ভাবে গড়েও তোলা হয় নি। সেই থেকে চন্দ্রপুরের বেহাল অবস্থা। কাঠের দেওয়ালগুলো মনে হয় যেন কাদালেপা। এত খেলো আর একঘেয়ে শহরের চেহারা যে দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। কোথাও ঢিবি কোথাও সমতল। কোন ছিরি-ছাঁদ নেই। বর্ষায় দুকূল ছাপিয়ে যখন গঙ্গায় ঢল নাবে তখন সবাই কামনা করে শহরের উঁচু জায়গাগুলো জলের স্রোতে ভেসে যাক। কিন্তু তা হয় না। স্রোতের তোড়ে মানুষ ডুবে মরে, ঘরবাড়ি ভেসে যায় কিন্তু শহরের রূপ-রেখার কোন বদল হয় না। আগের মতোই কোথাও স্ফীত কোথাও সঙ্কুচিত, ঠিক যেন অন্ত্যজ একটা প্রাণী। তার বৃদ্ধি নেই, বিনাশও নেই।

কিন্তু শহরের ভেতরের ছবি অন্যরকম। সেখানে নিত্য বদলের প্রত্যাশা। ডিম্বাকার একটা মাঠ আছে, চন্দ্রপুরের ময়দান। একটা হাসপাতাল আছে। রেল স্টেশনের পাশের উঁচু জমির ওপর সায়েবদের বাড়ি। রেল লাইনের পাশাপাশি বয়ে চলেছে নদী। জমি কোথাও নেবেছে কোথাও খাড়া উঠেছে। এইরকম এক খাড়া জমির ওপর সিভিল লাইন্স্ থেকে চন্দ্রপুরকে অত্যন্ত অগোছালো দেখায়। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কিছু বন্যবৃক্ষের সমাহার আর কিছু মাটির ঘর, এই নিয়ে চন্দ্রপুর। উপর থেকে বাজারটা স্পষ্ট দেখা

যায় না। কারণ বৃক্ষরাজির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে সেটা। মজা পুকুরের পাড় আর ভাঙাচোরা মন্দিরের গা ফেটে উঠেছে শিশু গাছ—তাল নিম আর আম। বাঁচার তাগিদে আর আলো বাতাসের লোভে মাথা তুলেছে শিশু-গাছেরা। ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে. একে অপরকে আশ্লেষে জড়িয়ে ধরেছে এবং অসংখ্য বিহগকুলের সুখনীড় রচনা করেছে। বর্ষার আগমনে এইসব বৃক্ষরাজি তাদের ঘন আর পরুষ্টু পাতার আবরণ দিয়ে নিচুতলার অগৌরব লুকিয়ে রাখে। আবার গ্রীষ্মের দারুণ অগ্নিবাণে দগ্ধ ধরিত্রী শ্যামল সুন্দরের সঙ্গসুধায় যেন নতুন প্রাণ লাভ করে। ছায়াসুনিবিড় সে পরিবেশ এত প্রীতিসুখকর, মনোরম যে কোন নবাগত ইংরেজের কাছেও চন্দ্রপুর অকিঞ্চিৎকর ঠেকে না। যতদিন না সে নিচুতলায় বিতাড়িত হচ্ছে ততদিন অব্দি চন্দ্রপুর সম্বন্ধে তার মুগ্ধতা কাটে না। অবশ্য সিভিল লাইন্‌স্‌-এর নিজস্ব কোন রূপ নেই। সে যেমন কাউকে কাছে ডাকে না তেমনি দূরেও ঠেলে দেয় না। তবে একটা যুক্তিগ্রাহ্য বিন্যাস আছে তার অলঙ্করণে। লাল ইঁটের তৈরি সিভিলিয়ানদের একটা ক্লাববাড়ি আছে—একটা স্টেশনারী দোকান আছে, আর আছে একটা গোরস্থান। সায়েবদের বাংলোর বাড়িগুলো রাস্তার ধারে পরপর সাজানো। রাস্তাগুলো সমকোণে পরস্পরকে কাটাকুটি করেছে। কোথাও উৎকট শ্রীহীন নয় এদের অঙ্গসাজ। বরং সব মিলিয়ে একটা ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন চেহারার ছাপ আছে। চন্দ্রপুরের নিচুতলার সঙ্গে কোথাও তার মিল নেই। আকাশের চাঁদোয়া ছাড়া পরে কিছুই সে নিচুতলার সঙ্গে ভাগ করে নেয় নি।

সিভিল লাইন্‌স্‌-এর মতন চন্দ্রপুরের আকাশেরও চেহারা নিত্য বদলায়। তবে গাছপালা নদীর মতন এই বদল তেমন সুস্পষ্ট নয়। মাঝে মাঝে ঢাকা হলেও চন্দ্রপুরের আকাশের বুকে একটা রঙের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। দিনের বেলায় আকাশের প্রধান রঙ নীল। তখন দিগন্তের কাছে এই নীল রঙ ফিকে সাদা দেখায়। সূর্যাস্তের পরে তার অন্যরূপ। দিগন্তের কমলা রঙ উপরের দিকে যত ওঠে ততই হাল্কা পাটল আভা ধারণ করে। অধিক রাতের আকাশের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। তখন টিকে থাকে তার মূল নীল রঙটি। আলোর মালার মতন নক্ষত্রগুলি তখন আকাশ থেকে ঝোলে। তবে আকাশ ও নক্ষত্রের মধ্যে দূরত্বের চেয়ে মহাশূন্যের দূরত্ব আরও বেশি। আরও দূরে সেই মহাশূন্যে আকাশের কোন রঙ নেই।

চন্দ্রপুরের ভাগ্যনিয়ন্তা আকাশ। মানুষ পরিবেশ সবকিছুর ভাগ্য নির্ধারণ করে আকাশ। শুধু জলবাতাস বা ঋতুবদল নয়. ধরিত্রী কেমন সুন্দরী হবে তাও স্থির করে আকাশ। আকাশ যখন উদার বারিধারায় স্নিগ্ধ করে চন্দ্রপুরের মাটি, তখন মনে হয় যেন দিগন্তের এক দিক থেকে অন্য দিক পর্যন্ত অপর্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আকাশের আশীর্বাণী। মহৎ ও বীর্যবান বলেই আকাশ এত দিতে পারে। প্রতিদিন সূর্য থেকে আহরিত তেজ শায়িতা পৃথিবীর বুকের মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে। তবুও শায়িতা ধরিত্রী অকলঙ্কিতা। মাইলের পর মাইল সমতল ধরিত্রী এইভাবে নিশ্চিন্ত শায়িত। এই সীমাহীন ব্যাপ্তি

বাধা পেয়েছে একেবারে দক্ষিণ দিগন্তে যেখানে স্ফীত হয়েছে ধরিত্রী। মনে হয় শায়িতা ধরিত্রীর শিথিল হাতের মুঠি শূন্যে উঠেছে যেন। কুমারী নারীর স্পন্দিত বক্ষোদেশের মতন এই স্ফীতিটুকুই হলো মাড়াবার শৈলশ্রেণী। এখানেই আছে সেই বিস্ময়কর গিরিকন্দর এবং চন্দ্রপুরের একমাত্র আকর্ষণ।

২

কেউ ধরার আগেই সাইকেলখানা ছেড়ে দিল আজিজ। তারপর বারান্দার ওপর লাফিয়ে উত্তেজনায় চেঁচাতে লাগলো।

'হামিদ্! আমি কি খুব দেরি করে ফেলেছি?'

সাইকেল পড়ার শব্দে চমকে উঠলেও হামিদ্উল্লা জানতো কি ঘটেছে। তাই ঘরের ভেতর থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে বললো, 'চলে আয়! লজ্জার কোন কারণ নেই। কারণ তুই লেট্ লতিফ।'

'সে কথা নয়। দয়া করে বলো আমার ভাগের খাবার আছে কি না। যদি না থাকে তবে এখুনি খাবারের সন্ধানে বেরুতে হবে। তা আলি সাহেব কেমন আছ?'

'ছিলাম তো ভালই। তবে এখন মরতে বসেছি।' বললো মহম্মদ আলি।

'আরে বাপ্! তা খেয়ে দেয়ে অন্তত মরো!'

আলি বললো, 'বললুম মরতে বসেছি। এখনো মরি নি। তবে হামিদ সত্যি সত্যি মরে গেছে। একটু আগে যখন তুমি সাইকেলে চড়ে আসছ তখনই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে।'

'বটে!'

'ঠিক তাই।' বললো হামিদ। আরও বললো, 'শোন্! আমরা এখন আর একটা পৃথিবী থেকে কথা বলছি। এ-পৃথিবীটা খুব মজার জায়গা রে!'

'তাই নাকি! তা এই নতুন পৃথিবীতে তামাকু সেবনের ব্যবস্থা আছে তো?' যদি যায় তো.........হুঁকোটা?'

ধমকে উঠলো হামিদ্উল্লা। 'বাজে বকিস না আজিজ। আমরা এখন গভীর-ভাবে একটা বিষণ্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছি।'

যথারীতি হুঁকোটি আজিজের হাতে তখন চলে এসেছে এবং আকণ্ঠ ঠাসা যন্ত্রটি থেকে কোন ধূম নির্গত হচ্ছে না। হামিদের বাড়ির এটাই রীতি। সব সময় হুঁকোর মেজাজ চড়িয়ে রাখা। সুতরাং হুঁকোর মেজাজ শান্ত করতে আজিজ সচেষ্ট হলো। অবশেষে হুঁকোবাবাজী প্রসন্ন হলেন। তামাকের ধোঁয়া ফিনকি দিয়ে আজিজের ফুসফুসে ঢুকলো এবং বাজার থেকে বয়ে আনা পোড়া ঘুঁটের জমানো ধোঁয়া টেনে বের করে আনলো তার বুক থেকে। আঃ! কি আরাম! পরম তৃপ্তিতে চোখ দুটি বুজে আসছিল আজিজের। মন

ততক্ষণে পৌঁছে এই অতীন্দ্রিয়লোকে। তবে একেবারে চৈতন্যহীন সে হলো না। হামিদ আর আলির কথাবার্তা সবই তার কানে ঢুকছিল। ওদের কথাবার্তা থেকেই সে বুঝতে পারলো তেমন কোন গভীর দুঃখের কথা ওরা আলোচনা করছে না। ওরা বলাবলি করছিল কোন ইংরেজের সঙ্গে বেশি মাখামাখি হওয়া ভাল না মন্দ। আলির মতে ভাল নয়। তবে হামিদ্‌উল্লার মতামত ততটা উগ্র নয়। সরাসরি সংঘর্ষ সে কখনও চায় না। কারো সঙ্গেই নয়। চওড়া বারান্দার ওপর আড় হয়ে শুয়ে আছে সবাই। চোখের ওপর ঝলমল করছে চাঁদটা। উপাদেয় খানা তৈরির স্বাদু গন্ধে ভরপুর হয়ে গেছে জায়গাটা। ভৃত্যেরা রাতের 'খানা' পাকাচ্ছে। গুনগুন করে গান গাইছে এবং কোথাও কোন বিষণ্ণতা নেই। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত দুঃখ পাবার মতন কোন কারণও ঘটে নি।

আলি বলছিল, 'আজ সকালবেলার অভিজ্ঞতার কথাই ধরো। আমি ভাবতেই পারি নি......'

তাকে থামিয়ে হামিদ্‌ বললো, 'তুমি যেমনটি চাইছ তা এদেশের মাটিতে আশা করো না। বিলেতেই সম্ভব তা।'

বস্তুত বিলেত যাবার হুড়োহুড়ি শুরু হবার অনেক আগেই হামিদ বিলেত ঘুরে এসেছে। ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্য-বোধের সুখকর স্মৃতির কথা সে তখনও ভুলে যায় নি।

আলিও তা স্বীকার করল। বলল, 'তা ঠিক। এখানে ভদ্রতা আন্তরিকতা আশা করা উচিত নয়। আজিজ ! জানো ! লালনেকো ইংরেজ ছোঁড়াটা আজ আদালতে আমায় অপমান করেছে। অবশ্য এটা তার দোষ নয়। যেমন শিখিয়েছে তেমনি লিখেছে। কিছুদিন আগেও ছোঁড়াটা আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতো। এখন ও পুরোপুরি ওদের খপ্পরে।'

হামিদেরও ওই মত। মাথা নেড়ে বললো, 'ঠিক বলেছ। এখানে ওদের ভবিষ্যৎ নেই। মানে ভদ্র থাকার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য ভদ্র থাকবে বলেই প্রতিজ্ঞা করে ওরা আসে। কিন্তু ওদের শেখানো হয় উল্টোটি। ও তুমি লেস্‌লী বলো, ব্ল্যাকিস্‌টন বলো, লালনেকো ছোঁড়া বলো, সবাই এক। এরপর পালা ফীলডিং-এর। দেখবে সেও ভদ্রলোক নয়। আরে! টার্‌টন্‌ যখন এদেশে প্রথম এল, তখন সে একেবারে অন্য মানুষ। কি ভদ্র, অমায়িক ! একসঙ্গে গাড়ি চড়ে ঘুরেছি। রীতিমত বন্ধু ছিলাম আমরা। আমায় ওঁর স্ট্যাম্প এ্যাল্‌বাম দেখিয়েছে। কি দারুণ কালেক্‌শন !

আলি ব্যঙ্গ করলো। বললো, 'এখন হলে এ্যালবামটা তোমায় দেখাতো না।'

'কেন ?'

'যদি চুরি করো। তবে তোমার ওই টার্‌টন্‌ বোধহয় লালনেকো ছোঁড়াটার চেয়ে কিছুটা ভাল। মানে ভদ্র।'

'ভুল কথা আলি। ওরা কেউ ভালও নয়, মন্দও নয়। সবাই সমান।' একটু চুপ করল হামিদ্‌উল্লা। তারপর সবজান্তার মতন বললো, 'শোনো আলি ! টার্‌টন্‌ হ'ক আর বার্‌টন্‌ হ'ক, একজন ইংরেজ যুবক বছর দুয়েক ভালো থাকে।

তারপর মুড়ি মিছরি সব এক। তবে ছেলেদের বেলায় যেটা দু'বছর, মেয়েদের বেলায় সেটা দু'মাস। তারপর সব সমান। ঠিক বলি নি?'

'না, বলো নি।' বেশ জোর দিয়ে অস্বীকার করল আলি। তারপর সকৌতুকে বললো, 'ওরা মোটেই একরকম নয়। হতেই পারে না, অন্তত আমার চোখে ওদের মধ্যে তফাৎটা বেশ গভীর।' আলির সকৌতুক মন্তব্যটা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল হামিদ। আলি বললো, 'তফাৎটা বুঝিয়ে বলছি। লাল-নেকো ছোঁড়াটা এমনভাবে চিবিয়ে কথা বলে যে স্পষ্ট বোঝা যায় না। টার্টনের কথা অবশ্য খুব পরিষ্কার একটুও জড়তা নেই। কিন্তু মিসেস টার্টনের স্বভাবটা ছোঁকছোঁকে। ভদ্রমহিলা ঘুষখোর। মিসেস লালনেকো সম্বন্ধে অবশ্যি এখনই কোন মন্তব্য করা উচিত নয়। কারণ তিনি গিন্নী হন নি।'

'মিসেস টার্টন্ ঘুষখোর?' একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল।

'কেন, তুমি জানতে না তা? কর্তাগিন্নী যখন মধ্যভারতে একটা খালের স্কীম দেখতে গিয়েছিলো, তখন একজন হিন্দুরাজা গিন্নীমাকে একটা সোনার সেলাইকল উপহার দেয়।'

'কেন?'

'যাতে খালের জল তার স্টেটের মধ্যে দিয়ে যায়।'

'তাই নাকি? তা খালটা তাঁর স্টেটের মধ্যে দিয়ে গেছে?'

'না।' হামিদের বিস্ময়ের ভাবটা লক্ষ্য করে আলি ব্যাখ্যা করে বললো, 'শোনো হামিদ। মিসেস টার্টন্ হিসেবী মেমসায়েব। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর বউ। সুতরাং তাঁর বোকা হওয়া সাজে না।' ব্যাপারটা আর কিছু স্পষ্ট করলো আলি। বললো, 'আমরা, অর্থাৎ নেটীভরা যেমন ঘুষ নিই তেমনি কাজটাও করি। তাই আইনের চোখ ফাঁকি দিতে পারি না। ইংরেজরা ঘুষ নেয় ঠিক কিন্তু কাজটাও করে না। ফলে আইনও তাদের ছুঁতে পারে না। কী? ব্যাপারটা চমৎকার নয়? আমি কিন্তু ওদের এই গুণের খুব কদর করি।'

'তুমি শুধু একা নও ব্রাদার, আমরাও করি।' বললো হামিদ। তারপর আজিজের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'বাবা আজিজ! হুঁকোর অধিকারটা এবার ছাড়বে?'

'উহুঁ! এখনই নয়। আমার হাতে হুঁকো এখন খুব খেলছে।' চোখ বুজে জবাব দিল আজিজ। হামিদ্ কপট রাগ করলো। বললো, 'তুই 'তো' ভারি স্বার্থপর রে?' আজিজকে কথাটা বলেই ভৃত্যদের উদ্দেশে সে চেঁচিয়ে উঠলো। জানতে চাইলো 'খানা' তৈরি কি না। ভৃত্যেরাও চেঁচিয়ে জানাল যে 'খানা' তৈরি। প্রভুও এই উত্তরটাই আশা করেছিল। অর্থাৎ প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে এই যোগাযোগটুকু সর্বদাই কাম্য এবং বাঞ্ছিত। তাই ভুল বোঝা-বুঝি হয় না এবং ওরাও তাড়া না দেখিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আলোচনায় বসে গেল। হামিদ্উল্লা এবার অন্য কায়দায় আলোচনা শুরু করলো। 'হিউজ ব্যানিস্টারের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ। এখন সে ছটফটে ইয়ং ম্যান। কিন্তু আমি যখন ইংল্যাণ্ডে যাই হিউজ তখন এতটুকুনটি। আমার কোলে কাঁধে

ঘুরে বেড়াত। অবশ্য ও একা নয়। ওর অন্য ভাইবোনেরও দেখাশোনার ভার আমার ওপর ছিল। রেভারেণ্ড ব্যানিস্টার এবং তাঁর সহৃদয়া স্ত্রী বিশ্বাস করে আমার ওপর তাঁদের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওঁদের ব্যবহার কি সদয় আর মিষ্টি ছিল! যেন আমি ওঁদেরই ছেলে। ছুটির সময় ওঁদের ইস্কুল কম্পাউণ্ডেই আমার দিন কাটতো। একদিন বেশ মজা হল। কুইন ভিক্টোরিয়ার শোক মিছিল বেরিয়েছে। দারুণ ভিড় মিছিলে। হিউজ খুব বায়না ধরেছে, মিছিল দেখবে। তখন দুহাতে মাথার ওপর তুলে ওকে মিছিল দেখালুম।'

হঠাৎ মহম্মদ আলি বাধা দিয়ে বললো, 'রানী ভিক্টোরিয়ার কথা বাদ দাও। উনি সম্পূর্ণ অন্য ধাতের মানুষ।'

হামিদ সে কথায় কান দিল না। সে তখনো স্মৃতি হাতড়ে আগের ঘটনার কথাই বলে যাচ্ছিল। হামিদ বললো, 'শুনলুম সেই হিউজ ছোকরা এখন কানপুরে চামড়ার ব্যবসা করে। বেশ বড়সড় ব্যবসা। মাঝে মাঝে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। আমার এখানকার বাড়ি তো আসলে তারই বাড়ি। কিন্তু ভরসা পাই না। ফিরিঙ্গি ছোঁড়াগুলো ইতিমধ্যেই তাকে কব্জা করে ফেলেছে ও কথা তুললে ভাববে অনুগ্রহ চাইতে এসেছি। তখন মুখ দেখাতেও পারবো না। আচ্ছা উকিল সাহেব, বলুন তো কেন এমনটা হয়? এদেশে এসে ওরা এরকম হয়ে যায় কেন?'

এতক্ষণ ভুড়ুক ভুড়ুক করে হুঁকো টানছিল আজিজ। একটা কথাও বলে নি। এখন হুঁকো টানা থামিয়ে হঠাৎ বলে উঠলো, 'শুধু ইংরেজদের দোষ দিয়ে কি লাভ? আমরাই বা কি? হয় বন্ধু নয়ত মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ। ওসব কথা ছেড়ে দাও ভাই। মনে করো যে, সবাই কুইন্ ভিক্টোরিয়া বা মিসেস ব্যানিস্টার নয়। তাছাড়া ওঁরাও তো মরে হেজে গেছেন।

হামিদ আপত্তি করলো। জোর দিয়ে বললো, 'না। না। আমি তা মানি না। আমি অন্য মানুষদের সঙ্গেও মিশেছি।'

'আমিও মিশেছি।' অপ্রত্যাশিতভাবে হেঁকে উঠল মহম্মদ আলি। তবে আলোচনার প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল সে। বললো, 'ওদের মেয়েরা কেউ একরকম নয়। সবাই আলাদা।' বলা বাহুল্য সবার অজান্তেই আলোচনাটা তখন মহিলাসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। ইংরেজ মহিলারা যে কত ভদ্র অমায়িক তারই প্রতিষ্ঠা নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল ওদের মধ্যে। একজন বললো, "সেদিন ভদ্রমহিলা অত্যন্ত ভদ্রভাবে আমায় ধন্যবাদ দিলেন।" আর একজন বললো, "গলার মধ্যে ধুলো ঢুকে জ্বালা করছিল গলা। তাই আমায় উনি একটা লজেন্স দিলেন।" ইত্যাদি। হামিদ্উল্লা বিলেত গিয়েছিল। সত্যিকার বিলিতী মেয়েদের সে দেখেছে। তার পক্ষে নারীর মহত্ত্বের অনেক পরিচয়ই দেওয়া সম্ভব। কিন্তু ফিরিঙ্গি ছাড়া অন্য মেয়েদের দেখে নি আলি। মেশেও নি অন্য মেয়েদের সঙ্গে। তাই স্মৃতি তোলপাড় করেও মহত্ত্বের কোন জুৎসই দৃষ্টান্ত সে দিতে পারলো না। সুতরাং প্রত্যাশিতভাবেই আলি তার পুরোনো ধারণায় ফিরে গেল এবং সদম্ভে বললো, 'অবশ্য যাদের কথা হলো,

তারা সবাই ব্যতিক্রম এবং কে না জানে যে, ব্যতিক্রম নিয়ম নয়! গড়ে ইংরেজ মহিলারা সবাই এক একটি মিসেস টার্‌টন্‌। এবং আজিজ তুমি ভাল করেই জানো তিনি কি চিজ্‌!' আজিজ অত স্পষ্ট করে জানতো না বটে, তবে অস্বীকারও করলো না। পরাধীন জাতির হতাশা থেকে সে নিজেও সবাইকে এক শ্রেণীভুক্ত করে ফেলেছে। তাকে স্বীকার করতেই হলো যে কয়েকজনকে বাদ দিলেও বেশিরভাগ ইংরেজ মহিলাই অত্যন্ত উদ্ধত বদমেজাজী এবং স্বভাবে নীচ। বলা বাহুল্য ওদের আলোচনা থেকে সেই সরস মসৃণ দীপ্তি-টুকু তখন চলে গেছে এবং আলাপটা হয়ে উঠেছে শীতের বাতাসের মতন রুক্ষ এবং কঠিন।

ঠিক তখনই ভৃত্য জানালো যে 'খানা' প্রস্তুত। ওরা তখন রাজনীতি আলোচনা করছিল। বয়স্ক পুরুষের এই আলোচনায় চিরন্তন আকর্ষণ, তাই অনায়াসেই এই ডাক তারা উপেক্ষা করতে পারলো। কিন্তু রাজনীতির আলোচনা আজিজের ভাল লাগছিল না। সে একরকম জোর করে বাগানে গেল। গাছের শরীর থেকে বেরোচ্ছে একটা মিষ্টি গন্ধ। আজিজ প্রায় মোহিত হয়ে গেল গন্ধটা পেয়ে। চাঁপা ফুলের গন্ধটাও ভাল লাগছে। কেমন যেন নেশার ঘোর লাগছে এখন। একটা ফার্‌সী কবিতা মাথায় ঘুরঘুর করছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে রান্নার স্বাদ। তাই বেশিক্ষণ বাগানে থাকতে পারলো না। ঘরে এসে দেখলো আলি নেই। সহিসের সঙ্গে কথা বলতে বেরিয়েছে। হামিদ্‌ তাকে তার বিবির কাছে নিয়ে গেল। হামিদ্‌উল্লার বিবি আজিজের সম্পর্কিত চাচী। চন্দ্রপুরে ইনিই তার একমাত্র মহিলা আত্মীয়া। পর্দানশীন চাচীর ঘরে প্রায় মিনিট কুড়ি কাটালো আজিজ। মহিলার অনেক নালিশের কথাই শুনতে হচ্ছিল আজিজকে। সম্প্রতি পারিবারিক এক ছুন্নত্‌ পরবে নাকি বাঞ্ছিত জাঁকজমক হয় নি। এই নিয়ে মহিলার বিস্তর অভিযোগ। কিন্তু মহিলার হৃদয়ের কথা শোনার কেউ নেই। তাই আজিজকেই শুনতে হচ্ছিল। বিবির ঘর থেকে পালিয়ে আসারও পথ নেই। যতক্ষণ না পুরুষদের ভোজনপর্ব শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বেগমসাহেবাও অভুক্ত থাকবেন এবং তাঁর অভিযোগও দীর্ঘায়িত হবে। যাহক, এক সময় চাচীর অভিযোগ শেষ হলো এবং স্নেহ-পরবশ চাচীর মনে হলো যে, আজিজের আবার বিয়ে করা উচিত।

কিঞ্চিৎ বিব্রত হলেও যথাসম্ভব সম্ভ্রম বজায় রেখে আজিজ বললো, 'একবার হয়েছে, এই ঢের!'

হামিদ্‌উল্লাও তাকে সমর্থন করলো। বললো, 'ঠিক তাই। ওর কর্তব্য ও করেছে। আর ওকে বিরক্ত করো না। বেচারাকে এখন সংসার দেখতে হবে। তিন ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হবে।'

আজিজ বললো, 'শোনো চাচী! ওরা ওদের দিদিমার কাছে খুব সুখে আছে। আমার যখন ইচ্ছে হয় ওদের দেখে আসি। তাছাড়া খুবই ছোট ওরা এখন।' হামিদ মাথা নেড়ে সায় দিল। বললো. 'মাইনের পুরো টাকাটা ছেলেমেয়েদের জন্যে পাঠিয়ে দেয় আজিজ। আর এখানে থাকে নেহাৎ কেরানীর মতন। আর কি করতে বলো ওকে?'

কিন্তু বেগমসাহেবার বক্তব্য তা নয়। তিনি সবিনয়ে যা বলতে চাইলেন, তা হলো, 'ছেলেরা সবাই যদি বিয়েতে আপত্তি করে তাহলে মেয়েরা কি করবে? হয় বয়সে যারা ছোট তাদের বিয়ে করবে, নয়ত...।' বেগমসাহেবা তখন বহু-বার বলা সেই নবাবী গল্প শোনাতে বসলেন। নবাবী অহঙ্কারের দরুন নাকি সারা জীবনে মেয়েটির বর জোটে নি। বরহীন এই বর্বর অবস্থার চেয়ে করুণ অবস্থা মেয়েদের জীবনে আর কী হতে পারে? ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েটার বর জুটলো না। হয়ত জুটবেও না, কোনদিন। মরার দিন অব্দি মেয়েটাকে একাই কাটাতে হবে। গল্পটা শুনতে শুনতে দুজন পুরুষ মানুষই উপলব্ধি করলো যে মেয়েদের জীবনের এই অভাবটা খুবই করুণ এবং সমাজের পক্ষে ব্যাপারটা বেশ কলঙ্কজনক। এর চেয়ে পুরুষের বহুবিবাহ ঢের ভাল। তাতে অন্তত নারীকে সারাজীবন অবাঞ্ছিত একা একা কাটাতে হবে না। পুরুষের বাহুবন্ধনের মধ্যেই নারীর জীবনের চরম সুখ। আর সে সুখী হয় মাতৃত্বে এবং সংসারের কর্ত্রীত্বে। এটা ঈশ্বরের দান। তবে কেন নারীকে ঈশ্বরের করুণা থেকে বঞ্চিত করা হবে? নারীর জন্ম তো এইজন্যেই? এবং যে পুরুষ তাকে বঞ্চিত করে সে কি জীবনের শেষ দিনটিতে ঈশ্বরের মুখো-মুখি হবার স্পর্ধা রাখতে পারবে? বেগমসাহেবার এমন মর্মস্পর্শী অনুনয়ের সামনে আজিজের দায়সারা জবাবটা খুবই খেলো শোনাল। কোনরকমে ঢোক গিলে সে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল বটে। কিন্তু শেষ হবার আগেই হামিদ যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। আজিজের দিকে চেয়ে বললো, 'যেটা তুমি উচিত বলে ভাববে সেটা পালন না করাটা অন্যায়। এটাই আমাদের চরিত্রের দোষ ; আর এইজন্যেই ভারতের আজ এই দুরবস্থা।' কিন্তু কথাটা বলার পরই হামিদ লক্ষ্য করলো তার যুবক আত্মীয়টির চোখমুখ দুশ্চিন্তায় বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। তখন হতাশা কাটাবার জন্যে দুএকটা সান্ত্বনার কথা তাকে বলতেই হলো। বেচারার ওপর থেকে তার স্ত্রীর প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফলটা সম্পূর্ণ মুছে না ফেলা অব্দি হামিদও যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না।

ওরা যখন বেগমসাহেবার ঘরে, তখন মহম্মদ আলি একটুকরো কাগজে লিখে গিয়েছিল যে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে আসছে। কিন্তু আলির জন্যে ওরা কেউ অপেক্ষা করলো না। বরং হামিদের এক দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই লতিফকে নিয়ে খেতে বসে গেল। মহম্মদ লতিফ এই পরিবারের আশ্রিত ; পদমর্যাদায় সে ভৃত্য নয় আবার পরিবারের একজনও নয়। সুতরাং জিজ্ঞাসিত না হলে সে যেচে কথা বলে না। আজকের খানাপিনার আসরে স্বয়ং হামিদ্-উল্লার উপস্থিতির সামনে মহম্মদ লতিফের আশ্চর্য রকমের মৌনীভাবটা খুব অপ্রীতিকর মনে হচ্ছিল না। অবশ্য কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেসও করে নি। তবে কথা না বললেও গুরুপাক রান্নার সমাদর করে সে মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা ঢেকুর তুলছিল। মোটামুটি হাসিখুশি শান্ত স্বভাবের এই বৃদ্ধটি কিন্তু জীবনভর কুটোটি নাড়ে নি। আত্মীয়-স্বজনদের কেউ না কেউ বৃদ্ধকে একবার না একবার আশ্রয় দিয়েছে। এবং যেহেতু কোনো সংসারই হঠাৎ দেউলে হয় না, তাই বৃদ্ধ এখনও পর্যন্ত গৃহহীন হয় নি, বৃদ্ধের

বিবিরও একই অবস্থা। কয়েক'শ মাইল দূরে সেও এমনি আর এক সংসারের আশ্রিতা। দুই মেরুতে দুজনে পরমানন্দে পরাভূত জীবন-যাপন করছে। দেখা-সাক্ষাৎ নেই। কারণ রেলভাড়া দিয়ে বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সামর্থ্য বৃদ্ধের নেই। অথচ সম্পর্কের দিক দিয়ে দুজনে কত ঘনিষ্ঠ। মানুষটাকে আজিজ পছন্দ করে। প্রধান কারণ লোকটার কাব্যপ্রীতি। খেতে খেতে লতিফকে উসকে দিল আজিজ। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ফার্সী উর্দু কাব্যের ঝরণা। লোকটার স্মরণশক্তি ভাল। সারা জীবনে পড়েছেও ঢের। তাই মনে আছে সব। অবশ্য কাব্যপাঠে কিছু পক্ষপাত আছে মহম্মদ লতিফের। তার পছন্দের বিষয় দুটি। এক; ইসলামের অবক্ষয়; দুই, প্রেমের অনিত্যতা। তার ধারণা সংসারে প্রেম চিরকাল টিকে থাকে না। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে তার আবৃত্তি। এখানকার মানুষ কাব্য বিচারে পশ্চিমী মানুষদের মতন অত খুঁতখুঁতে নয়। শুনতে ভাল লাগলেই হ'ল। তাই তারা বিরক্ত হয় না। ইংল্যাণ্ডের মানুষ ঠিক বিপরীত। তারা কাব্যের বিচার করে কবির ট্র্যাডিশনের মাপকাঠি দিয়ে। তাই লতিফ যখন কবিতা আবৃত্তি করছিল কেউ তাকে বাধা দিল না। শ্যায়রী কে?—হাফিজ, হালি না ইকবাল, এ' নিয়ে কোন অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশ করলো না। শুধু প্রাণ ভরে রাত্রির ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে কাব্যরসসুধা পান করলো। আজ এই মুহূর্তে একতাহীন খণ্ড খণ্ড শত ভারত যেন অপক্ষপাত চাঁদের আলোয় মাখামাখি হয়ে এক ও অখণ্ড সত্তা নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সবাই ভাবছিল, এই ত তাদের দেশ! এক অখণ্ড এবং ঐশ্বর্যময়ী। কিন্তু হায়! সে ভাষা ভুলিয়া গেছি নাম দোঁহাকার! সেই ঐশ্বর্য, সেই মহত্ত্ব আজ হারিয়ে গেছে। বাতাসে তারই বিলাপধ্বনি। তারা সবাই তখন ভারতবর্ষের সেই যৌবনের দিনগুলোতে ফিরে গেছে; যে যৌবন একবার গেলে আর আসে না। গয়ে রে যৌবন, ফিরি আওত নাহি। সবাই যখন ভারতবর্ষের অতীত ঐশ্বর্যের মধ্যে নিমজ্জিত, তখনই মূর্তিমান রসভঙ্গের মতন লাল উর্দিপরা একজন লোক এসে দাঁড়াল। সিভিল সার্জনের চাপরাসী। লোকটা আজিজের হাতে একটা চিরকুট দিল। লোকটাকে দেখেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল আজিজ। চিরকুটটা দ্রুত পড়ে নিল। তারপর হামিদ্‌উল্লার উদ্দেশে বলল, 'বুড়ো ক্যালেন্ডার ডেকে পাঠিয়েছে। এখুনি তার বাংলোয় গিয়ে দেখা করতে হবে। কিন্তু কেন তা জানাবার ভদ্রতাও লোকটার নেই।'

'বোধহয় কোন শক্ত রুগী এসেছে।'

'কিস্‌সু না। স্রেফ খেয়াল আর ক্ষমতা দেখানো। আমাদের এই খানাপিনার জমায়েতটা পণ্ড করার তাল।'

'হতে পারে। আবার না-ও ত' হতে পারে। এখুনি তুই জানছিস কি করে?' আজিজকে সামলাবার চেষ্টা করছিল হামিদ। যা একগুঁয়ে ছোঁড়াটা! হামিদ আরও বললো, 'শোন্, যাবার আগে পান খাওয়া মুখটা ধুয়ে যাস।'

আজিজ আরও ক্ষেপে উঠল যেন। চিড়বিড় করে বলে উঠলো, 'কেন? সে কি জানে না যে পান খাওয়া আমাদের রীতি। মোটকথা, মুখ ধুয়ে যেতে হলে আমি যাবো না। তারপর লতিফের দিকে চেয়ে বললো, 'আমার বাইকটা

বার করে দাও!'

অতএব লতিফকে উঠতে হলো। আকাশচারী বৃদ্ধের যেন বস্তুলোকে পতন হলো। ততক্ষণে একজন ভৃত্য সাইকেলটা নিয়ে এসেছে। বৃদ্ধ ধরে রইলো সাইকেলটা। আজিজ ততক্ষণে বদনা থেকে জল ঢেলে হাত ধুয়ে নিয়েছে। তারপর মাথায় সবুজ রঙের ফেল্ট টুপিটা পরে হামিদ্‌উল্লার কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে গেল সাঁ সাঁ শব্দে। তার এই চড়া মেজাজ দেখে হামিদের একটু যেন দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। না জানি কি করে বসে গোঁয়ার ছেলেটা! বার দুয়েক চেঁচিয়ে ডাকলো হামিদ্‌উল্লা। 'আজিজ! আজিজ!' কিন্তু কোথায় আজিজ? সে এ তল্লাটেই নেই। ক্রোধোন্মত্ত হয়ে সাইকেল চালিয়ে সে তখন বাজারে পেঁাছে গেছে। তার সাইকেলে আলো নেই, ব্রেক নেই, বেল নেই। না থাকুক। যেখানে আরোহীর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো গাড়ি চেপে গন্তব্যস্থলে পেঁাছানো, সেখানে সংঘর্ষটা নেহাৎই বাহ্যবস্তু। তাছাড়া এত রাতে রাস্তায় লোকজনও নেই। কিন্তু আজিজের চাপা রাগের বহিঃপ্রকাশ সইতে পারলো না তার দ্বি-চক্রযান। খানিকটা গিয়েই টায়ার ফেঁসে গেল। অসহায় আজিজ লাফিয়ে সাইকেল থেকে নেবে পড়লো। আর টঙ্গার উদ্দেশে হাঁকাহাঁকি শুরু করলো।

তখনই টঙ্গা পাওয়া গেল না। তাছাড়া সাইকেলটা এক বন্ধুর বাড়িতে রেখে আসতেও কিছুটা সময় লাগলো। মুখ ধুতেও আরও কিছুটা সময় নষ্ট করলো আজিজ। অবশেষে টঙ্গায় চেপে ঝমঝম শব্দে সিভিল লাইন্‌স্‌-এর দিকে এগোল। সিভিল লাইন্‌স্‌-এর চত্বরে ঢুকেই কেমন যেন মুষড়ে পড়ল আজিজ। ছিমছাম, পরিপাটি পরিবেশ, কিন্তু যেন প্রাণহীন। বড় বড় সেনাপতিদের নামে রাস্তার নামকরণ হয়েছে। সমকোণী রাস্তাগুলো এমনভাবে কাটাকুটি করেছে, যেন মনে হয় সারা অঞ্চলটা জুড়ে একটা ঠাস বুনন জাল পাতা আছে। আজিজের মনে হলো যে, সারা ভারতবর্ষ জুড়েই ইংরেজ এই সাম্রাজ্যবাদের জালটি সযত্নে পেতে রেখেছে এবং এখানে ঢোকা মাত্রেই সেও এই ফাঁদে ধরা পড়লো। মেজর ক্যালেন্ডারের বাংলোর হাতায় ঢোকার আগেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লো আজিজ। একেবারে বাংলোর বারান্দা পর্যন্ত গাড়ি চড়ে যাওয়াটা ধৃষ্টতা হবে ভাবলো সে। এটা যে শুধু তার দাস মনোভাবের প্রকাশ তাই নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভর্ৎসনার আশঙ্কা। কিছুদিন আগেই এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। একজন ভারতীয় গাড়ি হাঁকিয়ে সরাসরি ইংরেজ ওপর-ওলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু ইংরেজ ওপরওয়ালার খাস ভৃত্যেরা লোকটাকে বার করে দেয় এবং সাক্ষাৎপ্রার্থীর উপযুক্ত বিনয় নিয়ে তাকে পুনরাগমন করতে বলে। এরকম ঘটনা একটাই ঘটে। কিন্তু ইচ্ছে করেই ঘটনাটাকে এমনভাবে রাষ্ট্র করে দেওয়া হয়, যাতে ধৃষ্টতা প্রকাশের এমন দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতে না ঘটে। ঘটনাটা মনে ছিল আজিজের। এর অন্ত-র্নিহিত সংকটটুকু সে তাই অস্বীকার করতে পারল না। কুণ্ঠিত আজিজ তাই টঙ্গাওলাকে বারান্দা থেকে কিছুটা দূরে গাড়িটা দাঁড় করাতে বললো।

সিভিল সার্জন মেজর ক্যালেন্ডার যথারীতি অনুপস্থিত। বাংলোয় সে

নেই। আজিজ অবাক। স্তম্ভিতও বলা যায়। মরিয়া হয়ে সে বলল, 'কিন্তু সায়েব যে খবর পাঠিয়েছেন? আমায় দেখা করতে বলেছেন?' তাতে কি? ভৃত্যের সেই নিষ্প্রাণ কঠিন উদাসীন জবাব। 'না। তিনি নেই।' ভেঙে পড়লো আজিজ। কি হবে এখন? যে লোকটা এগুলো নিয়ে গিয়েছিল, তাকে বকশিস করতে ভুলে গেছে আজিজ। তার সেই ভুলটা এখন সুদে আসলে আদায় করতে চায় লোকটা। তাকে ইচ্ছে করেই বিপদে ফেলতে চাইছে সে। অক্ষম আজিজ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তেমন সুবিধে হলো না। হলঘর ভর্তি লোক গিজগিজ করছে। বেশিরভাগই মহিলা। হঠাৎই ওখান থেকে দুজন মহিলা বেরিয়ে এল। একজনের পরনে সান্ধ্য পোশাক। টুপি খুলে আজিজ তাদের অভিবাদন করলো। জায়গাটা আলো আঁধারি। সান্ধ্য পোশাকের মহিলাটি একবার তাকাল আজিজের দিকে। কিন্তু ভারতীয় দেখেই তাচ্ছিল্যে মুখ ঘুরিয়ে পার্শ্ববর্তিনীকে কি যেন বললো। পার্শ্ব-বর্তিনীও অনুরূপ উপেক্ষা দেখিয়ে সামনে তাকাতেই নিরীহ টঙ্গাটি তাদের দুজনেরই চোখে পড়লো। উল্লাসে, লাফিয়ে উঠল প্রথমা মহিলা। 'মিসেস লেস্লী! ওই ত' টাঙ্গাটা ওখানে দাঁড়িয়ে? 'আমাদেরটা?'
'যারই হ'ক। ভগবানের দান নিয়ে নাও।' বলতে বলতে দুজনেই লাফিয়ে টাঙ্গার ওপর উঠে কোচওয়ানকে বললো, 'চলো ক্লাব। আভি চলো।
টাঙ্গাওয়ালাও হতভম্ব। আজিজের দিকে চেয়ে আছে। কি করবে সে এখন? অসহিষ্ণু মহিলারা হেঁকে উঠলো, 'কিয়া ব্যাপার? হাঁদারাম চালাচ্ছে না কেন?'

আজিজ এগিয়ে এসে মহিলাদের আর একবার অভিবাদন করলো। তারপর কোচওয়ানকে বললো, 'যাও! এঁদের ক্লাবে নিয়ে যাও। আমার কাছ থেকে ভাড়াটা কাল নিয়ে নিও।' আজিজের মনের ভার তখন অনেকটা লঘু হয়ে গেছে। কিছু একটার প্রত্যাশা নিয়ে সে মহিলাদের দিকে ফের তাকালো। কিন্তু নিজে-দের নিয়ে ওরা এত ব্যস্ত যে ফিরেও তাকাল না। টাঙ্গা ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে।

অর্থাৎ যা স্বাভাবিক তাই-ই হলো। তাচ্ছিল্য আর উপেক্ষা। একটু আগে আলিও এই কথাটাই বলতে চেয়েছিল। কিন্তু আবেগের দরুন সেটা তারা গায়ে মাখে নি। এখন অনিবার্যভাবেই অপমানের হুলটি ওর গায়ে বিঁধিয়ে গেল মহিলারা গাড়ি ত' হাতছাড়া হলোই, ওর অভিবাদনটাও মাঠে মারা গেল। অবশ্য ঘটনা আরও খারাপ হতে পারতো। সুন্দরী দুজন মহিলাই স্থূলবপু হলে টাঙ্গার পিছনটা ঝুলে পড়ার আশঙ্কা ছিল। সে আর এক বিপত্তি। যা হোক, ওরা বেরিয়ে যেতে পকেট থেকে গোটা কয়েক টাকা বার করে চাকরটাকে দিল আজিজ। তারপর বিনয়ে গদগদ হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু কি বলে গেছেন মেজর সাহেব?' একই উত্তর দিল বটে, তবে রজতমুদ্রার প্রত্যক্ষ প্রভাবটা ইতিমধ্যেই ক্রিয়া শুরু করে দেওয়ায়, উত্তরটা আগের মতন উদ্ধত হ'ল না। বিনয়বচনে লোকটা জানাল যে আধঘণ্টা আগেই মেজর সাহেব চলে গেছেন এবং যাবার আগে আজিজের নামে কোন বার্তাও রেখে যায় নি।

'কিছুই বলে যান নি?'
'আজ্ঞে, একেবারেই যে কিছুই বলেন নি তা নয়।'
'কি বলেছেন?'
'ড্যাম্‌ আজিজ!' উক্তিটা কটু হলেও বিনয়বচনে মুড়ে সেটাকে পেশ করলো লোকটা। আজিজ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়েছিল লোকটার দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হলো বকশিসের মুদ্রামূল্য কমবেশি যাই হ'ক না কেন, আসল বস্তুটি বার করতে যে বকশিস লাগে তা এখনও কোন টাঁকশালে তৈরি হয় নি। স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গেলে আজিজ বললো, 'তাহলে দেখছি আমায় একটা চিঠি লিখতে হবে।' লোকটা আজিজকে ভেতরে যেতে বললেও আজিজ গেল না। লোকটা তখন কালি আর চিঠি লেখার কাগজ বারান্দায় এনে দিল। আজিজ এইভাবে চিঠিটা শুরু করলো। 'সবিনয় নিবেদন, প্রিয় মহাশয়, আপনার জরুরী বার্তা পেয়ে একজন অধীনস্থ কর্মচারীর উপযুক্ত তৎপরতা নিয়ে এখানে এসেছিলুম। কিন্তু—' এইটুকু লিখে আজিজের কলম থেমে গেল। থাক। চিঠির দরকার নেই। অসমাপ্ত চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললো আজিজ। তারপর বললো, 'সাহেবকে বলো আমি এসেছিলুম। তাতেই হবে। এই আমার কার্ড। আর আমার জন্যে একটা টঙ্গা ডেকে দাও!' লোকটা কার্ডখানা হাতে নিয়ে বললো, 'হুজুর টাঙ্গাওয়ালারা সবাই ক্লাবে চলে গেছে।'
'তাহলে টেলিফোন করে রেল স্টেশন থেকে একটা টাঙ্গা আনিয়ে দাও।' লোকটা ব্যস্ত হয়ে টেলিফোন করতে যাচ্ছিল। কিন্তু আজিজ তাকে থামিয়ে দিল। বললো 'থাক। এটুকু আমি হেঁটেই ফিরতে পারবো।' তারপর সেনা-পতির মতন হুকুম দিয়ে দেশলাই আনিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। আজিজের ভাবতে ভাল লাগছিল যে লোকটা এখন তার কত অনুগত। সে যা বলছে তাই করছে। অবশ্য এই আনুগত্য দাম দিয়ে কেনা। যদ্দিন পকেটে টাকা থাকবে তদ্দিনই ব্যস্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু পা থেকে ফিরিঙ্গি পাড়ার এই ধুলো ঝেড়ে ফেলা দরকার। এই ফাঁদ থেকে জাল কেটে বেরিয়ে আসতে হবে। নইলে পরিচিত পরিবেশের সহজ জীবনে সে ফিরে যেতে পারবে না। অতএব হাঁটা শুরু করলো আজিজ। যদিও অসময়ের ব্যায়াম, তবুও হাঁটতেই হলো।

আজিজের ছোটখাট চেহারার মধ্যে বেশ একটা চটপটে ভাব আছে। হঠাৎ দেখলে তাকে পরিশ্রমবিমুখ মনে হলেও, আসলে সে পরিশ্রমী এবং খাটবার শক্তিও তার আছে। তবুও অসময়ের এই পথচলায় সে বেশ কাহিল হয়ে পড়ল। এদেশের রাস্তায় পথা চলা বেশ কষ্টকর। একটু হাঁটলেই ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়। তাই নেহাৎ নতুন লোক ছাড়া এখানে কেউ হাঁটতে চায় না। এখানকার মাটির স্বভাব ভয়ানক রকমের প্রতিকূল। পথচারীর সঙ্গে সে কোন সহ-যোগিতা করে না। হয় আনত হয়ে পথচারীর পা আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে। থ্যাসথ্যাসে আঠাল মাটির মধ্যে ঢুকে যায় পথিকের পা। নয়ত পাথুরে রাস্তার শক্ত ভীষণ মাটির ঢেলার আঘাতে প্রতি পদে পথচারীর পা ক্ষতবিক্ষত হয়। একটু হেঁটেই অবসন্ন হয়ে পড়ে পথিক। আজিজও রেহাই পেল না। তাছাড়া

তার পায়ে ছিল পাম্পশ্যু। অত্যন্ত হালকা এবং পাতলা চামড়ার তৈরি জুতো। এদেশের রাস্তায় পথচলার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত পাদুকা। ক্লান্ত আজিজ কোনরকমে সিভিল লাইন্‌স্‌-এর সীমানাটুকু হে'টে এল, তারপর পাশের মসজিদের মধ্যে ঢুকে পড়লো জিরোতে।

এই মসজিদটার মধ্যে ঢুকলেই আজিজের মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। এখানে এলে সে যেন কৃপাবাতাস পায়। ভাঙাচোরা গেট পেরোলেই মসজিদের উঠান। উঠানের মধ্যে অভিষেক পুষ্করিণী। পুণ্যার্থী ভক্তেরা এখানে অবগাহন স্নান করে। পুকুরের জল পরিষ্কার, টলটলে। প্রবাহ আছে জলে। যে জল শহরে সরবরাহ করা হয়, সেটাই জলবাহিত হয়ে পুকুরে ঢোকে। চৌকো পাথরের স্ল্যাব দিয়ে উঠোনটি মোড়া। কোথাও কোথাও ভাঙাচোরা। মসজিদের গর্ভগৃহ অনেক গভীর, কিন্তু দুপাশ খোলা। ইংল্যাণ্ডের পল্লী অঞ্চলের গির্জার আদল আছে মসজিদের সঙ্গে। আজিজ যেখানে বসেছিল সেখান থেকে তিনটি খিলান ঢাকা পথের সবটুকু দেখা যায়। ঢাকা পথটি আংশিক আলোকিত।

কিছুটা চাঁদের আলো কিছুটা ঝোলানো বাতির আলোয় পথটা স্বল্পালোকিত। মসজিদের সম্মুখভাগ চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। পশ্চাৎপটে ঝালর দেওয়া পশমী কাপড়ের ওপর ঈশ্বরের নাম লেখা লিপি। দ্বৈতাদ্বৈতের দ্বন্দ্বের সঙ্গে তার মনের দ্বন্দ্ব এক হয়ে গিয়েছিল। আজিজ একটা প্রতীকী অর্থ খুঁজে নেবার চেষ্টা করলো। দ্বৈতাদ্বৈতের এই দ্বন্দ্বে মসজিদের ভূমিকা, তার কাছে যেন অনেকখানি। হিন্দুর মন্দির বা খ্রীশ্চানের গির্জার চেয়ে মসজিদের এই পরিবেশ তার অনেক ভাল লাগে। এখানে এলেই তার কল্পনা ছড়িয়ে যায় বহু দূরে, যা মন্দিরে বা গির্জায় গেলে হয় না। সত্য ও সুন্দরের মোহন ব্যঞ্জনায় তার মনের সৌন্দর্যবোধ বিকশিত হয়। ইসলাম তার কাছে কোন রূঢ় ধর্মবিশ্বাস মাত্র নয়, নয় অন্য ধর্মভাবের প্রতি বৈরিতার প্রতীক। ইসলাম তার কাছে এক মহান সত্য যে সত্যের বিনাশ নেই। তার জীবনদর্শন গড়ে দিয়েছে যে ধর্মবোধ তারই আশ্রয়ে থেকে আজিজের দেহমন বিকশিত হয়েছে।

মসজিদ-প্রাঙ্গণের বাঁদিকে নিচু পাঁচিলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে ছিল আজিজ। তার পায়ের তলায় মাঠ। সোজা শহর অব্দি চলে গেছে এই মাঠ। চতুর্দিক আশ্চর্য নীরব, শান্ত। তবে সেই নিঃশব্দতার মধ্যেও নানারকম শব্দ শুনতে পাচ্ছিল আজিজ। ডানদিকে ইংরেজদের ক্লাবঘর। সেখান থেকে শৌখিন অর্কেস্ট্রাদলের বাজনার ক্ষীণ শব্দ আসছে। হিন্দুদের ঢাক পেটানোর শব্দটাও শুনতে পাচ্ছিল আজিজ। ও জানে এটা হিন্দুদের ঢাকের বাদ্যির শব্দ কারণ এই বাদ্যির শব্দ ওর রুচির সঙ্গে একেবারেই মেলে না। দূর থেকে মড়াকান্নাও ভেসে আসছে। আজিজ জানে কে মরেছে। আজই বিকেলে ডেথ্‌ সার্টিফিকেট সই করেছে সে। তাছাড়া আছে পেঁচার ডাক, পাঞ্জাবমেলের ভোঁ, আছে স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টারের বাগান থেকে ভেসে আসা মিষ্টি ফুলের গন্ধ। কিন্তু এতগুলো মিশ্র আবেদনের একটাও তার মন স্পর্শ করলো না। মসজিদ

তার বিচিত্র ঐতিহ্য নিয়ে এদের সবাইকে অতিক্রম করে গেছে। মসজিদকে ঘিরে তার কল্পনা নানা রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে তখন। আজিজ ভাবছিল একদিন সেও একটা মসজিদ বানাবে। ছোট্ট মসজিদ। কিন্তু রুচিসম্পন্ন এবং পরিচ্ছন্ন। যাতে পথচলতি ক্লান্ত মানুষ দুদণ্ড বসে জিরোতে পারে। অপার শান্তি পেতে পারে। মসজিদের গায়ে তার সমাধি পাতা হবে। সমাধির ফলকে উৎকীর্ণ থাকবে একটা ফার্সী শ্যের।

হায়! আমি ছাড়াই,
হাজার বছর ধরে
গোলাপ ফুটবে, বসন্তে রঙিন হবে প্রকৃতি ;
কিন্তু যারা আমার হৃদয়ের কথা শুনেছে
তারা ঠিক আমার সমাধির পাশে এসে দাঁড়াবে।

দাক্ষিণাত্যের কোন এক রাজার সমাধিতে আজিজ এই পদটি খোদাই করা দেখেছিল। সেদিন থেকেই এর অন্তর্নিহিত গভীর ভাবটি তাকে নাড়া দিয়েছে। যা গভীর গোপন হৃদয়ের কথা, তা বড় করুণ, বেদনাময়। আপনমনে ফার্সী পদটা আবৃত্তি করতে করতে চোখে তার জল এসে গেল। হঠাৎ তার মনে হলো মসজিদের একটা থাম যেন দুলছে। অন্ধকারে নড়ে উঠে থামটা যেন সরে গেল। আতঙ্কে হিম হয়ে বসে রইল আজিজ। রক্তে তখন ভয়ের নাচন লেগেছে। বিস্ফারিত চোখে আজিজ দেখলো পরপর তিনটে থাম অন্ধকারে নড়ে উঠলো। আর তারপরেই এক রমণী মূর্তি চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এলেন। রমণী বিদেশিনী। আজিজের মাথায় হঠাৎ রক্ত চড়ে গেল। যেখানে বসেছিল সেখান থেকে চিৎকার করে উঠলো সে।

'কে ? কে ওখানে ?'

মহিলা ভয় পেয়ে গোঁ গোঁ করছিলেন। আজিজ বেশ চড়া গলায় বললো।

'কি করছেন এখানে ? এটা মসজিদ। জুতো পায়ে ঢুকেছেন কেন ? জানেন না, মুসলমানদের অতি পবিত্র জায়গা এটা ?'

মহিলা অপ্রস্তুত। বললেন, 'আমি তো জুতো খুলে এসেছি!'

'কোথায় খুলেছেন

'দরজার গোড়ায়।'

আজিজ লজ্জা পেল। বললো, 'তাহলে আমায় ক্ষমা করবেন।'

মহিলার আতঙ্ক তখনও কাটে নি। পুকুরটাকে পেছনে রেখে এগিয়ে এলেন কাছে। আজিজ ফের দুঃখ প্রকাশ করলো। বললো, 'কিছু মনে করেন নি তো ?'

'না। না। তা কেন বরং আমি ঠিকই ভেবেছিলুম। জুতো না খুললে ভেতরে ঢোকা নিষেধ। তাই না ?'

'ঠিক তাই। তবে ব্যাপারটা কি জানেন ম্যাডাম ? মেয়েরা কেউ এই কষ্টটুকু করতে চায় না। সবাই ভাবে, বারণ করার তো কেউ নেই ভেতরে!'

'কেউ না থাক, ঈশ্বর তো আছেন!'

আজিজ স্তম্ভিত হলো কথাটা শুনে। কোনরকমে বললো, 'ম্যাডাম!'

মহিলা বললেন, 'এবার তাহলে আসি।'

আজিজ আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবার একটু এগিয়ে এল। বললো, 'আমি কি আপনাকে কোন ভাবে সাহায্য করতে পারি? এখন বা পরে?'

'যদি কিছু মনে না করেন। আপনার নামটা বলবেন?'

প্রবেশপথের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন মহিলা। আজিজ তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি আজিজকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন। আজিজের প্রশ্নের উত্তরে গভীর স্বরে তিনি বললেন। 'মিসেস মুর বলে ডাকবেন!'

'মিসেস!' মনে মনে চমকে উঠলো আজিজ। আরও একটু এগিয়ে এল সে। তারপর অবাক হয়ে দেখলো মহিলা বৃদ্ধা।

রমণীকে ঘিরে এতক্ষণ সে কল্পনার যে প্রাসাদ মনে মনে তৈরি করেছিল, বৃদ্ধাকে দেখবার 'পর সেটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সে খুশি হলো, না দুঃখ পেল, তা সে নিজেও বুঝলো না। খালি বুঝতে পারলো যে মহিলা হামিদউল্লার বেগমের চেয়েও বৃদ্ধা। মুখখানা লাল টকটকে, মাথার চুল বেবাক সাদা, কিন্তু কণ্ঠস্বর আশ্চর্য মধুর। এই মিষ্টি কণ্ঠস্বরই তাকে ঠকিয়েছে। মিসেস মুরকে পরে একটু স্পষ্টভাবে দেখার পর আজিজ বললো, 'আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলুম বলে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু আপনাকে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। কি সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন আপনি! বললেন এখানেও ঈশ্বর আছেন। সবাইকে আপনার কথা বলাবো।' একটু থেমে আজিজ আবার বললো 'নতুন এসেছেন এখানে?'

'ঠিক তাই। কিন্তু তুমি কি করে তা বুঝলে, বাবা?'

'আপনার কথা শুনে। একটা গাড়ি ডেকে দেবো?'

'কিছু দরকার নেই বাবা। আমি ক্লাব থেকে এসেছি। আবার সেখানেই যাব। ক্লাবের ভেতরটা বড্ড গরম। বেশিক্ষণ টিকতে পারলুম না। তাছাড়া ওরা এখন যে নাটকটা অভিনয় করছে সেটা লণ্ডনেই দেখেছি।'

আজিজ তাকিয়েছিল মিসেস মুরের দিকে। বললো, 'কি নাটক?'

'কাজিন কেটি।'

'তবুও রাত্তিরে আপনার একা ফেরা উচিত নয়। দুষ্টু লোকজন আছে। তাছাড়া মাড়াবার পাহাড় থেকে অনেক সময় চিতাবাঘের উপদ্রব হয়। সাপ-টাপও নেমে আসে ওখান থেকে।'

সাপের কথায় আঁতকে উঠলেন মিসেস মুর। এটা যেন তাঁর মনেই ছিল না। আজিজ মনে করিয়ে দিল। বললো, 'কেমন জানেন? সাংঘাতিক বিষাক্ত এরা, গায়ে গোল চক্কর। নেতিয়ে পড়ে আছে। যেমনি তুলবেন ওমনি ছোবল মারলো। আপনিও খতম।'

মিসেস মুর কৌতুকভরে শুনছিলেন। বললেন, 'কিন্তু তুমি তো দিব্যি পায়ে হেঁটেই ঘোরাফেরা করছো।'

'ও আমার অভ্যেস আছে।'

'সাপে অভ্যেস?'

দুজনেই হেসে উঠলো। হাসি থামলে আজিজ ফের বললো। 'আমি ডাক্তার

তো, তাই আমায় ওরা কামড়াতে সাহস করে না।
মসজিদে ঢোকার মুখটাতে এবার তারা পাশাপাশি বসলো। আজিজ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো। 'একটা কথা বলবো?'
'বলো।'
'যখন শীত শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন এদেশে এলেন কেন? এখন তো গরম শুরু হবে।'
'আগে আসতেই চেয়েছিলুম। তবে অনিবার্য কারণে দেরি হয়ে গেল।'
'এরপর অসহ্য হয়ে উঠবে এখানকার গরম।' আরও বললো, 'তাছাড়া, এত জায়গা থাকতে চন্দ্রপুরেই বা এলেন কেন?'
'আমার ছেলে যে এখানকার সিটি ম্যাজিস্ট্রেট। তার কাছেই এসেছি।'
আজিজ ধাঁধায় পড়লো। বললো, 'ক্ষমা করবেন ম্যাডাম। আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নাম তো মিস্টার হীস্‌লপ্‌! আমি তাঁকে ভালো করেই চিনি।'
মিসেস মুর মিষ্টি হেসে বললেন, 'ওই তো আমার ছেলে!'
আজিজের ধন্দ তখনও কাটে নি। বললো, 'কিন্তু আপনি তো মিসেস মুর?'
'আমার দুবার বিয়ে, বাবা!'
'ও! তার মানে আপনার প্রথম স্বামী গত হয়েছেন।
মিসেস মুর ম্লান হাসলেন। 'শুধু তিনি নন। আমার দুজন স্বামীই গত হয়েছেন।'
আজিজ যেন নিজেকে শোনাতেই বললো, 'অর্থাৎ, আমার আপনার একই অবস্থা।' তারপর মিসেস মুরের দিকে তাকাল। 'তার মানে, আপনার সংসার বলতে যা কিছু ওই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে নিয়েই?'
'না। না। তা নয়। র‍্যালফ্‌ আছে, স্টেলা আছে। ওরা সবাই ছোট। ইংল্যাণ্ডেই থাকে।'
'তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হলেন র‍্যাল্‌ফ্‌, স্টেলার সতাতো ভাই।'
'ঠিক তাই।' হেসে বললেন মিসেস মুর।
আজিজ সলজ্জভাবে বললো, 'কি অদ্ভুত মিল আমাদের দুজনের। আপনার মতন আমারও তিন সন্তান। দুই ছেলে এক মেয়ে। যেন বড় করে আমাদের ভাগ্য তৈরি হয়েছে। তাই না?'
মিসেস মুর মিষ্টি করে বললেন, 'কি নাম তাদের? নিশ্চয়ই রনী, র‍্যাল্‌ফ্‌ বা স্টেলা নয়?'
বৃদ্ধার কথাগুলো কত অর্থবহ। সত্যিই মনের দিক থেকে তারা কত কাছাকাছি। খুশি হলো সে। উৎসাহিত হয়ে বললো, 'নিশ্চয়ই নয়। ওদের আলাদা নাম। আপনার শুনতে মজা লাগবে। শুনুন! বড় ছেলের নাম আহ্‌মদ ছোটর নাম করিম, আর মেয়ের নাম জামিলা। সন্তানদের মধ্যে মেয়েই বড়। তিন ছেলেমেয়েই যথেষ্ট। তাই না?'
'নিশ্চয়ই।'
কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। নিজের নিজের সংসার ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়ে গেছে। তাই ভাবছে দুজনে। খানিক পরে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলে মহিলা উঠলেন।
আজিজও উঠে দাঁড়াল। তারপর বললো, 'চন্দ্রপুরে আপনাকে কি আর দেখাবো! তবে মিণ্টো হাসপাতাল যদি দেখতে চান তো সকালের দিকে চলে আসুন একদিন।'
মিসেস মুর বললেন, 'আমি আগেই দেখেছি। তবে তুমি সঙ্গে থাকলে ভালো হতো।'
'নিশ্চয়ই সিভিল সার্জন সাহেব সঙ্গে ছিলেন।'
'হ্যাঁ। মিসেস ক্যালেণ্ডারও ছিলেন।'
আজিজ গাঢ় স্বরে বললো, 'মহিলা অসাধারণ মিষ্টি স্বভাবের!'
'যে তাকে চেনে।'
'কেন? কেন? ওঁকে আপনার ভালো লাগে না?'
বৃদ্ধা বললেন, 'হয়ত ও লোকের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চায়। কিন্তু স্বভাবের জন্যে পারে না।
আজিজও যেন গর্জে উঠলো। বললো, 'ঠিক বলেছেন। একটু আগে জিজ্ঞেস না করেই আমার টাঙ্গাটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এটা কি উচিত হয়েছিল? তারপর মেজর সাহেবের কথাই ধরুন। সাধারণত রাত্তিরে আমরা একসঙ্গে কয়েকজন খাওয়াদাওয়া করি। উনি সেই আড্ডায় রাতের পর রাত লোক পাঠিয়ে আমায় ডাকিয়ে আনান। ছুটতে ছুটতে ওঁর বাংলোয় আসি। কিন্তু উনি থাকেন না। কোন মেসেজও রেখে যান না। বলুন! এটা কিরকম ভদ্রতা? কিন্তু উনি জানেন আমি এর প্রতিবাদ করবো না। কারণ, আমি ওঁর কর্মচারী মাত্র। আমার কোন স্বাধীন ইচ্ছে নেই। আমার সময়েরও কোন দাম নেই। যতক্ষণ ওঁর খুশি আমি দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য। আর যেহেতু আমি ভারতীয় পরাধীন, তাই বারান্দাই যথেষ্ট। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি দাঁড়িয়ে থাকবো, আর আমারই নাকের ওপর দিয়ে মহিলারা আমারই ভাড়া করা টাঙ্গা নিয়ে উধাও হবেন......।'
মিসেস মুর চুপ করে শুনছিলেন। খানিকটা নিজের ভুল আর খানিকটা পরে একজনের সহানুভূতি পেয়ে আজিজ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। নালিশ শোনাবার মানুষ পেলে মানুষ এইরকমই আচরণ করে। আজিজও তাই করলো। বার বার একই অভিযোগ করে যাচ্ছিল সে। তবুও তার ধারণা বৃদ্ধা মন দিয়ে তার কথা শুনেছেন। এ তাঁর অনুগ্রহ। নইলে তারই সামনে স্বজাতির নিন্দে করতেন না। মানুষটা যে খাঁটি আজিজ তা আগেই বুঝেছিল। বৃদ্ধার প্রতি তার কৃতজ্ঞতার যেন শেষ নেই। খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠলো তার মনটা। আবেগরুদ্ধ স্বরে আজিজ বলে উঠলো, 'আপনি আমায় বুঝেছেন। কারণ অন্যের দুঃখ বোঝবার মন আপনার আছে। আর সবাই যদি আপনার মতন হতো!'
মিসেস মুর একটু যেন অবাক হলেন। বললেন, 'মনে হয় না সবাইকে আমি ঠিকমতন বুঝি। তবে কাকে ভালো লাগবে বা ভালো লাগবে না, তা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারি।'

'তাহলে আপনি ঠিক প্রাচ্যদেশের মানুষ।'
আজিজকে নিয়েই ক্লাব অব্দি হেঁটে গেলেন বৃদ্ধা। ক্লাবের দোরগোড়ায় এসে বৃদ্ধা আক্ষেপ করলেন, 'এখানকার মেম্বার হলে তোমায় বাবা ভেতরে আসতে বলতুম।'
'তা হয় না ম্যাডাম। চন্দ্রপুর ক্লাবে ভারতীয়দের ঢুকতে দেওয়া হয় না। অতিথি হলেও না।'
বৃদ্ধা চুপ করে শুনলেন। কোন অপ্রয়োজনীয় কৌতূহল দেখালেন না। লজ্জার কথাটা সাড়ম্বরে বলতে হলো না বলে আজিজও যেন স্বস্তি পেল। মিসেস মুর নিঃশব্দে ক্লাবে ঢুকে গেলেন।
ফেরার পথে অন্য কথা ভাবছিল আজিজ। পূর্ণিমার আলোয় ঝলমল করছে মনোহারী রাত। মায়াময় হয়ে উঠেছে সব কিছু। ঢালু পথে পায়ে পায়ে নাবছিল আজিজ। মসজিদের গায়েও চাঁদের আলো পড়েছে।
চাঁদের আলোয় রাত যেন মায়াময়। পায়ে পায়ে সে নাবছিল ঢালু পথে। মসজিদের গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে। অপরূপা হয়ে উঠেছে মসজিদ। তার খুব ইচ্ছে করছিল এই সবকিছুর মালিক হয়ে যাক সে। অনেকেই যেমন হয়েছে। হয়ত এ ব্যাপারে কিছু স্থূল স্বভাবের হিন্দু তাতে দাঁড়িয়ে গেছে। কিছু ইংরেজও হয়ত সফল হয়েছে। তারা মন্দির গির্জা বানিয়েছে। কিন্তু তাতে কি?

৩

মিসেস মুর ফের যখন ক্লাবে ঢুকলেন, তখন নাটকের তৃতীয় অংক শেষ হয়ে আসছে। চাকরবাকরেরা যাতে উঁকি মেরেও তাদের মেমসায়েবদের অভিনয় না দেখতে পায়, তাই অডিটোরিয়ামের সবকটা জানলা ভেতর থেকে বন্ধ। ফলে ঘরের বাতাস অসহ্য তপ্ত। দুটি সিলিং পাখার একটি বিকল : অন্যটি আহত পাখির ক্লান্ত ডানার মতন ঘুরছে। মিসেস মুর অডিটোরিয়ামের দিকে না গিয়ে বিলিয়ার্ড ঘরের দিকে গেলেন। ঘরে ঢুকতেই একটি মেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলো। আসুন আপনাকেই খুঁজছিলাম। রীয়্যাল ইণ্ডিয়া মানে সত্যিকার ভারতবর্ষ দেখার ব্যাপারটা কি হলো?'
মেয়েটার নাম য়্যাডেলা কোয়েস্টেড্। রনীর কথা ভেবেই মেয়েটাকে ইংল্যাণ্ড থেকে সঙ্গে করে এনেছেন। রনীর ইচ্ছে যে য়্যাডেলাকে বিয়ে করে। কিন্তু ওইটুকুই মাত্র। আর এগোয় নি কথা, কারণ রনীর মতন মেয়েটাও খুব সতর্ক স্বভাবের। মিসেস মুর বললেন, 'আমারও তো দেখবার খুব ইচ্ছে। মনে হয় টারটনরা আগামী মঙ্গলবার নাগাদ একটা কিছু বন্দোবস্ত করবে।
'সে তো হাতী চড়ে বেড়ানো! দেখুন না, সন্ধ্যেটা এরা কিভাবে কাটাচ্ছে!

তা হঠাৎ আপনি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন? গঙ্গার বুক থেকে চাঁদ ধরা হলো?'

আগের রাত্তিরের ঘটনা এটা। দূর থেকে গঙ্গার বুকে আকাশের চাঁদ যেন দ্বিগুণ উজ্জ্বল আর বড় হয়ে ধরা পড়েছে। দৃশ্যটা দেখে দুজনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন কাল।

মিসেস মুর বললেন, 'না। চাঁদ আর কই ধরা হলো! গিয়েছিলুম মসজিদ দেখতে।'

'তাছাড়া চাঁদ এখনো ওঠে নি। আজ পরে উঠবে।' বললো য়্যাডেলা।

অনেকখানি হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধা। হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'তা হবে। পরেই উঠবে।' আরও বললেন, 'এখান থেকে তো চাঁদের ওপিঠটা দেখতে পাব, তাই না?'

ওঁর কথার উত্তরটা দিল আর একজন। লোকটার গলার স্বর খুব মিষ্টি। বললো, 'যতটা খারাপ ভাবছেন দেশটা ততটা খারাপ নয় কিন্তু। পৃথিবীর আর এক প্রান্তে এসে পড়েছেন বটে, তবে এখানেও সেই পুরনো চাঁদটাই দেখবেন।'

লোকটাকে এঁরা কেউ চেনেন না। দেখেন নি আগে। কথাটা বলে লোকটা লাল ইঁটের থামের পাশ দিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

য়্যাডেলাও একই কথা বললো, 'উনি কিন্তু ঠিকই বলেছেন। অন্য প্রান্তের পৃথিবী কেমন আমরা তা দেখছি না।' মিসেস মুরের মনেও কথাটা ধরেছে। এই নতুন দেশে এসে অব্দি কেমন ভোঁতা হয়ে গেছেন তিনি। ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে আসার সময় সে কি রোমান্টিক আনন্দ! তারপর মিশর দেশের বালির সমুদ্র দেখে সে কি বিস্ময় তাঁর! কিন্তু ভারতবর্ষ দেখার সেই তীব্র মোহ কেটে গেল এখানে পোঁছে। সারি সারি বাংলো দেখে মোহভঙ্গ হয়েছে তাঁর। অবশ্য এটাই দেশের সবটুকু নয়। তাই হতাশ ভাবটা নিয়ে বৃদ্ধা তত ব্যাকুল হন নি, যেমন য়্যাডেলা কোয়েস্টেড হয়েছে। কারণ মেয়েটার চেয়ে তিনি প্রায় চল্লিশ বছরের বড়। দেখেছেন অনেক। অভিজ্ঞতাও অনেক। তিনি জানেন, যা চাই তা কখনও ঠিক সময়ে পাবো না। এটাই আমাদের ভাগ্যের মোচড়। অবশ্য জীবনে যে অপ্রত্যাশিত পাওনা জোটে না, তা নয়। কিন্তু দিনক্ষণ মিলিয়ে তা ঘটে না। সে হঠাৎই আসে এবং আসে হিসেবের বাইরে। সুতরাং মিস্ কোয়েস্টেডকে উৎসাহ দিতে মিসেস মুর আবার বললেন, 'দেখা যাক না, মঙ্গলবার ওরা কিরকম প্রোগ্রাম করে! একটা ভালো প্রোগ্রাম সেদিন আশা করছি।' ওদের কথার মধ্যেই একজন ভদ্রলোক এলেন এবং দুজনকে দুটো পানীয় এগিয়ে দিলেন। একে চিনতে পারলেন মিসেস মুর। ভদ্রলোকের সঙ্গে ডিনার খেয়েছেন কাল। চন্দ্রপুরের কালেক্টর, মিস্টার টার্টন্। গরমের দরুন নাটকের শেষটুকু না দেখে ইনিও পালিয়ে এসেছেন। বৃদ্ধার কাছে রনী সম্বন্ধে খুব প্রশংসা করলেন কালেক্টর। রনী খুব যোগ্যতার সঙ্গে স্টেজ ম্যানেজমেন্ট করছে। দায়িত্বটা দেওয়া ছিল মেজর ক্যালেন্ডারের ওপর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে না আসায় রনীকে ভার দেওয়া হয়। রনী

অবশ্য আশ্চর্য যোগ্যতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেছে। রনীর আরও গুণের কথা বললেন টারটন্। খেলাধুলোয় যথেষ্ট পারদর্শী না হলেও রনী খুব চটপটে। আইনের জ্ঞান হয়ত তার খুব সূক্ষ্ম নয়। কিন্তু সাধারণভাবে রনী যথেষ্ট যোগ্য। রীতিমত ব্যক্তিত্ব সচেতন যুবক সে এবং তার পদমর্যাদাবোধ খুব প্রখর।

ছেলের সম্বন্ধে এই নিছক প্রশংসা শুনতে শুনতে ভারি অবাক হচ্ছিলেন মিসেস মুর। কোন মায়ের কাছেই ছেলের পদমর্যাদার কথাটা আলাদা কোন গুণ বলে সমাদর পাওয়া উচিত নয়। য়্যাডেলার কাছেও ব্যাপারটা শঙ্কার কারণ। কোন পায়াভারি পুরুষকে মনের মানুষ করা যায় কিনা সে তা তখনও ঠিক করতে পারে নি। রনী সম্বন্ধে মিস্টার টারটনকে আরও কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল তার। কিন্তু সুযোগ পেল না য়্যাডেলা। মিস্টার টারটন যা বলতে এসেছিলেন হাতের ভঙ্গি দিয়ে প্রায় তাই বললেন। মোদ্দা কথা হলো, যেমনটি সবাই চেয়েছে রনী তেমনটি হয়েছে। একজন জাঁদরেল সাহেব হয়ে উঠেছে রনী হীসলপ। বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপর ঝুঁকে একজন নিশানা তাক করছিল। কালেকটর সাহেবের কথা শুনে লোকটা হৈ হৈ করে তাঁকে সমর্থন করলো। য়্যাডেলার মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল তা দূর হয়ে গেল। রনী যে উৎকট মর্যাদার মানুষ তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল। কালেকটরের অন্যত্র কাজ ছিল। তিনিও আর দাঁড়ালেন না।

ইতিমধ্যে অভিনয় শেষ হয়েছে। অর্কেস্ট্রায় জাতীয় সঙ্গীতের সুর বেজে উঠলো। বিলিয়ার্ড খেলা বা আলাপসালাপ বন্ধ করে সবাই প্রায় অজান্তেই মুখগুলো শক্ত করে দাঁড়িয়ে উঠলো। যে সঙ্গীত তখন বাজছিল তা হলো অকিউপেশন আর্মি, অর্থাৎ দূরদেশে নির্বাসিত হয়ে পড়ে থাকা সেনাবাহিনীর জাতীয় সঙ্গীত। এর সুর কানে গেলেই নিজেকে ছিন্নমূল মনে হয়। তবে নিজেকে ব্রিটিশ বলে ভাবলে একটা অতিরিক্ত তেজ মনের মধ্যে ক্রিয়া করে এবং তাতেই অনেক কাজ হয়। সবাই মিলে যখন একসঙ্গে গান করে তখন একটা সম্মিলিত ইচ্ছা দানা বেঁধে ওঠে। দেশের মাটি নয় বলেই এটা হয়। বলা বাহুল্য, এই জোটবাঁধা কামনার লক্ষ্য রাজাও নয় ঈশ্বরও নয়। কারণ এ সম্বন্ধে তাদের কোন স্পষ্ট ধারণাই নেই। তারা জানে যে বাঁচার তাগিদেই একজোট হয়ে তারা সাহস সঞ্চয় করছে, যাতে আরও একটা দিন নির্ভয়ে কাটাতে পারে। যাহোক, একসময় অর্কেস্ট্রার বাদ্যি থামলো। সবাই তখন হাতে ড্রিঙ্ক্স্ নিয়ে হলঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

দুহাতে দু গেলাস পানীয় নিয়ে রনীও ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তখন দুজনের দিকে গেলাস দুটো এগিয়ে দিল রনী। 'য়্যাডেলা একটা ড্রিঙ্ক নিন মা তুমিও নাও।'

ওরা কেউ ড্রিঙ্ক নিল না। কারণ পানীয় দেখে ওদের গায়ে তখন জ্বর আসছে। য়্যাডেলার মনে দেশ দেখার ভাবনাটাই ছেয়ে আছে। মনের কথা মুখেই প্রকাশ করলো সে। রনীর বাড়ানো পানীয়টা সরিয়ে দিয়ে বললো 'আমাদের দেশ দেখার ব্যাপারটা কি করলেন ?' রনীর মেজাজটা ভালো ছিল

অবশ্য য়্যাডেলার আবদারটা তার কাছে খুবই ছেলেমানুষী এবং মজাদার মনে হলেও, উড়িয়ে দিল না সেটা। পাশ দিয়ে যে যাচ্ছিল তাকেই ধরে বসলো রনী।

'মিস্টার ফীল্ডিং কি করে সত্যিকার ভারতবর্ষ জানা যায় বলতে পারেন?'

'দেশের মানুষের সঙ্গে মিশুন। একটা ধারণা হবে।'

কথাটা বলেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল লোকটা।

'উনি কে রনী?'

'আমাদের সরকারী কলেজের প্রফেসর। মাস্টারমশাই।'

মিসেস লেস্‌লী পাশেই ছিল। রনীর কথায় সায় দিয়ে বললো, 'মাস্টার-মশাই তো! তাই জ্ঞান দিয়ে গেল। যেন আমরা দেশের মানুষের সঙ্গে মিশি না। তাদের এড়িয়ে যাই। আহাম্মক!

য়্যাডেলা বললো, 'আমি কিন্তু সত্যিই এড়িয়ে গেছি। এদেশে আসা থেকে চাকরটা ছাড়া আর কোন ভারতীয়র সঙ্গে মিশিনি। কথাও বলিনি।'

'তবে তো আপনার ভাগ্য ভাল বলতে হয়!' কে একজন বললো।

'কিন্তু আমি ওদের সঙ্গে মিশতে চাই। ওদের জানতে চাই।' বললো য়্যাডেলা।

কৌতূহলী মহিলারা তখন য়্যাডেলা কোয়েস্টডকে ঘিরে ধরেছে। একজন বললো, 'ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতে চান? ভারি অবাক লাগছে তো!' আর একজন বললো, 'মাগো! নেটীভদের সঙ্গে?' তৃতীয় মহিলা বেশ দাপট নিয়ে বললো, 'ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি শুনুন। নেটীভদের সঙ্গে মিশলে ওরা আর আপনাকে পাত্তা দেবে না।'

'হতে পারে তা। কিন্তু বোধহয় অনেকবার দেখা-সাক্ষাতের পর। বললো য়্যাডেলা।

মহিলার স্বভাবটা অতি নির্বোধ। য়্যাডেলার কথার মর্ম বুঝলো না। আরও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুললো। বললো, 'আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই ব্যাপারটা আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। এককালে আমি নার্স ছিলাম একটা নেটীভ স্টেটে। তখন আমার বিয়ে হয় নি। সেই সময় ভারতীয়দের সঙ্গে ঢের মিশেছি। ওদের সম্বন্ধে জানি অনেক কিছুই। বলতে কি, ওদের স্বভাবের স্বরূপটি আমার জানা। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, কোন নেটীভ স্টেটে ইংরেজ মহিলা আত্মসম্মান নিয়ে কাজ করতে পারবে না, যদি নিজেকে নেটীভদের থেকে আলাদা না রাখতে পারে।'

'তার মানে?'

'এড়িয়ে চলা। উদাসীন থাকা।'

'রুগীদেরও এড়িয়ে চলবে?'

'কেন চলবে না?' যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো মিসেস ক্যালেণ্ডার।

'নেটীভদের যদি ভাল চান তবে তাকে তাড়াতাড়ি মরতে দিন।'

য়্যাডেলা স্তম্ভিত। মিসেস মুর একটু বাঁকা হেসে বললেন, 'যদি তাতে

সে স্বর্গে যায়?'
'যেখানে খুশি যাক। আমার কাছে না এলেই হলো!'
সেই নার্স মহিলাটি মিসেস মুরের দিকে চেয়ে বললো, 'স্বর্গ সম্বন্ধে আপনি যেন কিছু বলছিলেন? সেই কথাটাই ভাবছি। মিশনারীদের ওই কারণেই আমি অপছন্দ করি। বুঝিয়ে বলছি আপনাকে।'
কিন্তু গল্প শোনাবার সুযোগ সে পেল না। ওদের কথাবার্তার মাঝখানেই মিস্টার টারটন্ য়্যাডেলার দিকে চেয়ে বললেন, 'মিস কোয়েস্টেড কি সত্যিই আর্য ভাইদের সঙ্গে আলাপ করতে চান? তাহলে বলুন, ব্যবস্থা করি। আমার কাছে এটা কোন সমস্যা নয়। অবশ্য আলাপ করে আপনার ভাল লাগবে কি না তা জানি না।' একটু থেমে কালেক্টর মিস্টার টার্টন্ আরও বললেন, 'ঠিক কেমন মানুষ আপনার পছন্দ? অনেকরকম জীবিকার লোক আমি চিনি। সরকারী চাকুরে আছে, জমির মালিক আছে। হীস্লপ্ ইচ্ছে করলে কোন ব্যারিস্টারের মুহুরির সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিতে পারে। আবার এদেশের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে যদি কিছু জানতে চান, তারও ব্যবস্থা করা যাবে। শুধু ফীলডিংয়ের কাছে একবার যেতে হবে।'
য়্যাডেলা খুব একটা উৎসাহিত হলো না। বললো, 'সত্যি কথা বলি; ছবির মতন সাজানো নিষ্প্রাণ মানুষের মিছিল দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। অথচ এদেশে যখন নাবলাম তখন এর ঠাটবাট দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। এখন আর সেই বিস্ময়টা নেই। কারণ ঝলমলানি চোখে পড়ে না।'
য়্যাডেলার কথায় কালেক্টর্ খুব কৌতূহল দেখালেন না। তিনি চাইছিলেন, এদেশে এসে মেয়েটা যেন মনমরা হয়ে না কাটায়। আকর্ষণীয় একটা কোন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু কিরকম অনুষ্ঠান? হঠাৎ ব্রিজ পার্টির কথা মনে হলো তাঁর। এর পরিকল্পনাটি তাঁর নিজস্ব। তাস খেলার অনুষ্ঠান এটা নয়। এ হলো জীবনে জীবন যোগ করার খেলা। অর্থাৎ পূব আর পশ্চিমকে এক সুতোয় গাঁথা। অভিনব পরিকল্পনা সন্দেহ নেই। তাই যারা শুনলো তারাই উপভোগ করলো ব্যাপারটা। শুধু য়্যাডেলার মনঃপূত হলো না। সে বললো, 'সামাজিক সম্পর্ক হয়েছে এমনি কিছু ভারতীয়র সঙ্গে তাই আলাপ করতে চাইছিলুম।'
য়্যাডেলার কথায় হা হা করে হেসে উঠলেন কালেকটর। বললেন, 'মাপ করবেন। ওদের সঙ্গে আমাদের কোনরকম সামাজিক যোগাযোগ হয় না। ওরা হলো সর্বগুণান্বিত মানুষ। এদের সঙ্গে কি সামাজিক মিলমিশ হতে পারে? তাছাড়া এ ধরনের কঠিন বিষয়ের ওপর আলোচনার সময়ও এটা নয়। ঘড়িতে দেখেছেন রাত ক'টা? সাড়ে এগারোটা। চলুন চলুন!'
ফেরার পথে স্বামীর কানের কাছে ফিসফিস করে মিসেস টার্টন্ বললেন, 'মিস কোয়েস্টেড্, কি নাম! আহা!'
ইচ্ছে করেই মেয়েটার সঙ্গে তিনি যেচে আলাপ করতে যান নি। দেখেই বুঝেছিলেন যে মেয়েটা একটু খেয়ালি এবং বিসদৃশ্য রকমের স্পষ্টবক্তা। এইরকম একটা মেয়ের সঙ্গে হীস্লপের মতন চমৎকার মানুষের বিয়ে

হওয়াটা তাঁর মোটেই মনঃপূত হচ্ছিল না। কিন্তু সব দেখে শুনে তাঁর মনে হলো এ বিয়ে হবেই। মিসেস ভাবলেন স্বামীর মতটা জানতে পারলে বেশ হতো। গাড়ির মধ্যেই কথাটা কর্তার কানে তুললেন গিন্নী। মিস্টার টার্‌টন্ মানুষটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের ইংরেজ। কোন মহিলা সম্বন্ধে চট করে মন্তব্য করতে চায় না। তবুও স্ত্রীর কথাগুলো মন দিয়ে শুনে বললেন, 'দ্যাখো! ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে এলে মানুষের বিচারবুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায়। বিশেষ গরমকালে এটা খুব হয়। ফীলডিংকে দিয়েই দ্যাখো। এখানে এসে উল্টো বুদ্ধির মানুষ হয়ে গেছে।'

ফীলডিংএর নাম শুনেই চোখ বন্ধ করেছিলেন গিন্নী। একটু পরে চোখ খুলে বললেন, 'ঠিক বলেছ। লোকটা একেবারে ভিন্ন হয়ে গেছে যেন। ওই মেয়েটাও ওইরকম স্বভাবের। ওদের দুজনের বিয়ে হলেই বেশ হতো।'

কর্তা আর কোন মন্তব্য করলেন না। গাড়িও এতক্ষণে বাংলোর দরজায় এসে গেছে। মস্ত বাংলো। বিশাল কম্পাউন্ড। তবে ব্যবস্থাদি সব সেকেলে রকমের। চন্দ্রপুরের কালেক্‌টরের উপযুক্ত বাংলো হবার যোগ্যতা এর আছে। সিভিল লাইন্‌স্‌এর সবচেয়ে পুরোনো নিচু সিলিংওলা বাংলোয় ওঁরা যখন ঢুকলেন তখন প্রায় মধ্যরাত। এক গেলাস করে বার্লি খেয়ে শুয়ে পড়লেন দুজনে।

কালেক্‌টর দম্পতি হঠাৎ চলে আসায় ক্লাবের আড্ডাও ভেঙে গেল। এখানকার সব সমাবেশেই একটা সরকারী হস্তক্ষেপ আছে। ক্লাবের সমাবেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই লাট সাহেবের প্রতিনিধি যখন ক্লাব থেকে বেরিয়ে গেলেন তখন সরকারী নিয়মেই সমাবেশ চলতে পারে না। চন্দ্রপুরের সমাজের এটাই রীতি। যে সমাজ মনে করে রাজার প্রতি আনুগত্য রাজপ্রতিনিধিরও পাওনা হয়, সে সমাজ রাজপ্রতিনিধির বদলি শাসককেও সমান সম্মান দেখায়। অনুগ্রহ পেতে হলে এটুকু আত্মপ্রবঞ্চনা সইতেই হবে। চন্দ্রপুরের ছোট্ট সমাজে টার্‌টন্ দম্পতি রাজসমাদর পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। কারণ টার্‌টন্ এখানকার কালেক্‌টর্ সাহেব। অবশ্য পদাধিকার বলে এই সম্মানের হেরফের হয়। যতদিন চাকরি ততদিনই প্রতিপত্তি। তাই কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার পর হারিয়ে যাওয়া মহিলার অনুধ্যানই হবে টার্‌টন্ দম্পতির একমাত্র কর্মবিলাস।

কালেকটর সাহেবের অযাচিত অনুগ্রহ রনীকে অভিভূত করে দিয়েছিল। ওঁরা চলে যেতেই মিসেস মুরের সামনে এসে গদগদভাবে রনী বললো, 'দেখলে মা ওঁর ব্যবহার? মানুষ কি এমনি বড় হয়! আজ যে সম্মান উনি তোমাদের দেখালেন তার জন্যে আমি সত্যিই গর্ববোধ করছি।'

'সম্মান?'

য়্যাডেলার কথায় বিস্মিত রনী বললো, 'সম্মান নয়? কালেক্‌টর্ সাহেব নিজে ব্রিজ পার্টি দিচ্ছেন। এর আগে এমনটি কখনও হয় নি।'

'তাই নাকি?'

উচ্ছ্বসিত রনী বললো. 'ইচ্ছে ছিল আমি নিজেই একটা কিছু করি। কিন্তু

নেটীভদের চালচলন আমার চেয়ে বড়সাহেবই ভাল জানেন। অনেকদিন এখানে আছেন। ওদের যেমন উনি চেনেন, ওরাও তেমনি ওঁকে চেনে। চট করে বোকা বানাতে পারবে না। সে তুলনায় আমি তো আনকোরা! অন্তত টানা বিশবাইশ বছর না কাটালে এখানকার নাড়িনক্ষত্র চেনা যায় না। মা! তোমার ক্লোকটা!'

মিসেস মুরের হাতে ক্লোকটা এগিয়ে দিল রনী। তারপর য়্যাডেলাকে বললো, 'এখানকার মানুষরা কেমন অদ্ভুত তার একটা উদাহরণ দি, শুনুন।'

অবশ্য ভুলটা আমারই। একবার এজলাস থেকে নেবে একজন এদেশী উকিলকে একটা সিগারেট দিয়েছিলুম। সেই উকিলটা করলো কি জানেন? দালাল দিয়ে সারা শহরে জানিয়ে দিল যে উকিল মহম্মদ আলি সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বসে ধূমপান করেছে। অতএব এই উকিলকেই মামলা দাও। খুব শিক্ষা হয়েছিল সেদিন আমার। সেই থেকে কোর্টের মধ্যে লোকটার সঙ্গে যতটা পারি শক্ত ব্যবহার করি।'

য়্যাডেলা চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ বললো, 'একসঙ্গে সিগারেট খাওয়া তো! তা একদিন সব উকিলবাবুদের ডেকে ধূমপান করলেই হয়!'

মিস কোয়েস্টেডের এবার, যেন জেদ বেড়ে গেল। বললো, 'উকিলবাবুদের ক্লাবে বসে ধূমপান করতেই আমি ভালোবাসি।'

মিস কোয়েস্টেডের এবার, যেন জেদ বেড়ে গেল। বললো, 'উকিলবাবুদের ক্লাবে ডাকতে পারেন না?'

যতটা সম্ভব মাথা ঠাণ্ডা রেখে রনী বললো, 'না। পারি না। ক্লাবে ওদের প্রবেশ নিষেধ।' য়্যাডেলার এই অবুঝপনার কারণ রনী বুঝতে পারে। প্রথম প্রথম সে-ও এমনি অবুঝের মতন ব্যবহার করতো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এখানকার লোকগুলোর স্বভাবচরিত্র দেখে সে পোক্ত হয়ে যায়। তার বিশ্বাস য়্যাডেলার এই বিলাসিতা বেশিদিন টিকবে না।

জ্যোৎস্না রাত, চতুর্দিক ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। ক্লাবের বারান্দায় এসে রনী তার সহিসকে গাড়ি জুততে বললো। সহিসটা মাথা নিচু করে কুর্নিশ করলো বটে, কিন্তু রনী ফিরেও তাকাল না।

গাড়িতে উঠে থমকে গেছেন মিসেস মুরও। এ কি আশ্চর্য রাত! তিনি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন। চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ঝকঝকে উজ্জ্বল আলোয় সারা আকাশ ভরে গেছে। মিসেস মুর মুগ্ধ। ইংল্যাণ্ডেও চাঁদ দেখেছেন। কিন্তু সেখানকার চাঁদ মরা। আপন বলে মনে হয় না তাকে। এখানে তার অন্য রূপ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে রাতের চাদরে ধরা পড়েছে চাঁদ। চাঁদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিজেকেও ওদেরই মতন মনে হতে লাগলো। আত্মপর জ্ঞান রইলো না। যেন সবাইকেই নিয়ে এই বিশ্বসংসার। এর আগে কখনও নিজের সত্তাকে এমন বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার অভিজ্ঞতা তাঁর হয় নি। ভীষণ ভাল লাগছিল। অতিরিক্ত জল বেরিয়ে গিয়ে জলাশয় যেমন টলটলে হয়ে ওঠে, তেমনি দুশ্চিন্তাগুলো দূর করে বৃদ্ধার মন ঝরঝরে হয়ে উঠলো। জাতীয় সঙ্গীতের মূল সুরটা তখন হারিয়ে গেছে এই বিশ্বতানের মধ্যে।

রাস্তাটা হঠাৎ বাঁক নিল এখানে। আর তখনই বৃদ্ধার চোখের ওপর মসজিদের সুউন্নত মাথাটি চাঁদের আলোয় ঝকমক করে উঠলো। বৃদ্ধা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওই তো! ওখানেই তো ছিলাম এতক্ষণ!'

রনী অবাক। বললো, 'গেলে কখন?'

'কেন! তখন তোমাদের নাটক চলছে!'

'একলা?'

'একলা মা কোথাও যেতে পারেন না?'

য়্যাডেলার কথায় ঈষৎ তপ্ত হলো রনী। বললো, 'না। অন্তত এই দেশে পারেন না। এখানে সাপখোপের ভয় আছে। সন্ধ্যের পর রাস্তার ওপর শুয়ে থাকে ওরা।'

মিসেস মুর ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ ছেলেটিও সেই কথা বলছিল বটে।'

'ছেলেটি?' মুখ টিপে একটু হাসলো য়্যাডেলা। বৃদ্ধাকে তার ভীষণ ভাল লাগে। নাটক দেখে অযথা সময় নষ্ট না করে তিনি যে পালিয়ে গিয়েছিলেন তার জন্যে মনে মনে সে খুব খুশি। আরও খুশি হতো যদি সে-ও এই সুযোগটা পেত। বৃদ্ধার দিকে চেয়ে সে বললো, 'আপনার সঙ্গে একটা ছেলের আলাপ হলো, আমায় তো বলেন নি?' ব্যাপারটা কিন্তু খুব রোমাণ্টিক।'

'বলতে গিয়েছিলাম মা। কিন্তু কি থেকে কথাটা ঘুরে গেল, আমিও ভুলে গেলাম। বুড়ো হয়েছি। একবার খেই হারালে আর মনে পড়ে না।'

'ছেলেটি কেমন?'

'চমৎকার!' বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে বৃদ্ধা জবাব দিলেন।

রনী তখন রীতিমত অধৈর্য। বললো, 'ছেলেটি কে?'

'কে তা জানি না। তবে ডাক্তার।'

'ডাক্তার? চন্দ্রপুরে তো কোন যুবক ডাক্তার নেই,! অন্তত আমার জানা নেই। ঠিক কেমন দেখতে বলো তো মা?'

'বেঁটে মতন। অল্প গোঁফ আছে। চোখ দুটি বেশ ছটফটে। যখন মসজিদের বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, তখন ও আমার জুতোজোড়া দেখতে পায়। ওর ভয় হয়েছিল, বোধহয় জুতো পরেই আমি ভেতরে ঢুকবো। কিন্তু ব্যাপারটা আমার জানা ছিল। পরে ছেলেটার সঙ্গে অনেক কথা হলো। ওর ছেলে-মেয়ের কথা বললো। তারপর হাঁটতে হাঁটতে আমরা ক্লাবে ফিরে এলাম। ও কিন্তু তোমায় চেনে।'

'নিশ্চয়ই আমায় দেখিয়ে দিয়েছিলে? আমি কিন্তু এখনও ধরতে পারছি না ছেলেটি কে?' রনী বললো।

'দেখিয়ে দেব কি? ও তো ক্লাবেই ঢোকে নি। বললো, এখানে ওর ঢোকা বারণ।'

রনী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে তার কাছে। বললো, 'তাই বলো। একজন নেটীভ। আমি ভেবে মরছি কত কি! ছেলেটি মুসলমান নয় তো?'

'হ্যাঁ।' বৃদ্ধা ঘাড় নাড়লেন।

'মুসলমান!' উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলো য়্যাডেলা কোয়েস্টেড। তারপর রনীর দিকে চেয়ে বললো, 'মা ঠিক আপনারই মতন রনী, তাই না? আমরা যখন আসল ভারতবর্ষ দেখার কথা ভাবছি, উনি তখন বাইরে গিয়ে তা দেখে এসেছেন এবং ভুলেও গেছেন।'
রনীর খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। মা যা বললেন তা শুনে তার ধারণা হয়েছে যে, লোকটা নিশ্চয়ই গঙ্গার ওপার থেকে আসা মোল্লাদের কেউ। লোকটা যে নেটীভ এ কথাটা আগেই বলা উচিত ছিল। হঠাৎ রনী রেগে উঠল। ওপরওয়ালার মেজাজ নিয়ে বললো, 'লোকটা মসজিদের মধ্যেই অসভ্যের মতন চেঁচাচ্ছিল, তাই না? কিন্তু ও নিজেই বা এত রাত্তিরে ওখানে কি করছিল? এখন তো ওদের নমাজের সময় নয়? তুমি কিন্তু জুতো পরেই ভেতরে ঢুকলে পারতে। এসব ওদের চালাকি।'
বৃদ্ধা একটু অবাক। বললেন, 'চালাকির কথা বলতে পারবো না, বাবা। তবে ছেলেটা আমায় হঠাৎ দেখে ভয় পেয়েছিল। তাই হয়ত গলার আওয়াজটা একটু চড়া হয়ে ওঠে। কিন্তু আমি জবাব দিতেই ওর গলার স্বর স্বাভাবিক হয়ে যায়।'
'তোমার জবাব না দেওয়াই উচিত ছিল, মা।' বললো রনী।
য়্যাডেলা স্পষ্টবক্তা। বলো, 'তা কি করে হয়? চার্চের মধ্যে কোন টুপি পরা মুসলমানকে আপনি টুপি খুলতে বলবেন না?'
'দুটোর মধ্যে ঢের ফারাক মিস কোয়েস্টেড। আর আপনি তা বুঝবেনও না।'
'না। জানি না। মানছি তা। কিন্তু কি ফারাক?'
রনীর ইচ্ছে নয় যে য়্যাডেলা এই বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ুক। তাছাড়া রনীর মা অর্থাৎ মিসেস মুর স্পষ্ট করে কিছুই বললেন না। বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন বৃদ্ধা, এখানে এসেছেন ক'দিনের জন্যে। আবার ইংল্যান্ড ফিরে যাবেন। এদেশ সম্বন্ধে তিনি যে কোন ধারণাই সঙ্গে নিয়ে ফিরতে পারেন। এটা তাঁর নিজস্ব অভিরুচি। কিন্তু য়্যাডেলার ব্যাপারটা অন্যরকম। এদেশে সে পাকাপাকি থাকতে এসেছে। নেটীভদের সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা গড়ে উঠলে, দুদিনেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। ভাবতে ভাবতে ঘোড়াটাকে হঠাৎ থামিয়ে দিল রনী। তারপর দুজনকেই শুনিয়ে বললো, 'ওই দ্যাখ তোমাদের গঙ্গা।'
দুজনেই তাকাল এবং থমকে গেল তাদের দৃষ্টি। চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে ওটা কি? যেন নদী নয়, আলোর বাঁধ ভাঙা বন্যায় ঝলমল করছে একটা শস্যক্ষেত। রনী দেখাচ্ছিল কোথায় নতুন বালির চর উঠেছে। বেনারস থেকে ভেসে আসা মড়া ওই পথেই চলে যায়, যদি না কুমিরের পেটে যায়। অবশ্য রনী আশ্বস্ত করলো। বললো যে চন্দ্রপুর অব্দি মড়া ভেসে আসে না।
বৃদ্ধাকে যা আতঙ্কিত করছিল তা অন্য ভাবনা। নদীতে হাঙর কুমিরের এই প্রাদুর্ভাবের কথা শুনেই বিমূঢ় হয়ে গেছেন তিনি। 'কি ভয়ানক! আবার কি বিস্ময়কর এই নদী!' য়্যাডেলা ও রনী চোখে চোখে হাসল। সত্যিই বিস্ময়কর দেখাচ্ছিল চাঁদের আলোয় মাখামাখি নদীটা। ক্ষণে ক্ষণে নদীর সেই ঝকমকে চেহারাটার বদল হচ্ছে, যখন চাঁদ সরে যাচ্ছে। ওরা ভাব-

ছিল আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে এই মায়ার খেলা দেখবে। কিন্তু ঘোটকী আর অপেক্ষা করতে চাইছিল না। তার ভীষণ হ্রেষাধ্বনিতে নৈঃশব্দ খান খান হয়ে ভেঙে গেল। ওরাও গাড়িতে উঠে বসলো। সিটি ম্যাজিস্ট্রেট রনী হীস্-লপের বাংলোয় ফিরে এল ওরা। বাংলোয় ফিরে শুতে গেল ম্যাডেলা কোয়েস্টেড্। কিন্তু ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে তখনই শুতে গেলেন না মিসেস মুর।

রনীর মাথা থেকে সেই মুসলমান ডাক্তারের দুশ্চিন্তা তখনও নাবে নি। তার সন্দেহ লোকটা বাজারের এতটা হাতুড়ে হেকিম। এ ধরনের লোকগুলো সাধারণত সন্দিগ্ধ চরিত্রের হয়। সুতরাং এ লোকটা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ নেওয়া তার কর্তব্য। কিন্তু মিসেস মুর যখন বললেন যে, ছেলেটি মিন্টো হাসপাতালের ডাক্তার, তখন অনেকখানি আশ্বস্ত হলো রনী। এখন সে বুঝতে পেরেছে যে এই যুবক ডাক্তার আজিজ। মাকেও তাই বলল রনী। মিসেস মুরও খুশি। বললেন, 'আজিজ! বাঃ! সুন্দর নাম তো!'

'হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে তাঁরই কথা হয়েছিল। আশা করি, সংযত ভদ্র ভাবেই সে কথাবার্তা বলেছে তোমার সঙ্গে।'

রনীর প্রশ্নের ইঙ্গিতটা বুঝতে পারেন নি মিসেস মুর। বললেন, 'অভদ্র ব্যবহার কেন করবে? প্রথম মুহূর্তের আলাপটা ছাড়া সব সময়ই খুব সংযত ভাবে কথা বলেছে ছেলেটা।'

রনী আর একটু স্পষ্ট হলো। বললো, 'তা বলছি না। সাধারণভাবে ইংরেজ-দের সম্বন্ধে তার ধারণাটা কিরকম? খুব বিরূপ? মানে, আমরা সবাই দয়ামায়াহীন অত্যাচারী, নিষ্ঠুর বিউরোক্র্যাট এই রকম কিছু কি?'

বৃদ্ধা ঘাড় নাড়লেন্। বললেন, 'না। না। তা কেন? তবে মেজর ক্যালেণ্ডার সম্বন্ধে তার কিছু কিছু ব্যক্তিগত অভিযোগ আছে। অবশ্য এ কথাও বললো যে, তাতে কিছু যায় আসে না তার।'

'তার মানে, তোমার কাছে সে এমন কিছু বলেছে মেজর ক্যালেণ্ডার সম্বন্ধে যা মেজর নিশ্চয়ই শুনলে খুশি হবেন।'

বৃদ্ধা বেশ অসহায় বোধ করছিলেন। ছেলের মুখের দিকে সরাসরি চেয়ে বললেন, 'সে কি? তুমি কি মেজর ক্যালেণ্ডারকে এসব কথা বলবে? না রনী, তা করো না।'

'আমি নিরুপায় মা। আমায় বলতেই হবে। এ আমার কর্তব্য। কোন নেটীভ যে সরাসরি আমার অধীনে কাজ করে, সে যদি আমার অপছন্দ করে, এবং মেজর যদি তা জানেন, তাহলে আমি আশা করবো আমায় তিনি তার কথা জানাবেন। এই সামান্য বোঝাবুঝিটুকু আমাদের মেনে চলতেই হয়। নইলে এখানে আমরা টিকতে পারবো না।'

'কিন্তু বাবা! এ তো আমাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা। খুবই ব্যক্তিগত।'

'ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই। আজিজ নিজেও তা জানে। সুতরাং তোমার দুর্ভাবনার কারণ নেই। তবে আমার বিশ্বাস, মেজর ক্যালেণ্ডার সম্বন্ধে ও যা বলেছে, তা ঠিক নয়।'

'কেন নয় ?'

'তোমাকে খুশি করার জন্যে ও মেজরের বদনাম করেছে তোমার কাছে। মিসেস 'মুর অবাক। বললেন, 'আমাকে খুশি করার জন্যে ? তোমার কথা আমি ঠিক বুঝলাম না বাবা!'

'শোন মা! বোঝাবার চেষ্টা করছিল রনী। বললো, 'এসব হলো শিক্ষিত নেটীভ্‌দের আধুনিক চালাকি। আগের কালের নেটীভরা ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতো। তোশামোদ করতো। এ কালের ছেলেরা আস্ফালন করে। তবে চাটুবাদ বলো, আর আস্ফালন বলো, ওদের প্রতিটি কথার পেছনে একটা ইঙ্গিত থাকে। আর যেখানে তা থাকে না, সেখানে সে তার ইজ্জতের অজুহাত তোলে। তারপর সাদা ইংরিজিতে যাকে স্কোর করা বলে, তাই করে। অবশ্য সবাই এক ছাঁচের নয়। ব্যতিক্রমও আছে।'

রনীর কথায় একটু যেন দুঃখিত হলেন বৃদ্ধা। বললেন, 'দেশে থাকতে তুমি তো এমনভাবে মানুষের বিচার করতে না, বাবা ?'

রনী ঘাড় শক্ত করে বললো,

'ইণ্ডিয়া আমার দেশ নয়, মা।'

অবশ্য ইচ্ছে করেই রনী কটুভাষী হয়েছে। নইলে মিসেস মুর চুপ করতেন না। এ ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত। শক্ত কথাগুলো সে বলতে শিখেছে কবে থেকে। এগুলো মেজর ক্যালেণ্ডার বা মিস্টার টারটনের মতন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পদস্থ কর্মচারীদের কথা। তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কথা যা তারা ক্লাবের মধ্যে বলাবলি করে। মিসেস মুর বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন রনী একটাও নিজের কথা বলে নি। যা বলেছে সব ধার করা কথা। ইচ্ছে করলে চাপ দিয়ে তা বার করতে পারতেন। কিন্তু রনীকে অপ্রস্তুত করতে চাইলেন না বৃদ্ধা। শুধু বললেন, 'তোমার কথার প্রতিবাদ আমি করছি না বাবা। হয়ত যা বলেছ তা খুবই যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু কথা দাও, ডাক্তার আজিজ সম্বন্ধে যা শুনলে তা তুমি মেজর ক্যালেণ্ডারকে জানাবে না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো না রনী। তবে শর্তাধীন। বললো, 'বশ কথা দিলাম। কিন্তু তুমিও কথা দাও য়্যাডেলার কাছে আজিজের কথা তুলবে না।'

'তুলবো না ? কেন ?'

'মা, তুমি শুধু নিজের কথাই ভাবছো। আমার কথা ভাবছো না। অথচ সব কথা তোমায় বুঝিয়েও বলতে পারছি না আমি। কেন বুঝছো না যে, এর ফলে য়্যাডেলার মনে দুশ্চিন্তা বাড়বে। তার ধারণা হবে আমরা বোধহয় নেটীভদের সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহার করি না। যতসব উদ্ভট, ননসেন্স চিন্তা!' মিসেস মুর একই সুরে বললেন, 'কিন্তু ওই দুশ্চিন্তা নিয়েই সে এখানে এসেছে। জাহাজে উঠেও সে এই আলোচনা করেছে। তারপর এডেন বন্দরেও আমাদের এই কথা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সে তোমায় চেনে খেলোয়াড় হিসেবে। তোমার কর্মজীবনের সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই। তাই বিয়ের ব্যাপারে পাকা সিদ্ধান্ত নেবার আগে, সে তোমায় ঠিকমতন

জেনে বুঝে নিতে চায়। তার ইচ্ছে, তুমিও তাকে জেনে বুঝে নাও। খুবই খোলা মনের মেয়ে সে।'

মা'র কথা চুপ করে শুনছিল রনী। শেষ হলে শুধু বললো, 'আমি জানি।' রনীর গলার বিষণ্ণতা যেন মায়ের প্রাণ স্পর্শ করলো। মিসেস মুরের মনে হলো ছেলে তাঁর ছোট্টটিই আছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, যেমনটি সে চাইছে তাই করবেন। অকারণ তার মনে কষ্ট দেবেন না। তারপর গুড্ নাইট জানিয়ে শুতে গেলেন। ঘরে এসে আজিজের কথাও মনে পড়লো বৃদ্ধার। আজিজের কথা ভাবতে বারণ করে নি রনী। তাই নতুন করে ভাববার প্রেরণা পেলেন বৃদ্ধা। মনে পড়লো মসজিদের কথা। ছেলেটা প্রথম সাক্ষাতে তাঁকে প্রায় অপমানই করেছিল। তিনি অবশ্য গায়ে মাখেন নি। মিসেস ক্যালেণ্ডার ভাল কি মন্দ, তা তিনি জানতে চান নি। ছেলেটা প্রথমে মহিলার প্রশংসাই করে। পরে যখন দেখলো যে এ ব্যাপারে তাঁর কোন তাপ উত্তাপ নেই, তখন নিন্দে শুরু করলো। নিজের অভিযোগের কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে, তোষামোদ করে কথা বলেছে। তাঁর সহানুভূতি পাবার জন্যেই সে যে এসব করেছে এখন তা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। কিন্তু কি সে দিতে পারলো তাঁকে? খানিকটা আত্মম্ভরিতা। এটাই কি মনুষ্যত্বের সার বস্তু? যদি তাই হয় তবে বলতেই হবে যে জীবনের মহার্ঘ অভিজ্ঞতাটি ইতিমধ্যে হারিয়ে ফেলেছে ছেলেটি।

গা থেকে ক্লোকটা খুলে পেরেকের গায়ে সেটা ঝুলিয়ে রাখতে গেলেন বৃদ্ধা। একটা বোলতা বাসা বেঁধেছে সেখানে। ছোট্ট বোলতা। ইংল্যাণ্ডে যেমন দেখা যায় তেমন নয়। ওড়বার সময় এদের সরু হলুদ রঙের ঠ্যাঙ পিছন দিকে ঝোলে। বোধহয় কাঠের গজালটাকে সে গাছের ডাল ভেবেছে। মানুষের অন্দরমহল সম্বন্ধে এদেশের পশুপাখির আলাদা জ্ঞান নেই। তাই ইঁদুর বাদুড় পোকামাকড় সবাই ঘরের মধ্যে খড়কুটো দিয়ে বাসা বাঁধছে। তাদের ধারণা পৃথিবীর সবটাই জঙ্গল আর তাদের গতিও অবাধ। গজালটাকে আঁকড়ে ধরে ছোট্ট বোলতাটা ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরে শেয়াল ডাকছে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে ঢাকের শব্দ। নিঃশব্দতা তাই যেন বেড়ে গেছে।

সোনা আমার বলে বোলতাটাকে আদর করলেন মিসেস মুর। বোলতাটা শুনলো না। উড়েও গেল না। কিন্তু বৃদ্ধার মৃদু ডাকটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। রাতের অস্থিরতাটুকু যেন বেড়ে গেল তাতে।

৪

কালেক্টর কথা রেখেছেন। পরের দিনই আশপাশের ভারতীয়দের মধ্যে ছাপানো নেমতন্ন পত্র বিলি হয়ে গেল। আগামী মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে নিমন্ত্রিত অতিথিদের ক্লাবের ফুলবাগানে সম্বর্ধনা জানানো হবে। মিসেস টার্‌টন্ নিজে উপস্থিত থেকে সেই সব মহিলাদের অভ্যর্থনা জানাবেন যারা পরদানশীন নয়। বলা বাহুল্য ছাপানো নেমন্তন্ন পত্র পাওয়ার পর থেকে ভারতীয়দের মধ্যে অনেক জায়গাতেই মৃদু আলোড়ন উঠলো।

আলির বিশ্বাস লেফট্যানেন্ট গভর্ণরের নির্দেশেই টার্‌টন্ এই অভ্যর্থনার আয়োজন করেছে। সে বললো, 'নেহাৎ বাধ্য না হলে টার্‌টন এমন কাজ করতো না। উচ্চপদস্থ আমলাদের মেজাজ অন্যরকম—তাঁরা যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। যেমন ধরুন বড়লাটসাহেব। এঁদের কাছ থেকে আপনি এমন শোভন, ভদ্র ব্যবহার পাবেন যা আপনি ভাবতেই পারেন না। কিন্তু এঁরা তো চট করে আসেন না! এঁদের সাক্ষাৎ মেলে কালেভদ্রে। তখন এদের যাঁরা বদলি, অর্থাৎ—'

বেশ বুড়ো মতন একজন সজ্জন মানুষ আলির কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। মুখ ভর্তি সাদা দাড়ি মানুষটার। ইনি নবাব বাহাদুর। মুসলমান সমাজের সবাই তাঁকে খাতির করে। আলির কথা শেষ হবার আগেই নবাব সাহেব মৃদু হেসে বললেন, 'দ্যাখ বাবা দূর থেকে ভাল ভাল কথা বলে সহানুভূতি দেখানো খুব সোজা। কিন্তু কাছের লোক যখন মিষ্টি ব্যবহার করে তার দাম অনেক বেশি। চাপে পড়েই হ'ক বা নিজের থেকেই হ'ক টার্‌টন্ আমাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছে, মিষ্টি করে কথা বলেছে এবং আমরা তা পেয়েছি। এখন আর এ নিয়ে নাড়াঘাঁটা করা ঠিক নয়। কোরাণে কি বলেছে, শোন।'

কিন্তু কোরাণের বাণী শোনার মতন মনের অবস্থা তখন আলির নয়। আলি বললো, 'আপনি নিজে ভদ্র বলেই সবাইকে ভদ্র মনে করেন। কিন্তু আপনার মতন মধুর স্বভাব কি আমাদের আছে? তাছাড়া কত আপনার পড়াশুনো!'

নবাবসাহেব মৃদু হেসে বললেন, 'লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর আমার বন্ধু মানুষ মানি। কিন্তু আমি তার সুযোগ নিয়ে তাঁকে বিব্রত করতে যাই না। আমাদের বন্ধুত্ব ওপর ওপর। কেমন আছেন নবাব বাহাদুর? আজ্ঞে ভাল। আপনি কেমন আছেন স্যার গিলবার্ট? বাস, এইটুকুই আমাদের আলাপের পরিধি। অবশ্য টার্‌টন্‌কে আমি বেগ দিতে পারি। তবে নেমন্তন্ন যখন

করেছে, তখন আমি গ্রহণ করতে বাধ্য। আমি আসবো। সোজা দিলখুসা থেকে এইজন্যেই আসবো এবং জরুরি কাজ ফেলেই আমি আসবো।'

আলাপটা মোটামুটি অন্তরঙ্গই ছিল। কিন্তু একটা চড়া কথায় সুরটা যেন কেটে গেল। বেঁটে কালো মতন একটা লোক হঠাৎ বলে বসলো, 'আপনি কিন্তু নিজেকে খুব খেলো করে ফেললেন!'

কে বললো কথাটা? যেই হ'ক, সে অত্যন্ত অভদ্র। নবাব সাহেবের মতন ভদ্র এবং শরীফ্ মানুষকে অসম্মান করতেই কথাটা সে বলেছে। হয়ত কথাটা সর্বৈব মিথ্যা নয়। অন্তত আলির কাছে। কিন্তু রুচির বিচারে খুবই অশোভন। ভুঁইফোঁড় লোকটাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। আলি এগিয়ে এল। তারপর দুটো হাত কোমরে দিয়ে সামনে ঝুঁকে কড়া স্বরে আলি বললো, 'রামচাঁদ'!

'বলুন আলি।'

'বোধহয় আমাদের সাহায্য ছাড়াই নবাব বাহাদুর ঠিক করতে পারেন কোন্ কাজটা খেলো আর কোন্‌টা খেলো নয়। তাই না?'

নবাব বাহাদুরও মিষ্টি হেসে বললেন, 'ভাই, আমারও কি সাধ নিজেকে ছোট করি?' পরিবেশটা উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তাকে লঘু করতেই এমন-ভাবে তিনি বললেন। প্রথমে তিনিও ভেবেছিলেন লোকটাকে কড়া জবাব দেবেন। একটু অন্যরকম জবাব। বলবেন, 'হ্যাঁ খেলো হতেই চাই।' লোকটার ব্যবহার রীতিমত অশিষ্ট। তিনিও যদি উগ্র জবাব দেন তার পরিণাম খারাপ হতে বাধ্য। তাই যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে বললেন, 'ওরা নেমন্তন্ন করেছে, আমরা তা গ্রহণ করেছি। এতে খেলো হবার তো কোন কারণ নেই, ভাই! চিঠির ভাষাটিও কত মিষ্টি! বলুন?'

নবাব বাহাদুর আলোচনাটা আর গড়াতে দিলেন না। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর নাতি। অত্যন্ত সুশ্রী দেখতে ছেলেটি। পাছে এদের সঙ্গে তাঁর মত-পার্থক্য তীব্র হয়, তাই নাতিকে তাঁর গাড়িটা আনতে বললেন। গাড়ি আসতেই গাড়িতে উঠে বসলেন নবাব বাহাদুর। তারপর সকলের দিকে হাত নেড়ে বললেন, 'তাহলে ওই কথাই রইলো। মঙ্গলবার বিকেলে ক্লাবের ফুলবাগানে আমরা সবাই আসছি।'

নবাব বাহাদুরের কথার ওপর এদের অনেক ভরসা। এরা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় তাঁর কথায়। একে ধনী তার পরোপকারী মানুষ। দানধ্যানের ব্যাপারে তাঁর খ্যাতি চন্দ্রপুরের সবাই জানে। সব থেকে বড় কথা হলো তিনি সিদ্ধান্ত নিতে জানেন। সুতরাং এমন মানুষের কথা এখানকার সব ধর্মাবলম্বী মানুষই মানে গনে। সহজ সোজা মানুষ। যখন শক্ত তখন শক্ত। অন্য সময়ও তেমনি। দানের ব্যাপারে তাঁর নীতি হলো 'ধার দেবে কিন্তু ধার নেবে না। মরার পর কে তোমায় ধন্যবাদ দেবে? যখন মরবে নিঃস্ব হয়ে মরবে। ধনের স্মৃতি নিয়ে মরার চেয়ে লজ্জার আর কি থাকতে পারে!' এইরকম একজন মানুষ যখন বিশ পঁচিশ মাইল দূর থেকে গাড়ি চড়ে নেমন্তন্ন রাখতে আসেন, তখন উৎসবের চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়। কারণ, আসবো ব'লে শেষ মুহূর্তে

না আসার মানুষ তিনি নন। এইসব কারণেই নবাব বাহাদুরের অনুরোধটা সদ্য সদ্য ফেলতে পারলো না কেউ। সবাই স্থির করলো যে তারা পার্টিতে উপস্থিত থাকবে। অবশ্য মনেপ্রাণে তাঁর যুক্তি মেনে নিতে তাদের বাধছিল। কাছারির সামনের ছোট্ট ঘরটার মধ্যে বসে নবাব সাহেব কথা বলছিলেন। এখানেই উকিলবাবুরা মক্কেলদের জন্যে অথবা মক্কেলরা উকিলবাবুদের জন্যে মাটিতে বসে অপেক্ষা করে। কালেকটর সাহেবের নেমন্তন্ন এরা কেউ পায় নি। এই সমাজের বাইরেও মানুষ আছে। তাদের কৌপীন সার। আবার এমন মানুষও আছে যারা তাও পরে না। শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টির বাইরে বহুদূর অব্দি ছড়িয়ে আছে মানবজাতি। কোন পার্থিব ডাক এরা শোনে না। তাতে সাড়াও দেয় না।

তারা জানে যে শোনার মতন ডাক একটাই। এই ডাকটা ওপর থেকে আসে। এই প্রত্যাদেশ না পেলে মানবজাতিকে মিলিত করার সব চেষ্টাই বিফল। স্বার্থে স্বাথে সংঘাত, দ্বন্দ্ব, ঠোকাঠুকিতে বিভেদই বাড়বে। মিলন হবে না। এইরকম ভাবনার মানুষ হলেন দুজন ক্রীশ্চান মিশনারী। এঁরা অনুগত খ্রীষ্টভক্ত। একজন বৃদ্ধ গ্রেস্‌ফোর্ড অন্যজন যুবক শোলী। কসাইখানা ছাড়িয়ে আরও দূরে বাস করেন এঁরা। তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া এঁরা রেলগাড়িতে চড়েন না এবং কখনও ক্লাবে আসেন নি। ধর্ম প্রচারের সময় সাধারণ মানুষকে এঁরা বোঝান যে তাঁদের পরমপিতার আলয়ে অনেক ঘর। সেখানে সবাই আপন। ছোট ছোট স্বার্থ নিয়ে কলহলিপ্ত ভেদবুদ্ধির মানুষ সেখানে দুদণ্ড শান্তি পেতে আসে। এই আশ্রয় থেকে কাউকে বঞ্চিত করা হয় না। সাদা কালো মানুষে প্রভেদ করা হয় না। যার হৃদয়ে প্রেম আছে তেমন কাউকে দোরগোড়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। শুধু কি তাই? ঈশ্বরেব করুণা সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে আছে। শুধু মানবজাতি নয় বানরকুলও এই করুণা থেকে বঞ্চিত নয়। ঈশ্বরের রাজ্যে কি তাদের জন্যেও নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই? বৃদ্ধ গ্রেস্‌ফোর্ড এবং যুবক শোলীর মধ্যে এই নিয়ে সামান্য মতপার্থক্য আছে। বৃদ্ধ গ্রেস্‌ফোর্ড কিঞ্চিৎ অনুদার হলেও যুবক শোলী অত্যন্ত উদার। শোলীর ধারণা ঈশ্বরের করুণা সর্বত্রব্যাপী। তা অশেষ এবং সীমাহীন। শুধু মানবজাতি নয়, অন্যান্য প্রাণীকুল যেমন বানরজাতি বা আরও অন্ত্যজ প্রাণী যেমন শৃগাল এবং অন্য স্তন্যপায়ীদের মধ্যেই ঈশ্বরের করুণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করেছেন শোলী এবং জীবলোকের সব প্রাণীরই যে ঈশ্বরে অধিকার আছে নীতিগতভাবে তা স্পষ্ট হয়েছে তাঁর কাছে। কিন্তু কীটপতঙ্গ? যেমন বোল্‌তা? এরাও কি ঈশ্বরানুগ্রহ্ পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে? এই অব্দি নেবে এসে শোলীরও ধর্মপ্রচারে অনাগ্রহ দেখা দিয়েছে ইদানিং। ঈশ্বরের করুণাধারাটি আরও অধঃপতিত হতে দেবার সাহস হয় নি তাঁর। শুধু তো পোকামাকড় নয়! ঈশ্বরের আরও সৃষ্টি আছে। ফলমূল, গাছগাছড়া, পাথর, মাটি, কাদা আরও কত কি? এমন কি তাঁর নিজের শরীরের মধ্যে আশ্রয়পুষ্ট অসংখ্য জীবাণুকণা। এরা সবাই কি ঈশ্বরের করুণাপ্রার্থী?

এই প্রশ্নগুলো সমাবেশের সবাইকে কি ঈশ্বর কৃপা করতে পারেন? না না তা হয় না। অসম্ভব তা। কাউকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে, বঞ্চিতের দলে একজনও থাকবে না, এ কেমন কথা!

৫

ব্রিজ পার্টি একটুও দমলো না। অন্তত মিসেস মুর বা মিস কোয়েস্টেডের কল্পনার সঙ্গে মিললো না এই পার্টি। যেহেতু তাঁদের ঘিরেই পার্টির আয়োজন তাই আগেই এসেছেন তাঁরা। ভারতীয়রা আরও আগে এসেছে। টেনিস্ লনের ওপাশে ভিড় করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তারা।
মিসেস টার্টন্ও এসে পড়েছেন। মিসেস মুরের দিকে চেয়ে সামান্য হেসে বললেন, 'উনি এলেই শুরু করবো পার্টি। সবে পাঁচটা তো! আমার আবার এ ধরনের সমাবেশের সঙ্গে খুব পরিচয় নেই। মিস্টার হীস্লপ্ !'
রনী হীস্লপ তাকাল তাঁর দিকে। মিসেস টার্টন্ বললেন,,
'আমি মরার পরে কি এইরকম পার্টি দেবেন আপনারা?'
রনী মৃদু হাসছিল। উদ্দেশ্যমূলক হাসি। তার লক্ষ্য মা এবং মিস কোয়েস্টেড। একটু খোঁচা দিয়ে সে বললো, 'তোমরা ত' ছবির মতন সাজানো গোছানো মানুষ দেখতে চাও নি। আশা করি, যা চাইছিলে তা পেয়েছ! কিন্তু টুপি কুর্তায় আমাদের আর্য ভাইদের কেমন দেখছেন বললেন না তো?' শেষ কথাটা য়্যাডেলার দিকে চেয়ে বললেন। মিসেস মুর বা মিস কোয়েস্টেড জবাব দিলেন না। ব্যথিত হয়ে তাঁরা চেয়েছিলেন ওই সমাবেশের দিকে। দেখবার মতন কিছু নেই সেখানে। একটা পরিত্যক্ত ঐশ্বর্য যেন। এই কি প্রাচ্য? এই কি সর্বধর্ম সমন্বয়ের দেশ ভারতবর্ষ? হয়ত ছিল। এখন অধঃপতিত হয়ে গেছে সেই ঐশ্বর্য। ব্যথিত চোখে সেই দরিদ্র ছবিটাই দেখছিলেন তাঁরা।
রনী বললো, 'একটা কথা মনে রাখতে হবে তোমাদের। যাদের দেখছো তারা কেউ বিশিষ্ট নয়। সমাজের যারা বিশিষ্ট তারা আসে নি। ঠিক বলি নি মিসেস টার্টন্?'
'ঠিক তাই।' মিসেস টার্টন্ পিছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন। যতটা পারেন বাক সংযম অভ্যাস করছেন তিনি। পদাধিকার বলে তিনিও একজন বিশিষ্ট মহিলা। মনে মনে তাই গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। আজকের পার্টি নিয়ে তাঁর বিশেষ মাথাব্যথা নেই। অনাগত কোন অনুষ্ঠানের কথা ভাবছিলেন। হঠাৎ কোন ওপরওলা এসে পড়লে পদমর্যাদার প্রশ্নে নিজেকে তখন খেলো না করে ফেলেন। তাই দুই ধরনের সমাবেশে সংযমটুকু বজায় রাখার অভ্যাস করে যান তিনি।

মিসেস টারটনের সমর্থন পাবে ধরে নিয়ে রনী বললো, 'শিক্ষিত হলেই ভারতীয়রা যে আলাদা হবে তা নয়। এক সারিতে দাঁড়ালে তারাও এদেরই মতন। সুতরাং আমাদের কাছে শিক্ষিত অশিক্ষিত দুই সমান। এখানে যাদের দেখছো তারা অনেকেই মনে মনে ইংরেজবিদ্বেষী। বাকিরা ঝগড়াটে। কিন্তু আসল ভারতীয় বলতে যা বোঝায় তা কেউ নয়। মানে, হাবভাব, পোষাক-আশাকে এরা কেউ ভারতীয় নয়।'

বলতে বলতে হাত তুলে অপেক্ষারত জনতার দিকে ইঙ্গিত করলো রনী। সমাবেশের সবাই সুবেশী। চোখে বাহারি ফ্রেমের চশমা। কারও চোখে প্যাঁশনে। তাদের বিলিতি পোষাকগুলো শরীরের সঙ্গে মানায় নি। খুব কম মানুষের গায়েই পোষাকটা মানানসই হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষের গায়েই ওগুলো ঘাএর মতন দেখাচ্ছে। রনী চুপ করবার পরও কেউ কথা বললো না। ইংরেজদের সমাবেশে আরও মহিলা এসেছে। নিচুস্বরে সবাই কথা বলছে। উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কথাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। আকাশময় স্বাধীনভাবে চিল উড়ছে। আরও উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে শকুনের দল। এরা সবাই স্বাধীন। কিন্তু আকাশ আরও স্বধীন আরও নিরপেক্ষ। তার সুউন্নত উদার বক্ষপট নিষ্কলুষ, নির্মল। আকাশভরা আলোয় ঝলমল করছে সমগ্র বিশ্বসংসার। কিন্তু আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে কি আরও উদার, আরও গভীর, মহান কোন শাশ্বত সত্তা আছে, যা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ঢেকে রেখেছে? হয়ত তা অসম্ভব নয়। কিন্তু তারও পরে? কিছু কি আছে? কে জানে?

সদ্য অভিনীত নাটক নিয়েই কথা বলছিল সবাই।

অভিনয়ের মধ্যে তারা এখানকার জীবনধারাই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ প্রবাসী ইংরেজদের মধ্যবিত্ত জীবনধারা, যাতে তারা অভ্যস্ত। পরের বছর কোন্ নাটক অভিনয় করবে, তারও আলোচনা হলো। বস্তুত, বছরে একবারই সাহিত্য পাঠে তাদের রুচি হয়, যখন বাছাই করার জন্যে নাটক পড়তে হয়। অন্য সময় সাহিত্যপাঠ অবাঞ্ছিত। পুরুষদের সাহিত্যপাঠের সময় নেই এবং এই অরুচি মহিলাসমাজেও ঢুকে পড়েছে। অন্তত এই একটা ব্যাপারে তারা দৃকপাতহীন ভাবে পুরুষদের অনুসরণ করে। সংস্কৃতি সম্বন্ধে এদের অজ্ঞতা দেখবার মতন। আর সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যখন ঢাক পিটিয়ে নিজেদের মধ্যে এই অজ্ঞতা তারা প্রচার করে। অবশ্য তাদের ধারণা ভারতীয় পরিবেশে এসেই এই অবক্ষয় ঘটেছে। রনীর একটা পুরোনো বাদ্য-যন্ত্র ছিল। পুরোনো এই বাদ্যযন্ত্রটি দেখতে বড়সড় বেহালার মতন। মিসেস মুর যখন দোকানে গিয়ে এটার খোঁজখবর করছিলেন, তখন রনী কোনক্রমে তাঁকে নিরস্ত করে। আজকের দিনে এই ধরনের বাদ্যযন্ত্র নাকি একেবারে অচল এবং হাটে-বাজারে তা নিয়ে কেউ কথাও বলে না।

মিসেস মুর সকৌতুকে লক্ষ্য করলেন যে ছেলের মতামতের অনেক বদল হয়েছে। আগের মতন সে আর স্পষ্টবক্তা নেই। এখন সে লোকের মন বুঝে কথা বলে। মনে আছে লণ্ডনে এই নাটকটিই তাঁরা একসঙ্গে দেখেছিলেন।

রনী সেদিন নির্মমভাবে নাটকটার সমালোচনা করেছিল। এখানে সে ঢোক গিলে অন্য রকম কথা বললো, নাটকটা তার নাকি ভাল লেগেছে। মিসেস মুর বুঝতে পারলেন পাছে লোকেরা অসন্তুষ্ট হয় তাই আপোস করে কথা বলেছে রনী। স্থানীয় কাগজে নাটকটা নিয়ে বিরূপ সমালোচনা বেরিয়েছে। মিসেস লেস্‌লী বেশ রুষ্ট। বললেন, 'ভাবতেই পারছি না এমন রুচিহীন একটা লেখা কোন ইংরেজ লিখতে পারে।' সাধারণভাবে অভিনয় বা প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রশংসা থাকলেও, একটা নির্মম সত্যভাষণও ছিল। সমালোচক লিখেছে, 'মিস ডেরেকের অভিনয় চরিত্রানুগ না হলেও, রূপসজ্জায় তাঁকে চমৎকার মানিয়েছিল। অবশ্য অভিনয় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এই মহিলা প্রায়ই তাঁর পার্ট ভুলে যাচ্ছিলেন।' বলাবাহুল্য এই সত্যভাষণটি ডেরেক ছাড়া অনেককেই গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। মিস ডেরেক অত্যন্ত হালকা চপল স্বভাবের মেয়ে। সমালোচনা দেখে তার বিশেষ কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য হয় নি। তা ছাড়া চন্দ্রপুরের মেয়েও সে নয়। হপ্তা দুয়েকের জন্যে এখানে বেড়াতে এসেছে সে। পুলিশের বড়কর্তা ম্যাকব্রাইড্‌দের বাড়িতে অতিথি হয়ে আছে। তার চরিত্রটিতে অভিনয় করার লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই প্রায় শেষ মুহূর্তেই তাকে নামানো হয়। কিন্তু কি চমৎকার প্রত্যুপকারের স্মৃতি সে সঙ্গে নিয়ে যাবে? এই কথা ভেবেই ডেরেকের শুভানুধ্যায়ীরা আরও বিপন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

ভারতীয় মহিলাদের একটা ছোট্ট দল মাঠের তিন কোয়ার্টার জায়গা দখল করে দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে যারা নেহাৎই ভালমানুষ, গোবেচারা তারা আগেই সেই কুঁড়ে ঘরটার মধ্যে জড়ো হয়েছিল। বাকিরা মেমসায়েবদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। এদের পুরুষরা খানিক দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা সকৌতুকে লক্ষ্য করছিল। উপভোগ্য দৃশ্য সন্দেহ নেই। মাঠটাকে একটা ন্যাড়া দ্বীপের মতন দেখাচ্ছে।

কালেকটর এসে গেছেন। হাতে একটা ছোট্ট বাহারি ছড়ি। সেটা নাচাতে নাচাতে স্ত্রীর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'চল মেরী ওদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়টা সেরে ফেলা যাক।'

'ওই পর্দানশীন মেয়েরা তো দেখছি ঠিক এসেছে? ভাবতেই পারি নি।' একটু থেমে মিসেস টার্‌টন্‌ আরও বললেন, 'ওদেরই উচিত ছিল এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করা। যাক, বলছো যাচ্ছি। কিন্তু নবাব বাহাদুর ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে আমি হ্যান্ডশেক্‌ করবো না।'

কালেক্‌টর মিস্টার টার্‌টন্‌ স্ত্রীর কথার জবাব দিলেন না। সমাবেশের দিকে চেয়ে বললেন, 'কারা কারা এসেছে?' তারপর নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'অনেকেই এসেছে দেখছি। এত লোক আসবে ভাবি নি। এই লোকটাও এসেছে দেখছি! নিশ্চয়ই তদ্বির করতে। হিন্দু জ্যোতিষিটাও এসেছে। পার্শীটাও এসেছে দেখছি।

এগোতে এগোতে মিসেস টার্‌টন্‌ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ওদের কিন্তু গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া উচিত হয় নি।' ওঁর সঙ্গী হয়েছেন মিসেস মুর,

মিস কোয়েস্টেড আর কালেক্টরের পোষা টেরীয়ার কুকুরটা। হাঁটতে হাঁটতে মিসেস টার্টন্ বললেন, 'পর্দা ছেড়ে কেন যে এরা বাইরে বেরোয় জানি না। মেয়ে পুরুষের খোলাখুলি মেলামেশা ওরা খুব অপছন্দ করে। যেমন আমরাও করি ওদের এই পর্দাপ্রথা। মিসেস ম্যাকব্রাইডকে জিজ্ঞেস করবেন. ওর পুলিশবর প্রায়ই ওকে দিয়ে পর্দা পার্টি দেওয়াত।'

'এটা কিন্তু পর্দা পার্টি নয়।' ভুল শুধরে দিল য়্যাডেলা। মিসেস টার্টন্ও চড়া মেজাজে ছিলেন। বললেন, 'হুঃ!'

ভারতীয় মেয়েদের অবাক হয়ে দেখছিলেন মিসেস মুর। মিসেস টার্টন্কে ফিসফিস করে বললেন, 'এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন তো?'

'দেব। কিন্তু মনে রাখবেন পদমর্যাদায় এরা কেউ আমাদের সমকক্ষ নয়। দুএকজন রনী ছাড়া।'

কথাটা বলে মিসেস টারটন মহিলা দলের দিকে এগিয়ে এলেন। সবার সঙ্গে করমর্দন করলেন। উর্দুতে সবাইকে ধন্যবাদ দিলেন। চাকর-বাকরদের ধমকাতে বা তাদের হুকুম করতে উর্দুটা রপ্ত করেছেন মহিলা। কিন্তু যা তিনি শিখেছেন, তা দিয়ে হুকুমই চলে, আলাপ চলে না। যা হোক, প্রাথমিক আলাপ পর্ব মিটলো। সঙ্গিনীদের দিকে চেয়ে মিসেস টার্টন্ বললেন. 'ঠিক আছে তো?'

মিসেস মুর যথার্থই ভালমানুষ। কালেক্টর পত্নীকে অনুনয় করে বললেন, ওঁদের বলে দিন যে ওঁদের ভাষায় আলাপ করতে পারলুম না বলে খুব দুঃখিত। সবে এসেছি, এখনো ভাষাটা তেমন শিখি নি।'

মেয়েদের একজন বলে উঠলো, 'তাতে কি? আমরা তো আপনাদের ভাষা অল্পস্বল্প জানি।' মেয়েটি ইংরিজিতেই বললো।

মিসেস টার্টন্ অবাক। বললেন, 'দেখছি, আপনি ইংরিজি জানেন!

আর একটি মহিলা বললো. 'আরও জানি। ইস্টবোর্ণ, পিকাডেলী, হাইড্ পার্ক কর্নার!'

য়্যাডেলা দারুণ খুশি। উদ্ভাসিত মুখে বলে উঠলো, 'কি মজা! আমরা মন খুলে আলাপ করতে পারবো।'

অল্প দূরে পুরুষরা দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল। একজন বলে উঠলো, 'ও কিন্তু প্যারিসও দেখেছে।'

মিসেস টার্টন্ খুবই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ। পথে প্যারিস পড়ে বটে!' যেন যাযাবর পাখিদের পথের বৃত্তান্ত দিচ্ছেন তিনি। বস্তুত, যখনই জেনেছেন এরা ইংরিজি জানে এবং ভারতবর্ষের বাইরের জগতের খবর রাখে তখনই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন মহিলা।

পুরুষ দর্শকটি ততক্ষণে মহিলাদলের একজনের দিকে আঙুল তুলে পরিচয় দেবার চেষ্টা করছিল। বললো. 'ওই ছোটখাট মহিলাটি আমার স্ত্রী. মিসেস ভট্টাচার্য। আর ওর পাশে লম্বামতন যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে ও আমার বোন মিসেস দাস।'

ওরা দুজনেই ফিক করে হাসলো। অপ্রস্তুতির হাসি। তারপর শাড়িট

গুছিয়ে নিল। এ ধরনের পরিবেশে তাদের কোন্ আচরণ শোভন হবে, তা তারা বুঝে উঠতে পারছিল না। অর্থাৎ পূর্ব না পশ্চিম কোন্ রীতিতে অভিবাদন জানাবে তা না জানার দরুন। সবাই কেমন জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যখন মিস্টার ভট্টাচার্য কথা বলছিল, তখন তার স্ত্রী মুখ ঘুরিয়ে অন্য মানুষ দেখতে লাগলো। কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে গা টেপাটেপি করতে লাগলো। কেউ বা এমন ভাব দেখাল যেন এসব ব্যাপারে তার কোন উৎসাহই নেই। কেউ অকারণ কুকুরটাকে আদর করছিল। কেউ বা ভয় পেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকলো। মিস য়্যাডেলা কোয়েস্টেডের ইচ্ছাপূরণ হয়েছে। ভারতীয় মেয়েরা তার সামনেই দাঁড়িয়ে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আলাপ জমাতে পারলো না সে। ওদের সংস্কারের শক্ত দেওয়াল ভেদ করে ঢুকতে পারলো না। শুধু আঘাতের প্রতিধ্বনি শুনলো। সব থেকে অবাক হচ্ছিল যখন দেখলো, সে যা-ই বলুক না কেন, ওদের মনে তার কোন প্রভাব পড়ছে না। অস্ফুট একটা নিস্পৃহতা, যেন কোন কিছুই তাদের স্পর্শ করে না। য়্যাডেলা নিজের রুমালখানা মাটিতে ফেলে দিল। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার! মেয়েরা তাতেও নিস্পৃহ। মিসেস মূরও চেষ্টা করে হতাশ হয়ে গেছেন। শুধু মিসেস টার্‌টন্‌ই ব্যতিক্রম। দল থেকে আলাদা দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ; এদের সম্বন্ধে একটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর ভঙ্গি থেকে। ব্যাপারটা যে নন্‌সেন্স শুরু থেকেই তিনি জানতেন।

সবাই চলে গেলে ছোটখাট বাঙালী মেয়েটির সঙ্গেই কথা বলার ইচ্ছে হলো মিসেস মূরের। মেয়েটি অর্থাৎ মিসেস ভট্টাচার্যের মুখখানি খুব মিষ্টি। এগিয়ে এলেন মিসেস মূর। বললেন, 'আপনার বাড়ি গেলে আপত্তি করবেন?' মধুর ভঙ্গিতে ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটি বললো, 'আপত্তি করবো কেন? কবে আসবেন বলুন?'

'যেদিন আপনার সুবিধে।'

'আমার সব দিনেই সুবিধে।'

'বেস্পতিবার?'

'তাই হোক।'

'সেদিন তাহলে সবাই মিলে সত্যিকার মজা করা যাবে।' বললো য়্যাডেলা।

'কিন্তু কখন আমরা যাব?' মিসেস মূরও উৎসাহিত।

'যে কোন সময়।'

য়্যাডেলা একটু যেন অবাক। বললো, 'তা কি করে হয়? আমরা তো বিদেশী! ঠিক কখন অতিথি আসেন, তা আমরা জানি না।'

মেয়েটিও তা জানে না। তবে তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল বৃহস্পতিবারটি সে এদের জন্যে অপেক্ষা করে কাটাবে। কোথাও বেরোবে না। মেয়েটি এবার বলে উঠলো, 'আজ আমরা কলকাতা যাচ্ছি।'

'তাই না কি? তাহলে তো গিয়ে দেখবো আপনারা নেই।'

বউটি চট করে জবাব খুঁজে পেল না। পাশেই দাঁড়িয়ে মেয়েটির স্বামী ভট্টাচার্য। সে বললো, 'তা হোক। আপনারা বেস্পতিবারেই আসুন।'

'কিন্তু আপনারা তো কলকাতা যাচ্ছেন?'
'না। যাচ্ছি না।' লোকটি এবার খুব তাড়াতাড়ি বউকে বাংলায় কিছু যেন বললো। তারপর মিসেস মুরের দিকে চেয়ে বললো, 'তাহলে বেস্পতিবার আসছেন তো?'
বউটিও স্বামীর কথার প্রতিধ্বনি করলো। 'হ্যাঁ। বেস্পতিবার।'
মিসেস মুর ক্ষুণ্ণ স্বরে বলে উঠলেন, 'না। তা হয় না। আমাদের জন্যে আপনারা যাবেন না; সে ভারি অন্যায়।'
ভট্টাচার্য লোকটা হাসতে হাসতে বললো, 'কিছু অন্যায় নয় মিসেস মুর। আমরা তেমন দরের লোক নই।'
'তবুও আমার কিন্তু ভীষণ খাবাপ লাগছে।'
মিসেস মুরও হাসছিলেন। বলতে গেলে সবাই তখন হাসছিল। এলোমেলো কথা, হাসি ঠাট্টায় একটা লঘু পরিবেশ তখন সেখানে। মিসেস টার্টন্ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তা শুনলেন, তারপর মনে মনে একটু হেসে বিদায় নিলেন। ঠিক হলো বেস্পতিবার সকালেই তাঁরা ভট্টাচার্যের বাড়ি আসছেন। সকালেই আসবেন। গাড়ি পাঠাবে ভট্টাচার্য। কিন্তু এরা কোথায় উঠেছে তা কি ভদ্রলোক জানেন? ভট্টাচার্য হাসছিল। বললো, সব তার জানা। এরপর মিষ্টি মিষ্টি কিছু কথা আর হাসির আদান-প্রদান হলো এবং ওরা দুজন বিদায় নিলেন। ঘুরতে ঘুরতে কালেক্টরও এসে হাজির। আমন্ত্রিতদের দিকে চেয়ে ছোট-খাট হাসি-ঠাট্টা করলেন। সবাই হৈ হৈ করে তা উপভোগও করলো। অবশ্য ওদের ভাল না লাগার কিছু ঘটনাও তিনি জানতেন। কিন্তু সবিস্তারে সেগুলো ব্যাখ্যা করলেন না। এরা যখন তাঁকে ঠকায় নি, তখন তিনিও তাদের ঠকাতে চাইলেন না। এদের অনেকেই তাঁর কাছ থেকে কিছু আশা করে। তিনিও বিশ্বাস করেন, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সেতু বন্ধনের প্রয়াসটা নিছক ভাববিলাসিতা নয়। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর কোনো মোহ নেই। তাই ঠিক সময়েই এদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের দলের লোক-দের কাছে ফিরে গেলেন কালেক্টর। তাঁর এই চকিত অবগমনে ভারতীয়-দের মনে একটা বিচিত্র প্রতিক্রিয়া হলো। অনেকেই রীতিমত অভিভূত। চন্দ্রপুরের বড়সাহেব, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এসে তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন. এ যেন তাদের জীবনের একটা পাকা সম্পদ হয়ে রইলো। এরা সবাই সাধা-রণ মানুষ। এদের মতন আরও অনেকে অভিভূত। নবাব বাহাদুরের কথাই ধরা যাক। নিজের সম্বন্ধে উদাসীন হলেও, যথার্থ সম্মান দিয়েই ইংরেজরা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে। এদের সৌজন্যে তিনিও মুগ্ধ। হামিদ্উল্লাও খুশি। শুধু খুশি হয় নি মহম্মদ আলির মতন কিছু ইংরেজবিদ্বেষী মানুষ। এদের ধারণা যে ওপরতলার নির্দেশেই এই ব্রিজ পার্টি বা মিলন মেলার আয়োজন করেছে টার্টন্। অর্থাৎ বাধ্য হয়েছে করতে। মনের মধ্যে রাগ পুষেই এই কাজ করেছে টার্টনের মতন মানুষরা। তবুও এখানে এসেছে বলে মহম্মদ আলি খুশি। এতদিনের নিষিদ্ধ এলাকা অবারিত হয়ে গেল। ইংরেজদের ক্লাব ঘরের ভেতরকার অনেক দুর খবর তারা জেনে

ফেললো। খুশি সেইজন্যেই। আর কিছু না পারুক, এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে তারা হাসি-ঠাট্টা করতে পারবে।

এই মিলন মেলায় টারটন্ ছাড়া অন্য যে মানুষটিকে কর্তৃপক্ষের তরফে সব থেকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গেল, তার নাম ফীলডিং। চন্দ্রপুরের ছোট্ট সরকারী শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ। জায়গাটা সম্বন্ধে যতটুকু তার জ্ঞান, তার চেয়ে ঢের কম জ্ঞান এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয়দের সম্বন্ধে মানুষটার কোন বিরূপ ভাব নেই। প্রায় সর্বক্ষণ সে এদের সঙ্গেই রইলো। নেচে কুঁদে প্রায় লাফিয়ে বেড়ালো আমুদে মানুষটা। যেখানে সেখানে গেল, যাকে তাকে প্রশ্ন করলো এবং নানা ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে গিয়ে অসংখ্য ভুল করলো। তবে ছেলেমেয়েদের বাপ মায়েরা ঈষৎ ক্ষ্যাপাটে এই মাস্টারমশাটিকে প্রশ্রয় দিয়েই তার সব দোষ-ত্রুটি ঢেকে দিচ্ছিল। খাওয়া-দাওয়ার সময়ও মানুষটাকে এই দলেই দেখা গেল। এক মুঠো গরম ছোলাভাজা মুখে পুরে অবস্থা সামলাবার চেষ্টা করছে। এত বিরুদ্ধতার মধ্যেও মানুষটা এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে তাকে একেবারেই বিদেশী ভাবছিল না কেউ। সহজ কথাবার্তা আলাপ হচ্ছিল ফীলডিং-এর সঙ্গে। এই আলাপ থেকেই ফীলডিং জানতে পারলো যে, ইংল্যান্ড থেকে সদ্য এসেছেন যে দুজন মহিলা, তাঁদের সৌজন্যবোধে মুগ্ধ হয়ে গেছে এদেশের মানুষরা। তাঁরা যে নিজেরাই ভট্টাচার্যের সংসার দেখতে আগ্রহ দেখিয়েছেন, তার জন্যে ভারতীয় মহল বেজায় খুশি। খবরটা শুনে ফীলডিংও খুশি হলো। মহিলা দুজনের সঙ্গে তার কোন আলাপ নেই। তবুও খুশির কথাটা সে নিশ্চয়ই জানিয়ে দেবে।

খানিক পরেই তরুণী য়্যাডেলাকে একলা দেখতে পেল ফীলডিং। ক্যাকটাস ঝোপের ফাঁক দিয়ে দূরের মাড়াবার পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে। তখন সূর্যাস্ত হচ্ছে। পাহাড়ের লম্বা ছায়া পড়েছে এপাশে। সূর্যাস্তের সময়টা দীর্ঘক্ষণ হলে ছায়াটাও হয়ত টাউন অব্দি পৌঁছে যেত। কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলে সূর্য খুব তাড়াতাড়ি অস্ত যায়। ফীলডিং এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিল। ফীলডিংএর পরিচয় পেয়ে য়্যাডেলা এত খুশি হলো যে ঝলমল করে উঠলো যেন। ফীলডিংও প্রায় কৃতার্থ। বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন করে বসলো তাকে। উদ্ভাসিত মুখে য়্যাডেলা বললো, 'নিশ্চয়ই! আমি তো যাবই। মিসেস মুরও যাবেন। ক্লাবে তো দেখি নি আপনাকে?'

'আমি কিন্তু সংসারী নই। ঘরদোরের ছিরি আশ্রমের মতন।'

'তা হোক। এই পরিবেশে সংসার ঠিক মানায় না।' বললো য়্যাডেলা।

ফীলডিং কৈফিয়ৎ দিল। বললো, 'নিজের কাজ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকি তাই ক্লাবে ঠিকমতন যাওয়া হয়ে ওঠে না।'

'জানি, জানি। ক্লব জীবনের হাতছানি থেকে বেরিয়ে আসা কত কঠিন। আর সেইজন্যেই আপনাকে আমি ঈর্ষা করি কারণ ওই সময়টা আপনি ভারতীয়দের সঙ্গে মেশেন।'

'আপনি কি দুএকজন ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপ করতে চান?'

য়্যাডেলা উচ্ছ্বসিত। বললো, 'নিশ্চয়ই। বলতে কি ওই ইচ্ছেটুকু নিয়েই এসেছি। জানেন, আজকের এই পার্টি আমার খুব খারাপ লেগেছে। এত একঘেয়ে! খুব রাগ হয়ে গেছে আমার। এতটুকু সামাজিক বোধও কি আমার দেশের লোকগুলোর নেই? নিমন্ত্রিতরা যে অতিথি, তাদের যে অভ্যর্থনা করতে হয়, এই কাণ্ডজ্ঞানটা তারা ভুললো কি করে? আপনি, মিস্টার টারটন্ আর মিস্টার ম্যাকব্রাইড ছাড়া আর কারো মধ্যেই সামান্য শিষ্টাচারটুকুও দেখলাম না। অন্যদের ব্যবহারে আমি খুব লজ্জা পেয়েছি। এত খারাপ এদের ব্যবহার?'
বাস্তবিকই তাই। পুরুষরা অবশ্য ব্যাপারটাকে শোভন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের স্ত্রীদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বেসামাল হয়ে যায়। তাদের ফাইফরমাশের তত্ত্বাবধান করা, সময়মত চা দেওয়া, ঘন ঘন সাপ্তমেয়-সংবাদ যোগান দেওয়া, এইসব করতেই সময় বয়ে গেল। তারপর যখন টেনিস শুরু হলো, তখন আর কোন চক্ষুলজ্জার বালাই রইলো না। কথা ছিল, এদেশ আর ওদেশের খেলোয়াড়দের নিয়ে কয়েকটা ডবল্‌স্ সেট খেলা হবে। কিন্তু সে সব ভুলে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীরাই মিক্সড্ ডবল্‌স্ খেলা শুরু করে দিল। ফীলডিং নিজেও সবকিছু দেখেছে। কিন্তু মেয়েটার কাছে তখনই সব কথা ভাঙলো না। কে জানে মেয়েটার এই উচ্ছ্বাস কতটুকু খাঁটি? ফীলডিং অন্য কথা তুললো। তার কলেজে একজন বুড়ো অধ্যাপক আছেন। গানটান করেন। য়্যাডেলা যদি ইচ্ছে করে, তবে ভারতীয় রাগ সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে। তেমন আগ্রহ কি তার আছে?
য়্যাডেলা আবারও উচ্ছ্বসিত। বললো, 'হ্যাঁ। হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। আমাদের খুব ভাল লাগবে শুনতে।' একটু থেমে য়্যাডেলা বললো, 'ডাক্তার আজিজ নামে কাউকে চেনেন আপনি?'
'সরাসরি চিনি না। তবে ভদ্রলোক সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি। যদি বলেন, আমাদের চায়ের আসরে তাঁকেও আসতে বলি।'
'মিসেস মুর তাঁকে চেনেন। বলছিলেন, খুব চমৎকার মানুষ নাকি।' য়্যাডেলা জানালো।
'তাই হোক মিস কোয়েস্টেড। আগামী বৃহস্পতিবার। আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না তো?'
'মোটেই না। সেদিন সকালেই আমরা এক ভারতীয় বান্ধবীর বাড়ি যাচ্ছি। দেখছি, সব ভাল ব্যাপারগুলো বৃহস্পতিবারেই ঘটতে চলেছে।'
ফীলডিং হাসলো। তারপর বললো, 'আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে আসার জন্যে আমি কিন্তু সিটি ম্যাজিস্ট্রেটকে আলাদা করে কিছু বলছি না। আমি জানি ওই সময়টা উনি খুব ব্যস্ত থাকেন।'
ঘাড় নেড়ে সায় দিল য়্যাডেলা। বললো, 'হ্যাঁ। রনী কাজের মানুষ। সর্বক্ষণই সে খুব খাটে।'
কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল য়্যাডেলা। তাকিয়েছিল দূরের পাহাড়টার দিকে। তার কথাই সে এখন ভাবছে। কি আশ্চর্য সুন্দর হয়ে

ওই পাহাড়টা তার দৃষ্টির সামনে জেগে উঠেছে! কিন্তু কখনই সে তাকে ছুঁতে পারবে না। সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকবে তার ও রনীর বিবাহিত জীবন। অভ্যাসক্লিষ্ট একটা জীবন! ক্লাবে যাওয়া, ফিরে এসে পোশাক বদল করা এবং ক্যালেণ্ডার, লেস্‌লী, টার্‌টন্‌, বার্‌টন্‌দের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা। নেহাতই মামুলী প্রথাগত জীবনযাপন করতেই লগ্ন বয়ে যাবে। দেশটা সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল ধীরে ধীরে ঝরে যাবে। অথচ দেশটা তেমনই থাকবে। ভোরের আকাশ জুড়ে এক ঝাঁক পাখির সমাহার, মানুষের আদুল তামাটে রঙের গা, মাথায় সাদা পাগড়ি, লাল বা নীল রঙের দেববিগ্রহ, অগণিত সাধারণ মানুষের চলমান জীবনযাত্রা—তাদের হাটবাজার করা, পুকুরে স্নান করা আরও কত কি! ঘোড়ায় টানা শকটে চড়ে যেতে আসতে সে শুধু অলস চোখে এই জীবনযাত্রা দেখবে। কিন্তু যার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ধারাটা প্রবাহিত হচ্ছে, তার স্পর্শ পাবে না। ভারতবর্ষ নামে এই দেশটা তার দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে একটা প্রাণ-হীন উত্তাপহীন জড়পিণ্ডের মতন। অথচ তার সঙ্গিনী ওই বৃদ্ধার কি সৌভাগ্য! উত্তাপের এই আঁচটুকু তিনি আগেই পেয়ে গেলেন।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই সবাই ফিরে এল ক্লাব থেকে। বাংলোয় ফিরে পোশাক বদলাল য়্যাডেলা। তারপর ডিনার টেবিলে বসলো। আজ ডিনারে দুজন বাইরের নিমন্ত্রিত আছে। মিস ডেরেক আর ম্যাকব্রাইড দম্পতি। খাদ্য তালিকায় আছে জুলিয়েন স্যুপ, তার মধ্যে শক্ত শক্ত মটর দানা, ঘরে তৈরি পাঁউরুটি, কাঁটাওয়ালা মাছ। কাটলেট এবং সার্ডিনের টোস্ট। খাদ্য তালিকায় একটা বা দুটো পদ বাড়তে বা কমতে পারে। তবে এই বাড়া বা কমা নির্ভর করে গৃহকর্তার সরকারী পদমর্যাদার ওপর। মোট কথা, খাদ্য তালিকার এই ঐতিহ্য অনেকদিনের এবং সহসা তার ব্যতিক্রম হয় না। এদেশী বাবুর্চি দিয়ে রান্না করালেও, খাদ্যবস্তু ওদেশের এবং বিলিতি মতে রান্না করে ঐতিহ্য বজায় রাখতে হয়েছে। ডিনার টেবিলে বসে য়্যাডেলা ভাবছিল তার আগে আসা ছেলেমেয়েদের কথা। একের পর এক পি য়্যাণ্ড ও কোম্পানির জাহাজ বোঝাই হয়ে তারা এদেশে এসেছে এবং একই রকম খাদ্যবস্তু, চিন্তাধারা এবং বিশ্রম্ভালাপে অভ্যস্ত হয়েছে। তারপর যতদিন পর্যন্ত ক্ষমতাভূষিত হয়ে নিম্নপদস্থদের ভর্ৎসনা করতে শিখছে, ততদিন পর্যন্ত এইরকমভাবে নিজেরা ভর্ৎসিত হচ্ছে। একথা মনে হতেই য়্যাডেলার বিবমিষা হলো যেন। মনে মনে দৃঢ়ভাবে বললো, অমনটি সে কিছুতেই হবে না। হতে পারবে না। এখনো তার মন আছে এবং বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে সে মনের রঙ বদলায়। সে জানে যা সে চাইছে তা এদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার একেবারে বিপরীত। তাই এরা তা পেতে দেবে না। সেইজন্যেই তার নিজস্ব জগৎ তৈরি করতে চন্দ্রপুরের মানুষের সাহায্য দরকার। তার সৌভাগ্য, ইতিমধ্যেই ফীলডিংএর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, আর একজন ভারতীয় বান্ধবীর সাহায্যও সে পেতে চলেছে। কী যেন নাম মেয়েটির? মনে মনে অনেক চেষ্টা করেও য়্যাডেলা তার নামটা ঠিকমতন উচ্চারণ করতে পারলো

না। এখানে সব ঘটনারই একটা কেন্দ্রভূমি আছে। য়্যাডেলা ভাবলো যে, আগামী দু চারদিনের মধ্যেই তাকে জানতে হবে কোথায় সঠিক অবস্থান।
ডেরেক মেয়েটা ভীষণ স্ফূর্তিবাজ আর প্রগল্‌ভা। এক প্রত্যন্ত সামন্ত বাসর মহারাণীর সহচরী সে মহারাণীকে নিয়ে নানারকম মজার মজার কথা বলে সবাইকে হাসাচ্ছিল ডেরেক। মহারাণী মঞ্জুরা করেছেন বলেই যে সে ছুটি পেল, তা নয়। আসলে ছুটি পাওয়ার যোগ্যতা সে অর্জন করেছে এবং ছুটি নিয়েছে। সবাই হো হো করে হেসে উঠলো তার কথা শুনে। ডেরেক বললো, এবার তার নজর মহারাজার মোটর গাড়িখানার ওপর। সেটা এখন দিল্লী গেছে রাজপ্রধানদের একটা কনফারেন্সে খাটতে। গাড়িটা যখন ফিরবে, তখন কি ভাবে একটা জংশন স্টেশনে সেটাকে ভোগা দেবে সেই প্ল্যানের কথা বলছিল ডেরেক। ব্রিজ পার্টিতে এদেশের মানুষগুলোর আচার আচরণ নিয়েও বিদ্রূপ করছিল ডেরেক। হাসি হাসি মুখে সবাই তা শুনছিল। ডেরেকের ধারণা, এই উপমহাদেশের মানুষগুলো এক একটি ভাঁড়। যেন হাসির পালায় ভাঁড়ের চরিত্র অভিনয় করছে তারা। সুতরাং এদের এই হাস্যকর দিকটা না জানলে কিছুই জানা হলো না। ম্যাকব্রাইডের গিন্নী একসময় নার্সের কাজ করতো। ডেরেকের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে সেও মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল। বাস্তবিক, এদিকটা নিয়ে এমন করে কেউ ভাবে নি! শুধু আশ্চর্য রকমের শান্ত আর ভদ্র লাগলো ম্যাকব্রাইডকে। ভোজনোৎসবের এই কোলাহলে ভীষণ ব্যতিক্রম মানুষটি। কথাও খুব কম বললেন।

অতিথিরা চলে যাবার পর য়্যাডেলা শুতে গেল। কিন্তু মায়ে পোয়ে কেউ শুতে গেল না। য়্যাডেলাকে নিয়েই তারা কথা বলছিল তখন। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ পছন্দ না করলেও, রনীর ধারণা যে য়্যাডেলা সম্বন্ধে সে কিছু অধিকার অর্জন করেছে। আর সেই কারণেই এখন সে মাকে আটকেছে। মিসেস মুরের দিকে চেয়ে রনী বললো, 'আচ্ছা মা! য়্যাডেলার সঙ্গে তোমার কথাটথা হয় তো? এত কাজের মধ্যে ডুবে থাকি যে ওর দিকে ঠিকমতন নজর দিতে পারি না। অবশ্য আমার ধারণা, তার কোন অসুবিধে হচ্ছে না।'

বৃদ্ধা মন দিয়েই ছেলের কথাটা শুনলেন। তারপর বললেন, 'ভারতবর্ষ নিয়েই আমরা বেশিরভাগ আলোচনা করি। সুবিধে অসুবিধের কথাও হয়। তবে বাবা, যখন কথাটা তুললে বলি, ওকে ঠিকমতন বোঝার জন্যে আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে মেলামেশা দরকার।'

'তা ঠিক। তবে মুশকিল হলো এখানকার লোকদের নিয়ে। এই নিয়ে কানাকানি শুরু করে দেবে।'

'করুক না।'

রনীর তখনও সংকোচ। বললো, 'এখানকার লোকদের স্বভাব মোটেই হোম-এর মতন নয়। সবাই ছোঁক ছোঁক করছে। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আজ যখন ফীলডিংকে নিয়ে য়্যাডেলা ক্লাবের মাঠে ঘুরছিল, তখন ওদের লক্ষ্য

করাছিল মিসেস ক্যাভেণ্ডার। কিছুই এদের নজর এড়ায় না। এবং যতক্ষণ না সবাইকে ওদের মতন করে নিচ্ছে ততক্ষণ চোখে চোখে রাখে।'

'অসম্ভব!' বৃদ্ধা সজোরে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'য়্যাডেলা একেবারে অন্য ধাতের মেয়ে। কিছুতেই সে ওদের মতন হতে পারবে না। তার একটা নিজস্ব মতামত আছে।'

'আমিও তা জানি মা। আর সেটাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু...

ছেলের দুশ্চিন্তা আর অস্বস্তির ব্যাপারটা মিসেস মুরের কাছে খুব স্পষ্ট হচ্ছিল না। ভারতবর্ষে ব্যক্তি জীবনের গোপনীয়তা নেই? এ আবার কি কথা? তাহলে দেশটা সম্বন্ধে এতকাল যা তিনি শুনেছেন, সে সব ফাঁপা? আলাদা কোন ঐতিহ্য নেই? সেই পুরোনো সংস্কার, অভ্যাস?

রনী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'নিশ্চয়ই সে কিছু মনে করছে না?'

বৃদ্ধা স্থির ভাবে ছেলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, 'শোনো বাবা, এসব কথা তুমিই তাকে জিজ্ঞেস করো। সেটাই ভাল।'

রনী আরও স্পষ্ট হলো এবার। বললো, 'আমি জানি, এখানকার অসহ্য গরমের কথা শুনে সে বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু মা তুমি দেখো এই ঝলসানো গরমে আমি তাকে ভাজা ভাজা হতে দেব না। প্রত্যেক এপ্রিলেই আমি তাকে পাহাড়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।'

বৃদ্ধা অবাক। বললেন, 'এটা কিন্তু ঠাণ্ডা গরমের ব্যাপার নয় রনী!'

'তবে কিসের ব্যাপার? আবহাওয়া ছাড়া এদেশের আছেই বা কী?' বেশ উষ্মার সঙ্গেই জবাব দিল রনী।

বৃদ্ধা শান্ত স্বরে বললেন। 'হ্যাঁ, ম্যাকব্রাইডও তাই বলছিল বটে। কিন্তু আমার মনে হয় আসল কারণ তা নয়। এখানকার য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের ব্যবহারেই তার মনের ভাঙচুর হয়েছে। তোমরাই পারো তার মনের চাপ কমাতে।'

'আমরা? কিভাবে?

'য়্যাডেলার ধারণা ভারতীয়দের সঙ্গে তোমরা অত্যন্ত মন্দ ব্যবহার করো।'

ভদ্রতার মুখোশ খুলে গেল রনীর। ঝাঁঝিয়ে উঠলো সে।

'এটা যে হবে আমি তা জানতাম। গত সপ্তাহেই তোমায় বলেছিলাম। কিন্তু এমন তুচ্ছ একটা ঘটনা, যা মূল বিষয়ই নয়, তা নিয়ে য়্যাডেলা এত উতলা হচ্ছে কেন?'

ছেলের রূঢ় ব্যবহারে চকিত হলেন বৃদ্ধা। য়্যাডেলার উপস্থিতির কথাও ভুলে গেলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ ঘটনাকে তুমি তুচ্ছ বলছো? কোন্‌টা মূল বিষয় নয়?'

'দ্যাখো মা! আমাদের পাঠানো হয়েছে এখানকার লোকদের শাসন করতে। তাদের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে নয়।'

'তুমি কি বলতে চাইছ বাবা?'

'যা বলছি তা খুব সহজ। এখানে আমরা এসেছি ন্যায় বিচার করতে। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। এই ঝোঁক নিয়েই আমরা কাজ করি। ভারতবর্ষটা

আমাদের ড্রয়িংরুম নয় যে গালগল্প করে সময় কাটিয়ে দেব।'
'তোমার সেণ্টিমেণ্টগুলো দেখছি ঠিক ভগবানের সেণ্টিমেণ্টের মতন। অভি-ভাবকদের মতন।' অত্যন্ত শান্ত হয়ে জবাব দিলেন বৃদ্ধা। ছেলের উদ্ধত রুক্ষ ব্যবহারটাই তাঁকে আহত করেছে বলে মনে হচ্ছিল।
রনীও বুঝতে পারলো যে সে অকারণ অসহিষ্ণু হয়েছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'ভারতবর্ষ কিন্তু ঠাকুর-দেবতার দেশ, মা। ভগবানের অভিভাবকত্ব এরা খুব মানে।'
বৃদ্ধা আর যেন সংযত থাকতে পারলেন না। ভীষণ ব্যঙ্গ করে বললেন, 'তাই বুঝি ইংরেজরা ঠাকুরদেবতার- আসনে বসিয়েছে নিজেদের!'
'এসব যুক্তিহীন কথা বলে লাভ কি?' বললো রনী। আরও বললো, 'আমরা যা করতে এসেছি তা করবো। যেমন ভাবে ওদের চালাতে চাই তেমনি ভাবেই ওদের চলতে হবে।' রনীর গলার স্বর বেশ করুণ শোনাচ্ছিল। হঠাৎ সে যেন কেমন ভেঙে পড়লো। আকুল হয়ে বলে উঠলো, 'মা! তোমরা দুজনে আমার কাছ থেকে ঠিক কি চাও?' তোমরা কি চাও ওপরওলাদের মতের বিরুদ্ধে চলি? আমার ক্ষমতার অপব্যবহার করি? কাকে কর্তব্য বলে তা তোমরা কেউ জান না। আর জানো না বলেই লোক দেখানো কথা বলো। এসব কথা বলতে আমার ইচ্ছে হয় না। তবুও বলছি কারণ তোমরা দুজনেই মনের বিকারে ভুগছো। কিন্তু মনে রেখ, আমি এখানে এসেছি কাজ করতে এবং চাপ দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে। আমি সরকারী চাকর। কোন খ্রীশ্চান মিশনারী নই যে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে লোকের সঙ্গে মিশবো। আবেগপ্রবণ সাহিত্যিকও নই যে, এই নিয়ে গল্প ফাঁদবো। পার্লামেণ্টের বিরোধী দলের সভ্যও নই যে সংসদ ভবন তুলকালাম করবো। এই-ই আমার জীবিকা, আর এই জীবিকাই তুমি আমায় বাছতে বলেছিলে। ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক হলো কি না সেটা বড় কথা নয়। আমরা তা চাইও না। কারণ এখানে আমাদের কাজ করতে হবে। অনেক জরুরি কাজ।' ,
রনী অবশ্য ডাহা মিথ্যে বলে নি। একথা ঠিক যে নির্ভর নিঃশঙ্ক মনে তাকে বিচারকের কাজ করতে হয়। সে কাজ শক্ত এবং দায়িত্বপূর্ণ। মিথ্যের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম মিথ্যে সেটি বাছাই করতে হয়। অসহায় দুর্বল দের মধ্যে যে বেশি অসহায় তাকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হয় এবং যেটি একেবারে যুক্তিহীন তার বদলে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মতটাই মেনে নিতে হয়। এইসব মহৎ কর্ম সে পালন করে মিথ্যে আর চাটুবাদের জগতের মধ্যে বসে। সেদিন সকালেই আইনের সূক্ষ্ম বিচারে সে দুজনকে শাস্তি দিয়েছে। একজন রেলের ক্লার্ক। লোকটা নাকি তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে চাপ দিয়ে বেশি ভাড়া আদায় করেছিল। অন্যজন একজন পাঠান। তার অপরাধ আরও জঘন্য। একটি অসহায় মেয়েকে সে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল। এর জন্যে সে কোনরকম কৃতজ্ঞতা বা স্বীকৃতি আশা করে না। কারণ, এটা তার কাজ। কর্তব্য। কিন্তু নিজের সমাজের লোকদের কাছ থেকে বিশেষ নবাগত যারা, তাদের সহানুভূতি সে পেতে চায় এবং তা আশাও করে। ব্রিজ পার্টি সফল

হলো কিনা তা নিয়ে তার কোন দুশ্চিন্তাই নেই। সাধারণ মানুষ সে। কাজের শেষে একটু রিক্রিয়েশন চায় সে। সমমর্যাদার মানুষের সঙ্গে হয় একটু টেনিস খেলা নয়ত ইজিচেয়ারের লম্বা হাতলে পা তুলে চোখ বুজে বিশ্রাম করা।

রনী মিথ্যে বলে নি। কিন্তু বৃদ্ধার পক্ষে তাকে পরিপাক করা সহজ হচ্ছিল না। তিনি যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না তার সব কথাগুলো। তাঁর মনে হলো রনী শুধু অসুবিধের কথাগুলো উত্তেজিত হয়ে বলে গেল। নইলে কেমন করে সে বলতে পারলো যে ভদ্রতা শিখতে সে ভারতবর্ষে আসে নি? এবং শুধু বলা নয়, বলে তৃপ্তি পাওয়া। ছেলের ইস্কুলে পড়ার দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল তাঁর। ছেলেটা এখন কথায় খুব দড় হয়েছে। সেই যুবককালের মানবতাবোধ এখন পাঁকের গর্তে ঢুকে গেছে। কথা যা বলে তা বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। কিন্তু এই ছেলের গলায় মানায় না। এ একজন আত্মম্ভরি মানুষের কথা। কথা বলার সময় যার আত্মাদরস্ফীত মুখখানা ছোট্ট লাল গোঁফের তলায় বেশ তৃপ্তির সঙ্গে নড়াচড়া করে। সে বুঝতেও পারে না যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শেষ কথা বলার অধিকার সে অর্জন করে নি। দেশটা সম্বন্ধে একটা বেদনাবোধ, যা যথার্থ হৃদয়ের কথা, যদি সে বলতো তবে সে অন্য মানুষ হয়ে উঠতো এতদিনে। শুধু সে নয় এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা শুকনো শাসক শক্তির বদলে হয়ে উঠতো মঙ্গলশক্তি।

মিসেস মুর মাথা নেড়ে অস্বীকার করলেন। তাঁর কানের দুল দুলে উঠলো। বললেন, 'আমি যুক্তি দিয়ে জোর করে বলতে পারি যে ইংরেজরা এদেশে এসে প্রীতির প্রসার করলে ভাল হতো।'

'কেন তা বলছো তুমি, মা?'

'কেন বলছি? ভারতবর্ষ তো এই পৃথিবীরই একটা অংশ! এবং এই পৃথিবী যখন ঈশ্বরেরই সৃষ্টি এবং আমরা সবাই ঈশ্বরেরই সন্তান, তখন কেন আমরা নিজেদের মধ্যে অশোভন ব্যবহার করবো?' এই অব্দি বলে বৃদ্ধা চুপ করলেন। তাঁর মনে হলো কথাগুলো হয়ত রনীর ভাল লাগছে না। তবুও থেমে থাকতে পারলেন না। কিসের এক প্রেরণায় গড়গড় করে বলে গেলেন। 'ঈশ্বর আমাদের এই জগতে এনেছেন সবাইকে ভালবাসার জন্যে। ভালবাসার পথ দেখাবার জন্যে। এই-ই আমাদের কর্তব্য। ঈশ্বর সর্বত্রব্যাপী। এখানেও তিনি আছেন। আমাদের লক্ষ্য করছেন, দেখছেন আমরা কতটুকু সফল হয়েছি।'

মিসেস মুরের কথা শুনে রনীর দুর্ভাবনা বেড়ে গেল। এটা এক ধরনের মনোবিকার তা সে জানে। এই ধর্মাধর্ম তাই স্রেফ অপটু শরীরের লক্ষণ। দেহ বিকল হলেই মনে এইসব বিকার দেখা দেয়। তার বিপিতা যখন মারা যায়, তখনও মায়ের মধ্যে এইরকম একটা বিকার সে দেখেছিল। মিসেস মুর সত্যিই বুড়ো হচ্ছেন, সে ভাবলো। সুতরাং এই বয়সে তিনি কি বললেন না বললেন, তা নিয়ে মন খারাপ করার কোন কারণ নেই।

বৃদ্ধা তখনও আপন মনেই বলে চলেছেন, 'শোন বাবা! ঈশ্বর চান আমরা

'সবার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখি। তাতে তিনি খুশি হন। হয়ত সমান ভাবে সবাই সফল হতে না পারি, কিন্তু আগ্রহ থাকবে বৈকি! তাহলেই তিনি আশীর্বাদ করবেন। ইচ্ছেটাই সব। হয়ত আমার কথাগুলো খুব...'

রনী চুপ করে শুনছিল। বৃদ্ধা একটু থামতেই সে এগিয়ে এসে মিষ্টি করে বললো, 'মা! তুমি ঠিকই বলেছ। তবে অনেক রাত হলো মা। এবার শুতে যাও। আমারও কিছু অফিসের কাজ আছে। সেগুলো সেরে নি।'

'হ্যাঁ বাবা, রাত হলো।

তবুও কথা শেষ হলো না তখনই। তবে আলোচনায় ধর্ম প্রসঙ্গ ঢুকে পড়ায় তার চেহারাটা একটু অবাস্তব হয়ে উঠলো। ধর্মাধর্ম নিয়ে রনীর বেশ বাদবিচার আছে। স্বদেশপ্রীতি আর ধর্ম তার কাছে এক নয়। যতক্ষণ ধর্ম জাতীয় সঙ্গীতকে স্বীকার না করছে, ততক্ষণ তার কাছে ধর্মের কোন অস্তিত্বই নেই। ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্মকে সে পাত্তা দিতে প্রস্তুত নয়। তার ধারণা, প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব ধর্ম আছে এবং নিজের প্রয়োজনেই এটা সে গড়ে নিয়েছে।

বৃদ্ধার হঠাৎ মনে হলো আলোচনার মধ্যে ঈশ্বরের কথা এনে ভুল করেছেন। কিন্তু ইদানিং কোন কিছুই ঈশ্বর-বহির্ভূত মনে হয় না তাঁর। হয়ত বয়স হচ্ছে বলেই অনিবার্যভাবে তিনি ঈশ্বরমুখী হয়ে উঠেছেন। ব্যাপারটা আরও হয়েছে ভারতবর্ষে ঢোকার পর থেকে। অবশ্য তেমন আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্বাদ এখনও তিনি পান নি। তাহলেও সব কাজ সব চিন্তার মধ্যে ঈশ্বরই যে মহত্তম ইদানিং এই বোধ তাঁর হয়েছে। স্মরণ মননেও একই অনুভূতি তাঁর। এই পৃথিবীর ঊর্ধ্বে আর এক মহাব্যোম আছে। সেখানেও ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আছে। কিন্তু তারও পারে? মহাশূন্যের সীমাহীন নৈঃশব্দ্য। হঠাৎ যেন সংসারের বাস্তব পরিবেশে নেবে এলেন বৃদ্ধা। তীব্র অনুশোচনায় ভরে গেল মন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভারতবর্ষে এলেন তা তো পালন করছেন না? রনী এবং গ্ল্যাডেলার মধ্যে দূতির দায়িত্ব পালনে তিনি সফল হবেন তো? বিয়ের আগে ওরা নিজেদের ঠিকমতন বুঝে নিতে পারবে তো? কে জানে?



ব্রিজ পার্টিতে আজিজ যায় নি। অর্থাৎ যেতে পারে নি। মিসেস মুরের সঙ্গে আলাপের পর থেকেই চাকরি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হাতে অনেক-গুলো অপারেশনের কেস্। সেগুলো নিয়েই বেজায় ব্যস্ত সে। অলীক কাব্য-চর্চায় বা বেড়িয়ে বেড়ানোর সময় তার নেই। আধুনিক শল্যচিকিৎসার খুঁটিনাটি নিয়ে মজে আছে সে। বন্ধুদের কাছেও বিদ্যের বহর প্রচার করে

বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ডাক্তারি করতে বেশ লাগে তার। হাতে ছুরি কাঁচি নিলেই নিজেকে আধুনিক ডাক্তার বলে ভাবতে ভাল লাগে। কিন্তু মনটা সেই অনুপাতে এগিয়ে যায় নি। সেখানে এখনো সংস্কার আর অভ্যাসের বেড়া। যে হাতে রুগীকে ইঞ্জেকশন দিচ্ছে হয়ত সেই হাতেই খানিকটা জল খেয়ে নিল। এগুলো সবই অভ্যাসের দাসত্ব। আধুনিক এবং সংস্কারমুক্ত মন সে তখনও গড়ে তুলতে পারে নি। এসব দেখে শুনে মেজর ক্যালেণ্ডার আঁতকে উঠতো। লোককে ডেকে ডেকে বলে বেড়াত কেমন বেখেয়ালী মানুষ আজিজ। এমন মানুষের ওপর সে কেমন করে আস্থা রাখবে ? কিন্তু আস্থা সে রাখতো। মেজর ক্যালেণ্ডার জানতো যে ছুরি কাঁচি হাতে নিলে আজিজ ডাক্তার অন্য মানুষ। গেল বার মিসেস গ্রেস্ফোর্ডের অপারেশনটা আজিজের হাতে হলে মহিলা হয়ত বেঁচে যেত। কিন্তু এসব কথা তো সবাইকে বলে বেড়ানো যায় না! সুতরাং আজিজের সঙ্গে ব্যবহারটা শক্তই রেখেছিল ক্যালেণ্ডার।

সকালের দিকে মসজিদের সামনে বেশ ভিড় হয়। আজও হয়েছে। গতকাল রাতে অনেকক্ষণ জেগে ছিল ক্যালেণ্ডার। তাই সকাল থেকেই মেজাজটা চড়া। কাল রাত্তিরে আজিজকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিল ক্যালেণ্ডার। লোকটা কল্ পেয়েও আসে নি। কত বড় ধৃষ্টতা! সকালেই কৈফিয়ৎ চাইলো ক্যালেণ্ডার।

'আস নি কেন ?'

'আজ্ঞে, আপনার কল্ পেয়েই সাইকেল চেপে রওনা হই। কিন্তু পশু হাসপাতালের সামনে আসতেই টায়ার ফুটো হয়ে গেল। তখুনি একটা টাঙ্গা নিয়ে রওনা হলুম। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল আসতে।'

'পশু হাসপাতাল ? ওখানে কি জন্যে গিয়েছিলে ?' হুঙ্কার দিয়ে বললো ক্যালেণ্ডার।

'আজ্ঞে ?'

মেজর সাহেব তখন রীতিমত খাপ্পা। ধমক দিয়ে বললো,

'তুমি যেখানে থাক সেখান থেকে এখানে আসতে সময় লাগে দশ মিনিট। পশু হাসপাতালটা অন্য দিকে। তা হলে এখানে আসতে অতটা ঘুরে এলে কেন ? কি ? আর একটা মিথ্যে কৈফিয়ৎ সাজাবে তো ?'

কথাটা বলে হন্হন্ করে আজিজের সামনে দিয়ে চলে গেল মেজর। আজিজের কৈফিয়ৎ শোনার ধৈর্য তার নেই। সে ধরেই নিয়েছে যে আজিজ মিথ্যে বলছে। কিন্তু আজিজের কৈফিয়ৎটা মিথ্যে নয়। হামিদ্উল্লার বাড়ি থেকে এখানে আসতে ওই হাসপাতালটা পড়ে। মেজর সাহেব জানতো না যে আজিজ ওখানেই ছিল। বস্তুত, ভারতীয়দের সামাজিকতা সম্বন্ধে সাহেব-মেমদের কোন ধারণাই নেই। শিক্ষিত ভারতীয়রা যে পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখতে নিজেদের মধ্যে আনাগোনা করে, ক্যালেণ্ডার তা জানতো না। কোন ইংরেজই তা জানে না। ক্যালেণ্ডার শুধু জানে যে ভারতীয় মাত্রেই মিথ্যেবাদী। ভদ্রলোকের আক্ষেপ যে বিশবছর এদেশে বাস করলেও

আজ অব্দি কোন ভারতীয়র মুখ থেকে সে সত্যি কথা শুনলো না।
মেজর সাহেবের প্রস্থানটি বেশ উপভোগ্য লাগলো আজিজের কাছে। মেজাজ ভাল থাকলে ইংরেজদের বেশ মজাদার জাত মনে হয় তার। তখন সে চায় যে ওরা তাকে ভুল বুঝুক। কারণ, তাতেই মজাটা বেশি। এ সব হলো সাময়িক আনন্দ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব ক্ষীণ হতে থাকে। যা হোক, এটা তার উপরি পাওনা। মনে পড়ে গেল মিসেস ক্যালেণ্ডারের বিরক্ত মুখখানা। পেটের মধ্যে হাসি গুড়গুড়িয়ে উঠলো। ভাবলো, হামিদ্উল্লাকে বলতেই হবে ব্যাপারটা এবং বেশ রসিয়ে বলতে হবে। খুব মজা পাবে সে। কিছুক্ষণ পরেই কাজে ডুবে গেল আজিজ এবং ব্যাপারটা ভুলেও গেল।
ব্রিজ পার্টির ব্যাপারটা আজিজও শুনেছিল। তবে অস্পষ্ট এবং আবছা ভাবে। কালেক্টর সাহেব নাকি ভারতীয়দের সৌজন্যে একটা পার্টি দিচ্ছেন এবং নবাব বাহাদুর খুব উৎসাহ নিয়ে জনে জনে বলে বেড়াচ্ছেন, যাতে তারা উপস্থিত হয়। আজিজের সহকারী ডাক্তার পান্নালালের তো উৎসাহের শেষ নেই। তার খুব ইচ্ছে যে, নতুন কেনা টমটমে চড়ে সে আর আজিজ পার্টিতে যায়। ব্যবস্থাটা আজিজেরও মনঃপুত হলো। অন্তত সাইকেলে সওয়ার হবার লজ্জা থেকে সে রেহাই পাবে। টাঙ্গা ভাড়াও দিতে হবে না। ডাক্তার পান্নালাল একজন কোচম্যানের ব্যবস্থাও করেছে। গাড়ি চালানোর কাজটা পান্না ডাক্তার নিজেও করতে পারতো। কিন্তু তার বয়স হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে মোটর গাড়ির আওয়াজ শুনে চমকে ওঠা ঘোড়াকে সামলানোর ক্ষমতা তার নেই। সব বন্দোবস্ত পাকা করে খানিকটা কুণ্ঠার সঙ্গে পান্নালাল বললো, 'দেখুন স্যার, দুর্ঘটনা কেউ এড়াতে পারে না। তবে আমাদের দেখা উচিত, যাতে ঠিক সময়ে আমরা পৌঁছুতে পারি। তাছাড়া, যদি একই সময়ে আমরা দুজন ডাক্তারই ওখানে যাই, তাহলে ওদের মনে আমাদের সম্বন্ধে একটা ভাল ধারণা হবে।'
কিন্তু যাত্রালগ্ন যখন এল তখন বেঁকে বসলো আজিজ। সে ততক্ষণ স্থির করে ফেলেছে যে কিছুতেই পার্টিতে যাবে না। প্রথমত কাজের দায়িত্ব। সব কাজ শেষ করে যখন সে দায়িত্বমুক্ত হলো, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে এবং যাত্রালগ্নটি অতিক্রান্ত। সুতরাং স্বাধীনভাবেই না যাওয়ার পক্ষে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারলো। দ্বিতীয় কারণটি খুবই গোপন অথচ গভীর ও অন্তরঙ্গ। তার স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকী সেদিনটি। যোগাযোগটা নিতান্তই আকস্মিক, কিন্তু বাস্তব সত্য। বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গেই আজিজ তার বউকে ভালবাসতে পারে নি। এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন। অপরিচিতা কোন মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার আগেই পুরুষ ব্যবহার করার ঘোর বিরোধী সে। কিন্তু তবুও ভাল করে মেলামেশা, মন জানাজানি হবার আগেই তাদের প্রথম সন্তানের জন্ম হলো। আজিজ খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল তার এই পাশব প্রবৃত্তির জন্যে। তাই ভালবাসার পালা শুরু হয় প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর। বন্যার মতন প্রেম এল তাদের দুজনের মনে। তখন আজিজের মন জুড়ে আছেন তার হৃদয়েশ্বরী। নারীর পরিপূর্ণ ভালবাসার স্রোতোবেগ

আছড়ে পড়লো আজিজের শুকনো হৃদয়ের ঘাটে ঘাটে। বিহ্বল আজিজ বুঝতে পারলো তার বিবির এই প্রেম শুধু স্বামীর মন যোগানো নয়। এ আরও কিছু। স্বামীর মানসিকতার সঙ্গে সহমর্মিতা করার একটা প্রয়াস ছিল বুদ্ধিমতী নারীর। গৃহস্থ নারীর পর্দানশীন থাকার কুফল সম্বন্ধে স্বামীর আধুনিক মনের ছোঁয়া সে পেয়েছিল। সে জানতো এমন দিন আসছে যখন তাদের রক্ষণশীল সমাজেও গৃহস্থ নারী স্রেফ অবরোধবাসিনী হয়ে পুরুষশাসিত জীবন কাটাবে না। নিজেকে উপযুক্ত করে তোলার এই নিঃস্বার্থ চেষ্টা প্রেম ছাড়া আর কি? নারীর দেহভোগের বাসনা যে আজিজের ছিল না, তা নয়। কিন্তু এই একবছরে তার ধার অনেক কমে গিয়েছিল। আজিজ ক্রমেই বুঝতে পারছিল যে বিয়ে করে সে ঠকে নি। এমন কিছু সে পেয়েছে যা শুধু কাম প্রবৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ইতিমধ্যে আর একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে আজিজের বিবি। কিন্তু তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিয়ে সে চিরদিনের মতন হারিয়ে গেল স্বামীর জীবন থেকে। এখন আজিজ বুঝতে পারে কেমন রমনীরত্ন সে হারিয়েছে। একাধারে গৃহিণী সচিব ও সখীর স্থান অন্য কোন রমণী দ্বারা পূরণ হবে না। সে চলে গেছে এবং আজিজের জীবনের সেই শূন্যস্থান অপূর্ণই থেকে গেছে। তার স্মৃতি যেন নিয়ত আজিজকে পীড়ন করে। এই আশ্চর্য অনুভূতি কি প্রেম? এক একসময়ে সে ভাবে কেমন করে সে তার বিবিকে ভুলে আছে? কখনো মনে হয়, সংসারের যা কিছু সুখ, সৌন্দর্য, সবই তো সঙ্গে নিয়ে বেহেস্তে চলে গেছে! তাহলে তার বেঁচে থেকে কি লাভ? তার চেয়ে আত্মঘাতী হই। তখন মৃত্যুর পারে হয়ত তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। জীবনের অস্তিত্বের বাইরে কি তেমন কোনো মিলনস্থল আছে? কে জানে? গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী আজিজও তা জানে না। ঈশ্বর এক এবং তিনি আছেন এ নিয়ে তার কোন সংশয় নেই। কিন্তু অনেক ব্যাপারেই তার মন একজন সাধারণ খ্রীশ্চানের মতন সংশয়াচ্ছন্ন হয়। পুনর্জন্ম নিয়ে তার ধারণা খুব ক্ষীণ। বিবর্ণপ্রায় আশার মতন এখনো তার উদয় হয় আবার কখনো তা মিলিয়েও যায়। সে জানে না কোন্‌টি ধ্রুব। সে শুধু জানে যা নিত্য তা হারায় না এবং ফিরে ফিরে আসে। জন্ম-মৃত্যুর এই চক্রাকার গতি অবিচ্ছিন্ন। মৃতা স্ত্রীর জন্যে তার শোক অকৃত্রিম, কারণ তাকে সে ভোলে নি।

পান্নালালকে যদি পূর্বাহ্নেই তার মতামত জানাতো তাহলে অবস্থাটা এমন জটিল হতো না। কিন্তু যাওয়া বা না যাওয়া নিয়ে সে নিজেই নিশ্চিত ছিল না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে জানতো না যে সে মত বদলেছে। আসলে, ইচ্ছে করে সে মত বদলায় নি আপনা আপনি তা বদলে গেছে। এক গভীর বিতৃষ্ণায় ভরে গিয়েছিল তার মন। মিসেস লেস্‌লী, মিসেস ক্যালেণ্ডারদের মতন মহিলাদের সম্পর্কে এই বিতৃষ্ণার পাহাড় জয় করার সাধ্য তার নেই। ওখানে গেলে ওর এই মর্মপীড়া ওরা ঠিক বুঝতে পারবে। তারপর তা নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করবে। সুতরাং তৈরি হয়ে পার্টিতে যাবার সময়টাতেই আজিজকে তার ঘরে দেখা গেল না। সে তখন পোস্ট আপিসে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের

কাছে তার পাঠাচ্ছিল। ইতিমধ্যে পান্নালাল এসে তার খোঁজ করেছে এবং চলেও গেছে শেষমেষ। পান্নালাল চলে গেছে শুনে সে গভীর স্বস্তি বোধ করলো। ভালই হয়েছে ; এই মোটাবুদ্ধির মানুষটার হাত থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে সে তার স্বর্গতা বিবির কথা ভাবতে পারবে।

বাড়ি ফিরে ড্রয়ার খুলে তার বিবির একখানা ছবি বার করলো আজিজ। তারপর ছবিখানার দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইলো। চোখ দিয়ে দরদর করে জল ঝরছে। ছবিটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে ভাবলো কত অসুখী সে! নিজেকে করুণা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। তার স্ত্রীকে সে কত ভালবাসতো। এখনও বাসে। কিন্তু কই, তেমন ভাবে তাকে তো মনে পড়ছে না? অথচ যাদের ভাল লাগে না, তারা তার স্মৃতিতে এমন ভাস্বর হয়ে আছে কি করে? এইসব মানুষগুলো তার মনের দর্পণে কত উজ্জ্বল। অথচ ছবিখানার দিকে যতই সে চেয়ে থাকলো, ততই ছবির মানুষটা যেন অস্পষ্ট হয়ে যেতে থাকলো। তবে কি ছবির মানুষটা তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে? ঠিক তাই। যখন তারা শবাধারটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন থেকেই ছবির মানুষটা আড়াল হয়ে গেছে। একথা ঠিক যে, মরে গিয়ে তার বিবি হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। তবে ভেবেছিল যে হয়ত মনের মধ্যে তার বিবির আসন পাকা হয়ে গেছে। আজিজ অবশ্য জানে না যে মৃত্যুর পর কিছু থাকে কিনা। তখন সবটাই অপার্থিব। তাই যত তীব্রভাবে মৃত মানুষকে মনে করার কামনা হয়, ততই সে দূরে সরে যায়। স্মৃতির শেষ নিদর্শন স্বরূপ তার হাতের নাগালের মধ্যে এখন যেটুকু রয়েছে, তা একখানা ছবি। ছবিখানার দিকে চেয়েছিল আজিজ। তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে তার বিবি ওখানে লুকিয়ে আছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তীব্র শোকাহত হয়ে উঠলো সে। সত্যিই সে কত অসুখী! ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রাচ্যসংস্কৃতির জীবনদর্শনের মধ্যে সে যেন ক্রমেই নিমজ্জিত হতে লাগলো। অনেক কষ্টে এই প্রপঞ্চময় জীবনদর্শনের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে জীবনের মধ্যে ফিরে এল আজিজ। মৃতার চিন্তা তখনকার মতন মন থেকে দূর করে দিয়েছে সে। সে ভাবলো. সারা জীবনটাই তার বরবাদ হয়ে যাবে, যদি মৃতার চিন্তা থেকে সে মুক্তি না পায়। ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে পারবে না। আত্মবঞ্চনা করে নিজেকেও অসুখী করে তুলবে। জোর করে মনটাকে অন্য চিন্তায় ফিরিয়ে আনতে সে তাড়াতাড়ি ডায়েরী খুললো। হাসপাতালে আজই যে শক্ত অপারেশনটা করেছে তার নোট্স্ টুকে এনেছে সে। মন দিয়ে কেস্টা পড়তে লাগলো আজিজ। হয়ত একদিন কোন বড়লোকের এটা দরকার হতে পারে। তখন তার চিকিৎসা করে সে কিছু অর্থলাভ করতে পারবে। ছবিটা ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল আজিজ। এর প্রয়োজন এখন আর নেই। মৃতার চিন্তাও মন থেকে চিরদিনের মতন সরিয়ে দিল সে।

এক কাপ চা খেয়ে মনের চনমনে ভাবটা আবার ফিরে পেল আজিজ। হামিদ্উল্লার বাড়ি থেকে ঘুরে এলে মন্দ হয় না। হামিদ্ নেই। ব্রিজ

পার্টিতে গেছে। কিন্তু তার টাট্টুটা পার্টিতে যায় নি বলে তাকে পেল সে। বন্ধুর ব্রীচেস পরে ঘোড়ায় চেপে পোলো ম্যালেট নিয়ে সে ময়দানে গেল। পোলো মাঠ জনমানবশূন্য। একজনও খেলছে না। তবে মাঠের ধারে কয়েকটা ছেলে দৌড়োদৌড়ি করছে। আজিজ ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিছু একটা অনুশীলন করছে ওরা। কিসের অনুশীলন বলতে পারলো না। কি করুণ হাড্ডিসার চেহারা ছেলেগুলোর! গোল হয়ে দৌড়চ্ছে। হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকা-ঠুকি লাগার অবস্থা। কেন দৌড়োদৌড়ি করছে তাও জানে না। যেন করতে হবে বলেই করছে। আজিজ সবাইকে সেলাম জানালো। তারাও হেসে আলেকম্ সেলাম বললো। ওদের দেখে খুব খারাপ লাগছিল আজিজের। বারণ করলো যেন এত পরিশ্রম না করে। ওরা শুনলো, আবার তখনই দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিল।

ওখান থেকে ফিরে মাঠের মধ্যিখানে এল সে। নিজে সে মোটেই খেলতে পারে না। কিন্তু ঘোড়াটা রীতিমত ট্রেন্‌ড্। সুতরাং নিশ্চিন্ত হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে ম্যালেট দিয়ে বলটা মারবার চেষ্টা করছিল আজিজ। এই মুহূর্তে সংসারের যাবতীয় দুশ্চিন্তা থেকে ভারমুক্ত সে। অন্তত খানিকক্ষণের মতন জীবনধারণের বিরক্তিকর একঘেয়েমি থেকে রেহাই পেয়ে সারা মাঠময় ছুটো-ছুটি করতে লাগল আজিজ। বিকেলের শান্ত ঝিরঝিরে বাতাস তার কপাল ছুঁয়ে যাচ্ছে। মাঠটাকে ঘিরে থাকা গাছের সারির দিকে তাকালে তার আহত দৃষ্টিটা আশ্চর্য আরাম পাচ্ছিল যেন। একটু অন্যমনস্ক ছিল আজিজ। বলটা গড়িয়ে গেছে আর একজনের দিকে। একজন ইংরেজ সৈনিকও অনু-শীলন করছিল, আজিজ তা দেখে নি। লোকটা আজিজের দিকে বলটা মেরে বললো, 'আবার এদিকে মারুন তো?'

আজিজ তাই করলো। দেখে মনে হয় সৈনিকটা তার মতন আনাড়ি খেলোয়াড় নয়। কিন্তু ওর ঘোড়াটা রীতিমত অবাধ্য। সুতরাং হিসেবের খাতায় দুজনেরই যোগফল শূন্য। আজিজ তাকালে সৈনিকটা হাসলো। আজিজও হাসলো। সামরিকবাহিনীর লোকদের পছন্দ করে আজিজ। ওদের মনমুখ এক। যদি ভাল লাগলো তো কাছে টেনে নিল, নয়ত নয়। ঘোড়ায় চেপে দুজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। লোকটা বললো, 'প্রায়ই খেলেন নাকি?'

'মোটেই না।'

'আর একবার চেষ্টা করা যাক না?'

'মন্দ কি!'

সৈনিকটা যেমনি বলটাকে মারলো ওমনি ক্ষিপ্রভাবে ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠলো। কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিল সৈনিক।

খেলা তেমন জমলো না। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুজনেই বিশ্রাম নিচ্ছে। চোখে চোখে তাকাল দুজনে। চোখের দৃষ্টিতে বন্ধুতার আঁচ। কিন্তু খেলার বন্ধুত্ব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। শরীর জুড়োবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুত্বের আঁচও নিভে যায়। তাই আপন আপন জাতিপ্রীতি উগ্র হয়ে ওঠার আগেই ওরা পরস্পরকে সেলাম করে বিদায় নিল। হয়ত বিদায়ের মুহূর্তে ওরা ভেবে থাকতে পারে,

যদি সবাই বন্ধু হতো, কি ভাল হতো। কিন্তু ব্যাপারটা অনুমানের। তখন সবে সন্ধ্যে হয়েছে। মুসলমানরা দলে দলে আসছে নমাজ পড়তে। মক্কার দিকে মুখ করে ওরা প্রার্থনা করছে। একটা মোটাসোটা ধর্মের ষাঁড় গজেন্দ্রগমনে ওদের দিকে হাঁটছিল। ষাঁড়টা দেখেই মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো আজিজ। তার মনে হলো পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মের প্রতীক এই ষাঁড়টাকে এখনই তাড়ানো দরকার। পোলো খেলার ডাণ্ডা দিয়ে ষাঁড়ের গায়ে ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দিতে গেল আজিজ। রাস্তা থেকে তখনই কে যেন তাকে ডাকলো। আজিজ তাকালো। পার্টি থেকে ফিরছে তার সহকারী ডাক্তার পান্নালাল।

'কি ব্যাপার, ছিলেন কোথায়?' পাক্কা দশ মিনিট দাঁড়িয়ে তবে গেলুম।'

মুখখানা যথাসম্ভব করুণ করে আজিজ বললো, 'খুব দুঃখিত। এমন অবস্থা হলো তখন যে পোস্টঅাপিসে একবার না গেলেই নয়।'

আজিজের ঘনিষ্ঠ মহলের কাছে এমন কৈফিয়ৎ দিলে তারা বুঝতো এটা স্রেফ বাহানা এবং এ নিয়ে পীড়াপীড়িও করতো না। কিন্তু পান্নালালের বুদ্ধি-বৃত্তি এমন সজাগ নয় যে, সব বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝতে পারে। তার মনে হলো আজিজ ডাক্তার তাকে এড়িয়ে যেতেই এই কাণ্ডটি করেছে। ব্যাপারটা তার কাছে রীতিমত অপমানজনক। তাছাড়া ধর্মষাঁড়টাকে বিধর্মী আজিজ যে ভাবে তাড়া করছিল, সেটাও তার মনঃপুত নয়। অবাক হয়ে পান্নালাল বললো, 'পোস্টাপিসে চাকর যায় না?'

'অত চাকর কোথায় পাব? মাইনে কি পাই জানেন তো?'

'কিন্তু আপনার চাকরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'

'হতে পারে।' সামান্য ভেবে আজিজ বললো, 'কিন্তু তাকে কি করে বাড়ি ছেড়ে পাঠাই। আপনি আসবেন। আমরা বেরিয়ে যাব। তখন তো বাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকবে। আমার যা কিছু সম্বল সব লোপাট হয়ে যাক, এই চান আপনি? আমার রান্নার লোকটা বদ্ধ কালা। তাই আমি বা হাসান কেউ বাড়ি খালি রেখে কোথাও বেরোই না।'

আজিজের কথাগুলো যে খাঁটি সত্য নয় তা বোঝাই যায় এবং এ নিয়ে অন্য কেউ আলোচনাও করতো না। কিন্তু ডাক্তার পান্নালাল অন্য ধাঁচের মানুষ। তার কাছে আজিজের কথাগুলো একেবারেই মিথ্যে মনে হলো না। সে বললো, 'কোথায় যাচ্ছেন একটা চিরকুটে লিখে গেলেই পারতেন!

এ নিয়ে নাড়ানাড়ি করতে চাইছিল না আজিজ। ব্যাপারটা ক্রমেই যেন তিক্ত হয়ে উঠছে। টাট্টুর গায়ে চাপড় মেরে আদর করলো আজিজ। আদর পেয়ে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো ঘোড়াটা। ডাক্তার লালের টমটম গাড়ির ঘোড়াটা তেজী, টগবগে। টাট্টুর লাফিয়ে ওঠা দেখে সেটাও ছটফট করে উঠলো। বিব্রত পান্নালাল বললো, 'ওটাকে সরান স্যার। নয়ত এখুনি এটাও লাফা-লাফি শুরু করবে। সারা দুপুর আর বিকেলটা আজ এমন দাপাদাপি করেছে যে, কি বলবো। ক্লাবের বাগানের সব ফুল নষ্ট করেছে। অমন শখের বাগানের কি হাল হয়েছে গেলেই দেখবেন। শেষ পর্যন্ত চারটে লোক লাগিয়ে

একে টেনে আনি। মেয়েরা দেখেছে. কালেকটর সাহেব নিজে সব লক্ষ্য করেছেন। ডাক্তার পান্নালাল চুপ করলো। আজিজও এতক্ষণে বুঝেছে মানুষটার বিরক্তির আসল কারণ কি। আধবুড়ো মানুষটা সখেদে আবার বললো, 'আজিজ ভাই, আপনার সময়ের অনেক দাম তা জানি। এসব পার্টি-ফার্টি আপনি পছন্দ করেন না, তাও জানি। কিন্তু আমি সামান্য একজন ডাক্তার। ওপরওলাদের নেমন্তন্ন আমার কাছে আদেশের মতন। যেখানে যেতে বলেন সেখানে যেতে আমি বাধ্য। কিন্তু আপনি এলেন না, এটা অনেকে লক্ষ্য করেছে। আলোচনাও হয়েছে তা নিয়ে।'

'ওসব আমি থোড়াই কেয়ার করি।' বললো আজিজ।

'ওটা বয়সের ধর্ম। আপনার বয়স থাকলে আমিও তাই করতাম। কিন্তু যাবেন বলে আমায় আপনি কথা দিয়েছিলেন। পরে টেলিগ্রামের গল্পটা বানিয়েছেন। ঠিক কি না বলুন?'

ডাক্তার পান্নালাল আর দাঁড়ালো না। টমটম হাঁকিয়ে চলে গেল আজিজের সামনে থেকে।

পান্নালাল চলে যাবার পর আজিজের মন কেমন যেন হিংস্র হয়ে উঠলো। ইচ্ছে হচ্ছিল এমন কেউ তার শত্রু হয়ে থাকুক যার সঙ্গে সে জীবনভর লড়াই করতে পারে। ভাবতে ভাবতে তার মনে তীব্র উত্তেজনা হলো। ঘোড়ায় চেপে সে আবার পোলো ময়দানে ফিরে এল। একটু আগেই সৈনিকটার সঙ্গে এখানে সে খেলে গেছে। তার রেশ বজায় ছিল তখনও। ঘোড়ায় চেপে সারা মাঠটা সে ছুটোছুটি করলো খানিকক্ষণ। কিছুতেই যেন মনটা সুস্থির হচ্ছে না। একসময় ক্লান্ত হয়ে সে থামলো। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। সেই-ভাবেই হামিদ্‌উল্লার বাড়িতে ফিরে এল সে। হামিদ্‌ তখনও ফেরে নি। ঘোড়াটা তার আস্তাবলে ঢুকিয়ে দেবার আগে পর্যন্ত তার মনে হচ্ছিল সে যেন প্রবল পরাক্রমশালী কেউ। পৃথিবীর কোন শক্তির কাছে সে মাথা নোয়াবে না। কিন্তু যেমনি সে ঘোড়া থেকে নেবে মাটিতে পা দিল, অমনি ভয়ের একটা শিরশিরে অনুভূতি তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল। তার মনে হলো পার্টিতে না গিয়ে সে কি ওপরওলার বিরাগভাজন হয়েছে? কালেক্‌টর সাহেবকে কি অপমান করেছে সে? ডাক্তার পান্নালাল খুবই তুচ্ছ একজন মানুষ। কিন্তু তার সঙ্গেও কি বিবাদ করা বিবেচনার কাজ হয়েছে? আজিজের মনটা আর তখন মানুষের মন নেই। ধীরে ধীরে রাজ-নৈতিক মনে রূপান্তরিত হয়েছে তা। ভাবনাগুলো উদ্দেশ্যপ্রসূত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে তখন মোটেই মানিয়ে চলবার কথা ভাবছিল না। তার মন অধিকার করে আছে একটাই চিন্তা এবং তা হলো 'সে কি ক্ষমতাবান মানুষ-গুলোর সঙ্গে আড়াআড়ি করে চলতে পারবে?' এই রাজনৈতিক ভাবনাতেই দূষিত হয়ে আছে চন্দ্রপুরের পরিবেশ।

বাড়ি ফিরে আজিজ দেখলো তার নামে একটা চিঠি এসেছে। সরকারী মোহর দেওয়া খামটা নেহাৎ গোবেচারার মতন টেবিলের ওপর পড়ে আছে। কিন্তু যতটা ভাবছে ততটা নিরীহ কি ওটা? বরং আজিজের মনে হলো ওটা দারুণ

বিস্ফোরক একটা কিছু, যা ছোঁয়া মাত্রই তার বাংলোটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। হয়ত পার্টিতে না যাওয়ার দরুণ পদচ্যুতির নোটিশ বয়ে এনেছে খামটা। রীতিমত ভয়ে ভয়ে খামখানা ছিঁড়লো আজিজ। তারপর ভেতরের চিঠিটা বার করে পড়লো। বার দুই পড়লো সেটা। খুবই নিরীহ একটা চিঠি। সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ মিস্টার ফীলডিং তাকে আগামীকাল চায়ের আসরে নেমতন্ন করেছেন। চিঠিটা বার দুই পড়ার পর আজিজের দমে যাওয়া মনটা একটা প্রবল নাড়া খেয়ে আবার যেন জেগে উঠলো। হয়ত এই জাগরণ হতোই। কারণ তার অন্তরাত্মা মার খেলেও মরে যেত না এবং কোনো এক সময়ে সে ঠিকই জ্বলে উঠতো। কিন্তু ফীলডিং-এর এই নেমন্তন্নটা যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি। মাসখানেক আগে ফীলডিং আর একবার তাকে চা খেতে নেমতন্ন করেছিল। তখন সে যায় নি, কোনো জবাবও দেয় নি। ব্যাপারটা স্রেফ ভুলেই গিয়েছিল সে। এটা দ্বিতীয় দফার নেমন্তন্ন। আগের-বারের নেমন্তন্নর উল্লেখটুকুও এই চিঠিতে নেই। সে যে যেতে পারে নি, তার জন্যে কোন অভিযোগও করে নি ফীলডিং। মানুষটার সৌজন্যবোধে আজিজ তাই মুগ্ধ। সে বুঝতে পারলো মনের দিক থেকে মানুষটা মহৎ বলেই সে এত ভদ্র, সজ্জন ব্যক্তি। তাড়াতাড়ি প্যাড থেকে কাগজ ছিঁড়ে একটা ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ উত্তর লিখে ফেললো আজিজ এবং সেটা পাঠিয়ে দিল। এখুনি তার হামিদ্‌উল্লার সঙ্গে দেখা করা দরকার। ফীলডিং সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সে জানে না। মানুষটা কেমন, কিরকম তার পছন্দ অপছন্দ, গম্ভীর না আমুদে, কত বেতন পায়, কেমন তার অতীত, কি করে তাকে খুশি করা যায়, ইত্যাদি। কিন্তু হামিদ্‌ তখনও ফেরে নি। মহম্মদ আলি অবশ্য সবে ফিরেছে। কিন্তু ব্রিজ পার্টি নিয়ে তার স্থূল রসিকতাগুলো সেই মুহূর্তে আজিজের একটুও ভাল লাগছিল না।

৭

ফীলডিং নামের মানুষটিকে ভারতবর্ষ অনেক দেরিতে পেল। বোম্বাই শহরের ভিক্টোরিয়া টারমিনাস নামক সেই বিচিত্র চেহারার স্টেশনে ফীলডিং যেদিন এসে পৌঁছাল, তখন তার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা খুব সুখকর হয় নি। একজন ইংরেজ টিকিট চেকারকে ঘুষ দিয়ে ট্রেনে জায়গা জোটাতে হয়েছিল তাকে। সহযাত্রী ছিল দুজন। একজন সবে এসেছে ইংল্যান্ড থেকে। তারই মতন-আনকোরা। তবে খুবই ছোকরা বয়স তার। অন্যজন তার বয়সী একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এদেশে অনেকদিন আছে এবং রীতিমত পোড় খাওয়া লোক। ফলে সহযাত্রীরূপে যাদের সে পেল, তাদের সঙ্গে ব্যবধান থেকেই গেল। ফীলডিং অনেক দেশ দেখেছে, অনেক মানুষও দেখেছে। তার অভিজ্ঞতার আকাশ বর্ণময়। এদেশে এসেও

নতুন সঞ্চয় বাড়লো। অতীত অভিজ্ঞতায় প্রভাবপুষ্ট হয়েই এই নতুন সঞ্চয় গড়ে উঠেছে এবং ভুলত্রুটি নিয়েই সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে। একজন ভারতীয়কে একজন ইতালীয় মনে করা কিংবা ভারতবর্ষটাকে ভূমধ্যসাগরীয় দেশ ইতালীর মতন ভাবা, হয়ত ভৌগোলিক জ্ঞানের বিচারে ভুল। কিন্তু সেগুলো কোন ভয়াবহ ত্রুটি নয়। তাই ফীলডিং প্রায়ই এইভাবে মিল খোঁজার চেষ্টা করতো।

ফীলডিং পণ্ডিত মানুষ। তবে শুক্‌নো বিদ্যাভিমানী মানুষ নয়। অনেক মানুষ দেখেছে সে। তার মধ্যে খারাপও আছে। হয়ত পরে অনুতাপ হয়েছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণ হয়েছে। এখন ফীলডিং-এর মধ্যবয়স। এখন সে পরিপূর্ণ মানুষ। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন একজন বিচক্ষণ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। প্রাণে প্রাণে আলো জ্বালাবার সংকল্প তার। সেখানে কোন ভেদাভেদ নেই, বাছবিচার নেই। সমাজের সব স্তরের মানুষের জ্ঞান সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা সে পূরণ করে। এদের মধ্যে ইস্কুলের অভারতীয় ছাত্র যেমন আছে, তেমনি আছে ভারতীয় ছাত্র, আছে পুলিশের লোক, আছে জড়বুদ্ধির মানুষ। এদের সবাইকে নিয়েই ফীলডিং-এর এই ইস্কুল। কয়েকজন বন্ধুর প্রত্যক্ষ সহায়তায় সে এই কাজটা পেয়েছে এবং সে মনে করে এর দায়িত্বপালনে সে অসফল হয় নি, কারণ ছাত্ররা তাকে ভালবাসে। ছাত্রদের সঙ্গে মনের মিল হলেও নিজের দেশের মানুষদের সঙ্গে ফীলডিং-এর সম্পর্কের ব্যবধানটা ক্রমেই যেন বেড়ে যাচ্ছিল। এটা শুরু হয়েছে সেই ট্রেন থেকে অর্থাৎ ভারতবর্ষে তার পৌঁছানোর প্রথম দিনটি থেকেই। প্রথম প্রথম সে ধরতে পারে নি যে কোথায় তার দোষ। ইংল্যাণ্ডে থাকতে দেশবাসীদের সঙ্গে তো তার মনের অমিল হয় নি! তাছাড়া দেশের শত্রুও সে নয়। তাহলে এখানকার ইংরেজদের সঙ্গে তার মিলমিশ হচ্ছে না কেন? বাইরে থেকে তার বড়সড় চেহারা, ছড়ানো হাত পা, নীল চোখের গভীর দৃষ্টি মানুষকে কাছে টানলেও, তার বেপরোয়া কথার ধরন শুনে লোকে ফাঁপরে পড়তো। তারা বুঝতে পারতো যে কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণের জন্যে মানুষটা শিক্ষক পদের মর্যাদা রাখতে পারবে না। এর জন্যে অবশ্য এই অসভ্য বর্বর দেশের কুটিল মানুষগুলোকেই দায়ী করতো ইংরেজরা। ক্রমে ক্রমে চন্দ্রপুরের ইংরেজদের বদ্ধমূল ধারণা হলো যে ফীলডিং মানুষটা একটা অশুভ শক্তির কেন্দ্র। সে মানুষে মানুষে ভাব বিনিময় করায়। নতুন নতুন সংস্কারবিরোধী নানা ভাবনা সে ছড়িয়ে দেয় মানুষের মধ্যে। অথচ সে ধর্মপ্রচারক নয়। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার মধ্যেই এই ভাব বিনিময় সীমাবদ্ধ রাখতো সে। ফীলডিং বিশ্বাস করতো, পৃথিবীর সব মানুষই, যেখানেই সে থাকুক, আর একজনের কাছে পৌঁছতে চায়, জীবনে জীবন যোগ করতে চায়, পরস্পরকে বুঝতে চায়। তারাই পারে একাজ যারা হৃদয়বান, যারা মননে সৎ, সংস্কৃতিতে পরিচ্ছন্ন। দুর্ভাগ্য যে, চন্দ্রপুরের মানুষের কাছে এই বিশ্বাসটির কোন দাম নেই। কিন্তু ফীলডিং এই বিশ্বাসটি আঁকড়ে ধরে ছিল। হয়ত, দেরিতে এ দেশে এসেছে বলেই তা সম্ভব হয়েছে। সে জাতিভেদ মানতো না। এর

জন্যে সে কোনরকম শ্লাঘা বোধ করতো না। অন্য ইংরেজদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠও ভাবতো না। কারণ, যে পরিবেশে তার ভাবনাগুলো গড়ে উঠেছে, সেখানে কোন ইতর প্রবৃত্তির উন্মেষ হয় না। তার যে মন্তব্যটি নিয়ে ধিক্কারের ঝড় বয়ে যায়, ফীলডিং তা পরিহাসচ্ছলেই বলেছিল। ক্লাবে রসিকতা করে সে একবার বলেছিল যে, ইংরেজদের গায়ের কটা রঙ পুরোপুরি কটা নয়। তাতে অন্য রঙের মিশেল আছে। কথাটা সে বলেছিল নিছক মজা করার জন্যে। কিন্তু যে সাদা রংটা নিয়ে এত উন্মত্ততা তার তো কোন অস্তিত্বই নেই, যেমন অস্তিত্ব নেই ঈশ্বরের। অথচ প্রচলিত ধারণা হলো যে, ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করছেন। অর্থাৎ ফীলডিং-এর জানা ছিল না যে, শব্দের যথার্থ অর্থ যাই প্রতিপন্ন করুক না কেন, তাকে সব সময় মেনে নেওয়া চলে না। অপ্রিয় সত্য গোপন থাকাই বাঞ্ছনীয়। যে পুরুষপুঙ্গবটির গায়ের রঙ নিয়ে ফীলডিং ঠাট্টা করেছিল সে লোকটা ভেবেই নিয়েছিল যে ফীলডিং তাকে অপমান করছে। তাই নিরাপদ হবার জন্যে সে দলের লোকদের কাছে ব্যাপারটা ফাঁস করে দেয়।

তবুও দুটো কারণের দরুন ফীলডিংকে মোটামুটি সবাই পছন্দ করতো। তার মিষ্টি ব্যবহার আর তার শক্তপোক্ত পুরুষালী চেহারা। কিন্তু মেয়েরা তাকে একদম পছন্দ করতো না। তাদের ধারণা, ফীলডিং পুরোপুরি সাহেব নয়। ফীলডিং অবশ্য এসব নিয়ে নিজেকে কখনও বিব্রত করে নি। তবে ইংল্যান্ডের প্রমীলা সমাজে না হলেও এখানকার প্রমীলা সমাজে তার একটু বদনাম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বদনাম কাটাতে ওপরপড়া হয়ে ফীলডিং কখনও এমন কিছু করে নি যাতে মেয়েরা খুশি হয়। যেমন, কোন অজুহাতে বিশ্রম্ভালাপ করতে ভরদুপুরে সে কারো বাংলোয় যায় নি। সারমেয় বা অশ্ববিশারদ হবার ভান করে নি। কিংবা বড়দিন উপলক্ষ্য করে কারও ছেলেকে খুশি করতে ক্রিশমাস ট্রি সাজাতেও কেউ তাকে দেখে নি। সে ক্লাবে যেত টেনিস বা বিলিয়ার্ড খেলতে এবং খেলা হলেই ফিরে আসতো। এখানে এসে সে আবিষ্কার করেছিল যে ইংরেজ পুরুষরা পুরোপুরি অসহ্য নয়। তাদের এবং ভারতীয়দের নিয়ে মোটামুটি যোগাযোগ রেখে চলা যায়। কিন্তু ইংরেজ মহিলাদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি থাকলে ভারতীয়দের ত্যাগ করতে হবে। তাদের সঙ্গে মেশা যাবে না। কারণ, এই দুই সমাজ পরস্পরের ঘোর প্রতিপক্ষ। এদের কখনও মিল হবে না। অবশ্য এর দরুন কাউকে দায়ী করা চলে না। এটাই তাদের স্বভাব এবং এটা মেনে নিয়েই মানুষ দল বাছাই করে। বেশিরভাগ ইংরেজ পুরুষই মেয়েদের প্রতি অনুরক্ত থাকতে চাইত। তাদের সাহায্য ছাড়া এদেশে 'হোম্' পরিবেশ গড়ে তোলা অসম্ভব। ফীলডিং-এর দরকার হয় নি তা। ভারতীয়দের আস্থাভাজন থাকাই সে উচিত মনে করেছিল। অবশ্য এর দরুন তাকে অনেক দাম দিতে হয়েছে: সরকারী অনুষ্ঠান ছাড়া তার কলেজে কোন ইংরেজ মহিলা পদার্পণ করে নি। ফীলডিংও তাদের কখনও আসতে বলে নি। সবে এসেছে বলেই মিসেস মুর এবং মিস কোয়েস্টেডকে সেদিন সে চায়ের আসরে নেমন্তন্ন করেছিল।

নতুন বলেই এরা খুঁটিয়ে দেখবে না এবং কথা বলার সময় ক্ষণে ক্ষণে বলার স্বর পাল্টে যাবে না।

সরকারের পূর্ত বিভাগের তৈরি করা কলেজ ভবনটি একেবারে আধুনিক হলেও, সঙ্গের বাগানটি সেকেলে। একটি বাগানবাড়ি আছে বাগানের মধ্যে। এ বাড়িটাও পুরোনো। বছরের বেশিরভাগ সময় ফীলডিং এখানেই থাকে। আজিজ যখন এসে পেঁছলো, ফীলডিং তখন স্নান সেরে পোশাক বদলাচ্ছে। আজিজের আগমনবার্তা পেয়ে ফীলডিং চেঁচিয়ে বললো, 'আরাম করে একটু বসুন আমি আসছি।' বলা বাহুল্য, ভেবেচিন্তে কথা বলে না ফীলডিং। কাজও করে না ভেবেচিন্তে।

কিন্তু আজিজের কাছে ব্যাপারটা নতুন। এমনটির জন্যে সে তৈরি ছিল না। তাই ফীলডিং এর সৌজন্যে সে অভিভূত হয়ে গেল। সেও চেঁচিয়ে বললো, 'আপনাকে ধন্যবাদ মিস্টার ফীলডিং। আমি সত্যিই নিজের বাড়ি মনে করেই বলছি। বলতে কি, লোকের সঙ্গে লৌকিকতা সামাজিকতা করতে আমিও ভালবাসি না।' কথাটা বলে বেশ ঝরঝরে লাগছিল তার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে ঘরের চারপাশ দেখতে লাগলো। অনেক দুষ্প্রাপ্য এবং দামী জিনিসে ঘরখানা ঠাসা। কিন্তু লোক দেখানোর মনোভাব নেই। অগোছালো হয়ে পড়ে আছে জিনিসগুলো। তাই আজিজের একবারও মনে হলো না যে, লোককে বিশেষ ভারতীয়দের, তাক লাগানোর জন্যে এগুলো সে এনেছে। ঘরখানাও ভারি চমৎকার। তিনদিক দিয়েই বাগানে ঢোকা যায়। দেখতে দেখতে আবার চেঁচাল আজিজ। 'আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আমার অনেকদিনের ইচ্ছে। বলতে কি, নবাব বাহাদুরের কাছে আপনার সহৃদয়তার অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু চন্দ্রপুরের মতন হতভাগা দেশে দেখাসাক্ষাতের উপযুক্ত জায়গাই বা কোথায় ?' দরজার কাছে চলে এল আজিজ। অনুচ্চ স্বরে ফের বললো, 'প্রথম প্রথম ভাবতুম আপনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে বেশ হয়। সেখানেই আমাদের আলাপ হবে।' আজিজের কথা বলার ধরনে দরজার ওপাশ থেকে হেসে উঠলো ফীলডিং। আজিজও হাসলো। আরও উৎসাহ পেল সে এবং বানিয়ে বানিয়ে বলতে লাগলো, 'আজ সকালে আপনাকে কেমন দেখবো তাই ভাবছি দুদিন ধরে। যদি দেখি সিভিল সার্জেনের মতন ফ্যাকাসে, আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যেতুম। আপনার চিকিৎসার ভার আমিই নিতাম। তখন দুজনে জমিয়ে আড্ডা মারা যেত। আমি জানি আপনি কবিতা ভালোবাসেন। বিশেষ ফার্সী শ্যের।'

'তার মানে আপনি আমায় দেখেছেন ?' বললো ফীলডিং ওপাশ থেকে।

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। আপনিও আমায় চেনেন। বলুন ?'

'হ্যাঁ, চিনি। খুব ভালো করেই আপনাকে চিনি। তবে নামে।'

'কিন্তু কি করে ? আমি তো বেশিদিন এখানে আসি নি! আর এসে অব্দি বাজারের দিকেই থাকি। তা, আমার নাম জানলেন কি করে ?'

ফীলডিং নিরুত্তর। আজিজ আবার চেঁচাল।

'মিস্টার ফীলডিং? শুনতে পাচ্ছেন ?'

'পাচ্ছি।'
'আচ্ছা, আমি মানুষটা কেমন দেখতে, বলুন তো ?'
শোবার ঘরের ঘষা কাঁচের দরজা দিয়ে যতটুকু আন্দাজ করা যায়, তা সম্বল করে ফীলডিং বললো। 'পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি লম্বা।'
'চমৎকার। তারপর ? বেশ মান্যগণ্য দেখায় এরকম সাদা দাড়ি আছে আমার ?'
কিন্তু উত্তরের বদলে ফট্ করে একটা শব্দ শুনলো আজিজ।
'কি হলো ?'
'কিছু না। শার্টের কলারের শেষ বোতামটা মাড়িয়ে ফেললুম।'
'আমারটা নিন না।'
'আপনার কি বেশি আছে ?'
'হ্যাঁ। হ্যাঁ। আছে। এক মিনিট দাঁড়ান।'
'আপনারটাই খুলে দিচ্ছেন নাকি ?'
'তা কেন। আমার পকেটে একটা এক্সট্রা আছে।' এই বলে আজিজ চট করে পাশে সরে গেল, যাতে ঘষা কাঁচের দরজায় এর ছায়া না পড়ে। তারপর পরনের শার্ট থেকে নকল কলারটা খুলে তা থেকে সোনার বোতামটা ছিঁড়ে পকেটে পুরলো। সোনার বোতামটা তার শালার দেওয়া—ইওরোপ থেকে ভগ্নীপতির জন্যে এটা এনেছিল সে। আজিজ ততক্ষণে নকল কলারটা আবার পরে ফেলেছে।
'এই নিন।'
ওপাশ থেকে ফীলডিং বলে উঠলো, 'আপনি তো লৌকিকতা মানেন না। তাহলে ঢুকে পড়ুন ঘরে।'
আজিজ ভাবছিল বোতামহীন শার্টের কলারটা চায়ের টেবিলে হঠাৎ না খুলে যায়। ফীলডিং-এর যে বেয়ারাটা তাকে পোশাক পরায় সাহায্য করছিল, সে দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে ফীলডিং-এর হাতে সোনার বোতামটা দিল আজিজ। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো ফীলডিং। দুজনেই হাসলো। বন্ধুত্বের মধুর হাসি। আজিজের মনেই হচ্ছিল না ফীলডিং তার সদ্য পরিচিত। যেন কতদিনের পুরোনো বন্ধু সে। সেইভাবেই ঘুরে ঘুরে ঘরের জিনিসপত্তর দেখছে আজিজ। আজিজের ঘনিষ্ঠ আচরণ দেখে ফীলডিংও অবাক হলো না। সে জানে, যাদের হৃদয়াবেগ আছে তেমন মানুষরা পরস্পরের কাছাকাছি হতে সময় নেয় না। তাছাড়া, দুজনেই দুজনের সম্বন্ধে এত ভাল ভাল কথা শুনেছে যে, আলাপের প্রাথমিক বাধাটি আগেই উৎরে গিয়েছিল দুজনে।
ঘরের খুঁটিনাটি মন দিয়ে দেখতে দেখতে আজিজ বললো, 'আমার ধারণা ছিল যে ইংরেজরা ঘরদোর সব গুছিয়ে রাখে। এখন দেখছি তা নয়।' বলতে বলতে খাটের ওপরেই পা মুড়ে বসে পড়লো আজিজ। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে সে খুব সচেতন। বিছানায় বসে আজিজ বললো, 'ভেবেছিলুম গিয়ে দেখবো সবকিছু সুন্দর করে সাজানো।

তা এসে যা দেখছি তাতে আমার লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই। কি হ'ল বোতামটা লাগছে না?'

বিরক্ত ফীলডিং বিড়বিড় করে কি যেন বললো, আজিজ হাঁ করে শুনছিল। শব্দটা তার কানে খুব দুর্বোধ্য লাগলো। কিছুই বুঝলো না সে। বললো, 'কেমন নতুন নতুন ইংরিজি বলেন আপনারা। আমায় একটু শেখান না। আমার ইংরিজি জ্ঞানটা একটু ভাল করি।' ফীলডিং অন্য কথা ভাবছিল। যাদের বুদ্ধির তাকে সর্বকিছু পরিপাটী করে গেঁথে বসে গেছে তাদের পরে নতুন কিছু শেখানো যায় না। যারা অগোছালো তারাই শেষে বদলায়। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে সে দেখে ছোকরারা কেমন অনায়াসে ইংরিজি বলছে। ব্যাকরণের ধার ধারছে না, যখন তখন ক্রিয়াপদ বদলাচ্ছে, শব্দ বিন্যাসের প্রকরণ মানছে না। কিন্তু বক্তব্য ঠিকই বুঝিয়ে দিচ্ছে। আসলে, সেই পুরোনো ধাঁচের বাবু ইংরিজির শৃংখল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে এরা। এসব একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোনো প্রতিষ্ঠান এভাবে আমূল বদলায় না। যেমন ক্লাব। সেখানকার ইংরিজিতে ব্যাকরণের কড়াকড়ি। আষ্টেপৃষ্ঠে নিয়মের বাঁধা-বাঁধি সেখানে। তাই ক্লাবের নিয়মে একই টেবিলে ইংরেজের সঙ্গে কিছু খানদানী মুসলমান ছাড়া কোন হিন্দু বসতে পায় না, ভারতীয় মহিলা মাত্রেই পর্দানশীন ইত্যাদি। এ সবই সাবেকী ধারণা। নতুন আলোকপাত হয় নি এর ওপর। ব্যক্তি এভাবে আটকে থাকে না। সে এগিয়ে যায়। বদলায়ও। কিন্তু প্রতিষ্ঠান অনড়। সে বদলায় না একটুও।

ফীলডিং যখন এইসব ভাবছে, তখন তড়াক করে উঠে দাঁড়াল আজিজ। তারপর ফীলডিং-এর পেছনে এসে বললো, 'আপনার কলারে বোতামটা লাগিয়ে দেব? এ! ফুটোটা দেখছি খুব ছোট। ঘাড়টা একটু নোয়ান তো?' ফীলডিং ঘাড় নোয়ালো, কিন্তু রাগে গজগজ করছিল সে। বললো, 'এইসব নকল কলার-টলার পরার দরকার কি বলতে পারেন?'

'আমাদের দরকার আছে। এইসব পরে আমরা পুলিশকে ফাঁকি দিই।'

'তার মানে?'

ফুটোর ভেতরে বোতামটা গলাবার চেষ্টা করতে করতে আজিজ বললো, 'ধরুন বাইকে চেপে যাচ্ছি। পুলিশ হেঁকে উঠলো। তখন যদি আমার মাথায় হ্যাট আর কড়া ইস্ত্রি করা শার্টের কলার দেখে তো সাতখুন মাপ। কিন্তু মাথায় ফেজ্ থাকলে আর রক্ষে নেই। ঠিক চালান করে দেবে। লর্ড কার্জন বোধহয় ব্যাপারটা এতদূর ভেবে দেখেন নি। নইলে মোটেই তিনি আমাদের দিশি পোশাক ব্যবহারের অনুমতি দিতেন না।' হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো আজিজ।

'হুর্‌রে! বোতামটা কেমন লাগিয়ে দিলুম দেখুন।' আজিজ আবার চুপ করলো। তারপর কেমন গভীর স্বরে বলতে লাগলো। 'জানেন! মাঝে মাঝে চোখ বুজে আমি স্বপ্ন দেখি। যেন নানারকম জমকাল পোশাক পরে আলম্-গীরের পেছনে দাঁড়িয়ে আমি যুদ্ধ করছি। আচ্ছা মিস্টার ফীলডিং! সেই দিনগুলো খুব সুন্দর ছিল তাই না? মোগল সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যসূর্য

তখন মধ্যআকাশে। দিল্লীর ময়ূর সিংহাসনে বসে আলমগীর দেশ শাসন করছেন। তাঁকে ঘিরে......'

ফীলডিং বলে উঠলো, 'দুজন ইংরেজ মহিলা আসছেন আপনার সঙ্গে চা খেতে। আলাপ করতে। আপনি তাদের চেনেন তো?'

'আমার সঙ্গে? কিন্তু আমি তো কোন মহিলাকে চিনি না?'

'মিসেস মূর, মিস কোয়েস্টেড্‌কে চেনেন না?'

'ও, হ্যাঁ। মনে পড়েছে।' সত্যিই ভুলে গিয়েছিল সে। মসজিদের ভেতরে বৃদ্ধার সঙ্গে সেই রোমান্টিক আলাপের স্মৃতি মসজিদ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিয়েছিল। এখন মনে পড়েছে তার। আজিজ আবার বললো 'খুবই বৃদ্ধা এক মহিলা। তাই না? সঙ্গিনীর নামটা যেন কি বললেন?'

'মিস কোয়েস্টেড।'

ব্যাপারটা আজিজের খুব মনঃপূত হলো না। সে ভেবেছিল নতুন বন্ধু শুধু তাকেই নেমন্তন্ন করেছে। ক্ষুন্ন স্বরে সে বললো 'যেমন আপনার অভিরুচি।'

'ইচ্ছে করলে মিস্ কোয়েস্টেডের সঙ্গে ময়ূর সিংহাসন নিয়ে আপনি আলাপ করতে পারেন। শুনেছি উনি আর্টিস্ট।'

'আর্টিস্ট? তাহলে নিশ্চয়ই উনি পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট।'

ফীলিডং মুগ্ধ চোখে চেয়েছিল। বললো, 'পোস্ট ইম্প্রেশিনিজ্‌ম্ তত্ত্ব আপনি বোঝেন দেখছি? ইওরোপের চিন্তান্দোলনের সঙ্গে পরিচয় আছে আপনার? গুড্! আসুন, চা খাওয়া যাক।'

আজিজের বেশ রাগ হয়ে গেল ফীলডিং-এর কথা শুনে। খুবই তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত করেছে লোকটা। কিভাবে সে ভারতীয়দের? তার কি ধারণা যে ইওরোপের থট্ মুভমেন্টগুলো সম্বন্ধে তার মতন অখ্যাত অজ্ঞাত ভারতীয়র কিছু জানার অধিকার নেই। সে অধিকার কি শুধু শাসকশ্রেণীর মানুষেরই একচেটিয়া? বেশ রাগত স্বরে সে বলে উঠলো, 'মিসেস মূর আমার বন্ধু নন। তাঁর সঙ্গে আমার তেমন আলাপও হয় নি। মসজিদের ভেতরে একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল এই অব্দি।' আজিজ আরও কটুভাষী হয়ে বলতে যাচ্ছিল যে একমুহূর্তের সাক্ষাতে কেউ কারও বন্ধু হয় না, বা ওইরকম আরও কিছু। কিন্তু ফীলডিং-এর মুখের দিকে চেয়েই তার মনের সেই কঠিন ভাব অন্তর্হিত হয়ে গেল। সে বুঝতে পারলো, মানুষটা ভালমানুষির ভান করছে না। যথার্থই ভালমানুষ সে। আজিজের মনটাও সৎ। সেও নেহাৎ খারাপ নয়। কিন্তু ভালমন্দর স্রোতোবেগে অসহায় হয়ে ভাসতে ভাসতে কখনও তা কূল পায়। কখনও পাথরের গায়ে আছড়ে গুড়ে আহত হয়। তীর পেয়ে আজিজ নিরাপদ হয়েছে। সব তীরবাসীর মতন নিরাপত্তাবোধ থেকে তার আশ্রয়ের ভিত পাকা হয়েছে। সেও কামনা করছে আরও অসহায় মানুষ তার মতন তীরে আসুক। কিন্তু যখন সে ভাসছিল, তখন তার মনের মধ্যে যে তীব্র আবেগের ঝড় উঠেছিল, তার সন্ধান নিরাপদ মানুষ কি করে জানবে। একথা অবশ্য ঠিক যে আজিজ অভিমানী। অভি-

মানী না হয়ে মনটা যদি মনবেদনশীল হতো, তবে ভাল হতো। তাই সকলের সব মন্তব্যের মধ্যেই আজিজ একটা বিশেষ অর্থ খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, যেটা সঠিক অর্থ সেটাই তার চোখে পড়ে না। অভিমানের পাথরে ঘা খেয়ে ফিরে আসে। মনে দাগ কাটে না। জীবন নিয়ে প্রধানত সে স্বপ্নই দেখে, তাকে প্রত্যক্ষ করে না। যেমন বলা যায় যে, ফীলডিং মোটেই ভারতীয়দের অখ্যাত অজ্ঞাত ভাবে না। বরং পোস্ট ইম্প্রেশনিজ্ম্ নামে ওই চিন্তান্দোলনটাই তার কাছে দুর্বোধ্য। এবং সেটাই সে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু আজিজ তাকে ভুল বুঝেছে। মিসেস টারটনের ব্যঙ্গোক্তি. 'আচ্ছা! ওরাও তাহলে ইংরিজি বলতে পারে!' আর ফীলডিং-এর সৎ মন্তব্যটা যে এক নয়. দুয়ের মধ্যে আশমান-জমিন তফাৎ. আজিজের অভিমানী মন তা বুঝলো না। বোঝার চেষ্টাও করলো না। যাহোক, আজিজের চোখমুখের ভাব দেখে ফীলডিং বুঝতে পারছিল যে কোথাও একটা অনুপপত্তি ঘটেছে। কিন্তু তা নিয়ে নাড়াচাড়া করলো না। সে জানে যে অপ্‌টিমিস্ট, সকলেরই ভাল চায় সে মনে মনে। ব্যক্তিগত সম্পর্কটাই তার কাছে বড় এবং এইটুকু ভেবেই সে আগের কথার জের টেনে বললো, 'মেয়েরা ছাড়াও আজকের চায়ের আসরে আর একজনকে আশা করছি।'

আজিজ তাকালো ফীলডিং-এর দিকে। ফীলডিং বললো, 'আমার সহকারী নারায়ণ গড়বোলে।'

'ওহো! ওকে চিনি। মারাঠী ব্রাহ্মণ।'

'সেও ইতিহাস ভালবাসে এবং অতীতে ফিরে যেতে চায়। তবে অবশ্যই আলমগীরের কালে নয়।'

আজিজ মনে মনে উত্তেজিত হয়েই ছিল। ফীলডিং-এর কথায় তাতে যেন ঘৃতাহুতি হলো। তবুও যথাসম্ভব রাগ চেপে সে বললো, 'ওই মারাঠী ব্রাহ্মণরা কি বলে জানেন? ইংরেজ নাকি তাদের হারিয়ে এদেশ জয় করেছে। অর্থাৎ মোগল নয়, মারাঠা। বুঝুন ওদের আস্পর্ধা। শুধু তাই নয় ঘুষ দিয়ে ইতিহাস বইতে এইসব লিখিয়ে ছেলেদের শেখাচ্ছে। ওরা পারে না এমন কাজ নেই। ভীষণ ফন্দিবাজ আর বড়লোক ওরা। অবশ্য শুনেছি যে প্রফেসর গড়বোলে অন্য মারাঠী ব্রাহ্মণদের মতন ধান্দাবাজ নন। উনি যথার্থই সৎ মানুষ।'

ফীলডিং তাকিয়েছিল আজিজের দিকে। হঠাৎ বললো. 'আচ্ছা আজিজ! চন্দ্রপুরে আপনারা একটা ক্লাব করছেন না কেন?'

'হয়ত কোনদিন হবে। ওই তো ওঁরা এসে পড়েছেন! মিসেস মুর আর তাঁর সঙ্গিনীর নামটা যেন কি?'

সুখের কথা যে সেদিনের চা পার্টি ছিল সম্পূর্ণ ঘরোয়া। আচার অনুষ্ঠানের বালাই ছিল না। ফলে সহজভাবে মেয়েদের সঙ্গে মেশা বা কথা বলার সুযোগ ছিল আজিজের। তার একবারও মনে হয় নি যে এরা মেয়ে। একজন অতি প্রাচীনা আর একজন নামেই স্ত্রীলোক, চেহারায় নয়। নারীর দেহসৌন্দর্য বলতে যা বোঝায় মিস কোয়েস্টেডের তা নেই। পুরুষ মানু-

ষের মতন সোজা সরল তার চেহারা। কোথাও এতটুকু উঁচুনিচু বঙ্কিম ভাব নেই। তার ওপর সারা মুখে মেচেতার দাগ। ঈশ্বর যে কেমন করে একজন নারীর প্রতি এত নিষ্ঠুর হয়েছেন, তা তিনিই জানেন। মোট কথা মিস কোয়েস্টেডের মতন একজন যুবতী নারীর সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে আজিজকে মোটেই সঙ্কোচ বোধ করতে হলো না।
একটু আলাপের পরেই মিস্ কোয়েস্টেড জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি তো ডাক্তার আজিজ?' আজিজ ঘাড় নাড়লো। মেয়েটি আবার বললো, 'আপনার কথা মিসেস মুর আমায় বলেছেন। আমি শুনেছি মসজিদের মধ্যে আপনি ওঁকে খুব সাহায্য করেছেন। তাছাড়া কয়েক মিনিটের আলাপে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উনি যা জেনেছেন, এদেশে পা দেবার তিন হপ্তা পরেও আমরা তা জানতে পারি নি।' এত লম্বা প্রশংসা শুনে আজিজ রীতিমত সঙ্কুচিত। কুণ্ঠার সঙ্গে বললো, 'না। না। এমন সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে অতটা বাড়িয়ে বলবেন না। তার চেয়ে বলুন, আমাদের দেশ সম্বন্ধে আপনি আর কি জানতে চান?'
'আজ সকালেই একটা ঘটনায় আমরা খুব নিরাশ হয়েছি। ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দিতে হবে। আমার বিশ্বাস এটা ভারতীয় সামাজিকতার ব্যাপার।'*
'উহুঃ! আমরা ভারতীয়রা মোটেই সামাজিক নই এবং তার জন্যে কোনরকম সৌজন্যবোধও আমরা মেনে চলি না।' আজিজ বললো।
বৃদ্ধা মিসেস মুর পরিবেশ সহজ করবার জন্যে বললেন, 'ঠিক তা নয়। এটা কোন সামাজিকতার ব্যাপার নয়। আমার ধারণা, নিশ্চয়ই আমরা কোথাও ভুল করে বসেছি। আর তাই কারো অভিমানে আঘাত করে ফেলেছি।'
মৃদু হাসলো আজিজ। তারপর বললো, 'সেটা আরও অসম্ভব। যাই হোক, ঘটনাটা কি শুনি।'
মিস কোয়েস্টেড তখন বললো, 'আজ সকালে একজন ভারতীয় দম্পতি আমাদের জন্যে গাড়ি পাঠাবেন বলেছিলেন। সকাল ন'টায় গাড়ি আসার কথা। সেই থেকে অপেক্ষা করছি। গাড়ি আর আসে না। শেষ অব্দি গাড়ি এলও না। বুঝতে পারছি না কি হলো।'
ফীলডিং নির্বিবাদে বললো, 'কিচ্ছু হয় নি। স্রেফ ভুল বোঝাবুঝি।' ফীলডিং চাইছিল না এসব নিয়ে বেশি আলোচনা হোক। এর জট খুলতে গেলে আরও জট পাকাবে। কিন্তু ফীলডিংএর কথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলো মিস কোয়েস্টেড। আপত্তিতে মাথা নাড়িয়ে বললো, 'মোটেই ভুল বোঝা-বুঝি নয়। শুধু আমাদের আপ্যায়ন করবেন ব'লে ওরা কলকাতা যাওয়া বন্ধ করেছেন। নিশ্চয়ই আমরা দুজনে একটা কোথাও বিশ্রী ভুল করে বসেছি।'
ফীলডিং সামান্য একটু হাসলো। বললো, 'এ-নিয়ে আমার কিন্তু একটুও দুশ্চিন্তা নেই।'
র‍্যাডেলা কোয়েস্টেড লাল হয়ে গেল রাগে। বললো, 'হীস্‌লপও তাই বলছিল। কিন্তু চিন্তা না করলে অন্যকে বুঝবো কি করে?'

ব্যাপারটা গুরুগম্ভীর হয়ে যাচ্ছে দেখে ফীলডিং এখানেই আলোচনাটা থামিয়ে দিতে গেল। কিন্তু আজিজ যেন নতুন করে বিষয়টার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। টুকরো টুকরো যা সে শুনেছে তাতে বোঝা যায় যে অপরাধীরা হিন্দু। সুতরাং নির্বিবাদে সে বলে গেল, 'হিন্দুরা এমনিতেই কুঁড়ে। কথা দিয়ে কথা রাখা বা সময় মেনে চলা ওদের ধাতে নেই। সামাজিকতার ধার ধারে না ওরা। ওদের আমি খুব ভাল করে জানি। আমার হাসপাতালেই একজন হিন্দু ডাক্তার আছে। সে লোকটাও এইরকম ঢিলে। আপনাদের যাওয়া হয় নি ভালই হয়েছে। গেলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আপনাদের ভুল ধারণা হতো। নোংরা ঘরদোর। পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই। আমার কি মনে হচ্ছে জানেন ? ইচ্ছে করেই ওরা গাড়ি পাঠায় নি। ওদের বাড়িঘরের যা অবস্থা, তাতে সেধে আর কে বিব্রত হতে চায়, বলুন ?'

'এটা আপনার ধারণা।' ফীলডিং বললো।

য়্যাডেলা কোয়েস্টেড অসহিষ্ণু হয়ে যাচ্ছিল। বললো, 'দেখুন! এই ধরনের দুর্বোধ্য রহস্যময় ব্যাপার স্যাপার আমার একদম পছন্দ হয় না।'

'কোনো ইংরেজই পছন্দ করে না।' ফীলডিং তাকে যেন সমর্থন করলো।

'ইংরেজ বলে যে অপছন্দ করি তা নয়। এটা আমার ব্যক্তিগত রুচি।'

মিসেস মুর এতক্ষণ শুনছিলেন এদের কথা। এবার বললেন, 'রহস্যটহস্য মন্দ নয়। তবে ঘোঁট পাকানো ভাল নয়।'

'দুটো একই।' হাল্কা স্বরে জবাব দিল য়্যাডেলা।

'তুমিও কি তাই মনে করো, বাবা?' ফীলডিংএর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন বৃদ্ধা।

'হ্যাঁ ম্যা। দুটো একই। তফাত শুধু নামে। নাড়ানাড়ি করলে কোনোটা থেকেই ভাল কিছু পাওয়া যায় না। আজিজের সঙ্গে আমি একমত যে ভারতবর্ষের সবটাই এইরকম ধোঁয়াটে দুর্বোধ্য।'

'ওমা! কি সাংঘাতিক! সারা দেশটাই এইরকম ?'

আজিজ হঠাৎ বলে উঠলো, 'আমার বাংলোয় যদি পায়ের ধুলো দেন, তবে কোনো ধোঁয়াটে ব্যাপার পাবেন না। কথা দিচ্ছি। সবাই আসুন। দেখুন।'

বৃদ্ধা তখনই রাজী। বস্তুত, ডাক্তার ছোকরাকে আলাপ থেকেই তাঁর ভালই লেগেছে। তাছাড়া খানিকটা উদাসীনতা খানিকটা উত্তেজনা থেকে একটা নতুন আগ্রহ বোধ করছিলেন তিনি। যে কোন একটা নতুন পথ খুঁজতে মন চাইছিল। য়্যাডেলাও রাজী। তার মনে হলো বেশ তো একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে! আজিজকেও খারাপ লাগে নি তার। হয়ত ঘনিষ্ঠ হলে দেশ সম্বন্ধে আরও অনেক নতুন কথা সে জানাবে। খুশি হয়েই আজিজের ঠিকানা চাইলো সে।

কিন্তু কথাটা বলেই ভাবনায় পড়ে গেছে আজিজ। বাংলোর কথা মনে পড়ে গেল তার। নামেই বাংলো! বাজারের মধ্যে একটা ছোট্ট বাড়ি। বলতে গেলে একখানাই ঘর। নোংরা, অন্ধকার। ভনভন করছে কালো কালো মাছি। মনে পড়তেই মনে মনে শিউরে উঠলো সে। কথাটা ঘোরাবার জন্যে তাড়াতাড়ি

বললো, ‘সে হবে এখন। এখন বরং অন্য কথা বলা যাক।’ য়্যাডেলা আগ্রহ ভরে তাকাল। আজিজ বললো, ‘কি চমৎকার এই ঘরখানা! আহা! যদি এখানে থাকতে পারতুম! খিলানের নিচে ওই ছোট ছোট কাজগুলো দেখুন! কি চমৎকার শিল্পকর্মের নিদর্শন। তাই না?’ য়্যাডেলা কাজগুলো দেখছিল। আজিজ হঠাৎ বৃদ্ধার দিকে চেয়ে বলে উঠলো, ‘ভারতবর্ষের স্থাপত্যশিল্প খুব সমৃদ্ধ মিসেস মুর। সেই ভারতবর্ষেই আপনি এসে পড়েছেন। তাকিয়ে দেখুন একটু!’

ঘরখানা সত্যিই আজিজকে অভিভূত করে ফেলেছে। দেশটার প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সবাই যেন নতুন অনুপ্রেরণা পেল। যতদূর মনে হয় এটা বোধহয় একসময় দরবারঘর ছিল। কাঠের তৈরি ঘরখানায় আঠারো শতাব্দীর স্থাপত্য-শৈলী। ফীলডিং ভাবছিল ফ্লোরেন্সের খোলা গ্যালারির কথা। সেইরকমই খিলানাবৃত পথ। হলঘরের দুপাশে ছোট ছোট কুঠুরি। নিখুঁত ইওরোপীয় কায়দায় কুঠুরিগুলো আঁটসাঁট সজ্জিত। কিন্তু হলঘরটা খোলামেলা, কোথাও কোন প্রতিবন্ধ নেই। বাগানের হাওয়া হু হু করে ঘরে ঢুকছে। কল্পনা করা যাক, দরবারে বসেছেন কেউ। প্রজারা তাঁকে দেখছে। তিনিও তাদের দেখছেন। মালী পাখি তাড়াচ্ছে। চাষী জল তুলে পানিফল খেতে ঢালছে। আমগাছ-গুলো নষ্ট হতে দেয় নি ফীলডিং। গাছের ফল যাতে চুরি না হয়, তাই চাকরবাকরেরা দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে। মোট কথা সুন্দর হলঘরখানা ইংরেজ ফীলডিংএর হাতে শ্রীহীন হয়ে যায় নি। আজিজ থাকলে কি হতো বলা যায় না। বাগানের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আজিজ বললো, ‘ধরুন, এখানে বসে আমি বিচার করছি। একজন গরিব বিধবা এল। তার সর্বস্ব কেউ কেড়ে নিয়েছে। তাকে পঞ্চাশ টাকা দিলাম। আর একজনকে একশো টাকা দিলাম। যে চাইলো তাকেই দিলাম।’

মিসেস মুর মৃদু হাসলেন। বললেন, ‘কত টাকা দেবে, বাবা! সে তো ফুরিয়ে যাবেই।’

‘না মা। আমার ফুরোবে না। আমি যত দেব আল্লাও আমায় তত দেবেন। নবাব বাহাদুরের মতন শুধু দান করতে চাই আমি। আমার আব্বাও তাই করে গেছেন। দুহাতে বিলিয়ে গেছেন তিনি। তাই শেষ বয়সে কপর্দকহীন হয়ে গিয়েছিলেন।’ আজিজের মনে তখন কল্পনার হাট বসেছে। এক ঘর কর্মচারী। সবাই কর্মরত। আজিজ বললো, ‘আমরা কিন্তু চেয়ার সরিয়ে কার্পেটের ওপর বসেছি। সেকাল আর একালের মধ্যে এটাই প্রধান বদল। আমার মনে হয় আমরা কাউকে শাস্তি দেব না। কি বলেন?’

মেয়েরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিল। উৎসাহিত আজিজ বললো, ‘হতভাগ্য অপরাধীও মানুষ। তাকে আর একটা সুযোগ দেওয়া দরকার। জোর করে হাজতে পাঠালে সে আরও নষ্ট হতে পারে।’

বলতে বলতে আজিজের মুখখানা বেদনায় করুণ হয়ে উঠলো। সে ভুলে গেল যে যোগ্য শাসক বা বিচারক হতে গেলে নরম হওয়া সাজে না। সাজা না পেলে অপরাধী ফের বিধবার সর্বস্ব কেড়ে নিতে পারে। এ কথা জেনেও

আজিজ শক্ত হতে পারলো না। তাই বলে কিছু অমানুষ আত্মীয়কে সে কিন্তু কখনও ক্ষমা করবে না। তাদের ওপর সে প্রতিশোধ নেবেই। তবে অন্যদের সম্পর্কে সে যথেষ্ট উদার। এমনকি ইংরেজদের সম্পর্কেও সে সহানুভূতিশীল। অবস্থার চাপেই তারা নিষ্ঠুর হয়েছে। ঠাণ্ডা স্রোতের মতন দেশটার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, হৃদয়ের উষ্ণতার স্পর্শ পাচ্ছে না। এইসব ভাবতে ভাবতে আজিজ বলে উঠলো। 'না না, আমরা কাউকে শাস্তি দেব না। কাউকে না।' আবার কল্পনার রাজ্যে ফিরে গেল সে। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ফেলে আসা দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে চাইছিল আজিজ। শান্ত স্বরে বললো, 'তারপর রাত হবে। চলবে আমোদ উৎসব, খানাপিনা। সুন্দরী মেয়েরা নাচবে। পুকুরের দুপাশে হাতে রঙমশাল নিয়ে সারা রাত ধরে তারা নাচবে, গাইবে। খুশির হাট বসে যাবে এখানে। আবার সকাল হবে। আবার বিচার-সভা বসবে। আবার আমরা দানধ্যান শুরু করবো। লোকে খুশি হয়ে আমাদের আশীর্বাদ করতে করতে ফিরে যাবে। কারও মনে কোন দুঃখ থাকবে না।' আজিজ চুপ করলো। তারপর বিষণ্ণ স্বরে বললো, 'কেন আমরা সেই যুগটায় ফিরে যেতে পারি না? কেন?' তারপর মহিলাদের উদ্দেশে বলে উঠলো, 'চুপ করে আছেন কেন? বলুন? মিস্টার ফীলডিংএর বাড়িটা কি আশ্চর্য সুন্দর নয়? থামগুলো দেখুন। কি সুন্দর এর চিত্রকলা? আর কারুকাজ করা বারান্দাটা? ছোট ছোট ওই জালির কাজগুলো করতে কত সময় লেগেছে বলুন তো? ওপরের ওই ছাতটা দেখে কি মনে হয় না যে বাঁশের ছাত? কি সুন্দর! তাই না? আর পুকুরের ধারে বাঁশঝাড়টা? বাতাসের ধাক্কায় ওদের মাথাগুলো কেমন নুইয়ে পড়ছে? একটা বিস্ময়কর দৃশ্যপট। তাই না মিসেস মুর?'

মিসেস মুর হাসছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ। তবে......'

'আপনার মনে আছে মসজিদের কথাটা? একটা ক্ষীণ জলের প্রবাহ কোত্থেকে যেন কুলকুল করে নেমে আসছে আর জলাধারটা ভরে দিচ্ছে। কি নিপুণ বন্দোবস্ত বলুন তো? যাতে জলের প্রবাহ ঢালু পথে বাংলাদেশে বয়ে না যায় তাই এই ব্যবস্থা। ওঁরা পানি খুব ভালবাসতেন। যেখানেই গেছেন বাগান, ফোয়ারা, হামাম বানিয়েছেন। একটু আগে তাই তো মিস্টার ফীলডিংকে বলছিলুম যে তাঁদের সেবা করতে পারলে আমি বর্তে যেতুম।'

জলের গতি সম্বন্ধে আজিজ যা বললো তা যে অবৈজ্ঞানিক ফীলডিং তা বুঝেছে। কিন্তু প্রতিবাদ করে নি। সাধারণভাবে জলের গতি নিম্নমুখী। চাপ দিয়ে তাকে ওপরে তুলতে হয়। মসজিদ এবং ফীলডিংএর বাড়ির মধ্যের অংশটা টোল খাওয়া। তাই স্বাভাবিক ভাবেই জলের ঢল এইদিকে নেবেছে। ফীলডিংএর বদলে রনী বা টারটন্ থাকলে নিশ্চয়ই আজিজকে হেনস্থা হতে হতো। ফীলডিংএর আলাদা ধাত। মুখের সততার চেয়ে অন্তরের সততার দাম অনেক বেশি তার কাছে। সে জানে মুখে আজিজ যা-ই বলুক, মনে মনে মনে ভারি সৎ। য়্যাডেলা অবশ্য আজিজের সব কথাই সত্য বলে মেনে নিয়েছে। তার কেমন যেন ধারণা হয়েছে (অবশ্য এ-ধারণার সবটাই ভুল) যে

আজিজই ভারতবর্ষ। তার ভেতর দিয়েই সে আসল ভারতবর্ষ খুঁজে পাবে। তাই একবারও মনে হয় নি যে আজিজের দেখার গণ্ডী সীমাবদ্ধ। আসলে. কোন দেশকে জানার প্রকরণ যে এটা নয় সে ধারণাই য়্যাডেলার ছিল না। আজিজ তখন অসহিষ্ণু হয়ে শক্ত শক্ত কথা বলছিল। মাঝে মাঝে কথার খেই হারিয়ে উল্টোপাল্টাও বলছে। সবটাই অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা। ডাক্তারি বিদ্যের খুঁটিনাটি, অপারেশনের নিয়ম পদ্ধতি নিয়ে তার লম্বা বক্তৃতা শুনতে শুনতে বৃদ্ধা বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। মানুষটা প্রকৃতিস্থ তো ? য়্যাডেলার অবশ্য তেমন আশঙ্কা হচ্ছিল না। তার ধারণা, মানুষটা মনের দিক থেকে খুবই বড় মাপের, নইলে এমন সরলভাবে এসব নিয়ে আলোচনা করতো না। ইংল্যান্ডে এ ধরনের আলোচনা হয় শিক্ষিত মহলে। অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ শ্রোতাদের সামনে এসব কথা তারা বলে না। কিন্তু আজিজ যথার্থই মুক্ত মনের মানুষ। নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিদ্যাটা সে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই কারণেই মানুষটা শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। বস্তুত, শ্রদ্ধার উচ্চাসনে সেই-জন্যেই সে তাকে বসিয়েছে। হয়ত সেই মুহূর্তে আজিজও যথার্থ শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শিখরদেশে সে পৌঁছতে পারলো না। আকাশের বুকে ডানা মেলে উড়তে উড়তে কখন পক্ষ সঞ্চালন থেমে গেছে. জানতেও পারে নি সে। ক্লান্ত ডানার ভারে দেহটা যখন মাটিতে পড়ে গেছে তখন তার হুঁশ হলো।

প্রফেসর গড়বোলে প্রায় তখনই এসে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখে একটু থমকে গেলেও সেই ঘরোয়া বৈঠকের একমাত্র বক্তা ছিল আজিজই। স্বল্পভাষী গড়-বোলে স্বভাবে খুব ঠাণ্ডা এবং বিনয়ী। তবে কিছুটা জটিল চরিত্রের মানুষ তিনি। বাকপটু আজিজের ঠিক বিপরীত। সারাক্ষণ চুপ করে সকলের কথা শুনে গেলেন। নিজে প্রায় কিছুই বললেন না। ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে একটু দূরে বসেছেন হিন্দু গড়বোলে। তাঁর ঠিক পিছনে একটা নিচু টেবিল। পিছনে হেলে এক অভিনব কায়দায় তিনি চা খাবার নিচ্ছেন। ব্যাপারটা সকলের চোখে পড়লেও না দেখার ভান করলো তারা। মানুষটা বেশ বয়স্ক। সাদা গোঁফ জোড়ায় আরও পরিণত বুদ্ধির মানুষ মনে হচ্ছিল তাঁকে। ঈষৎ কটা চোখ এবং গায়ের রঙ প্রায় সাহেবদের মতন সাদা। মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি, সরু লম্বা চোঙের মতন তার আকার। পরনে ধুতি, কোট, ওয়েস্ট-কোট, মোজা, বুটজুতো এবং একটি পকেট ঘড়ি। অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটা সুন্দর সমন্বয়। মানুষটির পোশাকে এবং হয়ত মানসিকতাতেও। তাই একনজরে মানুষটাকে দেখে এলোমেলো মনে হয় না। গড়বোলেকে দেখে দুজন মহিলাই বেশ উৎসাহিত বোধ করছিলেন। তাদের মনে হলো আজিজ যেখানটায় অসম্পূর্ণ সেই ফাঁকটা ভরিয়ে দেবেন এই হিন্দু ব্রাহ্মণ। ধর্ম হলো ভারতবর্ষের আত্মা। হিন্দু ব্রাহ্মণ সেই ধর্ম নিয়ে আলোচনা করবেন। কিন্তু সারাক্ষণ গড়বোলে শুধু নিঃশব্দে হাসলেন আর চোখ বুজে একের পর এক খাদ্যবস্তু নিঃশেষ করলেন। একটা কথাও বললেন না।

বাকপটু আজিজ ততক্ষণে বিষয়ান্তরে চলে গেছে। মোগল সম্রাটদের ছেড়ে

তখন সে স্মৃতিচারণ করছিল। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আলোচনা এবং অহিংস এদেশের সেরা ফল আম নিয়ে তখন কথা বলছে আজিজ। সবাই মন দিয়ে শুনছিল। স্মৃতিকথায় বেশ অন্তরঙ্গ একটা উত্তাপ থাকে যা মনকে স্পর্শ করে। তার ছেলেবেলার কথা বলছিল আজিজ। কতদিন বৃষ্টির দুপুরে ছুটতে ছুটতে দলবল নিয়ে সে আমবাগানে গেছে। তার কাকার আমবাগানে। পেটপুরে আম খেয়েছে। তারপর ভিজে সপসপে হয়ে যখন ফিরলো তখন পেটের কামড়ানি শুরু হয়ে গেছে। সকলের একই দুর্ভোগ। কিন্তু তাতে কি ? ভাগ করে নিলে কোন কষ্টই গায়ে লাগে না। উর্দুতে একটা প্রবাদ আছে যার মানে হলো, কোন কষ্টই কষ্ট নয় যখন সেটা সবাই ভাগ করে নেয়। হঠাৎ য়্যাডেলার দিকে সরাসরি চেয়ে আজিজ বলে উঠলো, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করছি মিস কোয়েস্টেড! অন্তত আমের সীজ্‌ন্‌টা এখানে কাটিয়ে যান।' একটু থেমে আজিজ আবার বললো, 'পাকাপাকি থেকেই যান না এদেশে ? অনেকেই তো থাকছেন ?'

'না। না। তা হয় না।' কিছু না ভেবেই জবাবটা দিল য়্যাডেলা। সবাই ধরে নিল আলোচনার পূর্বাপর প্রসঙ্গেই য়্যাডেলা কথাটা বলেছে। খানিকক্ষণ য়্যাডেলারও সেই রকম ধারণা হয়েছিল। কিন্তু আধ ঘণ্টাখানেক পরেই তার মনে হলো রনীর অনুপস্থিতিতে এইরকম জবাব দেওয়া তার উচিত হয় নি।

'আপনার মতন বিদেশী মানুষ তো সচরাচর আমরা পাই না, তাই......!' আগের কথার জের টেনে আজিজ বললো।

ততক্ষণে। গড়বোলেও অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে। সেও সমর্থন করলো আজিজকে। বললো, 'তা ঠিক। ওঁর মতন এমন ভদ্র সদালাপী মানুষ কদাচিৎ আমাদের দেশে আসেন। কিন্তু কী বা আমাদের আছে যা দিয়ে ওঁকে আটকে রাখবো ?'

'আম। স্রেফ আম।' সবাই হেসে উঠলো আজিজের কথায়।

'আজকাল ইংল্যান্ডেও আম পাওয়া যাচ্ছে। জাহাজের খোলের মধ্যে বরফ দিয়ে আম পাঠানো হচ্ছে। যেমন এখানটাকে বিলেত করে ফেলেছি আমরা, তেমনি বিলেতটাকেও ভারতবর্ষ করে তোলা যায়।' বললো ফীলডিং।

'তা যায়। তবে খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হবে তা।' ফীলডিংএর দিকে চেয়ে য়্যাডেলা বললো।'

'তা ঠিক।'

'তাছাড়া আইডিয়াটাও বিচ্ছিরি।'

আলোচনার বিষয় ক্রমেই গুরুপাক হয়ে যাচ্ছে দেখে ফীলডিং তা লঘু করার চেষ্টা করছিল। এতক্ষণ বৃদ্ধা চুপ করেই ছিলেন। কেমন মনমরা এবং ব্যাকুল দেখাচ্ছিল ওঁকে। অত্যন্ত বিনীত হয়ে ফীলডিং তাঁর ইচ্ছের কথা জানতে চাইলো। 'আমাদের এই কলেজটা একটু ঘুরে দেখবেন ?' বৃদ্ধার চোখে খুশি উপচে পড়লো যেন। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সবাই উঠে দাঁড়ালো। য়্যাডেলাও দাঁড়ালো। শুধু বৃদ্ধ গড়বোলে একমনে বসে কলার

খোসা ছাড়াচ্ছিলেন। কিন্তু উঠলেও তখুনি য়্যাডেলা বসে পড়লো। মিসেস মুর অবাক। বললেন, 'তুমি যাবে না মনে হচ্ছে।'

'ঠিক তাই।' বললো য়্যাডেলা।

য়্যাডেলা বসে পড়ায় আজিজও ইতস্তত করতে লাগলো। তার শ্রোতার দল দুভাগ হয়ে গেছে। যাদের সে পছন্দ করে তাঁরা চলে যাচ্ছেন। তবে যারা মনোযোগী শ্রোতা তারা থেকে গেল। এবং সবটাই যখন ঘরোয়া, তখন আজিজও স্থির করলো সে যাবে না।

তখনও আম নিয়েই কথাবার্তা চলছে। বিদেশীদের কাঁচা আম খেতে দেওয়া চলে কিনা এই নিয়ে আলোচনা। আজিজ মুখখানা বেশ ভারিক্কি করে বললো, 'ডাক্তার হিসেবে বলছি, না। চলে না।'

গড়বোলের খাওয়া শেষ হয়েছে। মনটাও বেশ খুশিখুশি। য়্যাডেলার দিকে চেয়ে গড়বোলে বললেন, 'আপনাকে এবং মিসেস মুরকে আমি কিছু সুস্বাদু ভারতীয় মিষ্টান্ন খাওয়াতে চাই। আশা করি সে সুযোগ আমায় দেবেন।'

গড়বোলের কথায় আজিজের মনটা খারাপ হয়ে গেল। সেও পাঠাতে পারতো। কিন্তু ঘরণীবিহীন সংসার তার। কে এসব ঝক্কি নেবে। একটু ক্ষুণ্ণ হলো সে। বললো, 'ওঁর বাড়ির তৈরি মিষ্টি খুব উপাদেয়। খাঁটি ভারতবর্ষের স্বাদ পাবেন তার মধ্যে। আমি অবশ্য আপনাদের জন্যে কিছুই করতে পারলুম না।'

'সে কি? আপনার বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেন আবার কি? এ তো পরম সৌভাগ্য আমাদের।'

য়্যাডেলা কোয়েস্টেডের কথা শুনে চমকে উঠল আজিজ। ব্যাপারটা সে ভুলেই গিয়েছিল। বোকা মেয়েটা কিন্তু ঠিক মনে করে রেখেছে। তাহলে উপায়? চোখের ওপর বাড়ির চেহারাটা ভেসে উঠলো। মনে মনে শিউরে উঠলো আজিজ। হঠাৎ বিদ্যুতের চমকের মতন একটা বিকল্প প্রস্তাবের কথা মনে হলো তার। তার শেষ আশ্রয়। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো সে। বললো, 'হ্যাঁ। সে তো আছেই। তবে একটা নতুন এবং বিস্ময়কর জায়গায় আপনাদের নিয়ে যাবার কথা ভাবছিলুম।'

'কোথায়?'

'মাড়াবার গিরিগুহা দেখবেন? চমৎকার. একটা য়্যাড্‌ভেঞ্চার কিন্তু!'

'নিশ্চয়ই দেখবো। এবং রীতিমত খুশি হবো।'

গড়বোলেও সায় দিলেন। বললেন, সত্যিই খুশি হবেন গুহাগুলো দেখে। আমার বাড়ির মিষ্টির চেয়েও অনেক উপাদেয় হবে এই অভিযান। কিন্তু গুহাগুলো কি আপনি আগে দেখেন নি?'

'দেখি নি কি বলছেন? নামই শুনিনি।'

'নাম শোনেন নি? মাড়াবার পাহাড়ের গিরিগুহার নাম শোনেন নি? আশ্চর্য তো?'

'কি বলবো আপনাদের। আমাদের ক্লাবে হয় টেনিস না হয় পরচর্চা এছাড়া আর কিছু আলোচনা হয় না।' বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েই বললো য়্যাডেলা।

য়্যাডেলার স্পষ্টাপষ্টি জবাব শুনে গড়বোলে চুপ করে গেলেন। তাঁর সামনে বসে এই স্বজাতিনিন্দা উচিত হচ্ছে না মেয়েটার। তাছাড়া তিনি নিজেও তাঁকে সমর্থন করতে পারেন না, কারণ তা হবে স্পর্ধা দেখানো। আজিজের কথা আলাদা। সে চট করে মিস কোয়েস্টেডের কথাটা ধরে নিয়ে বললো, 'জানি। আমি জানি।'

'তাহলে আর যা জানেন, বলুন আমায়। নইলে ভারতবর্ষ নামে এই দেশটাকে কিছুতেই বুঝতে পারবো না। আচ্ছা! বিকেলে মাঝে মাঝে যে পাহাড়টা দেখি সেটার কথাই আপনারা বলছেন তো? গুহাগুলোয় কি আছে?'

বোঝাতে গিয়ে চুপ করে গেল আজিজ। সে নিজেও আজ অব্দি গুহাগুলো চোখে দেখে নি। মনে মনে ভেবে রেখেছে একবার গিয়ে দেখে আসবে। কিন্তু হয় সরকারী কাজ নয়ত নিজের দরকারের দরুন, যাওয়া হয়ে ওঠে নি। আজিজের অসহায় অবস্থা দেখে গড়বোলে মনে মনে খুশি। আজিজকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ করে বললেন, 'আশা করি আমার যুবক বন্ধুর পট্ এবং কেট্‌লএর পুরোনো প্রবাদটা জানা আছে? স্বভাবতই আজিজকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। য়্যাডেলা কোয়েস্টেড তখন উৎসুক।

'খুব বড় গুহা?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'না। খুব বড় নয়।'

'আমায় সব খুলে বলুন প্রফেসর।'

গড়বোলে প্রায় কৃতার্থ। গদ্‌গদ স্বরে বলে চললেন। 'এ তো আমার পরম সৌভাগ্য!' তারপর চেয়ারটা ওদের কাছাকাছি টেনে আনলেন। গড়বোলের মুখের চেহারা ততক্ষণে বেশ টানটান্ হয়ে উঠেছে। বোঝাই যাচ্ছিল যেন তিনি একটা কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। অবস্থাটা সহজ করতে য়্যাডেলা ওদের দুজনকে দুটো সিগারেট দিল। দেশলাই জেলে নিজেরটাও ধরাল। একটু চুপ করে নাটকীয় কায়দায় গড়বোলে শুরু করলেন তাঁর বিবরণ।

'পাহাড়ের একটা প্রবেশপথ আছে। প্রবেশপথটা দিয়ে গুহায় ঢুকতে হয়।'

'অনেকটা কি এলিফ্যান্টা গুহার মতন দেখতে?'

'না। একেবারেই না। এলিফ্যান্টা গুহার মধ্যে শিবপার্বতীর যুগল মূর্তি আছে। মাড়াবার গুহার মধ্যে কোনো দেবদেবীর ভাস্কর্য নেই।' গড়বোলে বললো।

তাকে খুশি করতে আজিজ বলে উঠলো, 'দেবদেবীর মূর্তি না থাকলেও শুনেছি গুহাগুলো নাকি তীর্থস্থানের মতন পবিত্র। তাই কি?'

'না। তাও নয়।'

'তাহলে কি গুহার ভেতরটা খুব কারুকার্য করা?'

'উঁহু!'

আজিজ অবাক। গড়বোলের দিকে চেয়ে বললো, 'কি আশ্চর্য! তাহলে কেভ্‌স্‌গুলোর অত হাঁকডাক কেন? ফাঁকা আওয়াজ?'

'কে বললো তা।'

তাহলে ব্যাপারটা কী? একটু পরিষ্কার করে ওঁকে বুঝিয়ে বলুন। উনি জানতে চাইছেন।'

'নিশ্চয়ই! এ তো আনন্দের কথা।' বিব্রত গড়বোলে ঢোঁক গিললেন। তাঁর অবস্থা দেখে আজিজের ধারণা হলো গুহাগুলোর ব্যাপারে হয়ত কিছু একটা রহস্য আছে যা গোপন করতে চাইছে গড়বোলে। আজিজ অবাক হলো না। নিষেধের আবর্তে সে নিজেও বহুবার পড়েছে। মেজর ক্যালেন্ডারের ধমক খেয়ে একটা সত্য চাপতে গিয়ে হাজারটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে হয়েছে তাকে। মেজর তাকে ধাপ্পাবাজ মিথ্যেবাদী বললেও আজিজ তা ঝেড়ে ফেলতে পারে নি। কারণ, অভিযোগটা একেবারে মিথ্যে নয়। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক গড়বোলেও তাই করলেন। চুপ করে রইলেন। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে গড়বোলে মন তৈরি করছেন যাতে অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারেন। তখন নিষিদ্ধ ব্যাপারটা অন্যভাবে বলবেন, যাতে য়্যাডেলা তাঁকে ভুল না বোঝে। হয়ত বলবেন যে বরফ জমে গুহামুখ এমন ঢেকে যায যে ভেতবে ঢোকা যায় না। তাই গুহার ভেতরে কি আছে কেউ জানে না।

ওরা হালকা সুরেই কথাবার্তা বলেছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওরা যে অন্য কথা ভাবছে য়্যাডেলা তা বুঝতে পাবে নি। দেখতে শুনতে সরল এই মুসলমান ছেলেটিব মানসিকতা যে মান্ধাতার আমলের য়্যাডেলা তাও জানতো না। আসলে স্বাধীন নিবপেক্ষ মূল্যাযনের ক্ষমতা আজিজের নেই। সেই অলস পরিবর্তনবিরোধী মন, বিস্মৃত অতীতের প্রভাব কাটিয়ে যে মন মুক্ত হতে পারে নি, তার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে আজিজের মানসিকতা। মাঝে মাঝে সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। তার নিষ্পৃহ বিরুদ্ধ মনের সঙ্গে তর্ক কবে। হয়ত বার বার হেরেও যায়। তবুও তার নিষ্প্রাণ মনটা একবারও মেনে নেয নি যে মাড়াবার গুহার কোন অসাধারণত্ব থাকতে পাবে এবং সেটা খোঁজার চেষ্টাও হযেছিল।

আজিজের এইরকম যখন মনের অবস্থা তখনই রনীকে দেখা গেল বাগান দিয়ে আসতে। মানুষটা যে ভীষণ বিরক্ত তা দেখেই বোঝা যায়। ভদ্রতা কবে বিরক্তি চাপার কোন লক্ষণই সে দেখাল না। বাগান থেকেই চেঁচাচ্ছিল রনী।

'কি ব্যাপার? ফীলডিং কোথায়? মা কোথায়?'

য়্যাডেলা ঠাণ্ডা নিস্তেজ স্বরে বললো 'গুড ইভনিং।'

'এখুনি আপনাদের দুজনকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। পোলো খেলা আছে।' রনী বললো।

'তবে যে শুনেছিলুম আজ পোলো খেলা হচ্ছে না?'

'ঠিকই শুনেছিলেন। আজ খেলাব দিন ছিল না। কযেকজন ফৌজী লোক এসে পডায আজই খেলাটা হচ্ছে। যেতে যেতে সব বলছি।'

সম্মান দেখাতে গডবোলে তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। বিনীত হয়ে বললেন, 'আপনার মা এখুনি এসে পড়বেন। আমাদের কলেজ দেখতে গেছেন। অবশ্য

কীই বা আছে দেখার।'
গড়বোলেকে পাত্তাই দিল না রনী। আগের মতন য়্যাডেলাকে লক্ষ্য করেই যা বলার বলতে লাগলো। কর্মস্থল থেকে সোজা এখানেই এসেছে য়্যাডেলাকে নিয়ে যাবে ব'লে। তার বিশ্বাস খেলা দেখতে য়্যাডেলার ভাল লাগবে। ফলে, ঘরের মধ্যে আরও যে দুজন পুরুষ আছে তাদের দিকে চেয়েও দেখে নি রনী। এটা স্রেফ অবহেলা। আসলে, ভারতীয়দের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কোনো স্বীকৃতি সে দিতে রাজি নয়। যতক্ষণ তার অধীনে কেউ কাজ করে, ততক্ষণই সে তাদের চিনতে পারে। যেহেতু এই মুহূর্তে এদের দুজনের কেউই তার অধীনস্থ নয়, তাই রনী তাদের দেখেও না দেখার ভান করলো।
কিন্তু আজিজকে অবহেলা করে ঠেকিয়ে রাখাব উপায় নেই। যেমন করে হোক স্বীকৃতি আদায় সে করবেই। আজও তার অন্যথা হলো না। গড়-বোলের মতন দাঁড়িয়ে উঠে সম্মান দেখাল না সে। চেয়ারে বসেই চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'আরে মশাই দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি? যতক্ষণ মা না আসছেন আমাদের সঙ্গে বসে পড়ুন। বসুন। বসুন!'
রনী তখন রাগে গজরাচ্ছে। ফীলডিংএর একটা চাকরকে ডেকে ভাঙা ভাঙা উর্দুতে গৃহকর্তাকে ডেকে আনতে বললো।
আজিজ নিরীহ স্বরে বললো, 'আপনার কথা ও বোধহয় বুঝতেই পারলো না। দাঁড়ান, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে চলতি উর্দুতে বুঝিয়ে দিল। আজিজকে উচিত শিক্ষা দিতে পারতো রনী। এইসব মানুষদের সে ভাল করেই চেনে। এদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকৃতিটা খুব বেশি। কিন্তু সে সরকারী কর্মী। চট করে কোনরকম উত্তেজনার মধ্যে যেতে চায় না। তাই আজিজের দিক থেকে যথেষ্ট প্ররোচনা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সংযত করে নিল রনী। আজিজ অবশ্য তাকে ক্রমাগত রাগাবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। যে কথাই বলুক, একটা ঔদ্ধত্যের ভাব ফুটে উঠছিল তার মধ্যে। এই ধরনের ব্যবহার তার স্বভাববিরুদ্ধ। সে চায়ও নি রনী হীসলপের সঙ্গে এমনি উদ্ধত ব্যবহার করতে। লোকটা তো তার কোন ক্ষতি করে নি? তবুও লোকটাকে যেন সইতে পারে না আজিজ। য়্যাডেলার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হবার আগ্রহ নিয়ে যে এইসব করছিল তা নয়। আবার গড়বোলেকে সমর্থনও করছিল না। অনেকটা আপনা থেকেই ঘটে যাচ্ছিল ঘটনাটা। বাগান দিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ফীলডিংএর নজরে পড়লো দৃশ্যটা। চারটি চরিত্রের কোন এক নাটকের মুহূর্ত যেন! একপাশে ডানাভাঙা পাখির মতন ক্লান্ত হয়ে পড়ে আছে আজিজ। ঘটনার নোংরামিতে য়্যাডেলা যেন স্তম্ভিত, রনীর দিকে তাকানো যায় না। চাপা রাগের আঁচে গনগন করছে তার মুখচোখ। আর মাটির দিকে চোখ রেখে গড়বোলে আড়চোখে তিনজনকে দেখছে।
ফীলডিংএর সঙ্গে মিসেস মুরও ঢুকছিলেন। তাঁকে দেখেই রনী চেঁচিয়ে উঠলো, 'থাক মা! তোমায় আর কষ্ট করে এটুকু আসতে হবে না। আমরা তো এখুনি বেরোচ্ছি!' এই বলে ফীলডিংকে একপাশে ধরে নিয়ে চাপা স্বরে বললো, 'মাপ করবেন মিস্টার ফীলডিং, এদের কাছে য়্যাডেলাকে এমন

একলা রেখে যাওয়া উচিত হয় নি আপনার।' মোটামুটি একটা হৃদ্যতার ভাব বজায় রেখেই কথাটা বললো রনী। অবাক হলেও ফীলডিংও ভদ্রভাবেই উত্তর দিল। বললো, 'তাতে কি?'

'না। তেমন কিছু না। তবে......দেখুন আমি নিজেও একজন পোড় খাওয়া শক্ত ধাতের আমলা। এসবে ঘাবড়ে যাই না। তবে যা দৃষ্টিকটু তা তো মানতেই হয়। ঘরে ঢুকেই দেখলুম দুজন নেটীভ পুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে বসে একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা সিগারেট খাচ্ছেন।'

'য়্যাডেলা কিন্তু ধূমপান করতেই ঘরে থেকে গিয়েছিল।'

'বুঝলাম। ইংল্যান্ড হলে কিছু মনে করতামও না।'

'দেখতে যখন পাচ্ছেন না তখন কি করে দেখাই! কিন্তু ওই লোকটার ইতর ব্যবহারটাও কি আপনার নজরে পড়ে নি?'

'কে? আজিজ?' ফীলডিং তাকাল আজিজের দিকে। সে তখন উত্তেজিত হয়ে মিসেস মুরকে কিছু একটা বোঝাচ্ছিল। রনীর কথার ধরনটা ভাল লাগে নি ফীলডিংএর। প্রতিবাদের সুরে সে বললো, 'আজিজ ইতর নয়। তবে হয়ত কোন কারণে ওর ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে।'

'বটে। তা ভদ্রলোকেব অমন মূল্যবান ধৈর্যের চ্যুতি ঘটলো কেন?'

'জানি না। যখন যাই তখন তো দিব্যি স্বাভাবিক দেখেছিলুম ওকে? বললো ফীলডিং।

ফীলডিংকে আশ্বস্ত করতে রনী বললো, 'ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। তবে আপনার অবগতির জন্যে বলি, লোকটার সঙ্গে আমি যেচে একটা কথাও বলি নি।'

'ঠিক আছে ব্রাদার। এখন মহিলাদের নিয়ে যান। মনে করুন বিপর্যয় কেটে গেছে।'

'আমিও মন্দ ভাবে কিছু বলতে চাই নি, ফীলডিং! আর...... যাক সে কথা। আমাদের সঙ্গে পোলো মাঠে আসছেন তো? খুব খুশি হব তাহলে।'

'না। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। সত্যিই আমি যেতে পারছি না। ভীষণ দুঃখিত তার জন্যে। তবে মনে কববেন না যে, আপনার নেমন্তন্ন উপেক্ষা করছি।'

এরপর শুরু হলো পরস্পরের কাছে বিদায় নেবার পালা। অল্পবিস্তর সবাই উত্তেজিত হয়ে আছে। একটু একটু করে বিরক্তি আর অসন্তোষ চুইয়ে পড়ে জমা হয়েছে সবার মনে। অথচ কারণটা কত তুচ্ছ! অন্য দেশে এত তুচ্ছ কারণে মন অশান্ত হয় না। কিন্তু এ দেশের সবটাই বিপরীত। আসলে ভারতবর্ষের মানুষের মনে সহিষ্ণুতার কোন সঞ্চয় নেই। হয় তারা একটুতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, নয়ত এমন নির্বেদ ঔদাসীন্যে নিমজ্জিত হয় যে, মনে কোনো দাগ কাটে না। যেমনটি হয়েছে ওই হিন্দু অধ্যাপকটির। ফীলডিং জানে যে সে নিজেও মুক্ত মনের মানুষ নয়। যেমন নয় আজিজ বা রনী হীস্‌লপ্‌। আজিজকে সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল যেন আপাদমস্তক একটা জাল মানুষ। মহিলা দুজন যেন ছেলেমানুষের মতন নির্বোধ এবং বাইরে

শিষ্টাচার পালন করলেও সে বা রনী কেউই শিষ্ট বা সৎ নয়। দুজনেই দুজনকে ঘৃণা করে। পরস্পরের নিষ্ঠুর প্রতিপক্ষ তারা।

এবার সত্যিকার বিদায় নেবার পালা এল। ফীলডিংকে ধন্যবাদ দিয়ে মিসেস মুর বললেন, 'বাবা! তোমার কলেজ বাড়িটা দেখলুম। কি সুন্দর পরিবেশ!'

'ধন্যবাদ মিসেস মুর।'

'কি চমৎকার বিকেলটা কাটলো আমাদের। তাই না মিস্টার ফীলডিং?'

'ধন্যবাদ মিস্ কোয়েস্টেড।'

'গুড্‌বাই ডক্টর আজিজ।'

'গুড্‌বাই মিসেস মুর। গুড্‌বাই মিস কোয়েস্টেড়।'

শেষমেষ আর একটু শয়তানি করতে ইচ্ছে হলো আজিজের। বললো, 'ভারতবর্ষ থেকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাবেন বলছেন। আমার খুব খারাপ লাগছে কারণ এটা আমাদের দেশের লজ্জা। অন্তত আর একবার ভেবে দেখুন, কিছুদিন থাকা যায় কিনা? আমি কিন্তু খুব শীগগির কেভ্‌স্ দেখার বন্দোবস্ত করছি।'

য়্যাডেলা বুদ্ধিমতী। সে ঠিক বুঝলো যে রনীর সামনে তাকে অপদস্থ করতে চাইছে আজিজ। সেও রেগে গেল। হিন্দু ব্রাহ্মণ গড়বোলের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললো, 'ছি প্রফেসর গড়বোলে! গান শোনাবেন বললেন অথচ শোনালেন না!'

'সে কি কথা! আমি এখুনি শোনাচ্ছি।' এই বলে গান ধরলেন গড়বোলে। স্বর যত চড়ছে ততই ফেটে যাচ্ছে। যেন ফাটা কাঁসর বাজাচ্ছে কেউ। এক-সময় মনে হলো যেন অনেক কণ্ঠের ছন্দহীন সুরহীন একটা ঐকতান। অনেকটা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বেতালা সিম্ফনির মতন। শব্দের কোলাহলে হারিয়ে যাচ্ছে গানের কথা। তবে কোথাও যেন একটা সুর আছে, শ্রুতি দিয়ে যা মর্মে প্রবেশ করে। অনেকটা যেন কোনো নাম না জানা পাখির গানের মতন ক্ষীণ স্বর তার।

গানের কথার মানে বুঝলো শুধু চাকরেরা। ভারি খুশি তারা। নিজেদের মধ্যেই কানাকানি করছে। যে লোকটা পুকুরে নেবে পানিফল তুলছিল প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় জল থেকে উঠে এল সে। কোমরে একটা ভিজে কানি জড়ানো, সারা উর্ধাঙ্গ দিয়ে জল ঝরছে। খুশিতে ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে, আর লাল টুকটুকে জিভটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। একসময় গানের কোলাহল থামলো। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎই তা থেমে গেল।

গান থামার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো ফীলডিং। বললো, 'চমৎকার! প্রফেসর গড়বোলে আপনাকে ধন্যবাদ! কিন্তু গানের মানেটা ঠিক বুঝলাম না। একটা গভীর ভাব আছে এর মধ্যে। তাই না?'

'ঠিক বলেছেন আপনি। একটা গভীর ভাব অন্তর্নিহিত আছে এই ভক্তি-গীতির মধ্যে।' একটু চুপ করে গড়বোলে সেই ভাবটি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। 'আমি যেন সখীভাবধারী এক ভক্ত গোপিনী। সেই ভাবরূপটি নিয়েই

রতিনায়ক শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করছি। তাঁকে ডাকছি, বলছি "হে আমার প্রেমাস্পদ তুমি আমায় দেখা দাও। আমার হৃদয়েশ্বর হয়ে অধিষ্ঠিত হও।" কিন্তু ভগবান একজন ভক্তের মনে দেখা দিল না। তাঁর অনেক ভক্ত। তাই একজনের ডাকে আসেন না তিনি। আমি তাই প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করে কাতর কণ্ঠে তাঁকে বলি, "হে হৃদয়বল্লভ! তুমি শত শত রূপে ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম ছড়িয়ে দাও। কিন্তু দেখা দাও হে বিশ্বনিয়ন্তা! বঞ্চিত করো না।" এমনি করে বার বার গানটি গাওয়া হবে, যাতে ভক্তের আকুলতা ভগবানের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। গানের সুরটা নিশ্চয়ই ভাল লেগেছে আপনাদের। কেন জানেন? সময়ের সঙ্গে মানিয়ে এর সুরটি বাঁধা হয়েছে, তাই।'

গড়বোলে চুপ করলো। সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। মিসেস মুর একসময় শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনাদের অন্য গানের মধ্যেও তো কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আসে, তাই না?' বৃদ্ধার প্রশ্নের তাৎপর্য ঠিক বুঝলো না গড়বোলে। প্রতিবাদের সুরে সে বললো 'উনি কিন্তু আসেন না। আসতে পারেন না। ভক্ত আকুল হয়ে তাঁকে ভজনা করবে। বলবে "দেখা দাও"। কিন্তু বার বার তিনি ভক্তকে প্রত্যাখ্যান করবেন। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এই ব্যবধান চিরকাল থাকবে। এটাই মূল বিষয়।'

রনী হীস্‌লপ্‌ চলে গেছে। তার পদশব্দ অনেকক্ষণ মিলিয়ে গেছে। সবাই চুপচাপ। এক বিস্ময়কর নীরবতা তখন বিরাজ করছিল সেখানে। মনে হচ্ছিল নদীর জলে কোন তরঙ্গ বিক্ষোভের ধ্বনি নেই, গাছের একটা পাতাও নড়ছে না।

৮

ইংল্যাণ্ডে থাকতে রনীর সঙ্গে আলাপ থাকলেও য়্যাডেলার মনে হয়েছিল যে বিয়ের আগে তাদের আর একবার দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। তাতে পরস্পরকে জানা যাবে। সেও তার মন বুঝতে পারবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই য়্যাডেলা ভারতে এসেছে। কিন্তু এখানে এসে রনীকে দেখে সে নিরাশই হলো। এখন সে একজন আত্মতৃপ্ত একদেশদর্শী মানুষ। যাদের সঙ্গে তার ওঠা বসা তাদের মনের কথা জানবার সময় বা অবসর কিছুই তার নেই। এইরকম নিষ্ঠুর উদাসীনতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে য়্যাডেলা। মানুষটার ইদানিং ধারণা হয়েছে যে সে কখনও ভুল করতে পারে না। তাই যখন প্রমাণ হয়ে যায় যে সে ভুল করেছে তখন ভীষণ খাপ্পা হয়ে যায় সে। য়্যাডেলাকে সে বলেই দিয়েছে যে তার নিজের ব্যবহার আচরণ নিয়ে য়্যাডেলা যেন মাথা না ঘামায়। কারণ এসব ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে রনীর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। তার নিজের ব্যবহারিক জ্ঞানও য়্যাডেলার চেয়ে অনেক বেশি।

মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে য়্যাডেলার তো কোনো অভিজ্ঞতাই নেই! কিংবা যদি থাকেও তার নির্দেশ পড়ার যোগ্যতা তার হয় নি। রনীর পাঠপর্ব শুরু হয়েছিল লণ্ডনের পাবলিক স্কুলে। শেষ হয়েছে য়ুনিভার্সিটিতে। তারপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। এইভাবে ধাপে ধাপে তার জীবনবোধ সমৃদ্ধ হয়েছে। একবার ঘোড়ায় চড়া শিখতে গিয়ে সে পড়ে গিয়েছিল। একবার তার জ্বরও হয়। এগুলো তার জীবনের মহার্ঘ্য অভিজ্ঞতা। য়্যাডেলাকে সে বুঝিয়েছে যে ঘটনাগুলো তুচ্ছ নয়। বরং একটা জাত বা দেশকে জানবার পক্ষে এগুলো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। য়্যাডেলার বোঝা দরকার যে এদেশ সম্বন্ধে ক্যালেণ্ড্যার বা টার্‌টন্ পরিবারের লোকেদের জ্ঞান অনেক পরিপূর্ণ। একদিনে তা হয় নি। টানা বিশ বছর এদেশে তারা বাস করেছে। তবে তাদের অনুভূতিগুলো এমন সজাগ হয়েছে, তীক্ষ্ণ হয়েছে। অবশ্য নিজের সম্বন্ধে রনীর দাবি এতখানি নয়। এখনও সে নেহাৎই কাঁচা। তাই 'যোগ্যতা অর্জন করি নি,' বলে, বেড়াতে তার কোন কুণ্ঠা নেই। কিন্তু রনীর এই অতি বিনয়ের ভণ্ডামিটাই য়্যাডেলার কাছে যেন অসহ্য লাগে।

ফীলডিংএর বাংলোয় একটু আগে সে কীরকম অভদ্র ব্যবহারটাই না করলো! গড়বোলের গানের মাঝখানে অমন দুম্ করে চলে আসাটা কি উচিত হয়েছে তার? অবশ্য নামেই গান। গড়বোলের গলায় না ছিল সুর না মাধুর্য। তবুও সকলের অনুরোধেই তিনি গান শুরু করেছিলেন! রনী কেন তা বুঝতে চাইলো না? কেন সে গানের মধ্যিখানে ঘর থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোকটিকে অপমান করলো? ঘোড়ার গাড়িতে ফেরার সময় এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাথাটা গরম হয়ে গেল য়্যাডেলার। রাগে বিরক্তিতে তখনই রনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে হলো। অপ্রত্যাশিতভাবে একটা সুযোগও পেয়ে গেল য়্যাডেলা। তখন কলেজের মাঠটা পেরোচ্ছিল তারা। রনী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা মা! তখন কেভ্‌স্ নিয়ে ওরা যে কি বলাবলি করছিল?'

দপ্ করে জ্বলে উঠলো য়্যাডেলা। রনীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মিসেস মুরের দিকে চেয়ে বললো, 'মিসেস মুর! আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন?'

একটু অবাক হয়ে বৃদ্ধা তাকালেন।

'কি বলো তো মা?'

'ওই আজিজ ডাক্তার আমাদের নিয়ে একটা পিকনিকের ব্যবস্থা করেছেন মাড়াবার গুহায়। আপনি, আমি, ফীলডিং আর গড়বোলে—এই চারজনে যাচ্ছি। ব্যবস্থা ট্যবস্থা সব আজিজ ডাক্তারই করবেন। চমৎকার মানুষ ওই ভদ্রলোকটি। রীতিমত সংস্কৃতিবান এবং পরিচ্ছন্ন রুচির।'

য়্যাডেলার উচ্ছ্বাসের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো রনী। মেজাজ চড়িয়ে বললো 'কোথায় যাচ্ছেন বললেন?'

'মাড়াবার গুহায়।'

'সর্বনাশ!' অস্ফুটে বলো রনী। একটু থেমে ফের জিজ্ঞেস করলো, 'সব

ঠিকঠাক জানিয়েছে তো আপনাদের ?'

'আপনি কথা বলুন না ভদ্রলোকের সঙ্গে ? বলবেন ?'

মাথা নেড়ে হেসে উঠলো রনী। য়্যাডেলা খুব বিরক্ত। বললো, 'আমি কি হাসির কথা বললুম ?'

'আমি অন্য কথা ভাবছিলুম।'

'বলুন !'

'ডাক্তারসাহেবের সাজপোষাকটা দেখেছেন ? সার্টের নকল কলারটা ঘাড়ের ওপর কেমন উঠে গিয়েছিল'!

'আমরা কিন্তু এখন কেভ্‌স্‌ নিয়ে কথা বলছিলুম।' মনে মনে ক্ষিপ্ত হলেও বেশ দৃঢ় সংযত স্বরে কথাগুলো বললো য়্যাডেলা।

'এখনও সেই আলোচনাই করছি।' একটু থেমে রনী বললো, 'টাই-পিন্‌ থেকে শুরু করে মোজা অব্দি যে লোকটা অমন নিখুঁত সাহেব, সে কি বোতাম ছাড়াই কলার পরতে পারে ? অর্থাৎ এই ঢিলেমিটাই হলো ভারতীয়-দের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটা ভাবতবাসীর এই এক দোষ। মাড়াবার কেভ্‌স্‌-এ মীট্‌ করা আর চারিং ক্রশের ঘড়ির তলায় মীট্‌ করা এক নয় মিস কোয়েস্টেড। আপনি জানেন গুহাগুলোর মধ্যে দূরত্ব কতটা ? মাইলেরও বেশি।'

'আপনি গেছেন ?'

'না গেলেও জানি। স্বাভাবিক ভাবেই জানি।'

'ও স্বাভাবিক ভাবেই জানেন ?' একটু খোঁচা দিল য়্যাডেলা।

রনী জবাবটা দিল মিসেস মুরের দিকে চেয়ে। একটু কড়া সুরে বললো, 'মা ! তুমিও কি কেভ্‌স দেখতে যাবে ঠিক করেছ ?'

ছেলের কথার ধরনটা বৃদ্ধার অত্যন্ত বেসুরো লাগলো। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমি কোথাও যেতে চাই না বাবা ! কিচ্ছু দেখতেও চাই না। এখন এই পোলো খেলা দেখার ইচ্ছেও আমার নেই। বরং বাংলোয় রেখে এস। তাতেই আমি খুশি হব। আমার এখন বিশ্রামের দরকার।'

'তাহলে আমাকেও রেখে আসুন। আমরাও পোলো খেলা দেখার ইচ্ছে নেই।'

য়্যাডেলার কথায় অভিমান হলো রনীর। বললো, 'বেশ ! খেলা দেখার প্রোগ্রাম-টাই বন্ধ থাক্‌ !' মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও একটা চাপা রাগ অনেকক্ষণ থেকেই ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছিল। হঠাৎ তা ফেটে পড়লো যেন।

বেশ চড়া গলায় বক্তৃতা দেবার ঢঙে রনী বলে উঠলো, 'দ্যাখো মা, এইভাবে নেটীভদের সঙ্গে মাথামাখি করা আমি একদম পছন্দ করছি না। এটা তোমাদের বন্ধ করতে হবে। যদি কেভ্‌স্‌ দেখতে যেতেই হয়, তবে ইংরেজদের সঙ্গে যাবে।' টম্‌টমের সামনের সীটে পাশাপাশি বসেছিলেন ওঁরা। ছেলের চড়া কথায় বৃদ্ধা মৃদু উত্তেজিত হলেন। উত্তেজনায় পাশের গদির ওপর চাপড় মেরে বললেন, 'কেভ্‌স্‌ কোথায় জানি না। তাদের নামও শুনি নি। কিন্তু এই নিয়ে তোমাদের ঝগড়া আমার একদম ভাল লাগছে না।

বৃদ্ধার কথায় ওরা দুজনেই লজ্জা পেল। ছি ছি এ কি রুচি হয়েছে তাদের !

মিসেস মুরকে বাংলোয় নামিয়ে ওরা দুজনেই তাই পোলো মাঠে যাবে স্থির করলো। যাবার পথেই ওরা মনস্থির করে নিল। কথায় কথায় আর ঝগড়া করবে না। তবে মনের মেঘটুকু একেবারে কেটে গেল না তখনই। ঝড় জলের পরেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায় না। য়্যাডেলার নিজের ব্যবহারটাও নিজের কাছে শোভন মনে হয় নি। একটা বোঝাবুঝির চেষ্টা না করে তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে সে কলহ করেছে। ইতিমধ্যেই যে দুএকটা অপ্রিয় মন্তব্য সে করেছে তা করা তার উচিত হয় নি। আম নিয়ে যখন কথা হচ্ছিল তখন এমন একটা কথা সে বললো যার মানে হয়, রনীকে সে বিয়ে করবে না। বিয়ে সে না করতে পারে, কিন্তু এতবড় সিদ্ধান্তটা ওইরকম একটা ইঙ্গবঙ্গ পরিবেশে ঢাক পিটিয়ে বলাটা রুচির পরিচয় হয় নি। কোন ভদ্র মার্জিত রুচির মেয়েই এমন কাজ করবে না। তার উচিত রনীর কাছে সব কথা খুলে বলা , কিন্তু কি বলবে সে ? খোলাখুলি আলাপ হলেই ভালো হয়। সে নিজেও তাই চায়। ঘটনা যেভাবে গড়াচ্ছে তাতে দুজনের সম্পর্কের মধ্যে আর কোনরকম গোপনতা রাখা চলে না। ইতিমধ্যেই অনেক জল গড়িয়ে গেছে নদী দিয়ে। একজন পুরুষের কতটুকু ভালো আর কতটুকু মন্দ তা নিয়ে কোন অভিযোগ করার সময়ও এটা নয় বিশেষ এই পড়ন্ত বিকেলে। পোলো খেলা হচ্ছে শহরে ঢোকার মুখের মাঠে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা দূরে চলে গেল। সূর্য অনেকখানি ঢলে পড়েছে এবং গাছের লম্বা ছায়া রাতের আগমন ঘোষণা করছে। য়্যাডেলা ভাবছিল ওদের প্রাপ্যটুকু বুঝে নেওয়া দরকার। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল সে এবং অবাঞ্ছিত আলোচনার সূত্রপাত করতে চাইলো। সে বললো, 'রনী ! আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে একটা খোলাখুলি আলোচনা হওয়া দরকার।'

রনী আগে থেকেই লজ্জিত ছিল। বললো, 'আমার ব্যবহারের জন্যে আমি লজ্জিত মিস কোয়েস্টেড। আপনাকে বা মাকে কোনরকম আদেশ করতে চাই নি আমি। তবে আজ সকালে বাঙালীরা যেভাবে আপনাদের হেনস্থা করেছে তার জন্যে আমার মাথা ঠিক ছিল না। ভবিষ্যতে যাতে এরকম না হয় তাই সাবধান করতে চেয়েছিলুম।'

'কিন্তু তার সঙ্গে তো এর কোন সম্পর্ক নেই ?'

'তা নেই। তবে আজিজও সব কিছু গুলিয়ে ফেলতে পারে। গুহাগুলো সম্বন্ধে ওর কোন স্পষ্ট ধারণা আছে বলে মনে হলো না। মজা করতেই ওখানে সবাইকে নিয়ে যাচ্ছে।'

পায়ের কাছে মরা ঘাসগুলোর দিকে চেয়েছিল য়্যাডেলা। সেইভাবেই বললো, 'কিন্তু আপনার সঙ্গে যে বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চাইছি তা আলাদা। তার সঙ্গে কেভ্‌স্‌ দেখতে যাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই।'

'তবে ?' বিস্মিত রনী য়্যাডেলার দিকে তাকাল।

'আমি ভেবে দেখলুম আমাদের বিয়ে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।'

রনী স্তম্ভিত। আজিজের কথাটা মনে পড়ে গেল। এইরকমই একটা ইঙ্গিত যেন তার কথায় ছিল। কিন্তু কথাটার তেমন মূল্য সে দেয় নি। সে ভাবতেও

পারে না যে দুজন রাজপুরুষের মধ্যে দূতির কাজ করবে একজন ভরতীয়। এখন য়্যাডেলার কথা শুনে তার মনে দারুণ ক্ষোভ হলো। যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে রনী বললো, 'কিন্তু আমাদের যে বিয়ে হবেই এমন কথা তো আপনি দেন নি? কোন বাঁধাবাঁধিও নেই। তাহলে অযথা দুশ্চিন্তা করছেন কেন?'

রনীর নিরুত্তাপ কথাগুলো চুপ করে শুনছিল য়্যাডেলা। মনে দারুণ তোলপাড় হচ্ছে। মানুষটা যে এত ভদ্র এত সজ্জন তা সে জানতো না। চাপ দিয়ে অনায়াসে বিয়ের কথাটা সে আদায় করে নিতে পারতো। কিন্তু রনী তা করলো না। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে একটা যে পবিত্রতা আছে রনী তার মূল্য দিয়েছে। যতদূর মনে পড়ে তাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় রনীর চরিত্রের এই দিকটাই তার নজরে পড়ে। ইংল্যান্ডের লেক অঞ্চলের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের প্রথম আলাপ। প্রথম দর্শনেই য়্যাডেলা মুগ্ধ হয়েছিল। সেই থেকে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু আজ কেন এটা একটা সমস্যা তাদের মধ্যে? কেন গলায় কাঁটা হয়ে লেগে আছে এটা? অন্তত এই অবস্থাটা দীর্ঘস্থায়ী হলে তাদের জীবন যে দুর্বিষহ হয়ে উঠবে তা সে বুঝতে পারছিল। তাই মনটা তৈরি করে নিতে চায় সে। রনীকে যে সে বিয়ে করতে পারে না একথাটা স্পষ্ট করে বলার সময় হয়েছে। সেই পুরোনো রোমান্টিক স্বপ্নের দিনগুলো আর নেই। তবুও সরাসরি রনীকে প্রত্যাখ্যান করতে তার বাধছিল। য়্যাডেলা বললো. 'দুশ্চিন্তার কথা নয় রনী। তবে নিজেদের মধ্যে বোঝাবুঝিটা ঠিক না হলে আমরা নিশ্চয়ই ভুল করে বসবো। সেটা অভিপ্রেত নয়। তাই আমার সম্বন্ধে আপনি কি ভাবছেন তা জেনে রাখা ভালো। তাতে দুজনেরই সুবিধে।'

রনীকে ভীষণ অসুখী দেখাচ্ছে। একটু যেন বিষণ্ণও। কিন্তু মনের ভাব গোপন করে সে বললো, 'থাক মিস কোয়েস্টেড! এ নিয়ে আলোচনা আর না-ই বা হলো! তাছাড়া সামনেই মহরম। কাজের চাপও অত্যন্ত বেশি। এসব নিয়ে ভাবতেই পারছি না আমি।'

'আমি কিন্তু ব্যাপারটা সহজ করতেই চাইছিলুম মিস্টার হীস্‌লপ্‌। আমার সম্বন্ধে যা খুশি প্রশ্ন করুন আমি জবাব দেব।'

রনী হীস্‌লপ্‌ তেমনি নির্বিকার। বললো, 'কিন্তু আমার তো কোন প্রশ্ন নেই! আপনি যা করেছেন তা করার অধিকার আপনার আছে। আমি মানুষটা কেমন, কি কাজ করি, দায়িত্ব পালন করি কি না—এসব নিজের চোখে দেখে মনস্থির করেছেন। ভালো। খুব ভালো। তাই নতুন করে ভাবনার কিছু নেই। তাতে মনে শুধু বাষ্পই জমা হবে।'

রনীকে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ দেখালেও য়্যাডেলার ওপর সে রাগ করতে পারলো না। ইংরেজদের এটাই বৈশিষ্ট্য। স্বজাতিদের সম্পর্কে তারা সহজে অনুদার হয় না।

একটা গাছের তলায় বসে ওরা কথা বলছিল। গাছের মগ্‌ ডালে বসে একটা ছোট্ট সবুজ রঙের পাখি। পাখিটা নিবিষ্ট মনে য়্যাডেলাকে দেখছে। ওপর

দিকে চাইতেই পাখিটার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল য়্যাডেলার। ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল য়্যাডেলা। খানিক পরে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে রনীর দিকে তাকাল। বললো, 'তা ঠিক। নতুন করে ভাববার কিছু নেই। তবে 'আমার যেটা খারাপ লাগছে তা হলো আমার জন্যে আপনাদের দুর্ভোগ। বিশেষ আপ-নার মা আমার জন্যে অনেক উপদ্রব সয়েছেন।'

য়্যাডেলা আবার পাখিটার দিকে তাকাল। অদ্ভুত সুন্দর আর উজ্জ্বল দেখতে পাখিটা। মনে হয় সবে নীড় থেকে এসেছে আবার এখুনি বাসায় ফিরে যাবে। য়্যাডেলা তাকাতেই পাখিটা তার চোখদুটো বুজে ফেললো আর ছোট্ট একটা লাফ দিল। কোন নাম না জানা বনের পাখি হয়ত। রনীর দিকে ফের তাকাল য়্যাডেলা। বললো, 'হ্যাঁ। সত্যিই কিছু করার নেই আমাদের। কারণ, আমরা সবাই ভীষণ রকমের ব্রিটিশ। তাই সংকটের সময়েও উদাসীন হয়ে যাই।'

'উদাসীন হলেই বা ক্ষতি কি? আমরাও তো তাই ...।'

'হয়ত তাই। তবে যা চাই তা নিশ্চয়ই ঝগড়া করে নয়?'

না। না। ঝগড়া কেন করবো? তাতে নিজেরাই ছোট হয়ে যাব যে!'

'অর্থাৎ আমরা তাহলে বন্ধুই থাকছি!' জিজ্ঞেস করলো য়্যাডেলা।

'নিশ্চয়ই! আমি অন্তত সেইরকমই মনে করি।'

'আমিও।' রনীর চোখে চোখ রেখে বললো য়্যাডেলা।

একটা খোঁচায় ওদের এতদিনের সম্পর্কটা কেমন অনায়াসে ভেঙে গেল যেন। তবে দেনাপাওনার সম্পর্কটা মিটে যাওয়ায় মনের দিক থেকে ওরা এখন অনেক সহজ। শুধু তাই নয়। দুজনেই যেন দুজনের জন্যে নতুন করে ভাবতে শিখলো। নিজেদের মনের সঙ্গেও আর কোন তঞ্চকতা নেই। পরিপূর্ণ ভাবে নিজেদের মেলে ধরেছে ওরা। ওরা বুঝলো ওরা দুজনে যেন আলাদা একটা জগৎ তৈরি করেছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সমাজ থেকে। ওরা ছাড়া আর কেউ নেই এই জগতে। যাদের সঙ্গে নিত্য ঘর করছে তারাও আলাদা হয়ে গেছে। অথচ বন্ধুত্ব ছাড়া আর তো কোন সম্পর্ক নেই! বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী এই-ই তো তাদের পরিচয় এখন!

এইসব ভাবতে ভাবতে য়্যাডেলা যে কখন রনীর কাছে সরে এসেছে জানতে পারে নি। হঠাৎ পাখিটার দিকে চোখ পড়ল তার। আবার সেটা ফিরে এসেছে। গাছের ডালে বসেছে। উৎফুল্ল হয়ে উঠলো য়্যাডেলা। তার ভারমুক্ত মনটা এখন বাতাসের চেয়েও লঘু।

য়্যাডেলা বললো, 'ওই সবুজ পাখিটা চেনেন? কি নাম ওটার?'

হবে কোন বী-ইটার।'

'উহুঁ। ওভাবে বললে হবে না। ওর ডানায় লাল ডোরা আছে দেখেছেন?'

'তাহলে কাকাতুয়া। টিয়া বা চন্দনাও হতে পারে।'

'হলো না।' মধুর ভঙ্গি করে বললো য়্যাডেলা।

ততক্ষণে পাখিটা ফের বাসায় উড়ে গেছে। দরকার না হলেও পাখিটার নাম-ধাম পরিচয় জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের। অন্তত একটা সান্ত্বনা পেত ওরা।

কিন্তু তা হলো না। ভারতবর্ষের কোন কিছুই যেন স্পষ্ট নয়। সবটাই দুর্বোধ্য রহস্যময়। কেউ জানেও না কোন্‌টার কী সঠিক পরিচয়। প্রশ্ন করলেও সদুত্তর পাওয়া যায় না। তাই কোন রহস্যেরও উন্মোচন হয় না। য়্যাডেলার কৌতূহল মিটলো না। রনী তাই বিষণ্ণ বোধ করছিল। শেষমেষ বললো, 'ম্যাকব্রাইডের কাছে একটা দারুণ পাখির বই আছে। অজস্র পাখির ছবি। দেখতে দেখতে বেশ চেনা হয়ে যায়। ম্যাকব্রাইডও তাই অনেক পাখি চেনে। আমার এসব কোন জ্ঞান নেই। সত্যি কথা কি কাজের বাইরের জগতের কোন খবরই আমি রাখি না। লজ্জার ব্যাপার বই কি!'

'আমারও সেই অবস্থা। সব ব্যাপারেই অযোগ্য।'

বোধহয় কাছাকাছিই ছিলেন নবাব বাহাদুর। য়্যাডেলার আক্ষেপটা তিনি শুনেছেন। চেঁচিয়ে বললেন, 'সেকি কথা ? একজন ইংরেজ মহিলা অযোগ্য ? না না। তা কখনও হতে পারে না।' হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ নবাব। এক মুখ প্রসন্ন হাসি। আশ্চর্য অমায়িক ভদ্রলোক।

রনীও আন্তরিক স্বরে বললো, 'আরে! নবাব বাহাদুর যে ? আবার পোলো খেলা দেখলেন ?'

'দেখলাম।'

নবাব বাহাদুর আসার আগে পর্যন্ত একটা মগ্নতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল দুজনে। ভদ্রলোককে দেখে সেই ভাবটা কাটিয়ে উঠলো ওরা। য়্যাডেলা তাড়াতাড়ি করমর্দনের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'কেমন আছেন নবাব বাহাদুর ?'

অবাক হলেও নবাব তা প্রকাশ করলেন না। সবে এদেশে এসেছে মেয়েটা। স্বভাবে এখনও সেই বেপরোয়া ভাব। চট করে এদেশের মানুষদের তো ছোট করতে পারে না। যে সব মেয়েদের ঘোমটা থাকে না তাদের সম্বন্ধে তাঁর অনেক কৌতূহল। অবশ্য কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা তিনি করেন না। তাঁর মনে হয় এসব মেয়েরা প্রায় পুরুষদের মতন নির্লজ্জ হয়। তবে এটা তাঁর একান্তই নিজস্ব মনোভাব। তাই বেমানান ঠেকলেও ঢোঁক গিলে যান। এই যেমন এদের বর্তমান অবস্থাটা। কেমন ঘন হয়ে বসে আছে দুজনে। খুব কি দৃষ্টিকটু লাগছে তাঁর ? বরং মনে হলো তাঁর ছোট্ট গাড়িটা এই প্রেমিক যুগলের জন্যে যদি ছেড়ে দেন তবে কেমন হয়! অবশ্য রনী হীস্‌লপ্‌ যদি রাজী হয়।

নবাব বাহাদুর প্রস্তাবটা দিতে রনী খুব একটা আপত্তি করলো না। একটু আগেই আজিজ এবং গড়বোলের সঙ্গে অসৈরণ ব্যবহার করেছে। সেই অভাবটা পুষিয়ে নিতে চাইল রনী। সে প্রমাণ করে দেখাবে যে যোগ্যতা থাকলে সব ভরতীয়কেই মর্যাদা দিতে সে জানে। এই ভেবেই য়্যাডেলাকে বললো, 'আধঘণ্টাখানেকের জন্যে চলুন না একটু ঘুরে আসি ? জায়গাটা একটু ঘুরে দেখবেন ?'

'সেকি ? বাংলোয় আমরা এখন ফিরবো না ?'

'কেন ? এখুনি ফিরতে হবে ?' একটু অবাক হয়ে তাকাল রনী।

'ভাবছি আপনার মার সঙ্গে কথা বলে কি করবো ঠিক করে নিই।'
'এখুনি তা করতে চান ? ঠিক্ আছে !'
নবাব বাহাদুর সমস্যাটা সমাধান করে দিলেন। গাড়ির দিকে যেতে যেতে বললেন, 'আমরা বাংলোতেই ফিরবো। তবে তার আগে জায়গাটা একটু ঘুরে যাব।'
বৃদ্ধের সমর্থনে রনী বললো, 'জায়গাটা আমার চেয়ে উনি ভালো করে চেনেন। তাই দ্রষ্টব্য যা তা উনি দেখালেই ভালো হয়। তাছাড়া আপনারও একটু ঘোরা হবে। খুবই অভিজাত এবং বিশ্বাসভাজন মানুষ উনি।'
য়্যাডেলা রাজি হলো। সে ঠিক করে নিয়েছে রনীকে আর অকারণ কষ্ট দেবে না। তবে ইতিমধ্যে দেশ দেখার আগ্রহ তার অনেক কমে গেছে। কৃত্রিমতা ঢুকে গেছে ব্যাপারটার মধ্যে।
সমস্যা দেখা দিল গাড়িতে বসা নিয়ে। এবং নবাব বাহাদুর নিজেই তা সমাধান করে দিলেন। পিছনের সীটে বসলো রনী, পাশে য়্যাডেলা। নবাব নিজে বসলেন শোফারের পাশে। শিষ্টাচার বহির্ভূত হলেও সামনে বসাই উচিত মনে করলেন নবাব বাহাদুর। তবে কৈফিয়ৎ একটা দিতে হয়। তাই শোফারের পাশে বসেই বললেন, 'শোফারের পাশে বসে গাড়ি চালানো শিখছি। বয়সটা বেশি হয়ে গেছে বটে, তবে মানুষ যে কোন বয়সে যা খুশি শিখতে পারে। অবশ্য আমি নিজে স্টীয়ারিং ধরি না। শোফারকে প্রশ্ন করে সব জেনে নিই। সে কি করছে, কেন করছে তা আগেভাগে জানতে পারি। এই পদ্ধতিতে শিখলে দুর্ঘটনা এড়ান যায়। অন্তত আপনাদের ক্লাবে গিয়ে ডাক্তার পান্নালাল যে কাণ্ডটি করে বসেছিল, তেমনটি আমি করবো না।' এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে একটু দম নিলেন নবাব বাহাদুর। তারপর রনীর দিকে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা স্যার ! ক্লাবের অমন সুন্দর বাগানটা কি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে ?' রনী উত্তর দিল না। নবাব বাহাদুর তখন শোফারকে বললেন, 'গঙ্গাবতী রোড ধরে চলো।' একটু পরেই তাঁর নাক ডাকতে শুরু করলো।
গঙ্গাবতী রোড মেরামত হচ্ছে। রনী তাই মাড়াবার রোড ধরে শোফারকে গাড়ি চালাতে বললো। স্টার্ট দিতেই একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ তুলে ছুটতে লাগলো গাড়ি। রাস্তার দুধারে খুবই খেলো জাতের গাছ। অনাদরে বেড়ে উঠেছে তারা। বিষণ্ণ হয়ে পড়ে আছে শুকনো রুক্ষ মাঠ এবং গ্রামাঞ্চল। এর আয়তন এত বিশাল যে একে সুন্দর করে রাখা যায় না। এখানকার প্রতিটি বস্তুই যেন নিষ্ফল প্রয়াসে পথচারীকে ডেকে বলছে, 'এসো, আমায় দেখো !' য়্যাডেলার পাশেই বসেছে রনী। ফিসফিস করে কথা বলছে ওরা। একটু পরেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল। মনে হচ্ছিল মাঠের বুক থেকে চাপ চাপ অন্ধকার বেরিয়ে এসে আশপাশ ঢেকে ফেলছে। অন্ধকারে রনীর মুখখানাও অস্পষ্ট হয়ে গেল। রনীর এই অস্পষ্ট রূপটাই য়্যাডেলার ভালো লাগছে। এই সময় গাড়ির ঝাঁকুনিতে য়্যাডেলার সঙ্গে রনীর হাতের ছোঁয়া লাগলো। যেন বিদ্যুৎ শিহরণ। আচমকা এই শিহরণে দুজনের মনেই যেন তীব্র সম্ভোগ

বাসনা জেগে উঠলো। মনে মনে দুজনেই তখন একমত ; তাদের মধ্যে যে সংশয় ছিল তা ভেসে গেছে এই ছোঁয়াছুঁয়িতে। দেহজ মিলনের ক্ষেত্রে মনের কোন ভূমিকা থাকে না। দুজনের কেউ হাত সরিয়ে নিল না। আরও চেপে ধরলো দুজনের হাত দুজনে। তারা জানতো না এই মিলনাকাঙ্ক্ষা বড় ক্ষণিক. বড় প্রবঞ্চনাময়। এই আছে এই নেই। জোনাকির অঙ্গপ্রভার মতন ক্ষণ স্থায়ী। রাত্রিও প্রবঞ্চনাময়। দিনের আলোয় এই ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হবে। রাত্রির তপস্যা বয়ে আনবে দিন এবং আকাশ মেদিনী ভেদ করে সেই চিরন্তন আলোর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হবে রাত্রির অন্ধকার।

হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল গাড়িটা। দুজনের বদ্ধ মুষ্ঠি আরও দৃঢ় হলো। গাড়িটা তখন মাটি থেকে লাফিয়ে উঠেছে এবং একদিকে কাত হয়ে পড়েছে। দুটো চাকাই শূন্যে ঝুলন্ত। কিন্তু গাড়িটা তখনও গড়াচ্ছে। সেই গড়ানো অবস্থাতেই রাস্তার ধারের একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেল। তারপরেই স্থির হয়ে গেল গাড়িটা। একটা ছোটখাট য়্যাকসিডেণ্ট। তবে কেউ আহত হয় নি। শুধু নবাব সাহেবের ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আঁতকে উঠলেন তিনি। আরবীতে একটা কি যেন বলেও উঠলেন।

মুহূর্তের জন্যে রনীও থমকে গিয়েছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আত্মসচেতন হয়ে অবস্থাটা বুঝে ফেললো। ব্যগ্র হয়ে প্রথমেই খোঁজ নিল কেউ আহত হয়েছে কিনা। ফিরিঙ্গি ড্রাইভারটা আচমকা এই ঘটনায় একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু রনীর গলার আওয়াজ শুনে সচেতন হলো। তারও গায়ে খাঁটি ইংরেজের রক্ত। সুতরাং কর্মতৎপরতা প্রমাণ করতে সে বলে উঠলো 'পাঁচ মিনিট সময় দিন স্যার। যেখানে বলবেন নিয়ে যাব।'

তখনও রনীর হাতের মধ্যে ম্যাডেলার হাত ধরা। ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে খুব অন্তরঙ্গভাবে রনী বললো, 'ভয় পেয়েছ ?' অন্তরঙ্গতায় একধাপ আরও এগিয়ে গেছে সে। আপনি থেকে তুমিতে নেবে এসেছে রনী।

ম্যাডেলা আশ্বস্ত করলো। বললো, 'মোটেই না।'

নবাব বাহাদুর অবাক। 'বলেন কি ম্যাডাম ? ভয় পান নি ? ভয়ের কারণ হলে ভয় না পাওয়া সুবুদ্ধির লক্ষণ নয় কিন্তু।'

রনী অধৈর্য স্বরে বললো 'ওসব কথা থাক। যা হবার তা তো হয়ে গেছে। আমাদের অনেক সৌভাগ্য যে গাছটা ওখানে ছিল। নইলে যে কি হতো ?'

'ঠিক কথা। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন ভেবে কি লাভ ? বরং আনন্দ করা যাক। ধূমপান করি আসুন। কিংবা যা খুশি তাই। ওঃ! কি দারুণ বেঁচেছি! আল্লা পরম করুণাময়!'

'ব্রিজে উঠতে গিয়ে পিছলে গিয়ে এই দুর্ঘটনাটা হয়েছে।' রনী বললো।

'উঁহু!' ম্যাডেলা মাথা নাড়লো। দুর্ঘটনার সবটুকু তার চোখের সামনেই হয়েছে। অন্ধকার হলেও সে দেখেছে ঘটনাটা। তার ধারণা অন্যরাও তা দেখেছে। রনী তাকিয়েছিল ম্যাডেলার দিকে। ম্যাডেলা বললো, 'একটা বড়-সড় জানোয়ারের সঙ্গে ধাক্কা লাগার দরুনই আমাদের গাড়িটা একদিকে কাত হয়ে যায়।'

য়্যাডেলার কথা শুনে কেমন যেন থিতিয়ে গেলেন নবাব বাহাদুর। বিদ্‌ঘুটে রকমের চিৎকার করে উঠলেন আতঙ্কে। বললেন, 'বলেন কি ? জানোয়ারের সঙ্গে ধাক্কা ?'

'তাই তো দেখলুম ! একটা বড়সড় জন্তু অন্ধকার থেকে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের ডান দিকে।'

রনীরও সেইরকম অনুমান। ডানদিকের দরজার কাছে খানিকটা জায়গা রং চটা। সেখানটা দেখিয়ে রনী চেঁচিয়ে উঠলো। বললো, 'ঠিক বলেছ য়্যাডেলা। এই দেখো এখানকার রঙ চটে গেছে।'

ফিরিঙ্গি ড্রাইভারও সমর্থন করলো য়্যাডেলাকে। ডানদিকের দরজার কব্জার ঠিক তলাতেই খানিকটা জায়গা টোল খাওয়া। বেশ জোর দিয়ে দরজাটা খুলতে হচ্ছে। য়্যাডেলা বললো, 'আমি ঠিক দেখেছি। বড়বড় লোমওলা একটা জন্তু।'

'কি জন্তু বুঝতে পারলে ?'

ঘাড় নাড়লো য়্যাডেলা। বললো, 'এদেশের জীবজন্তু সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। যেমন পাখি চিনি না, তেমনি জন্তু-জানোয়ারও চিনি না। তবে বেশ বড়সড় আকারের জানোয়ার। ছাগল-টাগলের চেয়েও বড়।'

'ছাগলের চেয়েও বড় ?'

নবাব বাহাদুরের বিস্ময় অনুসরণ করে রনী বললো, 'আসুন না, একটু খুঁজে দেখি !'

'চলুন। টর্চটা নিয়ে আসি তাহলে।'

সবাই মিলে দলবেঁধে পেছনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দুর্ঘটনার জন্যে রনী বা য়্যাডেলা একটুও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নয়। বরং উত্তেজনার দরুন বেশ চনমনে দেখাচ্ছিল ওদের। টর্চের আলোয় গাড়ির চাকার দাগ দেখতে দেখতে ওরা যেখানে এসে পৌঁছল, তার ঠিক আগেই একটা ছোট্ট সাঁকো। সাঁকোর নিচেই একটা নালা। দেখে শুনে মনে হয় জানোয়ারটা বোধহয় নালার ধার থেকেই উঠে এসেছে। রাস্তার বুকে টায়ারের চৌকো দাগ এত নিপুণ এত মসৃণ যে মনে হয় এই অব্দি গাড়িটা ঠিকমতন গড়িয়ে এসেছে। এর পরেই রাস্তার গায়ে ধস্তাধস্তির চিহ্ন। সেখানে টায়ারের দাগ নেই। যেন কোন ভারি বস্তুর চাপে দাগগুলো মুছে গেছে। টর্চের আলো ফেলেও বোঝা যাচ্ছিল না ভারি বস্তুটি কি হতে পারে। উত্তেজনায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো য়্যাডেলা। তার স্কার্টের ঝালর রাস্তার ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে রনী। ওদের মনেই নেই খানিক আগের তিক্ত সম্পর্কের কথা। উত্তেজনায় আরও কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। য়্যাডেলা হঠাৎ বলে উঠলো, 'আমার মনে হয় এটা একটা মোষ।'

'মোষ ?'

'যদি হায়না না হয়।' বললো য়্যাডেলা।

রনীরও তাই ধারণা। হয়ত শিকার ধরার জন্যে নালার ধারে লুকিয়ে ছিল হায়নাটা। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় রাস্তার ওপর

উঠে এসেছে।
হায়নার কথাটা নবাব বাহাদুরের মনঃপূত হলো না। থমথম করছে অন্ধকার রাত। সেদিকে চেয়ে বললেন, 'বাঃ! চমৎকার যোগাযোগ! একে অন্ধকার রাত তায় হায়না! হঠাৎ হেঁকে উঠলেন নবাব বাহাদুর। 'হ্যারিস? তোমার হলো?'
'আর একটু। দশমিনিট সময় দিন আর।' বললো হ্যারিস।
'তুমি শুনেছ তো? সাহেবরা বলছেন জন্তুটা একটা হায়না।'
'আহা; ওকে ঘাবড়ে দেবেন না। তুমি কাজ করো হ্যারিস! বললো রনী। তারপর নবাব বাহাদুরের দিকে চেয়ে ফের বললো, 'ও কিন্তু আমাদের খুব বাঁচিয়েছে। নইলে একটা বিচ্ছিরি য়্যাক্‌সিডেন্ট হতো।' /
'তার জন্যে হ্যারিসই দায়ী। আমার কথা শুনে ও যদি গঙ্গাবতী রোড ধরে যেত তাহলে এই য়্যাক্‌সিডেন্ট হতো না।' নবাব কথাটা বললেন বেশ রূঢ় স্বরে।
'সেটা আমার দোষ, ওর নয়। আমিই ওকে মাড়াবার রোড ধরে যেতে বলেছি। মিস্টার লেস্‌লী পাহাড় অব্দি রাস্তাটা পাকা করে দিয়েছেন।' বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে রনী জবাবটা দিল। নবাব বাহাদুর দারুণ অপ্রস্তুত। ততক্ষণে তাঁর স্বর নরম হয়ে গেছে। মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গিতে মুখখানা রীতিমত করুণ করে তুললেন তিনি। এই উপরিটুকু রনীরই পাওনা। সে শুধু অপেক্ষা করছিল। ইংরেজ চরিত্রের বিশেষত্ব হলো বিপদের সময় শান্ত থাকা। কিন্তু তারা অন্যের অবহেলার পাত্র নয়। উপযুক্ত মর্যাদা না দিলে তাদের সম্মানহানি হয়। তারা যে খেলো মানুষ নয়, নবাব বাহাদুর হয়ত তা জানতেন না তাই রাজপুরুষ রনী সেটা পুষিয়ে নিল।
তখন উল্টো দিক থেকে একটা বড়সড় গাড়ি আসছিল ওদের দিকে। হাঁকডাক করে গাড়িটা কোনরকমে থামাল রনী। গাড়ির বনেটের গায়ে লেখা, 'মুদ্‌কুল স্টেট'। গাড়ির ভেতরে বসেছিল আহ্লাদী ডেরেক। মজাদার আমুদে মেয়ে ডেরেক। গাড়ি থামতেই মুখ বাড়িয়ে ডেরেক বললো, 'কি ব্যাপার মিস্টার হীস্‌লপ্? ও মিস কোয়েস্টেডও আছেন দেখছি। এই অবলা নারীর পথ-রোধ কেন করলেন ভাই?'
'যন্ত্রবিকল হয়ে আমাদের রথ এখন পাহাড়ের মতন অচল হয়ে গেছে।'
'তা এই পচা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন কেন?'
'একটা হায়না চাপা দিয়ে গাড়িটা বিকল হয়ে গেছে।'
'ইস! কি বিচ্ছিরি ব্যাপার!'
'আমাদের একটা লিফ্‌ট্‌ দিতে হবে। দেবেন তো?'
'হ্যাঁ। দিতেই হবে।'
'আমাকেও।' বললেন নবাব বাহাদুর।
'আর আমি?' প্রায় ককিয়ে উঠল হ্যারিস।
ডেরেক ফোঁস করে উঠলো। চোখমুখ নেড়ে বেশ ভারিক্কি গলায় বললো, 'মানেটা কি? এটা কি বাস? আমার সঙ্গে একটা হারমনিয়ম আর দুটো

কুকুর আছে। মোট তিনজনের জায়গা হতে পারে আমার গাড়িতে। দুজন পেছনে আর কুকুর কোলে নিয়ে একজন সামনে বসতে পারে। এর বেশি একজনও নয়।'

'আমি সামনে বসছি।' বললেন নবাব বাহাদুর।

'তাহলে উঠে পড়ুন। আপনাকে অবশ্য আমি চিনি না।'

শোফার হ্যারিস এই সময় প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তার আধা-ইংরেজ কাণ্ড-জ্ঞান ততক্ষণে তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। কুলীন না হোক, একেবারে ব্রাত্যজনও সে নয়। সেটুকু বোঝাতেই বেশ চড়া গলায় সে বললো, 'আমি কি সারা রাত উপোস করে এখানে পড়ে থাকবো ? অসম্ভব !' অন্ধকার হয়ে গেলেও হ্যারিসের মাথায় তখনও টুপি। মুখখানা আত্মম্ভরিতায় মাখানো। যদিও দম্ভক্ষয় ছাড়া রাজপুরুষের আর কোন গুণ সে আয়ত্ত করতে পারে নি, তবুও তার রাজ-পুরুষোচিত মর্যাদাবোধ যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছিল। মুখে সে যাই-ই বলুক মনে মনে হ্যারিস তখন বেজায় অসহায়। মনের সেই করুণ ভাবটি ভাষায় বললে অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়। 'ওগো, আমায় এমন সংকটের মধ্যে ফেলে যেও না। আমি তোমাদেরই লোক। অবস্থার ফেরে এই বর্বর অসভ্য ভারতবর্ষে পড়ে আছি বটে, কিন্তু ভালো জায়গায় বসিয়ে দেবার দায়িত্ব তোমাদেরই।' বলাবাহুল্য তার মনের এই ব্যথা কোন রাজপুরুষই শুনতে পেল না। তারা ফিরেও দেখলো না ফিরিঙ্গি হ্যারিসের দিকে। শুধু নবাব বাহাদুরই কিছুটা আশ্বস্ত করতে পারলেন তাকে। তাঁর মনে পড়ে গেল যে হ্যারিস তাঁরই বেতনভুক কর্মচারী। এক্ষেত্রে তাঁরও কিছু কর্তব্যকর্ম আছে। অত-এব বেশ মালিকসুলভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে নবাব বাহাদুর হ্যারিসকে বললেন, 'শোনো হ্যারিস, তোমার খাবার পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি শুধু গাড়িটা সারিয়ে রেখো।'

ডেরেকের গাড়ি হুস করে চলে গেল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে থাকলো হ্যারিস, তারপর মাটির ওপর থেবড়ে বসে সঙ্গে আনা শুওরের মাংস চিবোতে লাগলো। যতক্ষণ এরা ছিল ততক্ষণ সে ছিল আধখানা ইং-রেজ আর আধখানা ভারতীয়। ঠিক কোন্ দলের সে তা জানতো না। এরা চলে যেতেই করুণ হয়ে উঠলো তার অবস্থা। এখন সে বুঝতে পেরেছে না ঘরকা না ঘাটকা তার অবস্থা। কোন দলই তাকে নিজের লোক বলবে না। শুধু নিজের কাছেই সে আপন। তাকে বাঁচতে হবে নিজের জোরেই।

গাড়ির ভেতরে ডেরেকের তখন উচ্ছ্বসিত ভাব। খোশ মেজাজে মুদ্কুল স্টেট থেকে গাড়ি চুরির বর্ণনা দিচ্ছে। ড্রাইভার সমেত গাড়িখানা সে বার করে এনেছে স্টেট থেকে। মহারাজা যখন তা জানতে পারবে, তখন তার মুখখানা কেমন দেখাবে সেই নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করছিল ডেরেক। তার চাকরিও চলে যেতে পারে। তবে অতটা এগোবার সাহস এদের নেই। তাছাড়া জোর করে না নিলে এরা হাত তুলে কাউকে কিছু দেবেও না। লোকটার নিজের জন্যে গাড়ির কি দরকার ? বরং চন্দ্রপুরের কোন মানুষ যদি মুদ্কুল স্টেটের গাড়িতে ডেরেককে ঘুরে বেড়াতে দেখে তাহলে তাতে স্টেটের মর্যাদা

বাড়বে। মহারানী অবশ্য বেশ ভালমানুষ। কুকুর টুকুর নিয়ে নির্বিবাদে আছেন। 'এই টেরীয়ার দুটো তো ওঁরই। ওদের নিয়েই সরে পড়েছি। বুঝুন মিস্টার হীস্‌লপ্‌! রাজ্যপ্রধানদের অধিবেশনে প্রতিনিধি হয়ে এরা যোগ দিতে চলেছে। যোগ্যতা আছে বলেই তো যাচ্ছে!' কথাটা বলে হাসিতে ফেটে পড়লো ডেরেক। কিন্তু হারমনিয়মটা? ওটার কি প্রয়োজন? না। কোনই প্রয়োজন নেই। এটা তারই ভুল। 'ওটাকে ট্রেনে তুলে দিতে পারতাম। সেইরকমই ভেবো

রনীও হাসছিল, তবে যথাসম্ভব সংযত হয়ে। নেটীভ স্টেটের অধীনে কোন ইংরেজের গোলামি করাটা তার একদম পছন্দ নয়। হয়ত রাজাউজিরদের কাছে চাকুরেদের ব্যক্তিগত পসার প্রতিপত্তি বাড়ে, কিন্তু ষোলআনা আত্ম-সম্মান বিলিয়ে দিতে হয়। এই মজার খেলায় ডেরেকের মতন যে মেয়েরা সবসময়ই জিতবে তাতে কোন সন্দেহই নেই। তবে সবাই তো ডেরেকের মতন হয় না! ডেরেকও তা স্বীকার করলো। বললো, 'এই সব রাজাউজিররা যখনই জানতে পারে যে ওরা হেরে যাচ্ছে তখনই আমাদের চাকরি যায়। কিন্তু সে ঘটনা ঘটার আগেই আমরা আর একটা স্টেটে চাকরি পেয়ে যাই। কারণ, সারা ভারতবর্ষ জুড়েই রানী বা বেগমসাহেবার দল এবং তাদের দরবারে আমাদেরও খুব খাতির।'

'তাই না কি? আমার কোন ধারণাই নেই।' বললো রনী।

'কি করে ধারণা হবে?' রনীর দিকে তাকিয়ে বললো ডেরেক। তারপর য়্যাডেলার দিকে চেয়ে বললো, 'মহারানী বা বেগমদের সম্বন্ধে এরা কতটুকু জানে? আমার ধারণা কিছুই জানে না এরা।'

ডেরেকের কথা বলার ধরনটা একটুও ভালো লাগছিল না য়্যাডেলার। তবুও শুনতে হচ্ছে। তার বিশ্বাস রনীরও ভালো লাগছে না। অন্ধকার গাড়ির মধ্যে হাত ধরাধরি করে বসে আছে ওরা দুজনে। রনী মৃদু চাপ দিল য়্যাডেলার হাতে। আদিম দেহজ কামনায় শিহরিত হলো দুটো দেহ। য়্যাডেলা বললো, 'যাই বলুন ডেরেক, এরা এমন কিছু বড় মাপের মানুষ নয় যে এদের সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ দেখাতেই হবে।'

ডেরেক প্রতিবাদ করলো। বললো, 'কে বললে এরা বড় মাপের মানুষ নয়? শুধু বড় নয়, এরা রীতিমত দামী মানুষ। যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি এদের।'

এতক্ষণ ড্রাইভারের পাশে বিচ্ছিন্ন বসে ছিলেন নবাব বাহাদুর। কথা বলার সুযোগ পান নি। এরা তাঁকে একঘরে করে রেখেছে। এবার আর চুপ করে রইলেন না। সামনের সীট থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'মিস কোয়েস্টেড ভুল বলেন নি। সত্যিই তো! এইসব নেটীভ স্টেটের মহারানীদের সম্বন্ধে আমা-দের কিসের আগ্রহ? কোন হিন্দু রানীর কথা ধরুন। দেখতে ভালো। সারাদিন পটের বিবি সেজে বসে থাকেন। হয়ত লোকের সঙ্গে ব্যবহারও ভালো। কিন্তু ওই অব্দি। লেখাপড়ার বালাই নেই। শিক্ষা সংস্কৃতির ধার ধারেন না। মাপ করবেন মুদ্‌কুল স্টেটের মহারানী সম্বন্ধে কোন কটাক্ষ

করছি না। তবে আমার আশঙ্কা তিনিও অন্যদের মতন। লেখাপড়া শিক্ষা-দীক্ষা নেই। ফলে কুসংস্কারও বেশি। ভারতের বেশিরভাগ মানুষই এই-ভাবে অন্ধকারে ডুবে আছে। আর এটাই আমাদের চরিত্রের সব থেকে বড় ব্যাধি।'

নবাব বাহাদুর যখন কুসংস্কারের কথা বলছিলেন তখনই সবাই চন্দ্রপুর স্টেশনের ঝলমলে আলোগুলো দেখতে পেল। চন্দ্রপুর এসে গেছে। আলো দেখে উৎসাহিত হয়ে পড়লেন নবাব বাহাদুর। তাঁর মনে হলো এই ইঙ্গিতটা বিশেষ অর্থবহ। যেন বলতে চাইছে মনের অন্ধকার দূর করো। এই হোক আমাদের লক্ষ্য। মুদ্‌কুল স্টেট সম্বন্ধে তাঁর সঠিক কোন ধারণা নেই। শোনা যায় স্টেটটার আর্থিক প্রতিপত্তি আছে। এগারোটা কামান আছে মহারাজার। কিন্তু হলফ্ করে একথা বলা যায় যে স্টেটের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার চল নেই। ব্রিটিশ উপনিবেশের সঙ্গে নেটীভ স্টেটের প্রশাসনের এখানেই তফাৎ। শিক্ষার আলো পেয়ে উপনিবেশের মানুষের মন অনেক পরিচ্ছন্ন, অনেক বাস্তববাদী। এখানকার প্রশাসনও অনেক বিচারবুদ্ধিসম্মত। এখানে কিছুই বিশৃঙ্খল নয়, স্ববিরোধী নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। নবাব বাহাদুরের নাতি-দীর্ঘ আবেগময়ী ভাষণ সবাই চুপ করে শুনছিল। শেষ হলে শুধু ডেরেকই ব্যঙ্গোক্তি করলো, 'ওঃ ভগবান!'

কিন্তু ব্যঙ্গোক্তি সত্ত্বেও বৃদ্ধ চুপ করে গেলেন না। তাঁর অনেক কিছু বলার আছে যা এখনই তাঁকে বলতে হবে। মিস কোয়েস্টেডের মতামতটা তাঁর মনোমত হয়েছে। সত্যিই তো, বড় বড় লোকদের সম্বন্ধে এত মনোযোগ দেবার কি আছে? নিজের কথাই ধরতে হয়। বেশ বড় স্টেটের নবাব তিনি। এখানকার জমিদারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তিনি। প্রতিপত্তি তাঁরও কম নয়! কিন্তু কথাটা কি জাঁক করে বলে বেড়াবার মতন! তাই য়্যাডেলার কাছে ব্যাপারটা ভাঙেন নি তিনি। সেটা উচিতও নয়। বেচারা অকারণে তটস্থ হয়ে থাকবে সারাক্ষণ। না জানি কি অসৌজন্য দেখিয়ে ফেললো! এটাই তাঁর বক্তব্যের সারাংশ। অবশ্য ডেরেকের প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞ। গাড়ি করে সে তাঁকে তাঁর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। অবশ্য তার জন্যে একজোড়া কুচ্ছিত কুকুর কোলে নিতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু এই সুযোগটুকুও তিনি না পেতে পারতেন? গাড়ি চলেছে। চন্দ্রপুরও এসে গেছে। কোথায় নাবলে তাঁর সুবিধে হবে তা তিনি বলে দিয়েছেন। এখানে তাঁর অনেক কাজ। মেকানিক খুঁজতে হবে। অপদার্থ নাতিটা কি অপকর্ম করে বসে আছে কে জানে! এগুলো তাঁর ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তা। একসুতোয় গেঁথে পরিবেশন করছিলেন নবাব। হঠাৎ তাঁর সন্দেহ হলো এরা কেউ শুনছে না। ছোকরা বয়সের ছেলেমেয়ে সবাই। হারমনিয়মের ডালার আড়ালে বসে কি ফষ্টি-নষ্টি করছে কে জানে! তিনি বৃদ্ধ মানুষ। তাঁর শরীরে নীলরক্তের ধারা। পরের ব্যাপারে কৌতূহল দেখানো তাঁর রুচিবহির্ভূত। কেউ যদি তরলমতি হয়, গভীর কথা শোনার মতন মানসিকতা যদি কারও না থাকে, তার জন্যে তিনি চুপ করে যেতে পারেন না। ঈশ্বর সমানভাবে সবাইকে গড়েন নি।

হাতের পাঁচটা আঙুলও সমান নয়। হয়ত তাঁর কথা শুনে ওরা বিরক্ত হচ্ছে। কিন্তু তিনি কি করতে পারেন ? তাঁর কথা তাঁকেই বলতে হবে। দুর্ঘটনা যা হবার হয়ে গেছে। এখন সবকিছু স্বাভাবিক। তিনিও পরম নিশ্চিন্ত। আর কোন আক্ষেপও তাঁর নেই। সুতরাং সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে যা বলার বলে যাচ্ছিলেন নবাব বাহাদুর। কেউ শুনুক আর না শুনুক।

নবাব বাহাদুর যেন কথার এক উষ্ণ প্রস্রবণ। যতক্ষণ গাড়িতে ছিলেন টগবগ করে ফুটছিলেন। কথার খই ফুটছিল মুখে। অন্যরা সবাই চুপ। তিনি নেবে যাবার পর রনীই প্রথম কথা বললো। পোলো খেলা নিয়ে খানিকক্ষণ হালকা কথা বললো। টারটন তাকে শিখিয়েছে যে কারো প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই তার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা ঠিক নয়। এই আপ্তবাক্য মেনে চলে রনী। সুতরাং নবাব বাহাদুর সম্বন্ধে তখনই কোন মন্তব্য সে করলো না। তাঁকে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানিয়ে আবার য়্যাডেলার হাতে হাত রাখলো। য়্যাডেলাও ঘনতর করলো স্পর্শ এবং স্পর্শসুখে বিভোর হয়ে রইল দুজনেই। বাংলোয় ফিরেও একই বিহ্বল অবস্থা। মিসেস মুর ঘরের ভেতরে ছিলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওরা বেশ খানিকক্ষণ দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। য়্যাডেলাই প্রথম কথা বললো। বিভোর ভাব তখনও কাটে নি। রনীর চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গভীর ভাবে বললো, 'রনী, তখন মাঠে যা বলেছিলুম তা ভুল। তাই ফিরিয়ে নিচ্ছি যা বলেছিলুম।'

রনীর মনের দোরেও ঘা পড়েছে। বুঝি পাল্টে গেছে তার বুকের শব্দ। সব বাধা পেরিয়ে দুটি দেহমন এক হবার প্রতিশ্রুতি নিল চুপি চুপি।

পরিণতিটা যে এমন সুখের হবে কেউ জানতো না। যে অনিশ্চিত মানসিক অবস্থায় রনীকে ফিরিয়ে দিয়েছিল য়্যাডেলা, সেখানে সে ফিরে যেতে পারলো না। ঠিক সময়েই সেই অনিশ্চিত ভাবটা কেটে গেছে। নাম-না-জানা সবুজ পাখি বা অজানা লোমশ জন্তুটার মতন সে আর পরিচয়হীনা হয়ে রইলো না। নিজের কাছেও আর গোপন নেই সে। রনীর বাগদত্তা সে। এই পরিচয়টাই মার্কামারা হয়ে রইল তার অস্তিত্বের সঙ্গে। এটাই এখন থেকে তার অস্তিত্ব, তার সর্বস্ব। কিন্তু এতবড় সিদ্ধান্তটা এত দ্রুত সে কেন নিল ? কেন নিজেকে এতটা খেলো করে ফেললো ? এমনভাবে ধরা দেবার আগে আরও একটু মন জানাজানি আরও একটু নাটকীয় এবং বিলম্বিত পরিচয় কি দরকার ছিল না ? রনী অবশ্য খুশি। যদিও বিস্মিত। সমস্যা একটাই ছিল। তারা দুজনেই দুজনকে গ্রহণ করতে পারবে কি না ! এখন আর সেই সংশয় নেই। দুজনেই সম্মতি দিয়েছে।

বাংলোর সীসেব জালের দরজা ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে রনী বললো, 'এসো য়্যাডেলা, মাকে সব বলি।' মিসেস মুর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অন্য দুই ছেলেমেয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন। র‍্যাল্‌ফ্‌ আর স্টেলা—এদের কথা এখানে কেউ বলে না। রনীদের কথাবার্তার শব্দ কানে যেতে ধড়মড় করে উঠে বসলেন বৃদ্ধা। ইদানিং নানারকম দুশ্চিন্তায় তিনি গভীরভাবে ডুবে থাকেন। তাই ঘোর ভেঙে গেলে চমকে ওঠেন। বিয়েতে ওরা দুজনেই যে রাজি হয়েছে

বৃদ্ধাকে সেই কথাটাই সাড়ম্বরে জানিয়ে রনী বললো, 'ফীলডিং-এর বাড়িতে আমার দুর্ব্যবহারের জন্যে আমি নিজেই লজ্জিত। তখন ঠিক বুঝতে পারি নি তোমরা কি চাও, তাই কি করছি নিজেও বুঝি নি। এখন মনে আমার কোন দ্বিধা নেই। যেমন মনে করবে তেমনিভাবে তোমরা ভারতবর্ষ দেখতে পারো।'

মিসেস মুর চুপ করে শুনলেন। অন্য কথা ভাবছিলেন তিনি। এবার তাঁর কর্তব্য সমাধা হয়েছে। ভারতবর্ষ দেখা না দেখা তাঁর কাছে সমান। এবার ফিরতে পারলে বাঁচেন। তাঁর নিজের সুখী বিবাহিত জীবনের কথা মনে পড়ছিল। রনী কোলে এসেছিল সেই সুখের দিনেই। যতদূর জানা আছে য়্যাডেলার মা বাবার বিবাহিত জীবনও সুখের ছিল। এখন ছেলেমেয়েদের বিবাহিত জীবনও যদি এমনি সুখের হয় তার চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে! শিক্ষা যত বাড়বে, যত মন নিষ্কলুষ হবে তত বাড়বে সুখী দম্পতির সংখ্যা। তারপর তাদের ছেলেমেয়েরা হবে আদর্শবান চরিত্রবান। সমাজের চেহারাই বদলে যাবে তখন। বৃদ্ধার চোখে সেই আগামী দিনের রঙিন স্বপ্ন। কিন্তু শরীরটা যেন ক্রমেই অপটু হয়ে আসছে। ফীলডিংকে নিয়ে অতবড় কলেজ কম্পাউন্ড ঘুরতে যাওয়া তাঁর উচিত হয় নি। সেই থেকে পায়ের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছেন। ফীলডিংএর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জোরে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গেছেন। তারপর টমটমে উঠে এদের কথাবার্তা শুনে মনটাও ভেঙে গিয়েছিল। এরা যে ঘর বাঁধতে পারবে সে আশা ছিল না। এখন এদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে বোধহয় ছাড়াছাড়ি হবে না। কিন্তু তাঁর নিজের সেই আগের উৎসাহ আর নেই যে উচ্ছ্বসিত হবেন। রনী তীর পেয়েছে। সুতরাং এখানে তাঁর কাজ শেষ। এখন যাবেন অন্য দুই ছেলেমেয়ের কাছে। যদি তারা চায় তাদের ঘর বাঁধার কাজে সাহায্য করবেন। দুটো তরুণ মন এক করে দেওয়াই হলো এই বুড়ো বয়সের কর্তব্য। সংসারে বুড়ো মানুষরা এ ছাড়া আর কি করতে পারে!

খেতে বসেও একই কথার আলোচনা হলো। সুখী আগামী দিনের কথা। সারা দিনে যা যা ঘটেছে তার ফিরিস্তি দিল রনী। তবে বেশিক্ষণ গল্প-গুজব চললো না। রনীর হাতে অনেক অফিসের ফাইল জমে গেছে। সেগুলো উদ্ধার করতে হবে তাকে। তার ওপর সামনেই মহরম। মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ পরব। আসন্ন উৎসবের ভাবনায় বিভোর হয়ে আছে চন্দ্রপুরের মুসলমানরা। এখন তাজিয়া তৈরির সময়। উঁচু উঁচু তাজিয়া তৈরি হচ্ছে। কিন্তু রনী জানে, এগুলো নিয়েই বিরোধ বাধবে। তাজিয়া যত উঁচু হবে ততই বাধা। মিছিল নিয়ে যাবার সময় গাছের ডালে বেধে যাবে তাজিয়া। মিছিল আটকে যাবে। হৈ-হৈ কাণ্ড বেধে যাবে তখন। একজন মুসলমান ছোকরা গাছে উঠে ডাল কাটতে যাবে, কারণ মিছিল থেমে গেছে। কিন্তু হিন্দুরা প্রতিবাদ করবে। তারাও ধর্মের দোহাই পাড়বে। ব্যস! শুরু হবে তুলকালাম অবস্থা। দাঙ্গা বাধবে হিন্দু মুসলমানে। কোথায় এর শেষ কেউ জানে না। সেনাবিভাগের সাহায্যও চাওয়া হতে পারে। কালেক্টর টার্টনের মধ্যস্থতায় একটা রফার

ব্যবস্থা হবে। দুপক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে শান্তি কমিটির মিটিং বসবে। ততক্ষণে থেমে গেছে চন্দ্রপুরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। টার্টন্ নিজে উদ্যোগ নিয়ে একটা রফার প্রস্তাব দেবেন। দুই সম্প্রদায়কে তা জানানো হবে। হয় তাজিয়ার উচ্চতা কমাতে হবে নয়ত অন্য পথে শোভাযাত্রা নিয়ে যেতে হবে। মুসলমানরা বলবে যে অন্য পথে শোভাযাত্রা ঘুরিয়ে দেবার অনুমতি দেওয়া হোক। কিন্তু হিন্দুরা তাতে রাজি হবে না। তারা বলবে তাজিয়ার মাথা কাটা হোক। কালেক্টর সাহেব হিন্দুদের প্রতি কৃপাপরবশ হবেন। কিন্তু তাঁর সন্দেহ হবে ওরা কৃত্রিমভাবে গাছের ডাল নুইয়ে দিয়েছে। হিন্দুরা অবশ্য বলবে পাতার ভারে ঝুলে পড়েছে ডাল। তখন সরকারী উদ্যোগে মাপজোপ শুরু হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানকার প্রশাসনের এটাই ধারা। এইভাবেই চলে আসছে এতদিন। রনীর কাছে ব্যাপারটা বেশ গুরুত্ব-পূর্ণ। তার ধারণা এই দেশের পক্ষে ব্রিটিশ শাসনের মতন পাকাপোক্ত শাসনই দরকার। নইলে এরা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে বসবে নিজেদের মধ্যে। এখানে তারা এসেছে দেশ শাসন করতে, প্রশাসন সুষ্ঠু রাখতে, শান্তি বজায় রাখতে। লোকের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করবার জন্যে তারা এখানে আসে নি। রনীর বিশ্বাস, বিয়ের পর য়্যাডেলা নিশ্চয়ই তা বুঝবে।

য়্যাডেলা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা! ওই বুড়ো নবাব লোকটা কেমন?' য়্যাডেলার কথায় বেশ একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। রনীর তা ভাল লাগলো। রনী বললো, 'শুনেছি পরোপকারী ভাল মানুষ উনি। তবে এসব হলো লোক দেখানো।'

'না কি?'

'হ্যাঁ, তাই। অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু এরা সবাই একরকম। সার্টে নকল কলার পরে, কিন্তু বোতাম দিতে ভুলে যায়। তিন শ্রেণীর ভারতীয়দের সঙ্গে আজ তোমার আলাপ হয়েছে। বাঙালী ভটচার্য, আজিজের দল আর এই বৃদ্ধ নবাব। এই তিন শ্রেণীর মানুষই তোমায় ঠেকিয়েছে। তবে সলা করে যে এ কাজ করেছে তা নয়। এদের স্বভাবটাই এমনি আলগা, ঢিলে। কাম্নার মাঝখানে মিসেস মুর বললেন 'আজিজ কিন্তু ভাল ছেলে। ওকে আমার খুব পছন্দ।'

বৃদ্ধার কথার খুব গুরুত্ব দিল না রনী। য়্যাডেলার দিকে চেয়ে বললো, 'জানোয়ারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গাড়িটা যখন কাত্ হয়ে গেল, তখন নবাব কিরকম মাথা গরম করেছিল মনে আছে? বেচারা শোফারকে যা নয় তাই বললো। মিস্ ডেরেকের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে গাড়িতে উঠলো। হয়ত বলবে এ এমন কি অন্যায়? আমিও তা মানছি। কিন্তু কোনো সাদা চামড়ার মানুষ এমনটি করতো না।'

'জানোয়ার? কি জানোয়ার?'

'মা! তোমায় বলতে ভুলে গেছি। মাড়াবার রোডে আমাদের গাড়ির সঙ্গে একটা জানোয়ারের ধাক্কা লাগে। য়্যাডেলার ধারণা ওটা একটা হায়না।'

'য়্যাকসিডেন্ট?' বৃদ্ধা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন।

'তেমন কিছু না। লাগে টাগে নি কারো। তবে আমাদের গাড়ির মালিকের দিবাস্বপ্ন ভেঙে যাওয়ায় খুব বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর ধারণা আমাদেব দোষেই য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে। আর সেই কথাটাই বার বার শোনাচ্ছিলেন।' চকিতে মিসেস মুরের মনে অশুভ ভাবনার উদয় হলো। মনে মনে কেঁপে উঠলেন তিনি। এটা কি কোন অপদেবতার উপদ্রব ? কিন্তু আশঙ্কাটা প্রকাশ করলেন না। রনী বা য়্যাডেলাও তাঁর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে নি। নিজেদের ভাবনার মধ্যেই তারা ডুবে ছিল। ফলে, মনের যে দুর্জ্ঞেয় প্রদেশ থেকে এই ভাবনার উদয় হয়েছিল, প্রশ্রয় না পেয়ে তা সেখানেই মিলিয়ে গেল। কোন বহিঃপ্রকাশ হলো না।

আগের আলোচনার জের টেনে রনী তখন বলছিল 'না অন্যায় হয়ত নয়। তবে ওইটেই এদের ধাত। আর সেইজন্যেই আমাদের ক্লাবে নেটীভ নবাবকে আমরা মেম্বার করি নি। আমার খুব অবাক লাগে যখন মিস ডেরেকের মতন ঝকঝকে বুদ্ধিমতী মেয়েদের নেটীভ স্টেটে চাকরি করতে দেখি।..'কিন্তু আর গালগপ্প নয়। এবার কাজে বসতেই হবে। অনেক ফাইল জমে গেছে। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!' কথা বলতে বলতেই চীৎকার করে কৃষ্ণকে ডাকতে লাগলো রনী। তার আপিসের পিওনের নাম কৃষ্ণ। কথা ছিল আপিসের ফাইলগুলো সে তার ঘরে পেঁাছে দেবে। কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ? হা কৃষ্ণ, জো কৃষ্ণ করে হাকডাকই সার হলো রনীর। ততক্ষণে মেজাজ রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে তার। তর্জন গর্জনে থমথম করছে ঘরের চেহারা। রনীর এমন মারমুখী মূর্তি য়্যাডেলা আগে দেখে নি। সে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এটা যে তার মুখোশ য়্যাডেলা তা জানতো না। আসলে অত্যন্ত দক্ষ আত্মগোপনকারী রনী। এটা যে তার আসল ক্রোধ নয় য়্যাডেলার অনভিজ্ঞ চোখ তা ধরতে পারলো না। কিন্তু ভৃত্যকুল এই দাপাদাপিতে এতটুকু ব্যস্ত হলো না। শুধু বার দুইতিন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে চেঁচাল, তারপর লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে গেল। কৃষ্ণনামের উচ্চরবের ডাক প্রতিধ্বনিত হয়ে রনীর কানেও গেছে। সেই শুনেই তার ক্রোধ শান্ত হলো তারপর অনুপস্থিত কৃষ্ণকে আট আনা জরিমানা করে সে পাশের ঘরে গেল বকেয়া কাজ তুলতে।

রনী চলে যাবার পর ঘরে রইলেন কেবল মিসেস মুর আর য়্যাডেলা। ভাবী পুত্রবধুর দিকে সস্নেহে তাকিয়েছিলেন বৃদ্ধা। বললেন, 'হ্যাঁ মেয়ে! এখন তো কোন কাজ নেই যে সময় কাটাই। তা, তোমার হবু শাশুড়ির সঙ্গে একটু পেশেন্স খেলবে ?

'মন্দ কি! বরং ভালই লাগবে। আমার কিন্তু একটুও উত্তেজনা হয় নি। ব্যাপারটা মিটে গেছে। তাই খুব ভাল লাগছে আমার। আমার মনে হয় এই ঘটনায় খুব বেশি আমরা বদলাবো না। একই রকম থাকবো তিনজন। আপনার কি মনে হয় ?'

'ঠিক তাই।' পেশেন্সের তাস সাজাতে সাজাতে জবাব দিলেন বৃদ্ধা। য়্যাডেলা চেয়েছিল তাঁর দিকে। বৃদ্ধা আস্তে আস্তে বললেন, 'ফীলডিংএর বাড়িতে যা হলো তাতে খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল হয়ত অন্যভাবে

ব্যাপারটা মীমাংসা করতে হবে।... ..উহ্‌! কালোগোলাম বসবে লাল বিবির তলায়।'

মৃদু স্বরে আলাপ করতে করতে ওঁরা তাস খেলছিলেন। য়্যাডেলা একসময় বললো, 'তখন আজিজ আর মিস্টার গড়বোলের সামনে যা বলেছি তা ঠিক আমার মনের কথা নয়।' বৃদ্ধা একবার তাকালেন। আবার খেলায় মন দিলেন। য়্যাডেলা বললো, 'এদেশে থাকবো না একথাটা ওইভাবে বলতে আমি চাই নি। অবশ্য আমার উচিত ছিল ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেওয়া। কিন্তু আজ অব্দি তা পারলুম না। যেদিন জাহাজে চড়েছি সেদিন থেকেই চেষ্টা করছি। অথচ আমার সঙ্গে আপনার ব্যবহার কত সরল। আমি কিন্তু সরল হতে পারলুম না। তাই মাঝে মাঝে ভাবি হয়ত আপনাকে আমি ঠকাচ্ছি। মিসেস মুর, কেউ যদি পুরোপুরি সৎ না হয় তাঁর বাঁচার কি দরকার?'

বৃদ্ধা তখনও তাস সাজাচ্ছেন। য়্যাডেলার কথাগুলো দুর্বোধ্য। কিন্তু বৃদ্ধার কাছে দুর্বোধ্য লাগলো না। মেয়েটার মনের অস্বস্তিটা তিনি যেন বুঝতে পেরেছেন। তাঁর জীবনেও এমন সংশয় এসেছিল। একবার নয় দুবার। কিন্তু বিয়ের পর সেই সংশয় আর ছিল না। তাঁর বিশ্বাস বিয়ের পর য়্যাডেলাও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাবে। তবুও মেয়েটাকে আশ্বস্ত করতে মিসেস মুর বললেন, 'শোনো মা, আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। আমি বেশ জানি এর কারণ তুমি একা নও। এখানকার অদ্ভুত পরিবেশও এর জন্যে খানিকটা দায়ী।' য়্যাডেলা বেশ আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে বৃদ্ধা আবার বললেন, 'আমরা এখানে নতুন। তাই এখানকার ধারার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছি। কত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মেতে উঠছি অথচ যা দরকারী তার দিকে তাকাচ্ছি না। তোমার মনের এই অনিশ্চিত ভাবটা ওই কারণেই হয়েছে।'

'তার মানে আমার নিজের ঝঞ্ঝাটগুলো এখানকার ঝঞ্ঝাটের সঙ্গে মিশে গিয়ে এইরকম হচ্ছে?'

য়্যাডেলার দিকে তাকিয়ে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধা। কিন্তু চুপ করে গেলেন। য়্যাডেলা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা! তখন কেন বললেন যে এটা ভুতুড়ে?'

'আমি?'

'আমরা যখন য়্যাক্‌সিডেন্টের কথা বলছিলুম, তখন প্রায় নিঃশব্দে আপনি ভূত কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন। আমি তা লক্ষ্য করেছি।'

'তা তুমি লক্ষ্য করতে পারো। কিন্তু যা বলেছিলাম তাই-ই যে ভাবছিলুম তার কিছু মানে নেই।'

'বোধহয় একটা হায়নার সঙ্গে আমাদের গাড়িটার ধাক্কা লাগে।'

'হতে পারে তা!'

এইভাবে পেশেন্স খেলতে খেলতে শান্তভাবে তাঁরা নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। ওদিকে চন্দ্রপুরের নিজস্ব বাংলোয় বসে নবাব বাহাদুর তখন গভীর ভাবনায় ডুবে আছেন। গাড়িটা তখনও সারাই হয়ে আসেনি। শহরের এই বাড়িটাও তাঁর। ছোট্ট আসবাবশূন্য বাড়ি। এখানে কদাচিৎ

আসেন। বাড়ির চারপাশে সামান্য জমি ছাড়া আছে। প্রতিপত্তিশালী ভারতীয়রা তাঁদের সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে এই রকম অস্থায়ী বাসস্থান করিয়ে রাখেন।

আত্মচিন্তায় গভীর ভাবে ডুবে ছিলেন নবাব। একটা পূর্বসংস্কার তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ন বছর আগের কথা। সবে গাড়ির মালিক হয়েছেন। তখন একটা মাতালকে চাপা দিয়েছিলেন। লোকটা মরে যায়। অপঘাত মৃত্যু। তাঁর ধারণা সেই থেকে লোকটা তাঁর জন্যে য়্যাক্সিডেন্টের জায়গায় বসে আছে। নবাব বাহাদুর জানেন তিনি নির্দোষ। আইনের কাছে. আল্লার কাছেও। ক্ষতিপূরণ বাবদ যা তিনি দিয়েছেন তা দ্বিগুণ। তবুও লোকটার মুক্তি হয় নি। অশরীরী মূর্তি নিয়ে তাঁর অপেক্ষায় বসে আছে। একথা কেউ জানে না। গাড়িতে যারা ছিল তাদের কেউ নয়। এমনকি তাঁর শোফারও জানে না। এসব কথা ঢাক পিটিয়ে বলার নয়। তাঁর সমাজের মধ্যেই এই সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে আছে। অন্য সমাজের মানুষ তা বুঝবে না। এই কথাগুলোই ধীরে ধীরে তিনি ওদের বলছিলেন। আজিজও ছিল তার সঙ্গে। আশঙ্কার কারণটা তাকে বুঝিয়ে বলার পর নবাব বাহাদুর যেন একটু স্বস্তি পেলেন। সম্মানিত অতিথিদের যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটতো? ভাবতেও ভয় হয়। আল্লার কি অসীম করুণা! তেমন দুর্ঘটনা ঘটে নি। আল্লাই রক্ষা করেছেন। আল্লার করুণার এমন জলজ্যান্ত নিদর্শন পেলেও আজিজ নির্বিকার হয়ে রইল। ওদের মতন সে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লো না। মসজিদের ঘটনার কথাটা তার মনে পড়লো। এটা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। সেদিন যদি মসজিদের মধ্যে মিসেস মুরের আগমনটাকে সে অশরীরী আগমন বলে ধরে নিত, তাহলে মিসেস মুরের মতন মানুষটার সঙ্গে তার আলাপ হতো না। ফিসফিস করে এই কথাগুলোই নবাব বাহাদুরের পৌত্র নুরুদ্দিনকে বলছিল আজিজ। মেয়েলি স্বভাব হলেও নুরুদ্দিন যুগের মানুষ। দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও ছেলেটাকে তার খারাপ লাগে না। এই বৈজ্ঞানিক যুগে সব ঘটনা বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে তবে মানতে হয়। আজিজ বললো, 'শোনো নুরুদ্দিন! এইসব কুসংস্কার আমাদের ছাড়তে হবে। নইলে মুসলমানদের উন্নতি হবে না। দেশও এগোবে না। মাড়াবার রোডের ওই ভুতুড়ে গপ্প আর কতকাল শুনবো বলো তো?' নুরুদ্দিন চোখ নাচিয়ে নিল। আজিজ তখনও বলে চলেছে, 'তোমার দাদু পুরোনো দিনের লোক। তাঁকে আমি ভক্তিশ্রদ্ধা করি। তাই চট করে তাঁর মুখের ওপর কথা বলতে পারি না। কিন্তু এ যুগে ওসবে বিশ্বাস করাটা অন্যায়। আমরা যদি তা করি তবে অন্যায় করবো। আমরা আধুনিক। আমাদের এগোতে হবে বিচার করে। নুরুদ্দিন তুমি আমার কথা শুনছো?' নুরুদ্দিন আবার চোখ তুলে তাকালো। আজিজ বেশ দৃঢ় ভাবে বললো, 'আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো —এইসব ভুত প্রেতে কখনও বিশ্বাস করবে না। আর...' একটু চুপ করে আজিজ ফের বললো, 'আমি মরে গেলে (শরীরটা আমার ভাল যাচ্ছে না) আমার ছেলেমেয়েদেরও এমনভাবে মানুষ করবে, যাতে তারাও এসব না

মানে।' আজিজের কথা শুনে নুরুদ্দিন ফিক করে একটু হাসলো। একটা জুৎসই জবাব তার সুন্দর ঠোঁটে এসে গিয়েছিল। কিন্তু তখনই গাড়িটা সাবাই হয়ে ফিবে এসেছে। নবাব বাহাদুরও দেরি করতে চাইলেন না। নাতিকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেবিয়ে গেলেন।

সিভিল লাইন্স এব বাংলোয সেদিন অনেক রাত্তিব অব্দি পেশেন্স খেলা চললো। খেলার মধ্যে ফাঁকেফাঁকে দুই নারীর টুকবো টুকরো নানা কথার আলোচনা চলছিল। ঘটনাগুলো সেদিনের। বিয়ের কথা, হায়নাব কথা, মুদকুল স্টেটেব মহাবানীর কথা। ঘটনার একটা এবড়োখেবড়ো চিত্ররূপ ফুটে উঠেছিল তাদেব মনে। ক্রমে সেই আঁকিবুঁকিগুলো একটা সুস্পষ্ট চেহাবা নিল। ভাবতবর্ষেব ভূপৃষ্ঠের চেহারাটা যদি চাঁদ থেকে দেখাব সুযোগ থাকতো তবে হযত এইবকমই দেখাত। খেলা শেষ করে ওঁরা যখন শুতে গেলেন তখন বাত প্রায় শেষ। অন্যত্র কাজেব মানুষরা জেগে উঠেছে। এবা সবাই সাধাবণ মানুষ। এদেব বাঁচাব আবেগটাই বিদেশিনীদের কাছে অপরিচিত। চন্দ্রপুবেব রাত কখনও শান্ত হয না। পরিপূর্ণ কালোও হয় না সে রাত। তবে অন্য বাতেব চেয়ে আজকের রাতের চেহারাটা একটু যেন আলাদা। সেদিন আকাশেব বুক চিরে উষ্ণ বাতাসেব দু একটা ঝাপটা সোজাসুজি আছড়ে পড়ছিল পৃথিবীর বুকে। শক্ত ঠাসা বাতাস। নিষ্ঠুব প্রাণহীন। এতটুকু স্নিগ্ধতাব আশ্বাস পর্যন্ত তার স্পর্শে নেই। বোঝাই যাচ্ছিল নির্মম গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছে।



আজিজ যা মনে করেছিল তাই হলো। অর্থাৎ অসুখে পড়লো সে। তেমন বাড়াবাড়ি কিছু না। তবুও তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠলো না সে। ভাবখানা যেন কত বাড়াবাড়ি অসুখ তাব। জ্বর যা আছে তা উপেক্ষা করা যেত, যদি হাতে কোন জরুরি 'কেস' থাকতো। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ডাক না আসায়, সে শুয়ে বসে দিন কাটাতে লাগলো। শরীরে একটা অস্বস্তি ছিল। মাঝে মাঝে তাই গোঙাতো। ভাবতো বুঝি সে মরে যাবে। কিন্তু মৃত্যুচিন্তা বেশি-ক্ষণ স্থায়ী হতো না।

সেদিন রোববার। প্রাচ্যদেশে রোববারটা হলো অকাজের দিন। লোকে শুয়ে বসে দিন কাটায়। নানা অছিলায় কুঁড়েমি করে। গির্জার ঘণ্টা বাজছে। দুদিকের দুটো গির্জা থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। আজিজের অভ্যস্ত কানে দুটো ধ্বনির পার্থক্য খুব স্পষ্ট। একটা ডাকছে ফিরিঙ্গি সমাজকে। সেটার হাঁকডাক বেশি। অন্যটা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকণ্ঠ। উদারভাবে মানব-সমাজকে ডাকছে এরা। প্রথমটা সিভিল লাইন্স্এর দিক থেকে। দ্বিতীয়টা

আসছে কসাইখানা ছাড়িয়ে মিশনারীদের গির্জা থেকে। মিশনারীদের ব্যাপারে আজিজের কোন ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। ওরা সুযোগ-সন্ধানী। বুড়ো গ্রেসফোর্ড বা ছোকরা সোরলী, দুজনেই এক ধাতের। দুর্ভিক্ষের সময় অনেককে ধরে ধরে ওরা খ্রীশ্চান করেছে। তখন দারুণ খাদ্যাভাব। খাবারের লোভে গরিব মানুষরা ধর্মান্তরে রাজি হয়েছিল। স্বেচ্ছায় তারা খ্রীশ্চান হয়েছে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয় নি তাদের। দুর্ভিক্ষ কেটে গেলে মিশনারীরা তাদের অনায়াসে ছেড়ে গেল। তারা যা ছিল তাই রহলো। মাঝখান থেকে ধর্মটা খোয়া গেল তাদের। এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। কিন্তু তবুও গরিব লোকগুলোর শিক্ষা হয় নি। শুয়ে থাকতে থাকতে আজিজের হঠাৎ মনে হলো যে, ফীলডিং ছাড়া আর কোন ইংরেজ ভারতীয়দের মানুষ মনে করে না। তখুনি মনে হলো মানুষটার সঙ্গে তার আর একবার দেখা হওয়া দরকার। কিন্তু কি করে? এখানে সে কি আসবে? ঘরের যা হতচ্ছেন্দা অবস্থা? বাইরের মানুষ এলে লজ্জায় মরে যাবে আজিজ। হাসানকে ডেকে সাফসুতরো করে নিলে হয়। কিন্তু ভীষণ ধড়িবাজ ছেলেটা। চেঁচিয়ে ডাকলো আজিজ। হাসান তখন সিঁড়ির ধাপে বসে পয়সা বাজিয়ে তার আওয়াজ শুনছিল। গৃহকর্তার ডাক সে শুনেছে আবার শোনেও নি, কারণ আজিজ তাকে ডাকতে পারে আবার না ডাকতেও পারে। সুতরাং অনায়াসেই না শোনার ভান করে বসে রইল। সারা ভারতবর্ষে জুড়েই এই অনিশ্চয়তা। হ্যাঁ বা না—এই নিয়ে দ্বৈধভাব। এইসব ভাবতে ভাবতে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো আজিজ। আর সেই ঘোরের মধ্যে ভাবনাগুলো তার বিচিত্র জীবনের প্রান্তদেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল।

ক্রমে অস্থির ভাবনাগুলো একটা বিন্দুতে এসে স্থির হলো। একটা মধুর প্রত্যাশার বিন্দু। নারীসঙ্গ প্রত্যাশা। পাদরি সাহেবদের মতে এই অবস্থাটা নাকি স্খলনের পূর্বাবস্থা। সে কিন্তু তেমনটি ভাবে না। হ্যাঁ, একটা সন্ধ্যায় সে যুবতী মেয়েদের সান্নিধ্য পেতে চায়। কয়েকটা উচ্ছল মুহূর্তের মধ্যে অবগাহন এবং পরিশেষে সম্ভোগসুখ। কিন্তু নারী সম্ভোগে মানুষ নরকস্থ হয় না। নিটোল জীবনের গায়ে ছোট্ট একটা টোল পড়ে মাত্র। এইটুকুই তার কামনা। কিন্তু সামান্য এই কামনাটাও মেটে নি তার। মেজর ক্যালেন্ডার নামক মানুষটার আত্মম্ভরিতার কাছে তার আবেগের কোন সমাদর হয় নি। এই ওপরওলা মানুষটি যদি ভারতীয় হতো, হয়ত দুতিন দিনের ছুটি সে পেতে পারতো। তখন কলকাতায় গিয়ে কয়েকটা প্রগলভ দিন কাটিয়ে আসতে পারতো আজিজ। কিন্তু মেজর সাহেব দাম্ভিক এবং হৃদয়হীন। তার ধারণা অধীনস্থ কর্মচারীদের মন বলে কোন পদার্থ নেই। তাদের বরফ মনে কোন চিড খায় না। অথবা চিড় খেলেও চন্দ্রপুরের বাজারেই তার সারাই হতে পারে। ভারতীয়দের সম্বন্ধে এদের ধারণাগুলো কত একপেশে! সহৃদয় বলতে একজনই ইংরেজ আছে চন্দ্রপুরে। তার নাম ফীলডিং।

ফীলডিংএর কথা মনে হতেই আজিজের ঝিমুনি কেটে গেল। চেঁচিয়ে ডাকলো সে, 'হাসান!'

পাড়ে এসে দাঁড়ালো হাসান। আজিজ তখন তাকিয়েছিল সিলিংএর দিকে। একটা কদাকার আকৃতির বস্তুপিণ্ড ছাতের গা থেকে ইলেকট্রিক তারের সঙ্গে লেপটে ঝুলে আছে। সেই কদাকার চেহারার বস্তুপিণ্ডটা মাছিদের বসতি। এখানে মাছিদের বসতিটাই মুখ্য, বৈদ্যুতিক তারটা গৌণ। তারের সর্বাঙ্গে দগদগে ঘায়ের মতন মাছিরা জড়াজড়ি করে আছে। দেখলেই গা গুলিয়ে ওঠে। কী কুৎসিত দৃশ্যটা! তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিউরে উঠলো আজিজ, তারপর সেই বস্তুপিণ্ডটার দিকে হাসানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

'চেয়ে দ্যাখ্ ওদিকে! কী ওটা?'

'হুজুর, ওরা মাছি!'

'চমৎকার। তা কি জন্যে তোকে ডেকেছি?'

'ওদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে।' খানিক ভেবে চিন্তে উত্তরটা দিল হাসান।

'কিন্তু একবার তাড়ালেই তো হবে না। ওরা তো আবার ফিরে আসবে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।'

তাহলে?' হাসান চুপ। আজিজ ফের বললো

'সুতরাং এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ওরা ফিরতে না পারে। তুই আমার নোকর। তাই তোকেই করতে হবে কাজটা।'

হাসান মনে মনে ঠিক করে নিল সে কি করবে। বাচ্চাটাকে দিয়ে মহম্মদ আলির বাড়ি থেকে বাঁশের মইটা আনাবে। প্রাইমা স্টোভে জল গরম করবে। গরম জলের বালতি নিয়ে মই বেয়ে ওপরে উঠবে। তারপর গরম জলের মধ্যে ন্যাতাটা ডুবিয়ে দেবে। আজিজ শুনে বললো 'চমৎকার! তাহলে এখন তোর কি কাজ?'

'মাছি মারা।'

'বাঃ! তবে তাই কর্।'

হাসান চলে গেল। বেড়ে ফন্দি বার করেছে সে। মনে মনে খুব খুশি। প্রথমেই সে বাচ্চাটার খোঁজ করলো। কিন্তু ছেলেটা নেই শুনেই কেমন যেন দমে গেল হাসান। একটু আগের সেই ক্ষিপ্রতা আর নেই। পদক্ষেপ অনেক মন্থর হয়ে গেছে। আবার স্বস্থানে ফিরে এলো হাসান। সিঁড়ির ধাপে চুপ করে বসে রইলো। গির্জার ঘণ্টা তখনও বেজে চলেছে। মনে হয় ইতিমধ্যে ঘণ্টার শব্দটা ইংল্যান্ডের শহরতলী ঘুরে চোরা পথে আবার ফিরে এসেছে এখানে। ঘণ্টার শব্দটা তাই যেন ঠিক মানাচ্ছিল না। আজিজের কল্পনায় তখন অনেক যুবতীর ভিড়। কি সুন্দর দেখতে ওরা! সেই মধুর আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইলো আজিজ।

আজিজ শক্ত মনের মানুষ, কিন্তু পশু নয় সে। পাশবপ্রবৃত্তি তার নেই। নিজের মনের ধাত সে অনেক আগেই জেনেছে। সংসারই তাকে শিখিয়েছে যে মেয়ে পুরুষ আলাদা নয়। কিন্তু ডাক্তারি পড়তে গিয়ে দেখলো যে সাহেব পণ্ডিতরা স্ত্রী পুরুষ আলাদাভাবে বিচার করেছে। বৈজ্ঞানিক বিচারের ফল যে তার অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা তা সে তখনই জানলো। বলা বাহুল্য, এই কেতাবী বিদ্যার সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার কোন মিল নেই।

তাই বলে সে এমন কিছু করতে পারে না যাতে সমাজে সে খেলো হয়ে যায় বা ছেলেমেয়েরা লজ্জা পায়। সমাজে তার একটা মানসম্ভ্রম আছে। পেশাগত একটা মর্যাদাও আছে। মেজর ক্যালেণ্ডার স্বীকার করুক বা না করুক, এই মর্যাদাবোধটা সে ক্ষুন্ন হতে দেবে না। এই ঔচিত্যবোধটুকু তার মূলধন, যা সে মেনে চলে। অবশ্য সাহেবদের মতন সব ব্যাপারেই নীতিবোধ জুড়ে দেয় না। তার যেটুকু দায় বা চুক্তি তা সমাজের কাছে। ধরা না পড়া অব্দি সমাজের সঙ্গে প্রতারণা করা যায়। প্রতারক মন নিয়ে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ানো যায় না, তা পাপ। সমাজের ক্ষেত্রে তেমন নয়।দিব্যি পাপ মন নিয়ে ঘুরে বেড়াও, সমাজ বা সংসারের চোখে না পড়লেই হলো। সুতরাং কলকাতায় যাবার দরুন একটা ছোট্ট মিথ্যাচার করাটা সে কোনরকম অন্যায় বলে ভাবলো না। সে ঠিক করলো একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে কলকাতা থেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবার ব্যবস্থা করবে এবং সেটা দেখিয়ে মেজর ক্যালেণ্ডারের কাছে সে ছুটি মঞ্জুর করাবে। এইসব যখন ভাবছে তখন গাড়ির চাকার শব্দ কানে এল আজিজের। নিশ্চয়ই কেউ তাকে দেখতে আসছে। সহানুভূতি এবং রোগবৃদ্ধির অনুভূতিটা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, নয়তো আজিজ হঠাৎই এমন অসুস্থ বোধ করবে কেন ? একথা মনে হতেই আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিল সে।

হামিদ্‌উল্লার গলার স্বরই সে আগে শুনলো। ইতিমধ্যে তার শয্যাস্থল চার-বার আলোড়িত হয়েছে। অর্থাৎ চারজন আগন্তুক পরপর তার অপ্রশস্ত বিছানার ওপর বসে পড়েছে। হামিদ্‌ বললো,

'ব্রাদার আজিজ, তোর অসুখের খবর পেয়ে অব্দি আমরা সবাই ভাবছি।'

সৈয়দ মহম্মদ একজন ইঞ্জিনীয়ার। সে বললো, 'হ্যাঁ বদ্যি রুগী হলে ভাবনা হয় বৈকি!'

'শুধু বদ্যি নয়। ইঞ্জিনীয়ারও যদি রুগী হয় তাহলেও মুশকিল।' বললো পুলিশ ইন্সপেক্টর হক্‌।

'তা ঠিক। আমরা যে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করি তা আমাদের বেতন দিয়েই বোঝা যায়।' মাথা নেড়ে বললো সৈয়দ।

সৈয়দের সঙ্গে তার ভাইপো রফীও এসেছে। ছোঁড়াটা একটু দুর্জন স্বভাবের। মিথ্যা প্ররোচনায় মানুষকে উত্তেজিত করে। সে বললো, 'গত বেস্পতিবার আজিজ ডাক্তার আমাদের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বাড়িতে চা খেতে গিয়ে-ছিলেন। শুনলাম তিনিও অসুস্থ। ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত। তাই না স্যাব ?'

রফীর কথা শুনে সবাই চুপ। একটু যেন সন্দিগ্ধ তারা। শুধু হামিদ্‌উল্লাই ধমকে উঠলো রফীকে। 'তুমি তো দেখছি সবজান্তা হে!' বেশ রাশভারি গলায় বললো হামিদ।

হামিদ্‌উল্লার ধমক খেয়ে রফী মনে মনে বেশ ভয় পেল। বুঝতে পারলো যে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে দেয়ালের কাছে সরে দাঁড়াল। হামিদের গলার আওয়াজ পেয়ে লাল রংয়ের লেপটা সরিয়ে মুখখানা বের

করলো আজিজ। শুকনো হলেও মুখখানা ঝকঝক করছে। তার ওপর সদ্য শুনেছে যে গড়বোলেও অসুস্থ। সুতরাং একটু বেদনার ভাবও মুখে ছিল। সকলের মুখের দিকে চেয়ে আজিজ ক্ষীণ গলায় বললো, 'ভাই আপনারা আমায় দেখতে এসেছেন কি সৌভাগ্য আমার। হক্ সাহেব, সৈয়দ্ সাহেব! বলুন আপনারা কেমন আছেন? হামিদ্‌দাদা তুমি কেমন আছ? কিন্তু খুব খারাপ লাগছে গড়বোলের অসুখের কথা শুনে। চমৎকার মানুষ উনি। কি হয়েছে ওঁর?'

রফীর চাচা সৈয়দ মহম্মদ বললো, 'রফী! বল্ না কি হয়েছে ওঁর? তুই সকলের হাঁড়ির খবর রাখিস।'

হামিদও তাই বললো, 'হ্যাঁ, আমাদের রফী হলো চন্দ্রপুরের শার্লক হোম্‌স্। তা বাবা রফী! যা জানো ঝোলা থেকে বের করে ফ্যালো!'

প্রায় অশ্রুত স্বরে বিড়বিড় করে রফী বললো, 'ডাইরীয়া।'

কিন্তু দুম করে কথাটা বলেই খানিকটা ভয় পেল রফী। সে স্পষ্ট দেখলো অসুখের নাম শুনে লোকগুলো প্রায় হতচকিত হয়ে গেছে। ডায়েরীয়া অর্থাৎ ভেদবমি, অতিসার। তার মানে কলেরার ঠিক আগের অবস্থা। আজিজ তখন লেপ সরিয়ে প্রায় খাড়া হয়ে বসেছে। চেঁচিয়ে বললো, 'সে কি? তা আমায় ডাকে নি কেন? ডায়েরীয়া তো সাধারণ অসুখ নয়? এখনও মার্চ গেল না এর মধ্যেই এই অবস্থা? কে দেখছে?'

'ডাক্তার প্যান্নালাল।' বললো রফী।

'বাঃ! হিন্দু রুগী, হিন্দু ডাক্তার। চমৎকার! হিন্দুকে হিন্দু না দেখিলে কে দেখিবে? অদ্ভুত মনোবৃত্তি এই হিন্দুদের। মাছির মতন একসঙ্গে ঝুলে থাকে; আর সবকিছু লুকিয়ে রাখে। তা হ্যাঁরে রফী! বস্ এখানে। খুলে বল্! পায়খানার সঙ্গে বমি আছে?'

'হ্যাঁ স্যর, আছে। আর সঙ্গে পেটের যন্ত্রণা।'

'তাহলে তো মিটেই গেল। আর চব্বিশ ঘণ্টা। তারপরেই শেষ।'

সবাই স্তম্ভিত। সত্যিকারের দুঃখ পেয়েছে ওরা। আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা! কিন্তু ওদের দুঃখ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। কারণ ডাক্তার রুগী দুজনেই হিন্দু। সুতরাং হিন্দু গড়বোলে কারো সহানুভূতি পেল না। এমনকি রোগ যন্ত্রণায় কাতর মানুষের যেটুকু সহানুভূতি পাওনা হয় সেটুকুও তার কপালে জুটলো না। পরিবর্তে ওরা গড়বোলের নিন্দে করতে লাগলো। ওদের দৃঢ় ধারণা যে শহরে গড়বোলেই ব্যাধির বিষ ছড়াচ্ছে। হক্ সরাসরি অভিযোগ করে বললো, 'হিন্দুরাই দেশে রোগ ছড়ায়।' সৈয়দ মহম্মদেরও অনুরূপ অভিযোগ। সে সরকারী কাজে এলাহাবাদ আর উজ্জয়িনীতে কুম্ভ-মেলার সময় গেছে। হিন্দুদের অনাচারটা সে নিজের চোখে দেখে এসেছে। মেলার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ঘেন্নায় মুখ কোঁচকাল সে। নদীর পানিতে বিষ, বাতাসে বিষ। এলাহাবাদের গঙ্গায় প্রবাহ আছে। রোগ জীবাণু দূরে ভেসে যায়। কিন্তু ছোট্ট নদী শিপ্রার তীর বাঁধা। অথচ হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন সেখানে স্নান করছে আর নদীর পানি দূষিত করছে। যত্রতত্র

পড়ে আছে গোবর আর বাসি গাঁদা ফুল। চড়া রোদে জ্বলে পুড়ে যায় শরীর। এখানে সেখানে সাধুদের ছাউনি। শহরের রাস্তায় নির্লজ্জের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে ন্যাংটা সাধুর দল। উজ্জয়িনীর মন্দিরে কোন্ ঠাকুরের মূর্তি তা জানবার চেষ্টাও করে নি সৈয়দ। হিন্দুদের মূর্তিপূজার ব্যাপারটা তার কাছে এতই অবজ্ঞার যে কোনো আগ্রহই দেখায় নি সে। এগুলো তার কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ এবং অবজ্ঞার বস্তু। কথা বলতে বলতে সৈয়দ এত উত্তেজিত হয়ে পড়লো যে তার ভাষা আর কেতাবী রইলো না। পাঞ্জাবের যে অঞ্চলের অধিবাসী সেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা শুরু করে দিল সে। সেই দুর্বোধ্য ভাষা যে কারোই মর্মগত হচ্ছিল না তা বলাই বাহুল্য। তবে সবাই বুঝলো যে অতঃপর মনের ঘৃণা আর উষ্মা প্রকাশের যথার্থ মাধ্যম সে খুঁজে পেয়েছে। হিন্দু নিন্দাটা আজিজেরও নেহাৎ খারাপ লাগছিল না। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইসলাম ধর্মের পরোক্ষ প্রশংসা। আজিজ ধর্মপ্রাণ মানুষ। পরধর্মের নিন্দা আর নিজের ধর্মের প্রশংসা শুনলে মন খুশি হয়। মনের আকাশে বর্ণময় সুন্দর কল্পনার নানান ছবি ফুটে ওঠে। তাই ইঞ্জিনীয়ার সৈয়দের একটানা হিন্দু নিন্দা শুনে বেশ একটা আত্মশ্লাঘা হলো আজিজের। উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে উঠলো, 'আমারও ঠিক ওই মত।' এই বলে লেপের ভেতর থেকে সে প্রথমে হাত দুটো বার করলো, তারপর সারা দেহটাই বার করে ফেললো। মনটা দারুণ কোমল আর বেদনাঘন হয়ে উঠেছে তখন। এই অবস্থায় গালিবের কবিতা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ছিল না আজিজের। মনের গভীরতম প্রদেশ থেকে কবিতার অনায়াস নিঃসরণ হলো। এ এমন কবিতা যে ঘটনার সঙ্গে যোগ না থাকলেও কিছু আসে যায় না। শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রসাদগুণ হলো তার অন্তর্গত করুণরস। কাব্যের উৎকর্ষ তখনই হয় যখন শ্রোতার মনের ব্যথার সঙ্গে কাব্যের আত্মিক যোগ হয়। একটা সুন্দর কোমল ফুল দেখে মানুষের মন যেমন ব্যথিত হয়, তেমনি এক ব্যথার শিহরণ হয় মরমী কবিতা শুনলে। সবাই তখন আত্মগত হয়ে শুনছে। বিশৃঙ্খল ঘরখানা অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেছে। থেমে গেছে নিরর্থক কোলাহল। উদাসীন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল মির্জা গালিবের সেই অমর আশ্বাস-বাণী। কলহ নয়, বিচ্ছিন্নতা নয়—একতাই ভারত মহাদেশের অন্তর্গত সত্য-মন্ত্র। শ্যায়রী গালিব তাঁর অমর কবিতার মধ্যে ঐক্যের এই উদার বাণীর সুরভি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সুদূর পারস্যে, আরবদেশে, তুর্কীস্থানে। তাঁর বেদনার গান শুনে ইসলাম ভাইয়েরা তাদের ভ্রাতৃত্ববোধের হাতখানি বাড়িয়ে দিয়েছে খণ্ড বিধ্বস্ত চন্দ্রপুরের দিকেও। বলেছে, তোমরা ভুলো না যে তোমরা ভারতবর্ষের মানুষ। ভুলো না যে তোমরা এক, তোমরা অখণ্ড।

দলের মধ্যে শুধু হামিদউল্লারই যা কিছু রসবোধ আছে। অন্য মানুষগুলোর নিরেট পাথর মনে কোন দাগ কাটে না। তবুও উৎফুল্ল হয়ে তারা মির্জা গালিবের কবিতা শুনছিল, কারণ তাদের সভ্যতা থেকে সাহিত্যকে আলাদা করে ফেলা হয় নি। পুলিশ ইন্সপেক্টর হকের কথাই ধরা যাক। মোটা দাগের মানুষ সে। তার একবারও মনে হয় নি যে কবিতা আবৃত্তি করে আজিজ

নিজেকে খেলো করছে! বরং ইংরেজদের মতন কবিতার উদ্দাম উচ্ছ্বাসের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে নিমজ্জিত হয় নি বলে ভাল লাগল হক সাহেবের। খোলা মন নিয়ে সে কাব্যসুধা পান করেছিল। তার মনের হীন ভাবনাগুলো তখন যেন কোন মায়ামন্ত্রে আশ্চর্য সজীব আর সদানন্দ হয়ে উঠেছে। এই অনুভূতি শুধু তার নয়। অন্যদেরও হয়েছে। কবিতা শুনে বৈষয়িক লাভ হয় না। তাদেরও হলো না। কিন্তু বুঝতে পারছিল যে কবিতা হলো আকাশ-পথের তীর্থযাত্রী। আকাশচারী বিহঙ্গের মতন মাটি ও আকাশের মধ্যে সে যেন যোগসূত্র। হিন্দুরা অনেক বাসনা নিয়ে কৃষ্ণনাম করে। এ কবিতার বাণী হিন্দুদের কৃষ্ণনাম জপের চেয়েও নিভৃত। এ যেন একলা মানুষের মনের কান্না তার প্রিয় সখার জন্যে। হয়ত প্রিয়সখা কোনদিন আসবে না। দেখা দেবে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে নেই। আজিজ গভীর-ভাবে তার মনোজগতেই ডুবে আছে। তবে কেমন যেন নিমজ্জিত দেখাচ্ছিল তাকে। সাধারণত কবিতা পাঠের পরেই এইরকম একটা অনুভূতি হয়। কেন হয় তা সে জানে না। হয়ত এর কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই তাই।

আসার পথে হামিদ একটা সভায় গিয়েছিল। সভাটা জাতীয়তাবাদীদের সভা। একটা দল আছে তাদের। সবাই প্রায় নামকরা মানুষ। হিন্দু শিখ মুসলমান, পার্শী জৈন, দিশি খ্রীশ্চান—সব ধর্মাবলম্বী মানুষই আছে কমিটিতে। স্বাভাবিক না হলেও এরা পরস্পরকে ভালবাসার চেষ্টা করে। এদের ইংরেজ বিদ্বেষ খুব তীব্র এবং যতক্ষণ এই অসূয়া বজায় থাকে ততক্ষণ তারা এক। কিন্তু অন্য ব্যাপারে এরা সবাই ভিন্ন মত এবং ভিন্ন-স্বার্থের মানুষ। ইংরেজ তাড়ানোই এদের লক্ষ্য। আর কোন কাজে এরা সংঘটিত নয়। তাই হামিদের সন্দেহ হয়, হয়ত ইংরেজ চলে গেলে এই দলও ভেঙে যাবে। হামিদও এদের সঙ্গে যুক্ত। তবে মনে মনে সে খুশি যে, আজিজ এই দলে নেই। আজিজকে সে ভালবাসে, তাছাড়া সে তার আপনজন। এই ধরনের খেলো রাজনীতির চর্চায় মানুষের লাভ হয় না। উপরন্তু চরিত্রবল নষ্ট হয়। শ্রমকাতর হয়ে পড়ে মানুষ। আর চরিত্রবল না থাকলে শ্রম না করলে জীবনে যে প্রতিষ্ঠা আসে না তা কে না জানে। কেমব্রিজের স্মৃতি মনে পড়ে গেল হামিদ্‌উল্লার। বিশ বছর আগের কথা। কিন্তু কি মধুর সেই দিনগুলো! ব্যানিস্টার সাহেব ছিলেন তাদের রেক্‌টর। খেলাধূলো কাজকর্ম সবই হতো একটা চমৎকার বোঝাবুঝির পরিবেশের মধ্যে। একটা সুস্থ জীবন গড়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ ছিল সেখানে। কিন্তু কই রাজনীতির প্রশ্রয় তো ছিল না সেখানে? এখানে সব কিছুই স্বার্থপ্রণোদিত। সবাই স্বার্থের টানে পরস্পরকে টানছে। সৈয়দ মহম্মদ বা হক্‌, এদের কাউকেই হামিদ বিশ্বাস করে না। আর ওই রফী ছোঁড়াটা তো একটা বিচ্ছু! এইসব ভাবতে ভাবতে আজিজের দিকে চেয়ে নিচু হয়ে বললো 'এবার আমরা উঠবো রে! বেশ বেলা হয়ে গেছে! তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ্‌। তুই না থাকায় আমাদের ঘরোয়া বৈঠক তো প্রায় অচল হতে বসেছে।'

সবার দিকে চেয়ে আজিজ বললো, 'আপনারা সবাই যে অনুগ্রহ করে আমায়

দেখতে এসেছেন, তার জন্যে আমি কৃতার্থ। এ আমি জীবনে ভুলবো না।'
'আমাদের মনে রেখ তাহলে! আমরাও চাই যে তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো! সবাই সাধ্যমত শুভেচ্ছা জানালো। নিষ্ফল কামনা সন্দেহ নেই, তবে এ শিখা সব মনেই অনির্বাণ জ্বলে। ওরা আরও খানিক বসলো। হাসান বাজার থেকে আখ এনেছে। তাই চিবোচ্ছিল ওরা। আজিজ এক কাপ দুধ খেল। তখনই আর একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পেল সবাই। আবার কে এল? প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি থেকে নাবলো ডাক্তার পান্নালাল, পেছনে রামচাঁদ। গাড়িটা সে-ই চালিয়ে এনেছে। দূর থেকে দুশ্চিন্তায় আজিজের অসুখ বেড়ে গেল এবং লেপের তলায় অদৃশ্য হলো সে।।
ঘরে ঢুকেই থমকে গিয়েছিল পান্নালাল ডাক্তার। যে কটি মানুষ ঘরে বসে আছে তারা সবাই যে উগ্রপন্থী তা সে জানে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। তার মনে হচ্ছিল বোধহয় হঠাৎ শত্রু শিবিরে ঢুকে পড়েছে। তাই কৈফিয়ৎ দেবার মতন সে বলে উঠলো, 'মাপ করবেন আপনারা! মেজর ক্যালেন্ডারের হুকুমেই আমি ওঁকে দেখতে এসেছি। কেমন আছেন উনি?'
'ওই তো শুয়ে আছে, দেখুন!' আজিজকে দেখিয়ে বললো হামিদ্।
'ডাকবো?'
'ডাকুন।'
"ডাক্তার আজিজ! আমি পান্নালাল। কেমন আছেন?'
আজিজ তখন লেপের তলা থেকে ভাবলেশহীন মুখখানা বের করেছে। হাতে থার্মোমিটারটা ধরা। পান্নালালের দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিল সে। পান্নালাল নাড়ি টিপে খানিকক্ষণ সিলিংয়ের দিকে চেয়ে বললো, 'একটু জ্বর আছে।' আড়চোখে থার্মোমিটার দেখে নিয়েছে সে। পরিবেশটা গোড়া থেকে খারাপ লেগেছে রামচাঁদের। তাই এদের উসকে দিতে সে হঠাৎ বলে বসলো, 'তেমন জ্বর নয়।' বোধহয় থার্মোমিটারটা সেও উঁকি দিয়ে দেখেছে।
কিন্তু পান্নালাল আমল না দিয়ে বললো, 'না। না। জ্বর আছে। এখন ওঁর শুয়ে থাকাই উচিত।' এই বলে থার্মোমিটারটা ঝেড়ে রাখলো যাতে আর কেউ না দেখতে পায়। আজিজ তার সহকর্মী। কিন্তু ছোকরাকে তার খুব পছন্দ হয় না। ইচ্ছে করলেই উল্টো রিপোর্ট দিয়ে সে তাকে মুশকিলে ফেলতে পারে। ভোগা দিয়ে ছুটি খাওয়া বেরিয়ে যাবে। কিন্তু মেজর ক্যালেন্ডার লোকটা একটু অদ্ভুত ধরনের। যদিও উগ্র নেটীভ বিদ্বেষী, তবুও চুকলি খায় না লোকটা। সুতরাং ও রাস্তায় না চলাই ভাল। বরং সহানুভূতি দেখিয়ে আজিজকে হাতে রাখাই নিরাপদ। পান্নালাল তাই বেশ খানিকটা উদ্বেগ নিয়ে শরীরের অন্য উপসর্গগুলো জেনে নিচ্ছিল। যেমন, মাথায় কোন অস্বস্তি আছে কি না, পেটের কোন গোলমাল আছে কি না ইত্যাদি। সব শেষে পথ্য হিসেবে শুধু দুধের ব্যবস্থা করলো পান্নালাল। হামিদ্ কিছুক্ষণ থেকেই পান্নালালকে লক্ষ্য করছিল। তার মনে হলো লোকটাকে হাতে রাখা দরকার। সুতরাং খোসামোদ করে বললো, 'আপনি নিজে এসে দেখে গেলেন ডাক্তার

সাহেব, আমরা যে কত নিশ্চিন্ত হলুম।'
'এ তো আমার কর্তব্য।'
'তা হোক। আমরা তো জানি আপনি কত ব্যস্ত!'
'তা বটে।'
'আর শহরময় রোগের যা ছড়াছড়ি!'
এতক্ষণ বেশ লাগছিল কথাগুলো শুনতে। স্তুতিবাক্য মিথ্যে হলেও অপ্রিয় হয় না। কিন্তু হামিদের শেষ কথায় পান্নালাল চকিতে সচেতন হলো। শয়তানির গন্ধ পেল যেন। কথার ফাঁদে ধরা পড়ে যাবে না তো সে? শহরে রোগের বালাই নেই বা শহরময় রোগের ছড়াছড়ি, দুটোর কোনটাই স্বীকার করতে সে প্রস্তুত নয়। কারণ, পরে এটাই তার বিরুদ্ধে এরা ব্যবহার করবে। সুতরাং ভেবে চিন্তে সতর্কতার সঙ্গে সে বললো, 'রোগও থাকবে আর আমাকেও ব্যস্ত থাকতে হবে। এটাই হলো ডাক্তারদের সামাজিক কর্তব্য।'
'ওঁর তো আবার এক মিনিটও সময় নেই। এখুনি গভর্নমেণ্ট কলেজে ছুটতে হবে ওঁকে।' রামচাঁদ বললো।
'প্রফেসর গড়বোলেকে দেখতে বোধহয়?'
পেশাগত গোপনতা বজায় রাখলো ডাক্তার পান্নালাল। কোনো জবাব দিল না। হামিদ্‌উল্লা ফের বললো, 'শুনলাম ওঁর ডায়েরিয়া হয়েছে। কেমন আছেন প্রফেসর গড়বোলে?'
'ভালো আছেন। তবে ওঁর ডায়েরিয়া হয় নি।'
'যাক নিশ্চিন্ত করলেন। আমাদের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। মানে, উনি আর আমাদের আজিজ, দুজনে খুব বন্ধু তো! তা কি হয়েছে ওঁর?'
'অর্শ।' বললো পান্নালাল।
আজিজ এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। এবার আর চুপ করে থাকতে পারলো না। লেপটা সরিয়ে উত্তেজিত হয়ে রফীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুই যে বললি কলেরা?'
পান্নালালও উত্তেজিত। বেশ চেঁচিয়েই বললো, 'এসব কে ছড়াচ্ছে বলুন তো?'
'কে আবার। ওই যে অপরাধী বসে আছে ওখানে!' রফীর দিকে আঙুল তুলে হামিদ্ বললো।
রফী ততক্ষণে সিঁটিয়ে গেছে ভয়ে। পান্না ডাক্তার তখনও উত্তেজিত। ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, 'আমি শুনেছি নানারকম অপপ্রচার চলছে আমার রুগীদের নিয়ে। কেউ বলছে কলেরা, কেউ বলছে প্লেগ। কিন্তু কোনটাই সত্যি নয়। মিথ্যে গুজব সব। শহরটা ভরে গেছে মিথ্যে গুজবে। কিন্তু এসব যারা ছড়াচ্ছে তাদের রীতিমত শাস্তি হওয়া উচিত।
হামিদ্ বললো, 'বুঝতে পারছো রফী! কতবড় অন্যায় করেছ তুমি? এবার বলো কেন এসব বাজে কথা ছড়ালে?'
ভয়ে জড়সড় হয়ে রফী মিনমিন করে যা বললো তার অর্থ হলো যে ব্যাপার-টার জন্যে সে মোটেই দায়ী নয়। আর একটি ছাত্রের মুখে সে ঘটনাটা শুনে-

ছিল। তাছাড়া সরকারী স্কুলে এমন পদ্ধতিতে তাদের ইংরিজি শেখানো হয়, যে, প্রায়ই তারা ভুল অর্থ বোঝে। তাই কোনো ছাত্রের পক্ষেই সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না।

'কিন্তু তাই বলে একজন ডাক্তারের নামে তো মিথ্যে অপবাদ দিতে পারো না?' বেশ রুষ্ট হয়েই বললো রামচাঁদ।

'ঠিক কথা।' বললো হামিদ্‌উল্লা। তার মনে হলো ব্যাপারটাকে আর বেশি গড়াতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, ইতিমধ্যেই সৈয়দ মহম্মদ আর হক্ সাহেবের মধ্যে চোখে চোখে কথা শুরু হয়ে গেছে। দুজনেরই মারমুখী মনোভাব। সুতরাং রফীর দিকে চেয়ে বেশ গম্ভীর ভাবে হামিদ্ বললো, 'রফী! তুমি অন্যায় করেছ। ডাক্তারবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। তোমার বাবাজীও তাই চান।'

পান্নালাল লজ্জা পেয়েছিল। বললো, 'থাক, থাক। বাচ্চা ছেলে, করে ফেলেছে। ক্ষমা চাইতে হবে না।'

কিন্তু রামচাঁদ সহজ হলো না। সে বললো, 'বাচ্চা হলেও শিখবে বৈকি!' এতক্ষণ সৈয়দ মহম্মদ একটা কথাও বলে নি। কিন্তু রামচাঁদের অর্বাচীন জিদ তার ভাল লাগলো না। সে ধাঁ করে বলে বসলো, 'শুনলুম, আপনার ছেলেটি তো নিচের ক্লাসও পাস করে নি।'

কি থেকে কি? সুতরাং রামচাঁদও চুপ করে থাকলো না। উল্টো অভিযোগ এনে বাঁকা সুরে বললো, 'ঠিকই শুনেছেন। ছাপাখানায় আমার ছেলের কোনো আত্মীয় তো কাজ করে না!'

সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এবং অবশ্যই শ্লাঘনীয় নয়। সৈয়দের মুখচোখ অপমানে লাল হয়ে উঠলো। তবে সে-ও অপবাদটা হজম করে নিল না। বললো, 'হ্যাঁ, তা বটে। যেমন ইদানিং তাদের প্রেসগুলো পাবার সুযোগও আপনার নেই!'

কথায় কথা বাড়ে। গলা চড়ছে দুপক্ষেরই। নোংরা ইঙ্গিত, উত্তপ্ত কথাবার্তা। হামিদ্ বা পান্নালাল কেউই তাদের থামাতে পারছিল না। এই উচ্চরব কলহের মধ্যে কখন যে চুপিসাড়ে ফীলডিং ঢুকেছে তা কেউ দেখে নি। ঘরে ঢুকেই বিবদমান দুই পক্ষের দিকে চেয়ে ফীলডিং বললো, 'ডাক্তার আজিজ কি সত্যিই অসুস্থ?' বলা বাহুল্য, ফীলডিং-এর গলা শুনেই কলহকারীরা চুপ করে গেছে। ফীলডিং-এর সম্মানে সবাই তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। কি করবে ভেবে না পেয়ে হাতে রাখা আখটা দিয়ে মাছির ঝাঁকে খোঁচা দিল হাসান। ভন্‌ভন্ করে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো মাছিরা।

আজিজ তখন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে যেন। ছিঃ! এই পরিবেশে কোন মানুষকে আপ্যায়ন করা যায়? কোনরকমে 'বসুন' বলে আজিজ মুখ-রক্ষার চেষ্টা করলো। কয়েকটা ইতর স্বভাবের মানুষের ভিড়ে ঘরটা যেন থিকথিক করছে। মেঝেয় ছড়ানো আখের ছিবড়ে, কালির ফোঁটা। ভন্‌ভন্ করে উড়ছে মাছির ঝাঁক। নোংরা দেওয়ালে বক্রী হয়ে ঝুলছে বাঁধানো ছবি। গরমে গলদঘর্ম অবস্থা। একখানা পাখাও নেই যে মানুষকে একটু স্বস্তি

দেওয়া যায়। এইরকম মানুষগুলোর সঙ্গে আজিজ কখনও সময় কাটায় নি আগে। না জানি ফীলডিং তার সম্বন্ধে কি ভাবছে? এই সময় রফীর দিকে চোখ গেল তার। ছেলেটা জড়সড় হয়ে একপাশে চুপ করে বসে আছে। রফীকে কাছে ডাকলো আজিজ, তারপর হাত ধরে পাশে বসালো। ছেলেটাকে অকারণে অপদস্থ করেছে একটু আগে। কিন্তু এইসব বয়স্ক ইতর লোক-গুলোর চেয়ে ছেলেটা অনেক ভদ্র। আর যাই হোক, যেখানে সেখানে গলা উঁচিয়ে ঝগড়া করে না। আজিজের ভদ্রতায় রফীও অভিভূত। কোনরকমে বললো, 'আমায় ক্ষমা করুন স্যার!'

আজিজ খুব খুশি। বললো, 'আমায় দেখতে এসেছিস, খুব ভাল লাগছে আমার। দেখিস, খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবো আমি।'

পুলিস ইন্সপেক্টর হক্ তখন ফীলডিং-এর আপ্যায়নের জন্যে খানতিনেক চেয়ার সাজিয়ে ফেলেছে। ব্যাপারটা দেখেই আজিজের মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। তারপর লোকটার কথা শুনে সে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। হক্ তখন গদ-গদ হয়ে বলছে, 'আমাদের অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে এসেছেন—কি সৌভাগ্য আমাদের! আপনার মহানুভবতা......'

কিন্তু পরের কথাগুলো বলবার সুযোগ পেল না হক্। আজিজ যেন ঝলসে উঠলো রাগে। 'কি যা তা বলছেন? উনি অমন খোসামুদে কথা একদম ভালবাসেন না। তাছাড়া তিনখানা চেয়ারের কি দরকার? উনি কি তিনজন মানুষ? না কি সায়েব বলে বেশি খাতির করছেন?'

ফীলডিং বসতে বসতে প্রশ্নটা আবার করলো, 'ডক্টর আজিজ? আপনি কি সত্যিই অসুস্থ?'

'আপনার কি মনে হচ্ছে?' একটু থেমে আজিজ বললো, 'আমি জানি, মেজর ক্যালেন্ডারের সন্দেহ হয়েছে আমি শুধু শুধু ডুব দিয়েছি। তাই না মিস্টার ফীলডিং?'

ফীলডিং রহস্য করে জবাব দিল। বললো, 'ডুব দেন নি তো?' তার কথার ধরনে সবাই হেসে উঠলো। আজিজও হাসলো। তারা ভাবছিল মদালাপী ইংরেজরাও কত সজ্জন হয়। আজিজ স্মিত মুখে বললো, 'ডাক্তার পান্নালাল তো সামনেই রয়েছেন। জিজ্ঞেস করুন, আমি কেমন আছি।'

ফীলডিং ভদ্রতা করে বললো, 'হঠাৎ এসে পড়লুম। আপনার অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'একটুও না। ঘরে ছ'জন মানুষ। আপনিও একজন হলেন। বসুন। আপনার এই ছাত্রের সঙ্গে একটু কথা বলে নি। কিছু বলবি?' রফীর দিকে চেয়ে আজিজ বললো।

ঘরের পরিবেশ তখন বেশ সহজ হয়ে গেছে। শুধু রফীই সহজ হতে পার-ছিল না। স্বয়ং প্রিন্সিপ্যাল সাহেব সশরীরে উপস্থিত। কি থেকে কি হয় কে জানে। হয়ত লেখাপড়ার কথাও উঠতে পারে। একটু আগেই এঁকে নিয়ে একটা বিরূপ মন্তব্য করে ফেলেছে সে। সুতরাং কেমন করে সরে পড়া যায় তারই সুযোগ খুঁজছিল রফী।

ফীলডিংকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরালো হামিদ্‌উল্লা। তারপর বললো, 'আজিজ অসুস্থ নয় আবার অসুস্থও বটে। এবং সত্যি বলতে কি, আমরা সবাই তাই।'

কথাটা মেনে নিল ফীলডিং। সৌম্যদর্শন বিচক্ষণ ব্যারিস্টার হামিদ্‌উল্লাকে তার ভাল লেগেছে। বেশ বন্ধুর মতন হয়ে গেল দুজনে। ফীলডিং বললো, 'আমার কাছে এই বিশ্বসংসারটাই মূর্ত মনে হয়। কিন্তু তা তো নয়! হবেও না তা। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে বিধাতার মঙ্গলময় একটা বিধানের অস্তিত্ব হয়ত আছে।'

'ঠিক বলেছেন আপনি। একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন।' বললো হক্‌। তার ধারণা, বিধানের কথা বলে ধর্মেরই জয়জয়কার করা হলো।

হঠাৎ হামিদ্‌ জিজ্ঞেস করলো. 'আপনি কি সত্যিই তা বিশ্বাস করেন?'

'কোন্‌টা বলুন তো? জগৎটা মৃত কি না? উঁহু! করি না।

'তা নয়। ওই যে বিধাতার বিধানের কথা বললেন?'

'না। বিধান আমি মানি না।'

'সেকি? বিধান মানেন না অথচ ঈশ্বর মানেন? কেমন করে তা সম্ভব?' বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো সৈয়দ মহম্মদ।

'কে বললো ঈশ্বর মানি? আমি ঈশ্বরও মানি না।' বেশ জোর দিয়েই ফীলডিং বললো।

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে তখন। যেন বলতে চাইছে, 'কী? বলি নি তোমায়?' ইত্যাদি। আজিজও তটস্থ। যেন তারই অপরাধ। শুধু হামিদ্‌-উল্লাই ব্যতিক্রম। একটু পরেই সে জিজ্ঞেস করলো. 'আচ্ছা মিস্টার ফীলডিং? শুনেছি ইংল্যাণ্ডের বেশিরভাগ মানুষ নাকি নাস্তিক?'

'আপনি কি শিক্ষিত সমাজের কথা বলছেন? হ্যাঁ তাই।' তবে এযুগে ওই নাস্তিক আস্তিক নামকরণগুলো কেউ পছন্দ করে না। ঈশ্বর আছেন কি না এ নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে অনেক হুজুক হয়েছে। তখন আপনি আমি খুব ছোট। এখন য়ুরোপে এ নিয়ে কেউ মাতামাতি করে না।'

'তার জন্যে কি নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে না?'

'সেটা নির্ভর করে......' বলতে বলতে চুপ করে গেল ফীলডিং। তারপর বললো, 'হয়ত হচ্ছে।'

'মাপ করবেন মিস্টার ফীলডিং। আমার তো মনে হয় ভারতবর্ষকে পরাধীন করে রাখাও ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ভ্রষ্টাচার করা। আপনি কি বলেন?'

আলোচনার মধ্যে অনিবার্যভাবে রাজনীতি এসে যাচ্ছে। অস্বস্তিকর সন্দেহ নেই। ফীলডিং নিজেও অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। তাই সরাসরি বললো 'দেখুন হামিদ, ওভাবে আমি ভাবি নি। তাই জবাব দেওয়াও আমার পক্ষে শক্ত। আমি এদেশে এসেছি কারণ আমার একটা চাকরির দরকার ছিল। শাসক হয়ে ইংল্যাণ্ডে থাকা উচিত কি উচিত নয় তা বলতে পারবো না।'

'যোগ্যতা থাকলে শিক্ষকের চাকরি তো ভারতীয়রাও পেতে পারে?' হামিদ আবার জিজ্ঞেস করলো।

'নিশ্চয়ই পারে। তবে আমি আগে পেয়েছি।' মৃদু হেসে বললো ফীলডিং। 'মাপ করবেন মিস্টার ফীলডিং! তাহলে সত্যি কথাটাই বলি। যেখানে একজন যোগ্য ভারতীয় পাওয়া যাচ্ছে সেখানে একজন ইংরেজকে বসিয়ে দেওয়া কি অন্যায় নয়? আমার প্রশ্নটা কোন ব্যক্তিবিশেষকে নয়। আপনার সম্বন্ধে আমাদের কোন ক্ষোভ নেই। বরং আপনি যে আমাদের মধ্যে এসেছেন, মিশছেন তার জন্যে আমরা ভীষণ খুশি।' বললো হামিদ।

ফীলডিং চুপ করে শুনলো। এর একটাই উত্তর হয়। জোর করে বলা যে এদেশের লোকের ভাল করতেই ইংরেজরা এখানে আছে। কিন্তু এমন মিথ্যে এবং অসভ্য উত্তর দেবার প্রবৃত্তি ফীলডিং-এর হলো না। ভাল হবার লোভ অনেক আগেই এই প্রবৃত্তিটা নষ্ট করে দিয়েছে। তাই সে অন্যভাবে জবাবটা দিল। ফীলডিং বললো, 'আমিও ভীষণ খুশি এদেশে এসে। এটাই আমার জবাব। এর জন্যে আপনাদের কি ভালমন্দ হয়েছে জানি না। সেভাবে দেখলে নিত্য অনেক মন্দই তো আমরা করছি। আমার এই বেঁচে থাকাটাই তো একজনকে বঞ্চিত করা! তাই না?' একটু থেমে ফীলডিং ফের বললো, 'আসল কথা হলো বেঁচে থাকার আনন্দ। আপনাদের দেশে এসে আমার ভাল লাগছে, আনন্দ হচ্ছে। আমি খুশি ভীষণ খুশি। এটাই আমার লাভ। দেখুন হামিদ্‌উল্লা, যে যতবড় বদমাশই হোক, তার জীবনে যদি আনন্দ থাকে, তাহলেই সার্থক হয় তার বেঁচে থাকা।'

হামিদ্‌উল্লা আর তার দলবল অবাক হয়ে শুনছিল ফীলডিংএর কথাগুলো। এমন কথা তারা আগে শোনে নি। এমন করে ভাবেও নি। কিন্তু এখন তারা বুঝতে পারলো, ফীলডিং যা বলেছে তা নেহাৎ ভাবাবেগ নয়। কথাগুলো সত্য, তবে প্রচলিত নিয়মনীতির পরিপন্থী। মানুষ তাই এই নিষ্ঠুর সত্য শুনতে চায় না পাছে মন অবসন্ন হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ মুখে যা বলে আর মনে যা ভাবে (একমাত্র স্নেহ মমতা ছাড়া) কদাচিৎ তা একরকম হয়। তাদের অসংখ্য মানসিক সংস্কার। এই সংস্কারগুলো নিয়েই জীবন যাপন করতে তারা ভালবাসে। কিছুতেই চায় না সেগুলো ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যাক। তাহলে জীবনধারণটাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। ব্যতিক্রম শুধু হামিদ্‌-উল্লা। একমাত্র তারই চিন্তাভাবনা এলোমেলো হয়ে যায় নি। তাই তখনও যুক্তি আঁকড়ে ছিল সে। হামিদ্‌ বললো, 'কিন্তু মিস্টার ফীলডিং, এমন কিছু ইংরেজ আছেন যাঁরা এদেশে এসেছেন বলে দুঃখিত। তাঁদের কি অজুহাত?'

'কোন অজুহাত নেই। তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিন এদেশ থেকে।'

হেসে ফেললো হামিদ্‌উল্লা। বললো, 'বাছবো কি করে? সে তো আরও শক্ত কাজ? 'শুধু শক্ত নয়। আরও খারাপ। কাজটা অন্যায়। আমরা ভারতীয়রা কাউকে তাড়িয়ে দিই না। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে কত মানুষ এসেছে গেছে, আমরা কাউকে চলে যেতে বলি নি। সবাইকে রেখে দিয়েছি এখানে। অন্যদের থেকে এইখানেই আমরা আলাদা। এটাই আমাদের জীবন-দর্শন। এটাই ভারতবর্ষের অধ্যাত্মশক্তি।'

রামচাঁদের ভাবাবেগ শুনে পুলিশ ইন্সপেক্টর হক্‌ প্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে

বলে ফেললো 'ঠিক কথা। খুব খাঁটি কথা।'
কিন্তু হামিদউল্লার কাছে এ ধরনের অসার ভাবাবেগের কোন দাম নেই। সে নিছক বাস্তববাদী। হক্ সাহেবের দিকে চেয়ে হামিদ বললো, 'সত্যি কি আমরা অধ্যাত্মশক্তিতে বিশ্বাস করি? সত্যিই কি আমরা জীবনে জীবন যোগ করাই? তাহলে আমরা আলাদা কেন? কেন আমরা এক হতে পারি না? আমরা কথা রাখি না, সময় রাখি না, কর্তব্য পালন করি না—এটাই কি ভারতবর্ষের তথাকথিত অধ্যাত্মবাদের নমুনা? বুঝলেন হক্ সাহেব! এইভাবেই চলবে যতদিন না দিন ফুরিয়ে আসছে।
হা হা করে হেসে উঠল ডাক্তার পান্নালাল। বললো, 'দিন ফুরোতে এখন অনেক দেরি। সবে সকাল সাড়ে দশটা। এখন-যদি অনুমতি দেন তো বলি, আজকের এই চমৎকার আলোচনা থেকে অনেক কিছু শিখলাম। বিশেষ করে মিস্টার ফীলডিংকে অনেক ধন্যবাদ। তাঁর অভিজ্ঞতা জীবনদর্শন, তাঁর আদর্শ আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যদি অনুসরণ করে এবং......।'
ততক্ষণে ফীলডিং হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়েছে। সকলের দিকে একবারটি চেয়ে হামিদউল্লাকে বললো, 'চলুন বেরিয়ে পড়ি। সবাই মিলে একজন অসুস্থ মানুষকে শুধু শুধু হয়রানি করছি। ডাক্তার আজিজ আমরা আজ উঠছি।'
ফীলডিং গমনোদ্যত হলো। সঙ্গে অন্যরা। বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে সবাই। চারজন মুসলমান, দুজন হিন্দু এবং একজন ইংরেজ। হামিদউল্লার পাশেই ফীলডিং। গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা। হামিদউল্লা বললো, 'আজিজ আপনাকে খুবই শ্রদ্ধা করে। তবে অসুস্থতার জন্যে আজ আপনার সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারলো না।'
'জানি তা।' একটু অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল ফীলডিং। ভারতীয়দের সঙ্গে এই মেলামেশাটা পছন্দ করছে না তার সমাজ। ক্লাবের একটা মন্তব্য কানে এসেছিল তার। সে নাকি নিজেকে খেলো করে ফেলছে। কিন্তু তাই কি? আজিজকে প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছিল তার। আলাপ করেও ভাল লেগেছে। তাই ছুটে এসেছে সে। মানুষটাকে আরও জানতে ইচ্ছে করে, আরও ঘনিষ্ঠ হতে। ফীলডিংও মনে মনে তাই চায়।

১০

গরমটা যেন ওৎ পেতেছিল এখন লাফিয়ে পড়লো। বারান্দায় বেরিয়েই ওরা তা টের পেয়েছে। পথঘাট খাঁখাঁ। মনে হচ্ছে কোনো মহামারীতে জনশূন্য হয়ে গেছে চন্দ্রপুর। ঘরের মধ্যে ওরা যখন অসমাপ্ত আলোচনায় ব্যস্ত ছিল, বাইরে তখন এতবড় ঘটনাটা ঘটে গেছে। আজিজের বাংলোর সামনে একটা বড়সড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কাজ এখনো শেষ হয় নি। বাড়ির গায়ে

ভারা বাঁধা। দুভায়ের নামে বাড়ি, দুজনেই জ্যোতিষী করে। এ বাড়িটাও জনশূন্য। অতবড় বাড়িটার একমাত্র বাসিন্দা একটা কাঠবিড়াল। মাথা নিচু করে তার নোংরা লেজটা নাড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠছে। তার কর্কশ ডাক শুনতে ভাল না লাগলেও সেই সুনশান নিঃশব্দ পরিবেশে মনকে উদাস করে দেয়। পাশেই একটা ঝাঁকড়া-মাথা গাছ। ধুলোয় মলিন অতবড় গাছটার ডালে ডালে অজস্র পাখির কিচিরমিচির। ওরা ব্যস্ত হয়ে খুঁটে খুঁটে পোকা খাচ্ছে। কোত্থেকে ভেসে আসছে একটা অদৃশ্য পাখির ডাক। পরিবেশের বিষণ্নতা যেন আরও বেড়ে যায় এই ডাক শুনে। মানুষের জগৎ ছাড়াও বিশ্বজুড়ে আর একটা জগৎ আছে। এই জগৎ আরও বড়—বিশাল তার ব্যাপ্তি। মানুষের সুখ-দুঃখ. ইচ্ছে-অনিচ্ছে নিয়ে এই প্রাণি-জগতের কোন মাথাব্যথা নেই। কে এই দেশটা শাসন করে, তারা ভাল না মন্দ, তা নিয়েও এই জগৎ বিচলিত নয়। এই নীরব প্রাণিজগৎ মানুষ সম্বন্ধে উদাসীন হলেও প্রকৃতি সম্বন্ধে এরা নির্বিকার নয়। মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যখন প্রকৃতির ওপর থেকে তার প্রভুত্ব তুলে নেয়. তখনই ধীরে ধীরে নিঃশব্দে প্রাণিজগৎ প্রকৃতির ওপর অধিকার সাব্যস্ত করে নেয়।

আজিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সাতজন মানুষই বুঝতে পারল যে গ্রীষ্মকাল নামক দুঃসময়টা তাদের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে। এ বোঝার ভার সবাইকে বইতে হবে। এখন থেকে ঝলসান দিনের বেলাটা কর্মহীন কাটবে। এই কর্মহীনতার বোঝা যেন আরও দুঃসহ। বাইরে বেরিয়েই ওরা বুঝতে পারল যে রোদের তাতে ওদের শরীর জ্বালা করছে। চোখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরোচ্ছে আর মাথার ওপর কে যেন এক হাঁড়ি গরম জল চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে মাথা গাল বেয়ে সর্বক্ষণ গরম ঘাম চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। কোন রকমে সেলাম আলেকম জানিয়ে ওরা একে একে গাড়িতে ঢুকলো। ঘরের স্নিগ্ধ পরিবেশে না ফেরা অব্দি ওদের আর শান্তি নেই। এই ঝলসান গরমে মুড়ি-মিছরি এক হয়ে গেছে। সেখানে না ফেরা অব্দি ওরা ওদের আলাদা পরিচয় ফিরে পাবে না।

শুধু চন্দ্রপুর নয়, গ্রীষ্মের দাবদাহে সারা ভারতবর্ষের মানুষ ভয়ে মুহ্যমান হয়ে যায়। যতক্ষণ না কোন নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে পারছে—হয় পাহাড় নয়ত কোন নিবিড় ছায়াবীথিকা, যেখানে সূর্যের রুদ্ররূপ উদ্যত খড়্গের মতন মনে হয় না—ততক্ষণ তার শান্তি নেই। সামনেই দারুণ এপ্রিল—সূর্য তখন নিষ্ঠুর উদাসীন হিংস্র। যে সাম্রাজ্যের সে রাজা সেখানে তার দোর্দণ্ড-প্রতাপ। তার উদ্ধত নিষ্ঠুর রূপ হতাশ প্রাণে আশ্বাস আনে না। গ্রীষ্মের সূর্য মানুষ প্রাণী কারও সখা নয়। তার দারুণ রোষ দীপ্তি প্রাণে প্রাণে আলো জ্বালায় না। গ্রীষ্মের সূর্য মহিমাদীপ্ত নয়। তার সব গৌরব হারিয়ে গ্রীষ্মের সূর্য মানুষের কাছে উপস্থিত হয় নেহাৎই তুচ্ছ অবাঞ্ছিত প্রাণীর মতন।

১১

হামিদউল্লা আর দলবল চলে গেছে! শুধু ফীলডিং তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে একা। কম্পাউন্ডের একটা অপরিসর কোণে একটা আচ্ছাদনের নিচে ফীলডিং-এর ঘোড়াটা অপেক্ষা করছে। কেউ ঘোড়াটাকে ডেকে দেয় নি তার কাছে। অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে ফীলডিং নিজেই ঘোড়াটাকে ডাকতে গেল। তখনই চোখা-চোখি হলো আজিজের সঙ্গে। বিছানার ওপর উঠে বসে আজিজ তাকে ডাকছিল। ফীলডিং বললো, 'কিছু বলবেন?'

'অনেক কিছু।'

'অর্থাৎ?'

'শেষ পর্যন্ত প্রাচ্যের আতিথেয়তার নিদর্শন পেলেন তো? আমাদের ঘর-সংসার দেখতে চেয়েছিলেন, তাই না? তা কি মনে হচ্ছে? দেয়ালময় মাছির চাক, পলেস্তারা খসে যাচ্ছে, বেশ লাগছে, কি বলেন? এখন কি ভাবছেন? কতক্ষণে সরে পড়বেন?'

ফীলডিং হাসছিল। বললো, 'সে কথা থাক। আপনি বিশ্রাম করুন।'

বিশ্রামের কথায় আজিজ হঠাৎ রেগে গেল। বললো. ডাক্তার লালের দৌলতে এখন বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে পারি। মেজর ক্যালেণ্ডারের চর হয়েও দেখতে এসেছিল ভোগা দিয়ে ঘরে বসে আছি কি না। তা ঈশ্বর মঙ্গলময়। লাল নিজেই দেখে গেল যে আমি অসুস্থ।'

'ভারতীয় বা ইংরেজ কাউকেই বিশ্বাস করে না মেজর ক্যালেণ্ডার। ওইরকমই ওর স্বভাব। অমন সন্দিগ্ধমনা একটা মানুষের কাছে যদি কাজ না করতেন, তবে খুশি হতুম। কিন্তু ভবিতব্য!'

ফীলডিংএর কথা শেষ হতেই আজিজ বললো, 'আপনার কি ফেরার খুব তাড়া আছে মিস্টার ফীলডিং? একটু আসবেন ঘরে? একটা কথা ছিল।'

ফীলডিং আবার আজিজের ঘরে ঢুকলো।

'বলুন!'

'এই নিন চাবি। ড্রয়ারটা খুলুন।' আজিজ চাবি দিল। তারপর বললো, 'খুলেছেন? টানার মধ্যে একটা ব্রাউন রঙের কাগজের মোড়ক পেয়েছেন?'

'পেয়েছি।'

'মোড়কটা খুলুন!' ফীলডিং কাগজের মোড়ক খুলে দেখলো একটি মেয়ের ছবি। বললো, 'কে ইনি?'

'আমার স্ত্রী।' একটু থেমে আজিজ ফের বললো, 'আপনি হলেন প্রথম বিদেশী এবং পরপুরুষ যিনি ওর মুখ দেখলেন।' ফীলডিং লজ্জা পেয়েছিল। ছবিটা তাড়াতাড়ি আজিজকে দিতে গেল। শুধু লজ্জা নয়। একটু অবাকও

হয়েছে সে। মরুভূমিতে পথ চলতে শুকনো পাথরের বুকে সে যেন হঠাৎ ফুলের বাহার দেখতে পেয়েছে। চমকটা সেইরকমই মধুর আর আকস্মিক। ফুলটা ফুটেই ছিল, এখন শুধু পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। শাড়ি পরা সাধারণ একজন মুসলমান মেয়ের ছবি। সোজাসুজি তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। অনবগুণ্ঠিতা রমণীর নিঃসঙ্কোচ চাউনি। ফীলডিং বেশ অপ্রস্তুত। বললো, 'আমার মতন একজন পরপুরুষকে আপনার বিবির ছবি দেখতে দিলেন ; আমি কৃতার্থ।'

'ওটা কিছু নয়। আমার বিবি লেখাপড়া জানা মেয়ে ছিল না। দেখতে শুনতেও অসাধারণ কিছু নয়। বেঁচে থাকলে ওর সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই আলাপ হতো। সুতরাং ছবি দেখেছেন বলে লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই।'

ফীলডিং আরও বিস্মিত। বললো, 'আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন?'

'নিশ্চয়ই!'

'কিন্তু আপনাদের জেনানা তো পর্দানশীন শুনেছি!'

'ঠিকই শুনেছেন। আমি নিজেও ওই প্রথা মানি। তবে আপনি যদি আমার ভাই হন তাহলে বাধা কোথায়? হামিদ্‌উল্লা এবং আরও অনেকের সঙ্গেই তার আলাপ ছিল।'

'আপনার বিবি কি সবাইকে আপনার ভাই ভাবতেন?' ফীলডিংএর বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটতেই চাইছিল না।

একটু অপ্রস্তুত হলো আজিজ। বললো, 'ঠিক তা নয়। তবে ভাই হলে সম্পর্কটা মধুর হয়। তা ছাড়া আমাদের সমাজে এর চলও আছে। সব পর-পুরুষের আচরণ যদি সহোদরের মতন হতো, তাহলে হয়ত পরদা প্রথাটা উঠেই যেত।'

'পর্‌দা আর পরদার—দুটো প্রায় কাছাকাছি শব্দ ; তাই না আজিজ?'

'ঠিক সেইজন্যেই আপনাকে ছবিটা দেখতে দিয়েছিলুম। আমি জানতুম আপনার বাইরেটা যেমন শোভন ভদ্র, ভেতরটাও তেমনি। আপনি যথার্থই আমার সহোদর।' খানিক চুপ করে আজিজ আরও গভীর স্বরে বললো, 'সবাই চেষ্টা করেও ভাল হতে পারে না, ফীলডিং।'

ফীলডিং তাকিয়েছিল। আজিজ বলে চললো। আবেগে গলার স্বর তার কাঁপছিল। 'মিস্টার ফীলডিং, আপনি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেও আমি কিন্তু আপনার যোগ্য সম্মান দিতে পারি নি। তাই যখন ডাকলুম, তখন ভাবি নি যে আপনি ফিরে আসবেন। আপনি জানেন না, আমরা ভারতীয়রা একটু সহানুভূতি একটু ভালবাসা দুটো মিষ্টি কথার জন্যে কিরকম কাঙাল হয়ে থাকি। তাই যার কাছে তা পাই তাকে আমরা ভুলি না। এটাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।' আজিজ চুপ করলো, মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্নের দেশ থেকে কথা বলছে সে। ফীলডিং সবিস্ময়ে তাকিয়েছিল। আজিজের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে চোখ নাবিয়ে নিল। আজিজ কিন্তু চুপ করে গেল না। আবার বললো, 'আপনারা ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কারের কথা ভাবেন কিন্তু মানুষের কথা ভাবেন না। তাদের মনের ভাবনাচিন্তার

কোন দাম দেন না। কিন্তু এই সংস্কারের কাজগুলো কি বাহ্যিক নয়? মহরমের কথাই ধরুন। তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোবে। তাই নিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে বিবাদ বাধলো। আপনারা বিচার করতে বসলেন। বললেন, হয় তাজিয়া ছোট কর নয়ত মিছিলটা অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দাও। পাড়ায় পাড়ায় তাই নিয়ে আপনারা শান্তি কমিটি করলেন। ভাল কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু সবটাই বাহ্যিক। মনের কথা জানতে চাইলেন না। আমাদের নিয়ে আপনারা পার্টি দেন, কিন্তু যখন আমরা মিশতে যাই তখন চামড়ার রঙ দেখে আপনারা নাকমুখ কোঁচকান। ব্যাপারটা কি অপমানের নয়?'

'অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই ভুল। ভুল দিয়ে শুরু, ভুলেই শেষ। তাই না?'

কিন্তু আমি বুঝলেও সরকারী কর্তাব্যক্তিরা তো বোঝেন না।'

কথাটা বলে ফীলডিং আবার ছবিখানার দিকে তাকালো। ঘোমটা সরিয়ে আজিজের বিবি পৃথিবীর দিকে সরাসরি চেয়ে আছে। হয়ত স্বামীর নির্দেশ পালন করেছে ও। হয়ত নিজেও চেয়েছিল অবগুণ্ঠন সরিয়ে তাকাতে। কিন্তু কি দেখছে মেয়েটা হতবাক, বিহ্বল হয়ে? এই কপট পৃথিবীর রূপ? তাই কি এই বিহ্বলতা?

ছবিটার দিকে তাকিয়েছিল ফীলডিং। আজিজ শান্তভাবে বললো, 'ছবিটা এবার আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিন। আজ আর ওই ছবির কোন দাম আমার কাছে নেই। মানুষটাই নেই! ওটা কেন আপনাকে দেখালুম, জানেন? আমার আর কিছু দেখাবার নেই তাই বাংলোটা ঘুরে দেখলেই বুঝবেন। সব শূন্য খাঁখাঁ করছে। আমার স্ত্রী গত। আমার তিন ছেলে-মেয়েরা থাকে তাদের দিদার কাছে। আমি এখানে একা পড়ে আছি। এই হলো আমার সংসার।'

বিছানার ওপরে আজিজের পাশে বসলো ফীলডিং। মন খুলে আজিজ তাকে অনেক কথা আজ বলেছে। এই সামান্য বিশ্বাসটুকুর অনেক দাম। তাই বিষণ্ণ হলেও তার আত্মশ্লাঘা হচ্ছিল। তার মনে হলো এমনি আবেগ-তরঙ্গে যদি সে নিজে ভেসে যেতে পারতো! আজিজের এই উচ্ছ্বাসটা তাকে স্পর্শ করেছে। হয়ত পরের বার যখন দেখা হবে তখন নিজেকে অনেক গুটিয়ে নেবে আজিজ। এটা অনুভব করে ফীলডিংএর মন আরও উদাস হয়ে গেল। আজিজ বলছিল ওরা সবাই দয়ার কাঙাল। এই হতভাগা জাতিটাও। দয়া, সহানুভূতি এসব অনেক দেওয়া যায়। কিন্তু শুধু দয়া দেখিয়ে কি হবে? জাতিটা তো মরে গেছে! এখন যা দরকার তা দয়া নয়, দোলা। রক্তে মাতন। কিন্তু আজিজ যা চাইলো তা দেবার সাধ্য তার নেই। জীবনের পিছন দিকে তাকালো ফীলডিং। বলবার মতন কতটুকু ফসল সে তুলতে পেরেছে? ঝুলিতে এতদিন ধরে যা সে ভরেছে তা দেখাবার মতন জিনিস নয়। সবগুলোই অনাবশ্যক। মহার্ঘ অভিজ্ঞতায় কেনা নয় একটাও। তাই সেগুলো কাউকে দেখায় নি সে। একটি মেয়েকে ভালবেসেছিল। কিন্তু মেয়েটি তাকে প্রবঞ্চনা করলো। জীবনপাত্রে এই একজনের স্মৃতিই অনেকদিন ভরা ছিল।

যতদিন গভীর ছিল এই স্মৃতি ততদিন অন্য নারীকে ভাল লাগে নি। স্মৃতি ঝাপসা হলে রক্তে দোলা লাগলো। মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলো। আবার ছাড়াছাড়ি আবার অনুতাপ। পরে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এসেছে মন। বলতে কি এ সবই তুচ্ছ। যেটা প্রধান তা হলো মনের এই শান্তি। আজিজ নিজেও ফীলডিংএর অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতে চায় নি। তার ধারণা, মনের কুঠুরিতে স্মৃতিগুলো ধরা আছে নিষ্প্রাণ স্তূপের মতন।

ফীলডিং ভাবছিল যে আজিজ বা কারো সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত নয়। এটা তার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা যে মানুষকে ততদিনই সাহায্য করা যায় যতদিন সে চায়। যেদিন চাইবে না সেদিনই সরে আসবে তার পথ থেকে। এটা তার জীবনদর্শন। অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ পড়বে না।

আজিজের দিকে তাকিয়েছিল ফীলডিং। একসময় জিজ্ঞেস করলো, 'গত বৃহস্পতিবার যে দুজন মহিলার সঙ্গে আলাপ হলো তাদের কেমন লাগলো তোমার?'

আচমকা 'তুমি' সম্বোধনে অবাক হলো আজিজ। কিন্তু প্রশ্নটা স্মৃতিসুখকর নয়। তাই বিতৃষ্ণায় মাথা ঝাঁকালো সে। মনে পড়লো মাড়াবার কেভ্‌স্‌ সম্বন্ধে একটা হঠকারী মন্তব্য করে ফেলেছিল সেদিন। সরাসরি জবাব না পেয়ে ফীলডিং আবার জিজ্ঞেস করলো, 'সাধারণভাবে ইংরেজ মেয়েদের কেমন লাগে তোমাদের?

আজিজ একটু ঘুরিয়ে জবাব দিল। বললো, 'হামিদের মতে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ওরা বেশ ভাল। তাই ওদেশে ভাল লাগে। এখানে আমরা ওদের দিকে তাকাই না। মানে সাবধানে মেলামেশা করি। কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক। অন্য কথা বলো।'

'হামিদ্‌উল্লা ঠিকই বলেছে। সত্যি ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ওরা চমৎকার। কিন্তু এখানে দেখছি ওরা অন্যরকম। বোধহয় এদেশটা ওদের ঠিক পছন্দ নয়।' বললো ফীলডিং, আজিজ তাকিয়েছিল তার দিকে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি বিয়ে করো নি কেন?'

ফীলডিংএর ভাল লাগলো প্রশ্নটা। বললো, 'বিয়ে ছাড়াই তো বেশ কাটিয়ে দিচ্ছি। আবার বিয়ের কি দরকার? ভাবছিলুম আমার নিজের কিছু কথা তোমায় বলবো। শুনবে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'একজনকে ভালবাসতুম। সে কিন্তু আমায় চাইলো না। বিয়ে না করার এটাই আমার প্রধান কারণ। অবশ্য সে ঘটনাও প্রায় পনেরো বছর আগের।'

'তোমার তো ছেলেমেয়েও নেই।'

'মানে?' ফীলডিং অবাক।

'কিছু মনে করো না ফীলডিং।' ফীলডিংএর চোখে চোখ রেখে আজিজ ফের বললো, 'কোনো অবৈধ সন্তানও নেই?'

'থাকলে খুশি হয়েই বলতাম।' বললো ফীলডিং।

'তাহলে মৃত্যুর পর তোমার নাম তো মুছে যাবে পৃথিবী থেকে।'
'নিশ্চয়ই যাবে।' খুব উদাসীন ভাবে জবাব দিল ফীলডিং।
আজিজ চুপ করে একটু ভাবলো। তারপর বললো, 'আমরা প্রাচ্য দেশের মানুষরা তোমাদের এই উদাসীনতার মানে বুঝি না।'
'আমি ছেলেমেয়ে চাই না। এ ব্যাপারে আমার কোন মোহও নেই।'
'এটা কোন আবেগের ব্যাপার নয় ফীলডিং।'
'তবে কিসের ব্যাপার? অভাব? আমার কোন অভাববোধও নেই। আমার মৃত্যুশয্যায় দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েরা কাঁদছে এ দৃশ্য কল্পনা করতে আমি রাজি নই। বরং তার বদলে কোন আইডিয়া রেখে যেতে চাই যা আমায় বাঁচিয়ে রাখবে চিরকাল। আরও তো অনেকে আছে। তারা ঘরসংসার করুক। তাদের ছেলেমেয়ে হোক। কর্তব্য পালন করুক তারা। তারপর ভারতবর্ষ ছেয়ে যাক এই সব চাকুরে ছেলেমেয়েরা।'
'তুমি য়্যাডেলাকে বিয়ে করছ না কেন?'
'হা ভগবান! ওইরকম একটা মেয়েকে?'
'কেন? দোষ কি তার?'
'ভাল করে ওকে জানি না। তবে মনে হয় পাশ্চাত্য শিক্ষার অত্যন্ত নিকৃষ্ট ফসল ও। মেয়েটা আমায় হতাশ করেছে আজিজ।'
তাই না কি?'
'হ্যাঁ। ভারতপ্রেমী হবার জন্যে তার কেমন একটা দম্ভ আছে। এদেশে এসে সে তাই লেকচার টুকে বেড়াচ্ছে। অমনভাবে কি দেশ জানা যায়?' ফীলডিং বললো।
'আমার তো মেয়েটাকে বেশ লাগে! বেশ ঝরঝরে মনের মেয়ে।'
'হয়ত তাই।' ফীলডিং চুপ করলো। একজন মহিলা সম্বন্ধে অশালীন একটা উক্তি করে ফেলে সে বেশ লজ্জিত বোধ করছিল। হঠাৎ বিয়ের প্রস্তাব শুনে মেয়েটা সম্বন্ধে সে এইরকম একটা নিষ্ঠুর মনোভাব নিয়ে ফেলেছে। মেয়েটা যে সরাসরি তার কাছে অবাঞ্ছিত তা হয়ত নয়। তবে এমনটি না হলে মানসিক অশান্তি কাটাতে পারতো না ফীলডিং। যা হোক, নিজেকে সামলে নিল ফীলডিং। তারপর বললো, 'কিন্তু চাইলেও ওকে আমি বিয়ে করতে পারতুম না। কারণ সে এখন রনীর বাগদত্তা।'
'তাই বুঝি! ভাল।' বস্তুত, খবরটা শুনে আজিজ তখন রীতিমত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। নিশ্চয়ই এরপর তাকে মাড়াবার অভিযানে ওদের নিয়ে যেতে হবে না। দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে সে খুশিই হলো। কারণ, নিয়ম করে আগন্তুক ইংরেজদের আপ্যায়নের দায়িত্ব নিতে সে মোটেই রাজি নয়।
নিজের কথার সূত্র ধরে ফীলডিং বললো 'এসব হলো মিসেস মুরের কীর্তি। বুড়ি এখানে এসেছে ওই জন্যেই। পাছে ছেলে অন্য কাউকে মন দিয়ে ফেলে, তাই য়্যাডেলা কোয়েস্টেডকে সঙ্গে করে এনেছে। এরপর দুজনকে একসঙ্গে জুড়ে দিতে পারলেই বুড়ির কর্তব্য শেষ হয়।'
'কিন্তু মিসেস মুর তো আমায় তাঁর প্ল্যানের কথা বলেন নি?'

'আমার ভুল হতে পারে। কারণ ব্যাপারটা শুনেছি ক্লাবের আড্ডায়। তবে বিয়ের ব্যাপারে ওরা দুজনেই যে মনে মনে তৈরি তা জানি।'

আজিজ হেসে ফেললো। বললো, তাহলে ফীলডিং সাহেবের জন্যে ম্যাডেলা কোয়েস্টেড নামে কোনো মেয়ে তার সাধের মালাটি হাতে নিয়ে বসে নেই। তবে দুঃখ করো না ব্রাদার। ম্যাডেলা কোয়েস্টেড এমন কিছু সুন্দরী নয়; তাছাড়া যুবতী মেয়েদের যেটা সবথেকে বড় সম্পদ সেই বুকের গড়নই ওর নেই।'

ফীলডিং হাসলো। যদিও স্বল্প পরিচিত কোনো মেয়ের বক্ষ সৌন্দর্য নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা তার খুব ভব্য লাগলো না। আজিজ তখনও হাসছিল। সেই ভাবেই বললো, 'অবশ্য আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পক্ষে ওই যথেষ্ট। তবে কথা দিচ্ছি ফীলডিং। তোমার কনে পছন্দ করবো আমি নিজে, এবং তার বুকের গড়নটি হবে শ্রীফলের মতন পুরুষ্টু।'

ফীলডিং তাকিয়েছিল আজিজের দিকে। বললো, 'ধন্যবাদ আজিজ! তবে তার দরকার হবে না।'

'আরে তুমি কি ভেবেছো আমি সত্যি কনে খুঁজতে বেরুবো! তা নয়। তাছাড়া তোমার পক্ষে ব্যাপারটা নিরাপদও হবে না।'

আজিজের মন তখন উড়ু উড়ু। কলকাতার কথা ভাবছিল সে। ভাল হতো যদি ফীলডিংকে রাজি করিয়ে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারতো সে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সম্ভব নয়। হঠাৎ নিজেকে ফীলডিংএর ভাল মন্দর সঙ্গে জড়িয়ে ফেললো সে। মানুষটাকে আগেভাগে সাবধান করে দেওয়া দরকার। ভারতবর্ষ নামে দেশটার প্রতিটি অলক্ষ্য স্থানেই লুকিয়ে আছে বিপদ। খোলামেলা মনের ফীলডিংএর তা জানা উচিত। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে তাই সে বললো, 'তোমায় একটা কথা জানিয়ে দিই ফীলডিং। এই দেশটা সম্বন্ধে আগেভাগেই তোমায় সচেতন হতে হবে। সচেতন হতে হবে কথাবার্তাতেও। ভেবে চিন্তে চলতে হবে তোমায়। জানবে হিংসুটে মানুষ তোমার সব কাজ সব কথা লক্ষ্য করছে। হয়ত আশ্চর্য হবে শুনে, এই ঘরেই আজ তিনটি চর বসে বসে তোমার সব কথা গিলছিল। তুমি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ভাবে কথা বলছিলে ওরা তা লক্ষ্য করেছে। দরকার পড়লে যথাস্থানে সেটি চালান করে দেবে ওরা।'

'কাকে বলবে?'

'যথাস্থানে।' আজিজ ফের একই কথা বললো। আরও বললো, 'তুমি মানুষের নীতিবোধ নিয়ে ব্যঙ্গ করছিলে। তার ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে উপহাস করছিলে। বললে যে এখানে এসে তোমরা এখানকার মানুষদের চাকরির অধিকার কেড়ে নিয়েছ। এগুলো খুব বিজ্ঞোচিত কথা নয়। এসব কথা এত খোলাখুলি বললে লোকনিন্দে হয়। দলের মধ্যে তোমার একজন ছাত্রও ছিল এখানে হয়ত তা দেখেছ।'

ফীলডিং চুপচাপ শুনছিল। আজিজ থামলে একটু হাসলো। তারপর বললো, 'ধন্যবাদ আজিজ। অনেক কিছু শিখলাম জানলাম। এখন থেকে নিশ্চয়ই

সময়ে চলবো। তেমন হলে নিজেকেও ভুলতে পারি। খুব একটা ক্ষতি হবে না।'

'এসব কথা খোলাখুলি বললেই বিপদ হয়। লোকে ভুল বোঝে। তখন হয়ত চাকরিটাই খুইয়ে বসবে।' বললো আজিজ।

'চাকরি যাবে?' হা হা করে হাসলো ফীলডিং। ফের বললো, 'যায় যদি ক্ষতি কি। বেঁচে যাব। জীবনটা অনেক হাল্কা হয়ে যাবে।'

'হাল্কা হবে? তোমরা তো কেজো জাত! কাজই তো তোমাদের ধর্ম!' কথাটা বলে পাশ ফিরলো আজিজ। মনে হলো এবার বোধহয় ও শোবে। কিন্তু তখুনি ঘুরে বললো, 'এটা কি আবহাওয়া যে ক্ষণে ক্ষণে চেহারা বদলাবে?'

ফীলডিং একটু আনমনা ছিল। সেই অবস্থাতেই বললো, 'তোমার দেশেরই কত মানুষ, কত সাধু, তীর্থযাত্রী এমনি হাল্কা হয়ে ঘুরছে। সব ছেড়ে জীবনের ভারটা নাবিয়ে ফেলেছে তারা। তোমার দেশের মানুষের এই ত্যাগব্রতটা আমি খুব শ্রদ্ধা করি। যতক্ষণ না বিয়ে-থা করে মানুষ ঘর-সংসার করছে ততক্ষণ সে এমনি হাল্কা হয়ে থাকে। তাই আমিও ঘর-সংসার করলুম না। সেই অর্থে আমাকেও তুমি সাধু বলতে পারো তবে মাইনাস হোলিনেস্। ইচ্ছে করলে ওই তিনজন চরকে আমার এই খবরটা তুমি জানিয়ে দিতে পারো।'

ফীলডিং যখন কথাগুলো বলছিল আজিজ তখন মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়েছিল। একটা নতুন চিন্তা যেন আবিষ্কার করলো আজিজ। তার মনে হচ্ছিল এই জন্যেই ফীলডিংএর মতন মানুষেরা নির্ভীক হয় বিপ্লবী হয়। কারণ তাদের কিছুই হারাবার ভয় থাকে না। কিন্তু চেষ্টা করেও ফীলডিং-এর মতন সে হতে পারবে না। তার সংস্কার গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে সমাজের মধ্যে ধর্মের মধ্যে। এই সংস্কারের মধ্যেই তাকে আবদ্ধ থাকতে হবে। এই সংস্কারকে অবলম্বন করেই তার প্রতিষ্ঠা। এরই মধ্যে তার অস্তিত্ব। ছেলেমেয়ে ঘর-সংসার সব একেই কেন্দ্র করে। হয়ত তুচ্ছ তার জীবনযাপন কিন্তু এটাই তার অস্তিত্ব। সুতরাং ফীলডিংএর মতন মুক্তির স্বপ্ন দেখা তার চলবে না।

আজিজ যখন ভাবছে তখন ফীলডিং তাকে দেখছিল। একসময় বললো, 'তবে তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমার চাকরি চট করে যাবে না। কেন জানো? আমার কাজ হলো শিক্ষাদান। কেতাবী শিক্ষা নয়। আমি সবাইকে এমন শিক্ষা দিই যাতে তারা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে পারে। যাতে তারা অপরকে বুঝতে পারে। যখন ক্লাসে পড়াই তখন অংক কষাবার মধ্যে এই শিক্ষাটাও দিই। আবার যখন সাধু হয়ে পথে পথে ঘুরবো, তখনও কোন কিছুর সঙ্গে এই শিক্ষাটাও দেব।'

ফীলডিংএর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা চুপ করে শুনছিল আজিজ। বুঝলো এটাই হলো মানুষটার জীবনবেদ। আত্মদর্শন। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। ইতি-মধ্যে মাছির উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় সর্বত্রই ভন ভন শব্দে ওরা উড়ছে। নাকে মুখে এসে পড়ছে মাছিগুলো। বিরক্ত ফীলডিং হাত পা ছুঁড়ে কিছু-

ক্ষণ রেহাই পাবার চেষ্টা করে উঠে পড়লো। আজিজকে বললো কাউকে দিয়ে কোচম্যানকে যেন ডাকিয়ে দেয়।

আজিজ মুখ টিপে হাসছিল। বললো, 'তখন ওকে আমিই বারণ করে দিয়েছিলুম। এই চালাকিটা না করলে তোমায় ধরে রাখতে পারতুম না। অপরাধ নিও না ভাই। আসলে হামিদউল্লা ছাড়া আমার কথা বলার মানুষ নেই। তুমি ছিলে তাই প্রাণের কথা বলতে পারলুম। হামিদকে কেমন লাগলো তোমার ?'

'চমৎকার মানুষ।'

'কথা দাও আবার আসবে। অসুবিধে হলেই আসবে। দ্বিধা করবে না।'

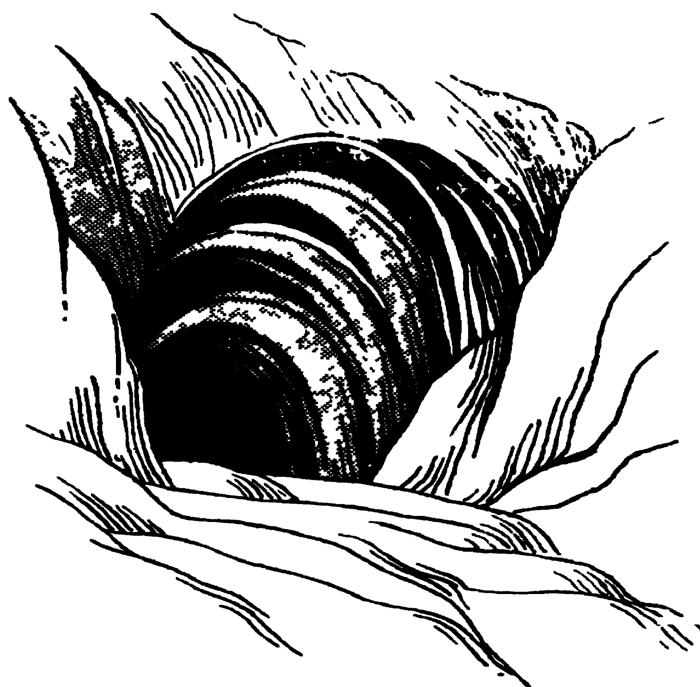
'আমার কোন অসুবিধে নেই আজিজ। আমি খুব ভাল আছি।'

ফীলডিং চলে গেল। তার গমন পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আজিজের মনে হচ্ছিল এই বিচিত্র মানুষটা নিজের দুঃখের কথা সাতকাহন করে বলতে কোনদিনই আসবে না। মানুষটা সত্যিই আশ্চর্য। খুব ঘনিষ্ঠভাবে কিছুক্ষণ মিশে আজিজ তা বুঝেছে। এখন আর তাই অবাক হলো না। তবে মানুষ চেনার ক্ষমতা ফীলডিংএর নেই। এটাই তার একটা মহৎ দোষ। তার হৃদয় আছে। নিয়মের বাইরেও সে ভালবাসতে জানে। কিন্তু বিচক্ষণ বিজ্ঞ সে নয়। নইলে রামচাঁদ বা রফীর দলবলের সামনে সে নিজেকে অমন খোলাখুলি মেলে ধরতো না। এতে তার কিছু লাভ হলো না।

কিন্তু লাভ হলো আজিজের। অমন খোলাখুলি মেলে ধরেছিল বলেই ফীলডিংকে সে যথার্থ চিনতে পারলো। এখন তারা ভ্রাতৃপ্রতিম। পরস্পরকে বিশ্বাস করে, ভালবাসে। ওই ছবিটা থেকেই এই বিশ্বাসটুকু জন্মেছে। কোন ঠুনকো সম্বন্ধ এটা নয় যে ছোঁয়া মাত্রই আলগা হয়ে যাবে। এই সুখস্মৃতিটুকু তার জ্বরতপ্ত মনের আবেগের আঁচ ধীরে ধীরে নিভিয়ে দিয়েছে। তন্দ্রাভাব আসছে তার। শেষ দুটো ঘণ্টার স্মৃতি কত মধুর! সবাই ছিল সেখানে। মির্জা গালিব, হামিদউল্লা, তার ছেলেমেয়েরা, স্বপ্নলোকের সুন্দরীরা, ফীলডিং এবং তার প্রিয়তমা বিবি। তার বিবির ছবিখানাই দূতির কাজ করেছে তার ও ফীলডিংএর মধ্যে। তন্দ্রাচ্ছন্ন আজিজের চেতনা অন্য এক লোকে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল। এখানে কোন বৈরিতা নেই, কোন অস্পষ্টতা নেই। ফুল হয়ে ফুটে আছে আনন্দের মুহূর্তগুলো—ঝলমল করছে নন্দনকানন। এ যেন শাশ্বত আনন্দলোকে এসে পড়েছে আজিজ। ওই তো মসজিদের প্রধান গম্বুজ! ওর সাদা দেয়ালে কালো হরফে লেখা সর্বগুণান্বিত ঈশ্বরের কথাগুলো কেমন জ্বলজ্বল করছে! ওই অব্দি পেঁৗছে গেছে আজিজের মনের আনন্দময় মুহূর্তগুলো।

গুহা

দ্বিতীয় অধ্যায়



১২

বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে নির্গত হয়ে শিবের জটার বাঁধন খুলে প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গা। তবুও পুরাণখ্যাত এই প্রবাহিণী সুপ্রাচীন নয়। ভূতাত্ত্বিকদের গবেষণা পুরাণ ছাড়িয়ে আরও অতীতে দৃষ্টিপাত করেছে। বৈজ্ঞানিক এই গবেষণা থেকে জানা যায় যে, পুণ্যভূমি বলে আখ্যাত ভারতবর্ষের উত্তরাংশে গঙ্গা বা তার ধাত্রী নগাধিরাজ হিমালয়ের অস্তিত্ব সেকালে ছিল না। সেই আদিম প্রাগৈতিহাসিক কালে এই বিশাল অঞ্চলের সবটাই ছিল সমুদ্রের তলায়। পরে সমুদ্রগর্ভ থেকে হিমালয় পর্বতশ্রেণী মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং পাথর বালির আবর্জনায় বুজে গেছে সমুদ্র। ভূ-পৃষ্ঠে ওঠার পর হিমালয়ের চূড়ায় দেবদেবীরা এলেন এবং বাসা বাঁধলেন। এই দেবদেবীরাই বরফগলা জলের ধারায় সৃষ্টি করেছিলেন পুণ্যতোয়া গঙ্গা এবং স্মরণাতীত কাল থেকে যে ভূখণ্ডটি ভারতবর্ষ নামে আখ্যাত হয়ে এসেছে জন্ম হয়েছিল সেই পুণ্যভূমির। কিন্তু যথার্থ ভারতবর্ষ নামে ভূখণ্ডের অস্তিত্ব আরও প্রাচীন কালে ছিল। সেই আদিম কালে যখন পৃথিবীর সর্বত্র জল থৈথৈ করতো, তখন এই উপমহাদেশের দক্ষিণাংশে যে ভূখণ্ডটির অস্তিত্ব ছিল তাকেই বর্তমানে দ্রাবিড়ভূমি বলা হয়। এই দ্রাবিড়ভূমি যথার্থই উচ্চভূমি এবং পৃথিবীর আদিমতম ভূমিখণ্ডের অন্যতম বলা যায়। সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে ভূমিখণ্ডের একটা দিক আফ্রিকা মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কালের প্রবাহে এই দিকের ভূখণ্ড, যেটা আফ্রিকা মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। অন্যদিকে সমুদ্র ভেদ করে মাথা তুলে উঠেছে গিরিরাজ হিমালয়। পৃথিবীর আদিমতম এই ভূখণ্ড কখনও জলমগ্ন হয় নি এবং অনন্তকাল ধরে সূর্য অনুক্ষণ আলো এবং তেজ বিকিরণ করেছে। সূর্যের বক্ষকন্দর থেকে ছিঁড়ে আনা একটা জ্বলন্ত টুকরো ছিল এই পৃথিবী। তাই সূর্যের জৈব সত্তার প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাহাড়ঘেরা এই আদিমতম ভূখণ্ড থেকেই পাওয়া যেত।

কিন্তু এই ভূখণ্ডের আকৃতিরও বদল হয়েছে। উত্তরাংশের হিমালয় সংলগ্ন ভূখণ্ড যত জেগে উঠেছে তত নেমে গেছে দক্ষিণাংশের এই আদিম ভূখণ্ড। হয়ত এমন কোনদিন আসবে, কোন লক্ষকোটি বছরের ব্যবধানে, যেদিন এই নেমে যাওয়া ভূখণ্ড আবার সমুদ্রের তলায় চলে যাবে। ইতিমধ্যে উত্তর থেকে গঙ্গাবাহিত পলিমাটির অভিযান শুরু হয়েছে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে এই আগ্রাসী ভূমির তলায় ঢাকা পড়েছে দক্ষিণাংশের নেমে যাওয়া ভূখণ্ড। মূল ভূখণ্ডটি উচ্চভূমি তাই ঢাকা পড়ে নি। কিন্তু প্রান্তদেশের নেমে যাওয়া ভূমিখণ্ড আকণ্ঠ ডুবেছে গঙ্গাবাহিত পলিমাটির তলায়। এই চাপা পড়ে থাকা শিলাস্তূপ চিরকাল মাটির তলায় অবরুদ্ধ থাকে নি। এই বন্দীত্ব থেকে

মূর্তি পেতে তারা হাত পা ছুঁড়ে মাটির উপর মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অবিশ্বাস্য তাদের আচরণ। হঠাৎই তারা উৎকটভাবে ভূপৃষ্ঠের উপর জেগে উঠেছে। তাদের শ্বাসরোধকারী স্ফীতি ভীষণাকার। এতই সামঞ্জস্যহীন এই স্ফীতি যে ভূপৃষ্ঠের উপরের পাহাড়শ্রেণীর সঙ্গেও তাদের মিল হয় না। এ যেন এক 'ভুতুড়ে'আস্ফালন। কিন্তু 'ভুতুড়ে' বললেও স্পষ্ট হয় না এই আচরণ, কারণ শব্দের আকারের চেয়েও আদিম এই আস্ফালনের প্রকৃতি। পরবর্তীকালে যখন হিন্দুধর্মের প্রবর্তন হলো, তখন উৎসাহী প্রবক্তারা শিলাখাতের গায়ে লিপি ক্ষোদাই করে। ছবি এঁকে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন যাতে তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করা যায়। এইসব শিলাখাতের অভ্যন্তরে কোন দেবদেবীর মূর্তি বা বিগ্রহ নেই ; তবুও তীর্থযাত্রীদের মনে আক্ষেপ হয় নি। কারণ এর নির্জন স্তম্ভিত পরিবেশে তাঁরা যা পেয়েছেন তা তাঁদের প্রত্যাশার অধিক। অবিশ্বাস্য এবং অসাধারণ এক দৃশ্যপট, যা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। হয়ত কিছু সাধু সন্ন্যাসী একদা এই শিলা-খাতের মধ্যে তপস্যার জন্যে এসেছিলেন। কিন্তু অনুমান হয় এই ভয়ংকর পরিবেশের নির্জনতায় তপস্যার আগেই তাঁদের মোক্ষলাভ হয়েছিল। সম্ভবত বুদ্ধও এই পথ দিয়েই তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু মাড়া-বার গিরিগুহায় বসে নির্বাণ লাভের চেয়ে বোধি বৃক্ষের তলায় বসে নির্বাণ-তপস্যা আরও পরিপূর্ণ মনে হয়েছিল তাঁর। ফলে মাড়াবার গিরিগুহাগুলি সৃষ্টির আদি থেকেই অস্পৃশ্য থেকে গেছে। কোন মহামানবও তাঁর আত্মিক সংগ্রামের কোন নিদর্শন এখানে রেখে যান নি। মাড়াবার গিরিগুহা কেন্দ্র করে কোন ইতিহাস বা কিংবদন্তীও গড়ে ওঠে নি।

গিরিগুহার অভ্যন্তরের আকার একই রকম। একটা টানেল বা সুড়ঙ্গপথ দিয়ে গুহায় ঢুকতে হয়। টানেলটি লম্বায় আটফুট, উচ্চতায় পাঁচফুট এবং চওড়ায় তিনফুট। টানেল পেরিয়ে একটা বৃত্তাকার ঘর। ঘরের ব্যাস প্রায় বিশফুট। সব গুহাগুলিই একই রকম দেখতে। মোট চব্বিশটা গুহা আছে মাড়াবার পাহাড়ে। এক এক করে সবকটি গুহা দেখার পরেও পর্যটকেরা যখন চন্দ্রপুরে ফিরে আসে তখন তাদের বেশ হতাশ মনে হয়। উল্লেখযোগ্য কী তারা দেখল বা আদৌ কিছু দ্রষ্টব্য ছিল কি না, তার কোন অভিজ্ঞতাই যেন তারা সঞ্চয় করে নি। ফলে গুহা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা কিংবা মনের মধ্যে কোন স্মৃতির সঞ্চয় সাজিয়ে রাখা তাদের কাছে যেন অসম্ভব। গুহাগুলো বিসদৃশ রকমের বৈচিত্র্যহীন। বিরক্তিকর তাদের একঘেয়েমি। কোথাও একটা বাদুড় বা মৌমাছির বাসা পর্যন্ত নেই যে একটা থেকে অন্য-টাকে আলাদা করে চেনা যায়। গুহাগুলোর কোন অসাধারণত্ব চোখে পড়ে না। কোন খ্যাতি বা সমাদরও তাদের ঘিরে গড়ে ওঠে নি। তবুও এই বিস্ময়-কর গিরিগুহাগুলো অসাধারণ। এই অসাধারণত্বের কথা অস্ফুটে বলে দেয় তার স্তম্ভিত পরিবেশ। কানাকানি করে বাতাস এবং উড়ে যাওয়া পাখিরা ছড়িয়ে দেয় এই অস্ফুট ধ্বনি। বাতাসে ছড়িয়ে থাকা এই অস্ফুট ধ্বনি কানে শুনে মানুষ জেনেছে যে এরা অসাধারণ।

গুহার ভেতরটা ছমছমে অন্ধকার। এমনকি সুড়ঙ্গপথের মুখে যখন সূর্যালোক পড়ে তখনও অতি ক্ষীণ আলো গুহার ভেতরে ঢোকে। বৃত্তাকার গর্ভগৃহে ঢুকলে প্রথমে কিছুই চোখে পড়বে না। পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে অন্ধকার সইয়ে নিতে হবে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে মনে হবে একটি প্রতিবিম্ব শিখা জ্বলে উঠেছে গুহাভ্যন্তরে। শিখাটি যেন নিষ্প্রাণ পাথরের বন্দিনী আত্মা। ভুতুড়ে শিখাটি কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছে। মনে হবে যেন শিখা দুটি মিলিত হতে চায়। কিন্তু যুগল-মিলন হয় না। কারণ, একটি বাস্তব সত্য অন্যটি তারই প্রতিবিম্বরূপ। একটি শিখা প্রাণ-আহরণ করে বাতাস থেকে অন্যটি নিষ্প্রাণ পাথরের বুক থেকে। দুটি শিখার মধ্যে আড়াল রচনা করেছে দর্পণসদৃশ মসৃণ দেওয়ালগাত্র। দর্পণের গায়ে বর্ণময় আলোকছটার প্রতিফলন হয়। নক্ষত্রপুঞ্জের বর্ণাঢ্য আলোর মিছিল যেন সেখানে, যেন ধূমকেতুর উজ্জ্বল পুচ্ছ বা মধ্যদিনের সূর্য। মনে হয় নিষ্প্রাণ গ্রানাইট পাথরের বুকে বিলীয়মান প্রাণস্পন্দন। পলিমাটির আগ্রাসী অভিযানে মাটির তলায় বন্দী থাকা শিলাস্তূপগুলি নিঃশ্বাস নিতে হাত পা ছুঁড়ে মাটি ভেদ করে উপরে উঠেছে—এ প্রাণস্পন্দন তারই। দেওয়ালের গায়ে প্রতিফলিত রশ্মি আরও উজ্জ্বল হয়। এগিয়ে আসে প্রেমিক শিখা-যুগল। আলিঙ্গনাবদ্ধ হয় তারা। পরস্পরকে আশ্লেষে চুম্বন করে। তারপর হঠাৎই ফুরিয়ে যায় তারা। গিরিগুহাটি অন্য গুহাগুলির মতন আবার চাপ-চাপ অন্ধকারে ডুবে যায়।

গর্ভগৃহের দেওয়ালটা মসৃণ হলেও টানেলের দুপাশের দেওয়াল খড়খড়ে রুক্ষ। যেন ভেতরের মসৃণতা বাইরের রুক্ষতার এক সফল উত্তরচিন্তার মানুষ টানেল বানিয়েছিল যাতে সে গুহার ভেতরে ঢুকতে পারে তার নিজের দরকারে। কিন্তু গ্রানাইট পাহাড়ের গভীরতম প্রদেশে কি আরও গুহার অস্তিত্ব আছে এবং তার অভ্যন্তরে যাবার সুড়ঙ্গপথ কি মানুষ তৈরি করে নি ? শোনা যায় সেই গভীর অন্তর্লোকে দেবতারা বাস করেন। তাই গুহা-মুখ সর্বদাই রুদ্ধ থাকে। স্থানীয় মানুষের ধারণা এমন রুদ্ধদ্বার গভীর গোপন গিরিকন্দরের সংখ্যা অগণিত। কত হাজার লক্ষ কোটি যে তাদের সংখ্যা তা কেউ জানে না। সেইসব মৃত অন্ধকার গিরিগুহার মধ্যে কিছুই নেই। হা হা করছে তার শীতল কঠিন শূন্যতা। হয়ত পৃথিবীতে জন্ম-মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই এমনি রুদ্ধদ্বার হয়ে আছে এই সব গিরিগুহা। অনুসন্ধিৎসু মানুষ যদি কখনও দ্বার খুলে ভেতরে ঢোকে তাহলে ভাল বা মন্দ কিছুই দেখতে পাবে না সে। এইরকমই একটা রুদ্ধদ্বার গিরিগুহার সন্ধান পাওয়া গেছে একটা গোলাকার পাথরের মধ্যে। এক উঁচু পাহাড়ের শীর্ষে ঝুলন্ত হয়ে আছে এই গোলাকার শৈলখণ্ডটি। চারপাশ ঢাকা এই গিরিগুহার ছাত নেই, মেঝে নেই। চাপচাপ অন্ধকারে ঘন হয়ে আছে গুহার ভেতরটা। নিঃসীম অন্ধকার আর শূন্যতাই তার আন্তর রূপ মসৃণ দেওয়ালে অন্ধকার ছাড়া অন্য রূপের প্রতিফলন হয় না। শূন্য কুম্ভের মতন পাথরটা পাহাড়শীর্ষে ঝুলছে। যদি কখনও সেটি স্খলিত হয়, তাহলে নিঃশেষ হয়ে

যাবে এর ভেতরের গুহা। ফাঁপা হওয়ার দরুন বাতাসের সামান্য ছোঁয়াতেও দুলে ওঠে এই শৈলখণ্ড। বিস্ময়জনক একটা প্রকাণ্ড দণ্ডকে আশ্রয় করে শূন্যে ঝুলছে এই শৈলখণ্ড। একটা ছোট্ট কাকের দেহভার বহন করবার শক্তিও এই পাথরখণ্ডের নেই। স্থানীয় মানুষ তাই এই অতিকায় শিলাখণ্ড আর দণ্ডটির নামকরণ করেছে কাউয়া দোল্ অর্থাৎ কাকের দোলনা।

১৩

দিনের একটা বিশেষ মুহূর্তে এবং একটা বাঞ্ছিত দূরত্ব থেকে মাড়াবার পাহাড়টা আশ্চর্য রোমান্টিক দেখায়। সেদিন সন্ধ্যে নাগাদ ক্লাবের বারান্দা থেকে পাহাড়টা দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেল য়্যাডেলা কোয়েস্টেড। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে যায় ওই স্বপ্নলোকে। সঙ্গে ছিল ডেরেক। তাকেই বললো কথাটা। ফীলডিংএর বাড়িতে আজিজ তাকে কথা দিয়েছিল মাড়াবার দেখাবে। কিন্তু এখন অব্দি সে কথা রাখে নি। হয়ত ভুলেই গেছে ব্যাপারটা। ভারতীয়রা এই রকমই হয়ে থাকে। এটাই তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ক্লাবের যে লোকটা পানীয় পরিবেশন করছিল সে হঠাৎ শুনে ফেলে য়্যাডেলার মন্তব্যটা। লোকটা অল্পস্বল্প ইংরিজি জানে এবং সেই যৎসামান্য জ্ঞান থেকেই সে বুঝতে [illegible] খবরটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া দরকার। মহম্মদ আলির লো[illegible] গুপ্তচর নয়, কারণ আলি তাকে কোন পারিশ্রমিক দেয় না। তবে চোখকান খুলে কাজ করার নির্দেশ আছে তার ওপর। কোন অবাঞ্ছিত দৃশ্য বা মন্তব্য জেনে ফেললে সে অন্য ভৃত্যদের মধ্যে সেটি বিলিয়ে দেয়। লোকটার সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও ভৃত্য মহলের আলোচনার সারটুকু আলি ঠিকই জানতে পারে। কথা কানে হাঁটে। এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হলো না। ডালপালা সমেত মন্তব্যটি আজিজের কানেও গেল। আজিজ রীতিমত আতঙ্কিত। সে শুনলো যে বিদেশিনী মহিলারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং প্রায় রোজই তার নেমন্তন্নর জন্যে অপেক্ষা করছেন। তার মনে হলো কেভ্স্ সম্বন্ধে তার মন্তব্যটা হয়ত ভুলে গেছেন ওঁরা। কেন সে গুহাদর্শন করছে না সে কথা আজিজ বলেছিল। যাক, নতুন করে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসলো সে। ফীলডিংএর বাড়িতে যে চা চক্রের ব্যবস্থা হয়েছিল তারই আদলে একটা বড়সড় পার্টি করতে হবে। এর জন্যে যে দুজন মানুষের সাহায্য তার দরকার তাঁরা হলেন ফীলডিং এবং গড়বোলে। প্রস্তাবটা মিসেস মুর এবং মিস কোয়েস্টেডের কাছে তুলবে ফীলডিং। সেই-ই একমাত্র যোগ্য লোক। রনী হীসলপের অজান্তেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে হবে। ওঁদের ভালমন্দ দেখাশোনার ভার রনীর ওপর। সুতরাং তার দিক থেকে যাতে কোন বাধা না আসে, তাই এই গোপনতা। কিন্তু ফীলডিংএর কাছে ব্যাপারটা

মোটেই মনঃপূত হল না। তাছাড়া নিজেও সে ব্যস্ত মানুষ। গুহা দেখার ব্যাপারে তেমন আগ্রহও তার নেই। তার কেমন যেন আশঙ্কা হচ্ছিল যে সংঘর্ষ অনিবার্য এবং অকারণ খরচের ধাক্কায় পড়বে আজিজ। তবুও অনুরোধটা সরাসরি ফেলে দিতে পারল না কারণ আজিজ তার বিশেষ বন্ধু। অবশেষে মহিলাদের সম্মতি পাওয়া গেল। অন্য অনুষ্ঠানের ভিড় থাকলেও তাঁরা রাজি হয়েছেন। রনী হীস্‌লপের সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁরা সম্মতি দিলেন। রনীও অসম্মত নয়। তবে শর্ত হলো যে মহিলাদের আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্বটা ফীলডিংকেই নিতে হবে। বলাবাহুল্য দুজন ছাড়া অন্য মহিলারা আগ্রহ দেখালেন না। অতঃপর আজিজের নেতৃত্বে মাড়াবার অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ হল।

আজিজই সব থেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। অভিযান দীর্ঘ নয়। ধকলও বিশেষ নেই তবুও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তার। ভোরের আগেই চন্দ্রপুর থেকে যে ট্রেনটা ছাড়বে সেটাতেই দুপুর নাগাদ ফিরে আসবে তারা। এ ব্যাপারে দায়িত্বটা সরকারী পর্যায়ে এসে পড়ায় সে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। তার কেবলই আশঙ্কা হচ্ছিল যদি দায়িত্বটুকু সে পালন করতে না পারে! যদি পরিণতিটা অসম্মানজনক হয়! ওপরওলা মেজর ক্যালেন্ডারের কাছে সে আধবেলার ছুটি চাইতে গিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি বেশ কিছুদিন অসুস্থতার অজুহাতে সে অনুপস্থিত ছিল। অতএব ছুটি মঞ্জুর হলো না। অতএব হতাশা এবং ফীলডিংএর সাহায্যে নতুন করে আবেদন পেশ। এবার ছুটি মঞ্জুর হলো বটে তবে যথেষ্ট অবমাননা সইতে হল ওর দরুন। মহম্মদ আলির কাছ থেকে সে ছুরি চামচ ইত্যাদি বাসনপত্র ধার করেছে। তবে তাকে নেমন্তন্ন করে নি সে। পানীয়ের ব্যবস্থা রেখেছে কারণ মেয়েরাও পানীয়তে অভ্যস্ত। সুতরাং হুইস্কী, পোর্ট [illegible] রেখেছে। মাড়াবার ছোট্ট ওয়েসাইড স্টেশন। সেখান থেকে কেভস্ [illegible] জিনিসপত্র নিয়ে যাবার সমস্যা আছে। সমস্যা আছে হিন্দু গড়বোলেকে [illegible] নিয়ে। অবশ্য ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে গড়বোলের খুব একটা উৎপাত নেই। চা, ফলমূল, সোডা মিষ্টান্ন সবই গ্রহণ করবেন। এমনকি ব্রাহ্মণ পাচক দিয়ে রান্না করালে অন্ন ব্যঞ্জনও গ্রহণ করতে আপত্তি নেই। শুধু [illegible] এবং মাংস। সব থেকে গোঁড়া আপত্তি গোমাংসে। তার নিজেরও [illegible]। শূকর মাংস অনেকের পছন্দ। কিন্তু ধর্মের নিষেধ আছে। [illegible] আপত্তি করেছে। আরও সমস্যা আসছে। তবে আজিজকে মুখরক্ষা [illegible] হবে এদের। নইলে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কূপমণ্ডূকতার অপবাদের উচিত জবাব দেওয়া যাবে না।

অবশেষে সেই বাঞ্ছিত মুহূর্তটি এসে গেল।

শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গে আজিজের মেলামেশাটা খুব ভাল চোখে তার বন্ধুরা দেখে নি। তাই সময়ানুবর্তিতা সম্বন্ধে বন্ধুরা তাকে বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছিল। ফলে আগের রাত থেকেই আজিজ স্টেশনে পড়ে রইলো। ভৃত্য এবং পরিচারকদেরও প্ল্যাটফর্মের একধারে গাদাগাদি করে বসিয়ে

রেখেছিল। তাদের ওপর কড়া নির্দেশ ছিল যেন প্ল্যাটফর্মের ওপর তারা অকারণ ঘোরাফেরা না করে। শেষরাত থেকে মহম্মদ লতিফকে নিয়ে প্ল্যাট-ফর্মের এমাথা থেকে ওমাথায় পায়চারি শুরু করে দিল সে। লতিফই তার প্রধান ভরসা। তবুও সর্বক্ষণই আজিজ বড় অসহায় বোধ করছিল। খানিক পরেই একটা গাড়ি এসে থামল স্টেশনের কাছে। আজিজ ভেবেছিল ফীলডিং এসেছে। মনে মনে খুশি হয়েছিল। কিন্তু গাড়ি থেকে নাবলেন মিসেস মুর, য়্যাডেলা আর তাঁদের গোয়ানিজ পরিচারক। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ওঁদের গাড়ি থেকে নাবাল আজিজ। মনটা তখন খুব হাল্কা হয়ে গেছে। উজ্জ্বল মুখে বললো, 'তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনারা এলেন! কি যে ভাল লাগছে আমার! মনে হচ্ছে আমাব জীবনের সব থেকে আনন্দের মুহূর্ত এটা।'

ভদ্রতার খাতিরে মহিলারা চুপ করে রইলেন। রাত থাকতেই বেরিয়েছেন তাঁরা। সুতরাং আনন্দের মুহূর্ত এটা নয়। তবে যাত্রা শুরু হলে তাঁদের ভাল লাগবে আশা করছেন। সুন্দর ব্যবস্থা করেছে আজিজ। অভিযানের আয়োজন করার পর থেকে এই প্রথম আজিজের সঙ্গে মেয়েদের দেখা হল। যথারীতি আজিজকে ধন্যবাদ জানালেন তাঁরা।

আজিজ রীতিমত উচ্ছ্বসিত। বললো, 'কাউকে যেন টিকিট কাটাতে পাঠাবেন না। মাড়াবার ব্রাঞ্চ লাইনে টিকিট লাগে না। এটাই এর বিশেষত্ব। আর একটা মজার ব্যাপার আছে। আপনাদের মহিলা কামরায় উঠতে হবে। পছন্দ হবে তো? গাড়ি লাগলে আপনারা কামরায় গিয়ে বসুন। এখুনি মিস্টার ফীলডিং এসে পড়বেন।'

পর্দানশীন কামরায় উঠতে মেয়েদের আপত্তি নেই। ইতিমধ্যে প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এসে লেগেছে। ভৃত্যের দল এক ঝাঁক মৌমাছির মতন ঝাঁপিয়ে পড়লো কামরার মধ্যে। বসার জায়গা নিয়ে তারা তখন বাঁদরের মতন লাফালাফি শুরু করেছে। আজিজের খাস ভৃত্য ছাড়াও কিছু ধার করা লোক আছে। কাড়াকাড়ি লাফালাফি চলছে তাদের মধ্যে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে মেম-সায়েবের গোয়ানিজ ভৃত্যটা। এদের এই অসভ্য অবতরণ দেখে লোকটার মুখে বিদ্রুপের ভাব। বোম্বাই থেকে লোকটাকে এনেছে মেমসাহেবরা। এক ঝাঁক লোকের মধ্যে গোয়ানিজটা নিশ্চয়ই বিচারে শ্রেষ্ঠ গণ্য হবে। কিন্তু যখনই মেমসাহেবরা তাকে এদের সঙ্গে এক করে দিল তখনই লোকটা নিজেকে সরিয়ে নিল দল থেকে।

তখনও বেশ রাত। অবশ্য ভোরের লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার থেকে মুরগীর ডাক ভেসে এল। একটা রাত-চরা পেঁচাকে চিল ভেবে ডেকে উঠেছে কুক্কুটীরা। কামরার আলোগুলো আগেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজ এগিয়ে রাখলো কর্তৃপক্ষ। অন্ধকার কামরায় ঠাসাঠাসি করে বসেছে ভৃত্যের দল। বিড়ির উৎকট গন্ধ ভেসে আসছে সেখান থেকে। শোনা যাচ্ছে নিষ্ঠীবন ত্যাগের শব্দ। মাথায় পাগড়ি খুলে নিমডাল দিয়ে কেউ কেউ দাঁত মাজছে। সব মিলিয়ে একটা স্বচ্ছন্দ স্বস্তির

পরিবেশ তাদের মধ্যে। হঠাৎ একজন কর্মচারীর সন্দেহ হল যে হয়ত সূর্যোদয় হয়ে গেছ। অত্যুৎসাহে ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বাজিয়ে দিল সে। হুড়ো-হুড়ি পড়ে গেল ভৃত্যদের মধ্যে। আতঙ্কিত হয়ে হুড়মুড় করে দুপাশ দিয়েই তারা ট্রেনে উঠতে লাগলো। জেনানা কামরায় অতিথিরা বসে আছেন। কিন্তু তখনও কিছু মাল তোলা বাকি। আজিজ তাই ব্যস্ত। অতিথিরা সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। এঁরা কেউই যুক্তিহীন মানুষ নন। কোনরকম জাতি বৈষম্য নেই। বৃদ্ধর তো নেই-ই যে নবীনা তারও নেই। আজিজের সঙ্গে তাঁদেব ব্যবহার খুব স্বচ্ছন্দ। একজন সহৃদয় যুবকের সঙ্গে যেমন ব্যবহার সমীচীন তেমন ব্যবহারই তাঁরা করছিলেন। আজিজও কৃতার্থ। তার ধারণা ছিল এঁরা ফীলডিংএর সঙ্গেই আসবেন। কিন্তু তাঁরা একা এসেছেন শুধু তার ভরসাতেই ; একথা মনে হতেই সৌজন্যবোধে মুগ্ধ হয়ে গেল আজিজ। জিনিসপত্তর গুছিয়ে রেখে আজিজ বললো।

'ইচ্ছে করলে আপনার সঙ্গের লোকটিকে ছেড়ে দিতে পারেন। ওকে দরকার হবে না। আমরা যে ক'জন আছি সবাই মুসলীম। একসঙ্গে কাজ করার সুবিধে তাতে।'

'খুব ভাল। লোকটার ব্যবহারও ভীষণ খারাপ। আমাব মোটেই পছন্দ নয়।' য়্যাডেল্লা অসহিষ্ণু হয়ে বললো। তারপর সরাসরি গোয়ানিজটার মুখের দিকে চেয়ে আদেশ করলো. 'শোন এণ্টনি। এবার তুমি যেতে পার। তোমাকে আর দরকার নেই।'

'সাহেব আমায় আপনাদের সঙ্গে থাকতে বলেছেন।' নির্বিকাব উত্তর দিল লোকটা। য়্যাডেলা আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। একটু চড়া সুরে বললো, 'মেমসাহেব তোমায় যেতে বলছেন।'

'সাহেব বলেছেন মেমসাহেবদের সঙ্গে সকালটা থাকতে।'

'কিন্তু তোমার মেমসায়েবরা তোমায় রাখতে চাইছেন না। বুঝলে ? শুনুন !' আজিজের দিকে ঘুরে তাকাল য়্যাডেলা। রাগের আঁচে মুখচোখ গনগনে লাল। বললো,

'এই উদ্ধত লোকটাকে এখুনি বিদায় করে দিন ডাক্তার আজিজ।'

'নিশ্চয়ই !' যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলো আজিজ, তারপরেই হাঁক দিল,

'মহম্মদ লতিফ!'

কামরার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সামলাচ্ছিল লতিফ। আজিজের ডাক শুনে কামরা থেকে লাফিয়ে নেমে এল সে। বলতে গেলে মহিলাদের সামনে এই-ই তার প্রথম আবির্ভাব। আজিজ পরিচয় করিয়ে দিল, 'সম্পর্কে আমার ভাই হয়। মহম্মদ লতিফ। উহুঁ, হ্যাণ্ডশেক ওর পছন্দ নয়। তার চেয়ে সেলাম আলেকম বলুন। খুশি হবে। খুবই প্রাচীনপন্থী মানুষ। ও কিন্তু একদম ইংরিজি জানে না। কি লতিফ, ঠিক বলি নি ?'

ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে লতিফ মৃদু আপত্তি করল। বলল, 'তুমি মিথ্যে বলছ।'

হাসছিল আজিজ। সেই ভাবেই বলল, 'মিথ্যে বলছি! তা ভাল।'

তারপর মেয়েদের দিকে চেয়ে বলল, 'লোকটা খুব আমুদে। ওকে নিয়ে

আমরা মজা করবো'খন। তবে যতটা ভাবছেন ততটা বোকা ও নয়। বোকা সেজে থাকে। অবশ্য মানুষটা সৎ। আর খুব গরিব। আমাদের বড় পরিবার। তাই এখানে ওখানে থেকে ওর চলে যায়। সেদিক দিয়ে ওকে ভাগ্যবান বলতেও পারেন। কিন্তু কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনারা? ভেতরে গিয়ে আরাম করে বসুন। শুতেও পারেন। আমি বাইরে আছি। আরও দুজন অতিথি আসবেন। তাঁদের জন্য আমায় দাঁড়াতেই হবে।'
ততক্ষণে প্রাচ্যবাসীদের অভ্যস্ত কলহপ্রবণতা অনেকটা নিস্তেজ হয়ে এসেছে। বিদেশিনীরা তাই নির্বিঘ্নে কামরার ভেতরে গিয়ে বসলেন।
প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে আজিজ বেশ অস্থির হয়ে পড়েছে। ট্রেন ছাড়ার মাত্র দশ মিনিট দেরি। অবশ্য অতটা অস্থির হবার কারণ নেই। ফীলডিং নিজে ইংরেজ। তার সময়জ্ঞান অত পলকা নয় যে ট্রেন মিস্ করবে। অবশ্য গড়বোলে হিন্দু। দুশ্চিন্তাটা তাকে নিয়েই। তবুও যথাসম্ভব শান্ত থাকবার চেষ্টা করছিল আজিজ। এ্যাণ্টনি নামে লোকটার হাতে পয়সাকড়ি দিয়ে তাকে বিদায় করে দিয়েছে লতিফ। সেদিক থেকেও সে খানিকটা নিশ্চিন্ত। লতিফকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারি করতে করতে দরকারী কথাগুলো সেরে নিচ্ছিল আজিজ। একটা ব্যাপারে ওরা দুজনেই একমত। ভৃত্যের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। সুতরাং মাড়াবার স্টেশনে দুতিনজনকে অনায়াসেই রেখে আসা যায়। আজিজ বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে অতিথিদের মনোরঞ্জন করা, তাদের দেখাশোনা করা, এসবই লতিফের দায়িত্ব। হয়তো আজিজ তাকে নিয়ে একটু আধটু মস্করা করবে। লতিফ যেন কিছু মনে না করে। যেন মনে না ভাবে যে আজিজ হৃদয়হীন। আসলে অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্যেই এরকমটা করতে হতে পারে। বৃদ্ধ লতিফ মোটেই কিছু মনে করল না। বরং সে জানিয়ে দিল যে এমনভাবে হাস্যাস্পদ হলে সে খুশি হবে। তাছাড়া সে তো তুচ্ছ নয়! তাকেও দরকার হয়। অতএব দুঃখিত কেন হবে সে? বরং উৎসাহিত হয়ে একটা পুরনো কাহিনী বলতে যাচ্ছিল বৃদ্ধ লতিফ। কিন্তু আজিজ তাকে থামিয়ে দিল। বলল, 'ভাই, আজ নয়। ওটা পরে শুনবো'খন। হাতে যখন অবসর থাকবে। এখন আমাদের অনেক কাজ। যাঁরা অতিথি হয়ে এসেছেন তাঁদের দেখাশোনা পরিচর্যা নিখুঁত হওয়া চাই। দলে থাকবেন তিনজন সায়েব একজন হিন্দু। যিনি হিন্দু তাঁকে তুমি চেন। প্রফেসর গড়বোলে। তাঁর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। যেন মনে না ভাবেন যে হিন্দু বলে তাঁকে আমরা উপেক্ষা করছি।'
বৃদ্ধ লতিফ গম্ভীর হয়ে বলে উঠলো, 'তাঁর সঙ্গে আমি দর্শন নিয়ে আলোচনা করব। বেশ হবে না?'
'খুব ভাল হবে। তবে একটা কথা।' আজিজের দিকে তাকাল লতিফ। আজিজ বললো, 'চাকরদের দিকেও নজর রাখতে হবে। যাতে তারা বেয়াদপি না করে। কোনরকম বিশৃঙ্খলা যেন কোথাও না হয়। তাহলেই আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে। তাই আমার ইচ্ছে এসবের ভার তুমিই নাও, আর...'
আজিজের কথা শেষ হলো না। পর্দানশীন কামরা থেকে একটা ভয়ার্ত

চীৎকার ভেসে এল। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন। সবে চলা শুরু করেছে। গতিও তেমন নেই। লতিফ হা আল্লা বলে লাফিয়ে ট্রেনে উঠলো। তার দেখাদেখি আজিজও। পাদানিতে দাঁড়িয়ে শরীরটা ঝুলিয়ে হাসতে হাসতে য়্যাডেলার উদ্দেশে বললো, 'আমরা যে বাঁদরের উত্তরপুরুষ তাতে কোন সংশয় আছে কি ? সুতরাং আমাদের জন্যে মোটেই ভাববেন না।'
য়্যাডেলাও হাসছে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো আজিজ। 'ফীলডিং! মিস্টার ফীলডিং!' ওদের দেখতে পেয়েছে আজিজ। দুজনকেই। লেভেল ক্রসিংয়ের ওপরে টঙা থেকে নেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। লেভেল ক্রসিংএর গেট বন্ধ। ওদের ট্রেন বেরিয়ে গেলে আবার গেট খুলবে। কী সাংঘাতিক এই ট্র্যাজেডি! এত কাছে কিন্তু এত দূরে যে ধরা ছোঁবার উপায় নেই। শব্দ করে ট্রেনটা তখন লাইনের পয়েন্ট পেরোচ্ছে। প্রায় গড়াচ্ছে ট্রেন, এত ধীর তার গতি। যে কেউ ইচ্ছে করলে দুটো কথা সেরে নিতে পারে। পাদানিতে ঝুলে আজিজ চেঁচাল 'খারাপ খুব খারাপ! তুমি আমার দারুণ ক্ষতি করে দিলে।'
রাস্তা থেকে ফীলডিংও চেঁচাল, 'কি করবো ? গড়বোলের পুজোর জন্যেই তো দেরি হলো!'
গড়বোলে তখন লজ্জায় চোখ নাবিয়েছেন। তবে ভরসা যে লজ্জাটা তাঁর নয়। ধর্মের। পুজোর সময়টা যে এতটা লম্বা হয়ে যাবে তা তিনি ভাবেন নি।
আজিজ ফের চেঁচাল। 'যাই হোক। উঠে পড়। তোমায় আমার খুব দরকার। লাফিয়ে উঠতে পারবে তো ?'
'খুব পারবো। হাতটা বাড়াও।'
আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস মুর। 'মোটেই না। খুন হয়ে যাবে মানুষটা।'
ফীলডিং ততক্ষণে আজিজের বাড়ান হাতটা ধরতে লাফিয়েছে। কিন্তু ফস্কে গেল। শরীরের ভারসাম্য নেই। উল্টো ঝোঁকে লাইনের ধারে পড়ে গেল ফীলডিং। ট্রেনটাও গড়গড় করে এগিয়ে গেল। পেছনে পড়ে রইল ফীলডিং আর গড়বোলে।
'আমি ঠিক আছি। আমার জন্যে ভেব না।' ফীলডিংএর কথাটা ভেসে এল বাতাসে। দেখতে দেখতে ক্ষীণ হয়ে গেল তার কথার শেষটা। ওদের ছেড়ে ট্রেনটা তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে।
পাদানিতে দাঁড়িয়ে ছিল আজিজ। চোখদুটো ঝাপসা হয়ে গেছে জলে। প্রায় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো যেন সে.
'মিসেস মুর, মিস কোয়েস্টেড আমাদের ট্রিপটা একেবারে মাটি হয়ে গেল। আর কোন আকর্ষণ রইল না এর।'
'খুব রইল। তুমি ভেতরে ঢোক তো বাছা! কি কাণ্ড! নিজে মরতে ফীলডিং-কেও মারতে! আজিজ তখন যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। সেইভাবে আবদার করছে। বললো, 'কি করে বললেন যে মাটি হল না ? বুঝিয়ে বলুন আমাকে!'
'বুঝিয়ে তো তুমিই দিলে একটু আগে।'
আজিজ অবাক। বৃদ্ধা মধুর হেসে বললেন, 'তুমিই তো বললে বাবা! যারা রইলাম তারা সবাই মুসলমান। তাই-ই তো হলো!'

আজিজ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে কথাটা শুনল। মাতৃসম এই বৃদ্ধা মহিলাকে এই জন্যেই এত ভাল লাগে তার। মসজিদে যেদিন সে প্রথম দেখলো সেদিন থেকেই অন্তরের প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধা ভালবাসা দিয়ে এ'কে মনে মনে সেবা করেছে। শ্রদ্ধা ভালবাসার সেই ফল্গুধারায় আবার যেন নতুন করে পরিচ্ছন্ন হলো তার মন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, এই বৃদ্ধার সেবা করার সুযোগ সে কখনও অবহেলা করবে না। প্রাণ দিয়েও তা পালন করবে।

য়্যাডেলা এতক্ষণ চুপ করে দেখছিল। এখন ধমক দিয়ে বললো,

'আগে আপনি কামরার ভেতরে ঢুকুন, তারপর অন্য কথা। আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন আপনি।'

'কিন্তু......'

'কোন কথা নয়। আগে ঢুকুন। ওদের বোকামির জন্যেই ওরা ট্রেন মিস্ করেছে। দোষটা কার? ওদের না আপনার?'

'আমারই দোষ। আমিই ওদের নেমন্তন্ন করেছি।'

'ননসেন্স!' বেশ উষ্মার সঙ্গেই বললো য়্যাডেলা। সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিল। শান্ত হয়ে বললো, 'যান, নিজের কামরায় যান! জানবেন ওদের ছাড়াই আমাদের এই ট্রিপ সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।'

মেয়েটার কথাবার্তায় ঝাঁজ আছে। কিন্তু কথাগুলো সরল। কোন ঘোর-প্যাঁচ নেই। নিষ্ঠুরও নয় মেয়েটা। অবশ্য মিসেস মুর একেবারে আলাদা ধাতের মানুষ। তাঁর সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। একদিক দিয়ে এ'রা দুজনেই আশ্চর্য স্বভাবের মহিলা। তাই এ'দের সঙ্গ পেয়ে কৃতার্থ মনে করলো আজিজ। এই আশ্চর্য সুন্দর সকালটা তার জীবনেও একটা মহার্ঘ্য অভিজ্ঞতা হয়ে রইলো। নিজেকে এখন অনেক যোগ্য মনে হচ্ছে তার। শুধু যোগ্য নয়, দামীও। তাকে ছাড়া এই বিদেশিনীরা কত অসহায় হয়ে যাবে এই অভিযানে! ফীলডিং আসতে পারলো না বলে আজিজ দুঃখিত হয়েছে। এটা তার ব্যক্তি-গত ব্যাপার। কারণ শুধু বন্ধু নয়, ফীলডিং তার জীবনে আরও কিছু। তবে এটাও ঠিক ফীলডিং উপস্থিত থাকলে অধিনায়ক সেই-ই হতো। ভারতীয়দের যোগ্যতা সম্বন্ধে সায়েবদের তাচ্ছিল্যটা মাঝে মাঝে বড় খোঁচা দেয় তাকে। 'ভারতীয়রা নাকি দায়িত্ব নিতে অক্ষম।' হামিদ্উল্লাও প্রায়ই কথাটা শোনায়। কিন্তু সবকিছুতেই যারা হতাশ তাদের দেখিয়ে দেবে অযোগ্য সে নয়। আসলে ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাদের ধারণাটাই ভুল। আত্মবিশ্বাসে ভরে উঠল আজিজের মন। বাইরের দিকে তাকিয়েছিল আজিজ। শেষ রাতের অন্ধকার ফিকে হচ্ছে। কিন্তু বাইরের জগৎ তখনও অস্পষ্ট। পাতলা অন্ধকারের চাদরে ঢাকা আছে জগৎটা। সূক্ষ্ম ওড়নার মতন অন্ধকারের চাদরটা খুব ধীরে ধীরে সরে যচ্ছিল। আকাশের দিকে তাকাল আজিজ। বৃশ্চিকরাশিটা অন্ধকার আকাশে হাত পা ছড়িয়ে জ্বলজ্বল করছে। দেখতে দেখতে সেটা ম্লান হয়ে গেল। আরও খানিকক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে রইলো আজিজ। তারপর জানালা দিয়ে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ঢুকে পড়লো।

কামরায় লতিফও ছিল। আজিজ হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করলো,

আচ্ছা লতিফ ভাই। এই মাড়াবার গিরিগুহায় কি দেখতে যাচ্ছি আমরা? গুহার মধ্যে কি আছে জানো কিছু?'
লতিফ জানে না। তার মতন সাধারণ মানুষের জানবার কথাও নয়। তবে বিমূঢ় আজিজকে একেবারে নিরাশ করতেও ইচ্ছে হলো না তার। একটা ভাসাভাসা উত্তর দেবার চেষ্টা সে করলো। তার ধারণা ঈশ্বরও জানেন না কি আছে ভেতরে। তবে স্থানীয় লোকেরা নিশ্চয় অনেক কিছু জানে। গাইডের কাজটাও তারাই করবে। খুশি হয়েই করবে।

১৪

জীবনের বেশিটাই এত একঘেয়ে যে তা বলে বেড়ানোর মতন নয়। অবশ্য যাঁরা জীবনধর্মী তাঁরা উল্টো কথা বলেন। তাঁরা বলেন যে জীবনের ধারা ভারি মিষ্টি, পদে পদে তার রোমাঞ্চ। এই মিথ্যাচার জেনেশুনেই করেন তাঁরা, নইলে তাঁদের নিজেদের জীবনধারণটা একঘেয়ে বলতে হতো। অন্নগতপ্রাণ আমাদের। তাই অন্ন সংস্থানের জন্যে আমরা খাটি। সেই সঙ্গে কিছু কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন করি। মানুষের জীবনধারণের সমস্ত উৎসাহ এই খোলসের মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকে। তখন সুখ বা দুঃখের মোটা দাগের অনুভূতি ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। এমনকি যেদিনটা খুব রোমাঞ্চকর মনে করে, সেদিনও উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে না। তাই যখন বলি, 'বাঃ! দিনটা খুব সুন্দর কাটলো তো!' কিংবা 'উঃ! কি ভয়াবহ এই দিনটা!', তখন আমরা মিথ্যাচার করি। আমরা সাধারণ মানুষরা আনন্দ বা বেদনার অনুভূতি-গুলো ঠিক মতন বুঝি না বলেই এই মিথ্যাচার করি। কিন্তু যাঁরা স্থিতধী মানুষ তাঁরা এই মিথ্যাচার করেন না। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভয়-ক্রোধ কোন অবস্থাতেই তাঁরা বিচলিত হন না। এ'রাই পূর্ণ মানুষ ; এ'দের জীবন-যন্ত্রের ব্যবহারও যথাযথ এবং ত্রুটিহীন।
মিসেস মুর এবং য়্যাডেলা চন্দ্রপুরে এসেছেন দিন পনেরো হলো। এই ক'দিনে গড়বোলের বেসুরো গলার ছোট্ট গানটা শোনা ছাড়া আর কোন বৈচিত্র্য এ'রা পান নি। কমবেশি খোলসের মধ্যেই একঘেয়ে জীবন কেটেছে। তবে মিসেস মুর চাপা মানুষ। বিরক্তিটা নিজের মধ্যেই চেপে রাখতেন। য়্যাডেলা ঠিক বিপরীত মনের বিরক্তি অসন্তোষের জন্যে সে নিজের ওপর রুষ্ট হতো। তার বিশ্বাস, কোন ঘটনাই অপ্রয়োজনে ঘটে না। সে যে এক-ঘেয়ে বোধ করছে তার জন্যে সে নিজেই দায়ী। তাই মনের উষ্মা চেপে সে হৈহৈ করার চেষ্টা করতো। দেখাতে চাইতো যেন সে মোটেই বিরক্ত নয়। য়্যাডেলার আপাত সৎ জীবনযাপনে এটাই একমাত্র ছলনার দিক। তার সব-থেকে বড় বিরক্তির কারণ হলো বিয়ে করতে ভারতবর্ষে আসার ঘটনাটা।

অথচ এই একটা কারণের জন্যেই তার জীবন প্রতি মুহূর্তে মধুর হতে পারতো।

জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল য়্যাডেলা। সকাল হচ্ছে। তবুও বাইরের প্রকৃতি তখনও স্পষ্ট হয়নি। অনেক দেরিতে হলেও শেষমেশ আজিজরা তার ইচ্ছের দাম দিয়েছে। তবে ক'টা দিন আগের সেই উৎসাহ আর নেই। অবশ্য অখুশি সে নয়, বরং ভালই লাগছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে। অদ্ভুত মজাদার সব কাণ্ডকারখানা। পর্দানশীন মহিলা কামরা, স্তূপ করা কম্বল বালিশ, কামরার মধ্যে গড়িয়ে যাওয়া তরমুজ, ছোট্ট একটা মই, পাতমোড়া একটা বাক্স—এরই মধ্যে বাথরুমের দরজা দিয়ে হাতে চা আর ডিমভাজার-ট্রে নিয়ে খানসামার হঠাৎ ঢুকে পড়া—সবটাই বেশ উপভোগ্য অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই। দেখার ফাঁকে ছোট ছোট মন্তব্য করতে বেশ লাগছিল তার। এসব থেকে মনে কোন ক্ষোভ জমে না। তাই য়্যাডেলার মনে হলো এখন থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে রনীর কথাই বিভোর হয়ে ভাববে।

হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে চাকরটার দিকে চেয়ে য়্যাডেলা বললো,

'বাঃ! ছেলেটা কি ফুর্তিবাজ, চটপটে! এ্যাণ্টনির ঠিক উল্টো! তাই না?'

মিসেস মুরের তন্দ্রা আসছিল। ভাবছিলেন একটু গড়িয়ে নেবেন। সেই ঝিমোনো অবস্থায় বললেন, 'তা বটে। যেভাবে চা খাবার আনছে, তাতে চমকে উঠতে হয়। এখানকার সবই যেন অদ্ভুত।'

'আমি কিন্তু এ্যাণ্টনিকে তাড়াবই। তখন প্ল্যাটফর্মের ওপর ওর ব্যবহার দেখেই আমি ঠিক করে ফেলেছি।'

মিসেস মুর অন্য কথা ভাবছিলেন। য়্যাডেলার বিয়ে হবে সিমলায়। সেখানেই বাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছে রনীর আত্মীয়রা। সেখানে এ্যাণ্টনিকে দরকার হবেই।

জবাবে য়্যাডেলা বললো, 'ঠিক আছে। আর একটা চাকর তো লাগবেই হোটেলে আপনার দেখাশোনার জন্যে! কারণ রনীর ওই বলদেও না কি নাম যেন......'

'তা বেশ! তুমি বরং অন্য একটা লোক নিও। আমার কাছেই থাকুক এ্যাণ্টনি। ওকে যাহোক করে গরমের শেষ অব্দি আমি মানিয়ে নেব।'

য়্যাডেলা হঠাৎ বললো, 'এসে অব্দি গরমের কথা খুব শুনছি। মেজর ক্যালেণ্ডারের মতন লোকেরা কানে ধরে শোনাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়। যেন সবাইকে বোঝানো যে তাদের তুলনায় এদেশটা অনেক বেশি জানেন। বিশ বছরের অভিজ্ঞতা তো!'

'না বাড়াবাড়ি নয়। সত্যি দুর্বিষহ এখানকার গরম কালটা। তবে একবারও আমি ভাবি নি যে এভাবে এখানে আটকে পড়বো।'

মিসেস মুর খুব অন্যায় বলেন নি। বিজ্ঞ মানুষদের মতন এরা যেমন গয়ংগচ্ছ করছে, তাতে মনে হয় না যে মাসের আগে এরা বিয়ের টোপর মাথায় পরবে। আর বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তো ফিরতে পারবেন না তিনি! তারপর মে মাস পড়ার পর শুরু হয়ে যাবে গরমের তাণ্ডব। ভারতবর্ষ আর তার

আশপাশের ওপর আগ্নের গোলার মতন আছড়ে পড়বে গরমকাল। অন্তত সেই কটা দিন হিমালয়ের কোলে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তাঁর গতি নেই, অধৈর্য য়্যাডেলা বললো, 'আমি কিন্তু এখানকার বউদের মতন মাসের পর মাস ওইভাবে আলাদা থাকবো না। দেখছেন তো এদের? স্বামী বেচারারা যখন গরমে সেদ্ধ হচ্ছে তখন তাদের বউরা নিশ্চিন্ত হয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘ্রছে। মিসেস ম্যাকব্রাইড্ তো স্বামীর সঙ্গে সারা বছর ঘরই করে না। কিন্তু ভদ্রলোক মোটেই অবিবেচক নন। ঘর করার মন আছে। অথচ মিসেস ম্যাকব্রাইড দ্'মাস নিশ্চিন্তে ওঁকে ছেড়ে থাকে। তাবপর যখন জ্ঞান হয় তখন বনিবনা হচ্ছে না বলে চেঁচায়।'

'ওর কিন্তু ছেলেমেয়ে আছে।'

'হ্যাঁ। তা আছে সত্যি।' একট্ যেন আলগা স্বর য়্যাডেলার। বললো, 'ওই ছেলেমেয়েদের জন্যেই আসে। যদ্দিন না তারা বড় হচ্ছে, ঘর সংসার করছে। তারপর আবার নিজের মতন একলা থাকবে হয় পাহাড়ে বা অন্য কোথাও।'

'তাই তো! ঠিক বলেছ তুমি মা! এভাবে আমি ভাবি নি।'

য়্যাডেলা তার হাতের খালি পেয়ালাটা অপেক্ষারত চাকরটার হাতে দিয়ে বললো, 'আমার বিশ্বাস রনীর ভাইরা বিয়ে পর্যন্ত আমার জন্যে একটা লোকের ব্যবস্থা রাখবে। বিয়ের পর রনীকে নতুন করে ঘর সংসার গোছাতে হবেই। নইলে প্রোনো চাকররা আমার কথা শ্নবে না। তাদের দোষ দেওয়াও যাবে না, কারণ মনিব নতুন হলে প্রোনো লোকেরা সহযোগিতা করতে চায় না।'

মিসেস ম্র জবাব দিলেন না। জানলাব শার্সি তুলে বাইরের দিকে তাকালেন। তখনও ভাল করে আলো ফোটে নি। চাপচাপ অন্ধকারে ডুবে আছে বাইরেটা। বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নানা কথা ভাবছিলেন বৃদ্ধা। রনী আর য়্যাডেলার ইচ্ছেতেই ওদের দ্জনকে মিলিয়ে দিতে দ্তির কাজ করছেন। এর বেশি আর কিছ্ করার অধিকার তাঁর নেই। তারা কি করবে না করবে সে পরামর্শ তিনি দিতে পারেন না। ইদানিং তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে যে নিজেদের নিয়ে মান্ষ যতটা সচেতন হয়, ততটা সচেতন তারা সম্পর্কের ওপর হয় না। যদি তা হতো তাহলে একজন আর একজনকে ভুল ব্ঝতো না। বিয়ের আগে কত হৈ-হৈ, আচার অন্ষ্ঠানের বাঁধাবাঁধি। কিন্তু সবই বাইরের কোলাহল। দ্টো শরীরের কামনার ক্ষ্ধা মেটানো ছাড়া বিয়ে কি দিয়েছে আজ পর্যন্ত? কটা মন একত্র করেছে? সেই কবে থেকে আড়ম্বর করে বিয়ের অন্ষ্ঠান চলে আসছে কিন্তু আজও একজনের মনের কাছাকাছি আর একজন পেঁছিতে পারলো না।

মিসেস ম্র জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিলেন। য়্যাডেলা জিজ্ঞেস করলো, 'পাহাড়ের ওপর কিছ্ দেখতে পাচ্ছেন?'

'তেমন কিছ্ না। শ্ধ্ অন্ধকার।' 'আমরা বোধ হয় সেই য়্যাক্সিডেণ্টের জায়গা থেকে খ্ব দ্রে নেই।' য়্যাডেলাও জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। স্র্যোদয়ের আগের ম্হ্র্তে প্রকৃতির যেন অন্য র্প। ট্রেন তখন

একটা নালা পেরোচ্ছে। শব্দ হচ্ছে ঝম্ ঝম্। খুব ধীরে ধীরে নালার ওপরের ব্রিজটা পেরোচ্ছিল ওদের ট্রেন। নালাটা দেখেই য়্যাডেলার মনে পড়ে গেছে য়্যাক্সিডেণ্টের ঘটনাটা। একটু এগিয়ে আর একটা নালা, তারপর আবার একটা। বোঝাই যাচ্ছে সামনে চড়াই আসছে। য়্যাডেলা ফের বললো, 'মনে হচ্ছে এই জায়গাটাই। রাস্তাটা এখানে রেল লাইনের পাশাপাশি চলেছে।' য়্যাক্সিডেণ্টের ব্যাপারটা তার কাছে এখন মধুর স্মৃতি যেন। সেদিনের দুর্ঘটনাটা না ঘটলে তার অবশ শুকনো মনে নাড়াচাড়া হতো না। রনীর যথার্থ দাম সে উপলব্ধি করতে পারতো না। রঙিন ভাবনায় আবার তার মন ডুবে গেল। মনে মনে স্বপ্নের জাল বোনার এই শখ ছেলেবেলা থেকে। স্বপ্ন দেখা আর তাতে ডুবে থাকা। তবে শুধু রনী নয়, তাদের এই যাত্রার কথাও ভাবছিল সে। আজিজের কথা মনে হলো। বেশ বুদ্ধিমান ছোকরা। ঝুড়ি থেকে একটা পাকা পেয়ারা তুলে খেতে খেতে নিসর্গ শোভা দেখছিল য়্যাডেলা। মন ভরে উঠেছে তার। একবার চেষ্টা করলো একটা ভাজা মিষ্টান্ন খেতে। কিন্তু পারলো না। পরিচারকদের সঙ্গে উর্দুতে কথা বলার চেষ্টা করলো। এদেশে তার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবছিল। কেমন হবে জীবনটা এই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজে কাটবে কে জানে? টার্টন্ বার্টন্দের সমাজে তাকে মানিয়ে চলতে হবে। কোলাহল করে ট্রেনটা আর একটা ব্রিজ পেরোল। ঝম্ ঝম্। যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলেছে এই শাখা লাইনের ট্রেন। কিন্তু কোথায় চলেছে? যাদের নিয়ে চলেছে তারাও কেউ বিশিষ্ট যাত্রী নয়। ধীরে ধীরে দুপাশের সীমাহীন মাঠের মধ্যে হারিয়ে আছে ট্রেনটা। শহর থেকে দূরে চলেছে ট্রেন। একটাই বার্তা তার। চলা। সাজানো গোছানো শহুরে মনটা পেছনে ফেলে এসেছে তাদের ট্রেন। পেছনে অনেক দূর দিয়ে একটা ব্যস্ত দ্রুতগামী মেল ট্রেন চলে গেল বাঁশি বাজিয়ে। ভীষণ তাড়া তার। কলকাতা বা লাহোরের মতন কোন বড় শহরে তাকে এখুনি পেঁাছতে হবে। সেখানে নিত্য কত ঘটনা ঘটছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে এইসব বড় বড় শহরের সদাব্যস্ত পরিবেশে। কিন্তু এতবড় দেশটার মধ্যে কটাই বা শহর! এখানে যা ছড়িয়ে আছে তা তার মাঠঘাট বন পাহাড়। খানিক এগিয়েই ট্রেনের লাইন শেষ হয়ে গেছে। এবার মোটরের রাস্তা। রাস্তার দুপাশের মেঠো পথ ধরে গরুর গাড়ি চলেছে মন্থর গতিতে। একসময় এই ধুলো মাটির পথও হারিয়ে যায় আবাদী জমির মধ্যে। তখন শুধু ধুধু মাঠ। এমন একটা পরিত্যক্ত দেশকে কি করে দীর্ঘদিন মনে রাখা যায়? কি আছে তার? যুগে যুগে অভিযান হয়েছে এর মর্মবস্তু খুঁজে পেতে। কিন্তু যারা এসেছে তারা হেরে গেছে। শহরগুলো যেন সেই হেরে যাওয়া হতাশ মন-গুলোর আশ্রয়স্থল। আবিষ্কার করতে এসে যারা হেরে গেছে তারাই রয়ে গেছে এখানে। ভারতবর্ষ তাদের মনোকষ্টের কারণ জানে। শুধু তাদের নয়—সারা পৃথিবীর মানুষের মনোবেদনা উপলব্ধি করে ভারতাত্মা। এই মনোভূমির যা কিছু মহান যা কিছু তুচ্ছ সব মেলে ধরে ভারতাত্মা সবাইকে আহ্বান করে। কিন্তু কি দেবার আছে তার সেটাই যেন স্পষ্ট নয়! বস্তুত,

কোন আশ্বাসই সে দিতে পারে না। শুধু স্বপ্ন দেখায়।
একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটার গতি ক্ষীণ হয়ে যেতেই য়্যাডেলার স্বপ্ন দেখা শেষ হয়ে গেল। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে। তারপর মিসেস মুরের উদ্দেশে বললো, 'শীতকাল এলেই আপনাকে সিমলা থেকে নাবিয়ে আনবো। তারপর তাজমহল দেখে আমরা বোম্বাই যাব আপনাকে বিদায় জানাতে। আমার তো মনে হয় এই প্রোগ্রামটাই সবচেয়ে ভাল হবে। ভারতবর্ষে এসে এখানকার মোগল শিল্পকলার নিদর্শন না দেখতে পেলে আমরা অনেক কিছুই মিস্ করবো। তাই না মিসেস মুর?' কিন্তু য়্যাডেলার কথাগুলো বৃদ্ধার কানেই গেল না। তিনি তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। শেষরাত থেকেই অনেক খাটুনি গেছে। এ বয়সে এতটা ধকল নেওয়া তাঁর উচিত হয় নি। শরীরটাও তেমন ভাল যাচ্ছে না। ভেবেছিলেন আসবেন না। কিন্তু পাছে আর একজনের আনন্দের ব্যাঘাত হয়, তাই এসেছেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনিও স্বপ্ন দেখছেন। প্রায় একই বুননের স্বপ্ন। তবে যাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তারা বড় আপন। তাঁর অন্য পক্ষের ছেলেমেয়ে—র‍্যাল্ফ্ এবং স্টেলা। তাদের অনুনয় করে বলছিলেন তাঁকে যেন ভুল না বোঝে। য়্যাডেলার কথায় বৃদ্ধার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি দেখলেন অবাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা। সেই ভাবেই হঠাৎ বলে উঠলো, 'অসাধারণ! অদ্ভুত!'
অসাধারণই বটে। চন্দ্রপুরের সিভিল লাইন্স্ থেকেও মাড়াবার শৈলশ্রেণী সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু এখান থেকে মনে হচ্ছে এ দৃশ্য আরও মহান। ঈশ্বরের মতন মহিমান্বিত এবং দৃপ্ত এর সৌন্দর্য। তুলনায় এই ভূমণ্ডল কত হীন, কত নিরেশ। কাছের পাহাড়টাই কাউয়া দোল্। আকাশের দিকে মুখ তুলে সোজা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শৃঙ্গদেশ থেকে আলম্বিত হয়ে আছে একখানা প্রকাণ্ড পাথরের চাঙড়। কিন্তু এত বিশাল পরিধির পাথরের চাঙড় কি আদৌ সম্ভব? মনে হচ্ছে অন্য পাহাড়গুলো যেন অতিকায় এই চাঙড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের মধ্যের গুহাগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন। ট্রেনটা যখন ধীরে ধীরে পেরিয়ে যাচ্ছে তখন মনে হচ্ছিল পাহাড়-গুলো যেন পিছন দিকে সরে যাচ্ছে। যেন ওদের দিকে নজর রাখতেই পাহাড়ের এই পশ্চাদ্পসরণ।
য়্যাডেলা অভিভূত। আবেগের উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠলো সে। দেখুন! দেখুন! এ এক অভাবনীয় দৃশ্য মিসেস মুর! কোন কিছুর বদলেই এমন দৃশ্য হারাতে পারতুম না। দেখুন! সূর্য উঠছে—তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে সূর্যোদয় হচ্ছে। কি মহান এই আগমন! এর কোনো বিকল্প আছে কি? অন্তত আমার জানা নেই। এই দৃশ্য কখনই দেখতে পেতুম না যদি ওখানেই পড়ে থাকতুম।'
কথা বলতে বলতেই য়্যাডেলা দেখলো যে আকাশের পূর্ব দিকটা গাঢ় কমলা রঙ ধারণ করেছে। আকাশের চেহারাটা কেমন রাগী রাগী। রঙের আভাস উঁকি দিচ্ছিল গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে। ক্রমেই উজ্জ্বল হচ্ছে

রঙ। ঝকঝকে এই উজ্জ্বলতা যেন অবিশ্বাস্য প্রয়াসে বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আত্মপ্রকাশের এই মুহূর্তটি অলৌকিক—যখন রাত্রিবসানের পর দিনের উদয় হয়। কিন্তু এই মহত্তম মুহূর্তটিতে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটলো না। যেন মুহূর্তটি তার নিষ্পাপ দিব্য ভাবটি হারিয়ে ফেলেছে। ইতিমধ্যে পূব আকাশে রঙের ঝলমলানি অনেক কমে এসেছে! পাহাড়গুলো অস্পষ্ট হলেও তাদের শৃঙ্গদেশ শীতরৌদ্রে আলোকিত হয়ে উঠেছে। ঝিরঝির করে বইছে ভোরের বাতাস। অর্থাৎ সূর্য প্রকাশিত। গভীর হতাশায় ভেঙে পড়লো য়্যাডেলা। কারণ প্রকাশের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি সে দেখতে পেল না। সাজানো ঘরে সমারোহ করে নতুন বর আসবে এটাই তো সকলের প্রত্যাশা! কেন তা থেকে বঞ্চিত হলো সে? যেন সূর্য উঠলো, কিন্তু ঐশ্বর্যটুকু ছাড়াই তার উদয় হলো। গাছগুলোর পিছন থেকে সূর্যালোক বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তখন। মরা আকাশটা ভরে উঠেছে তার হলুদ রঙে। দেখতে দেখতে যেখানে 'ওরা কাজ করে' সেই মাটির পৃথিবীতে নেমে এল সূর্যরশ্মি।

য়্যাডেলা দারুণ হতাশ। ক্ষুব্ধ স্বরে সে বলে উঠল, 'ইস! আমরা শেষ পর্যন্ত নকল সূর্য ওঠা দেখলাম! কেন এমন হয় জানেন মিসেস মুর? মিস্টার ম্যাকব্রাইড আমায় বলেছিলেন। এখানকার বায়ুমণ্ডলে ধুলোর আস্তরণ এত পুরু যে সারা রাত্রির মধ্যেও তা নেবে যায় না। ঠিক এই জন্যেই সূর্যোদয়ের মহত্তম মুহূর্তটা হারিয়ে গেল। ইংল্যাণ্ডে এমনটি হয় না। অন্তত সূর্যোদয়ের ব্যাপারে এই জালিয়াতিটা সেখানে হয় না। গ্রাস্‌মীয়ারের কথা মনে পড়ে আপনার?'

'গ্রাস্‌মীয়ার? রূপসী গ্রাস্‌মীয়ার? নিশ্চয়ই মনে পড়ে।' রূপসীই বটে এবং রোমাণ্টিকও। ছোট ছোট পাহাড় আর লেক দিয়ে প্রকৃতি তাকে নিপুণ করে সাজিয়েছে। মনে হয় রূপসী গ্রাস্‌মীয়ার পৃথিবীর বিশুদ্ধ দান। কিন্তু পৃথিবীর কলুষ ছুঁয়েছে মাড়াবারকে। মালিন্যসমাকীর্ণ তার দেহ।

অন্য কামরা থেকে আজিজ তখন তাদের দেখে ফেলেছে। সেখান থেকেই চিৎকার করে উঠল সে।

'গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। শীগগির মাথায় টুপি পরুন। এখন আমি ডাক্তার হিসেবে বলছি। ভোরের রোদ খোলা মাথায় লাগাবেন না। ওটা মারাত্মক।'

'গুড মর্নিং। তা আপনি পরেন নি কেন?'

একমাথা ঘন চুল আজিজের। ঠাস বুননের চুলে হাত বুলোতে বুলোতে হা হা করে হেসে বললো, 'আমার চুল কিরকম ঘন দেখছেন?'

স্মিত মুখে অনুচ্চ স্বরে নিজেকে শোনাতেই য়্যাডেলা বলে উঠলো। 'চমৎকার মানুষটা।'

'শুনুন!' আজিজ আবার বললো, 'মহম্মদ লতিফও আপনাদের গুড মর্নিং জানাচ্ছে।'

হাসি মুখে ঘাড় নাড়লো য়্যাডেলা। তারপর বললো, 'পাহাড় কখন দেখাবেন?

ট্রেনটা কি থামতে ভুলে গেছে?'
'ঠিক বুঝছি না। হয়ত চক্র রেল। না থেমে আবার চন্দ্রপুরেই ফিরে যাবে। কি হবে কে জানে!'
আরও মাইলখানেক গড়িয়ে ট্রেনটা থামলো। সামনেই দাঁড়িয়ে পাহাড়ের মতন বিশাল এক হাতী। তার চিত্রবিচিত্র কপালটা ভোরের সূর্যের দিকে ফেরানো। চেহারায় আভিজাত্যে রীতিমত ঝলমল করছে গজরাজ। ছোট্ট একটা প্ল্যাটফর্ম অবশ্য আছে। কিন্তু গজরাজের অভিজাত অস্তিত্বের সামনে প্ল্যাটফর্মটা নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। হাতী দেখে দুজন মহিলাই বিস্ময়াবিষ্ট। এতটা তাঁরা আশা করেন নি। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে আজিজও হৃষ্ট। মহিলাদের আনন্দ দেখে সে যেন কৃতার্থ। আল্লাই জানেন কত কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে এই হাতীটা সে সংগ্রহ করেছে। হামিদ্‌উল্লার বেগম, নুরুদ্দিনের মা, নবাব বাহাদুর—এইভাবে এগিয়েছে তার আবেদন। দীর্ঘপথ সন্দেহ নেই এবং রীতিমত জটিল পথ অতিক্রম করে তবেই তার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। কিন্তু শুধু দীর্ঘ বা জটিল নয়। অনিশ্চিত এবং পলকা এক সুতোয় বাঁধা ছিল হস্তী প্রাপ্তির সম্ভাবনাটি। হামিদ্‌উল্লার বেগমকে আশ্বস্ত করতে হয়েছে—ট্রেনের জেনানা কামরার ভাঙা শার্সি কলকাতা থেকে সারাই করিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে তবে সম্ভব হয়েছে। অবশ্য ঈশ্বরের অসীম করুণা যে সুতো ছিঁড়ে যায় নি। মনে মনে সে তাই গর্বিত। অবশ্য প্রাচ্যদেশ বলেই এমন ঘুর পথেও অনিশ্চিত নিশ্চিত হল। বন্ধু এবং তস্য বন্ধুর সাহায্যেও কাজ হাসিল হল। হাতী দেখে লতিফও খুশি। দুজন অতিথি অনুপস্থিত বলে হাওদার ওপর চড়ার অধিকার তার স্বীকৃত হলো। অন্যথায় তাকে গরুর গাড়িতে এদের অনুসরণ করতে হতো। হাতীর উপস্থিতিতে অভিযানটা যে অতিরিক্ত মর্যাদা পেল, তার জন্যে ভৃত্যকুলও উল্লসিত। কামরার ভেতর থেকে তারা তখন ছুঁড়ে ছুঁড়ে জিনিস-পত্তর ফেলছে আর সবাইকে আদেশ করছে।
দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল কর্মযজ্ঞ। সবাই ব্যস্ত। আজিজও ব্যস্ত। তবে চাপা খুশিতে ছটফট করছিল সে। একটু পরে য়্যাডেলার দিকে চেয়ে হেসে বললো, 'কেভ্‌স্ অব্দি যেতে এবং আসতে আমাদের সময় লাগবে দুঘণ্টা। দুঘণ্টা লাগবে কেভ্‌স্‌গুলো ঘুরে দেখতে। আর এক ঘণ্টা রাখা আছে বিপদ-আপদ সামাল দিতে। অবশ্য বিপদ আপদ তেমন কিছু নয়। অর্থাৎ মোট পাঁচ ঘণ্টার যাত্রা—খুবই ছোট্ট অভিযান তবে খুবই থ্রীলিং। এই ট্রেনটাই এখানে আসছে বেলা সাড়ে এগারোটায়। তার মানে একটার মধ্যেই আমরা চন্দ্রপুরে পৌঁছে যাচ্ছি। মিস্টার হীস্‌লপের সঙ্গে বসে লাঞ্চ করতে পারবেন একটা পনেরোর মধ্যেই। যেমন রোজ করেন। বলুন প্ল্যানটা কিরকম? এটা একেবারে আমার নিজস্ব প্ল্যান। আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই ছকটা তৈরি করেছি। ইচ্ছে হলে এর অদলবদল করতে পারেন। এমনকি কেভ্‌স্ দেখার পরিকল্পনাও বাদ দিতে পারেন। যেমনটি চাইবেন। কি? রাজী তো? তাহলে উঠুন হাতীর পিঠে। আজিজের কথায়

বেশ একটা অধিনায়কোচিত কর্তৃত্বের ভাব ফুটে উঠছিল। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটা সে যে আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছে তা বোঝা যায়। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনেই মহিলারা তাকে মেনে নিলেন।

ধূসর রঙের অতিকায় জন্তুটা ততক্ষণে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে। বাস্তবিক পাহাড়ের মতনই তার আকৃতি। ছোট্ট সিঁড়ি বেয়ে প্রথমে মিসেস মুর এবং পরে য়্যাডেলা হাওদার উপরে উঠলো। আজিজ সিঁড়ির সাহায্য নিল না। দক্ষ শিকারীর মতন হাতীর গোড়ালিতে ভর দিয়ে তার পাকানো লেজে পা রেখে হাওদার ওপর লাফিয়ে উঠলো সে। একই পদ্ধতিতে লতিফও উঠতে গেল। কিন্তু নির্দেশমত হাতীর লেজের পাকটা ভৃত্যেরা তখন খুলে দিয়েছে। সুতরাং হাতীর পাছা বেয়ে সড়সড় করে গড়িয়ে পড়লো বেচারি। ছোট্ট একটু তামাসা। কিন্তু কী প্রাণান্তকর এই পরিহাস! কি নিষ্ঠুর রুচি-বিকৃতি! ভালই লাগলো না মেয়েদের। ছি! ছি! মানুষকে নিয়ে এ কি নিষ্ঠুরতা! দুপাশে নড়েচড়ে হাতীটা একা দাঁড়িয়ে উঠলো। মাটি থেকে প্রায় দশ ফুট উঁচুতে আরোহীরা বসে আছে। আর হাতীটার পা জড়িয়ে আছে এঁটুলির মতন কয়েকটা অনাহারক্লিষ্ট নির্জীব প্রাণী। গ্রামবাসীদের উলঙ্গ ছেলেমেয়েরা ঘুরঘুর করছিল হাতীর পায়ের কাছে। টঙ্গার ওপরে ততক্ষণে বাসন-কোসন গুছিয়ে ফেলেছে চাকরেরা। গড়বোলের জন্যে যে হিন্দু পাচককে আনা হয়েছিল তাকে একটা বাবলা গাছের তলায় বসিয়ে রাখা হলো। ফেরার সময় লোকটাকে আবার সঙ্গে নেওয়া হবে। শুঁয়োপোকার মতন ট্রেনটা তখন এঁকে বেঁকে মাঠ প্রান্তর পেরিয়ে চলতে শুরু করেছে। তার পথ চলার ভঙ্গির মধ্যে যেন আবার ফিরে আসার আশ্বাস। দেখতে দেখতে ন্যাড়া মাঠের ধুধু সীমাহীনতার মধ্যে হারিয়ে গেল ট্রেনটা। ট্রেনের ধুক-ধুক আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে সারা পরিবেশ স্তব্ধ হয়ে গেল। কোথাও কোন জীবনস্পন্দন নেই। জীবনের প্রকাশ নেই। শুধু যেখানে শুঁয়ো পোকার শুঁড়ের মতন পাতকুয়ার দণ্ডগুলি একটা নির্দিষ্ট ছন্দে উঠছে নামছে, সেখানে একটা বিষণ্ণ জীবনের ছবি ফুটে উঠছিল। ভোরের ঝিরঝিরে বাতাসে সমস্ত পরিবেশ জুড়েই এই বিষণ্ণ জীবনের চিত্র—নিষ্প্রভ এবং জীবনীশক্তিহীন।

সকালের ফ্যাকাসে রোদ ততক্ষণে পাহাড়ের পাদদেশেও পেঁছে গেছে। পাহাড়ের খাঁজে পেন্সিলের মতন সরু লম্বা ছায়া। ধীরে ধীরে হাতীটা তখন পাহাড় ভেঙে ওপরে উঠছে। চারিদিকে কী গভীর নৈঃশব্দ্য! সম্পূর্ণ অন্য রূপ। একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ যেন। শুধু কান নয় সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে এই নৈঃশব্দ্য অনুভব করতে হয়। জীবন ঠিকই বয়ে চলেছে, কিন্তু তার লক্ষণ যেন বোঝা যাচ্ছিল না। শব্দের প্রতিধ্বনি নেই। মনটাও চিন্তা-ভাবনাশূন্য—হাহা করছে তার শূন্যতা। যা দেখছে সবই যেন অলীক, মায়া-ময়। তাই নানা কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে এদের ঘিরে। পথের ধারে ছোট ছোট অসংখ্য মৃত্তিকাস্তূপ। খাঁজ কাটা তাদের গা। ঝকঝকে ঢিপিগুলো যেন নিপুণভাবে চুনকাম করা। এগুলো কারও সমাধি? না পার্বতীর

পয়োধর? স্থানীয় মানুষের কাছে দুটো বিশ্বাসই সমান প্রচলিত। আরও দৃষ্টান্ত আছে। চলতে চলতে য়্যাডেলা দেখলো লিকজিকে কালো একটা সাপ লেজে ভর দিয়ে দুলছে আর ক্রুর চোখে তাদের দেখছে। ভয়ে হিম হয়ে গেল তার শরীর। কোনরকমে বললো, 'সাপ!

সঙ্গের লোকেরাও দেখেছে সাপটাকে। আজিজও দেখলো। ফিসফিস করে বললো, 'কেউটে। ভীষণ বিষাক্ত। আমাদের দেখে লেজে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।' একটা ছোট ঝর্ণার ধারে সাপটা দাঁড়িয়ে উঠেছে। য়্যাডেলার কি খেয়াল হলো। রনীর বড় দূরবীনটা দিয়ে লক্ষ্য করে বুঝলো যে ওটা সাপ নয়। শুকনো পাকানো একটা গাছের ডাল। কিন্তু সেকথা মানতে রাজী নয় গ্রামের লোকেরা। তাদের কাছে ভ্রমটাই সত্য। আজিজও ওই দলের। দূরবীন দিয়ে দেখেও তার সংস্কার ভাঙতে চাইল না সে। জোর করেই বললো যে ওটা সাপই আর নানারকম ভাঁড়ামি করে তার ভীত আতঙ্কিত ভাবটা দেখাতে লাগলো। বলা বাহুল্য এই ভ্রান্তি, এই কুহেলিকার কোন নিষ্পত্তি হলো না। বরং কাউয়া দোলের খাড়া পাহাড় থেকে সূর্যরশ্মির বিকীরণ এই অস্পষ্টতা যেন বাড়িয়ে দিচ্ছিল। তবে কাউয়া দোলের যত কাছাকাছি তারা এগিয়ে যাচ্ছে ততই এই মরীচিকাভ্রম কমে যেতে লাগলো। য়্যাডেলা বুঝতে পারছিল যে সূর্যরশ্মির বিকীরণের জন্যে তাদের মনে এই কল্পলোকের সৃষ্টি হচ্ছে।

অবশেষে গজরাজ এসে থামলো কাউয়া দোল পাহাড়ের সামনে। মনে হলো এবার বোধহয় ঢুঁ মেরে পাথর ফাটিয়ে সে সোজা ভেতরে ঢুকে যাবে। আরও কিছুটা এগিয়ে হাতী মোড় নিল। তার চলার পথের পাথরগুলো পায়ের ধাক্কায় খাড়া নিচে গড়িয়ে পড়ছে। ওরা যত ওপরে উঠছে সমভূমি তত দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে। সমস্ত অভিজ্ঞতাটা য়্যাডেলার কাছে এত বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল যে এর মধ্যেই ডুবে ছিল তার চেতনা। ইতিমধ্যে কখন যে তারা শক্ত পাথরের রাজ্যের অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছে বুঝতে পারে নি য়্যাডেলা। যখন উপলব্ধি করলো তখন দেখলো তার চারপাশে গ্র্যানাইট পাথরের নিরেট দেওয়াল আর সেই স্তব্ধ প্রাণহীন পরিবেশের মধ্যে তারা ক'টি প্রাণী সম্পূর্ণ বন্দী। তাদের মাথার উপর বিরাজ করছে সর্বব্যাপী আকাশ। অনেক কাছে চলে এসেছে আকাশটা। একটা অস্বাস্থ্যকর নিকটত্ব। সরলোন্নত শৈলশ্রেণীর মাথায় সিলিংএর মতন ঝুলছে আকাশটা—যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। আত্মতৃপ্তিতে আজিজ এতই আবিষ্ট ছিল যে প্রকৃতির এই অবিস্মরণীয় গম্ভীর রূপটি তার নজরেই পড়ে নি। বিদেশী অতিথিরাও চোখ মেলে যেটুকু দেখেছে তা সামান্য। তাদের কাছেও এর কোনো আলাদা আকর্ষণ নেই। তাদের মনে হচ্ছিল না যে এটা এমন কিছু দর্শনীয় অভিজ্ঞতা। বরং এটা যদি কোন মোগল স্থাপত্য হতো, নিদেন একটা মসজিদ, তাহলেও এর শিল্পনিপুণতায় তারা মুগ্ধ হতে পারতো। আজিজের পক্ষেও সহজ হতো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে। এই পরিবেশে আজিজের অজ্ঞতা যেন ক্রমেই দৃষ্টিকটু হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষের এই নিরাবরণ আন্তররূপ তার

কাছে আজও অনাবিষ্কৃত। তাই যথেষ্ট সহজভাবে কথাবার্তা বললেও সে তার অজ্ঞতা চেপে রাখতে পারলো না। গড়বোলের অনুপস্থিতিতে আজিজ যেন ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছিল শৈলরাজ্যের এই অনতিক্রমণীয় দুর্গমতায়।
গিরিপথ ক্রমশ সরু হচ্ছে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে থালার মতন চওড়া হয়ে গেল পথটা। মোটামুটি এটাই তাদের মন্তব্য। পাশেই একটা মজা পুকুর। যৎসামান্য জলও আছে পুকুরে। পুকুরের ওপরেই একটা শৈলখাত। এটাই প্রথম গুহা। হাতার মতন জায়গাটার তিনদিকে উত্তুঙ্গ পাহাড়। দুদিকের পাহাড় থেকে একটা ভ্যাপসা গরম তাপ উঠছে। শুধু একদিকের পাহাড়ের গায়ে ছায়া। ওখানেই তারা তাঁবু ফেললো।
মিসেস মুর বিরক্তিতে বিড়বিড় করছিলেন, 'উঃ! কি অসহ্য গুমোট এখানটা! বীভৎস!'
য়্যাডেলার এসবে লক্ষ্য নেই। সে সপ্রশংস চোখে লোকজনদের কাজকর্ম দেখছিল। যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ওরা ব্যবস্থাদি করছে। ইতিমধ্যেই মাঠের ওপর একখানা চাদর বিছানো হয়েছে। মধ্যিখানে একটা ফুলদানি। নকল ফুল দিয়ে ফুলদানিটা সাজানো। মহম্মদ আলির পাঠানো বাবুর্চিটা দ্বিতীয় দফার চা এবং ডিম ভাজা পরিবেশন শেষ করলো। খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ওরা এসব করছিল। আজিজকে য়্যাডেলা প্রশংসা করলো এদের কাজের।
'বাঃ! আপনার লোকজনেরা তো খুব চটপটে!'
স্মিত মুখে আজিজ বললো, 'আমি ভাবলাম কেভ্‌স্‌ দেখতে যাবার আগে সামান্য কিছু খেয়ে নিলে ভাল হয়। তারপর ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট করবো।'
'এটা ব্রেকফাস্ট নয়?'
'এইটুকু ব্রেক ফাস্ট? আপনারা কি ভেবেছিলেন আমি আপনাদের উপোস করাবো? বেশ আত্মশ্লাঘার সঙ্গে জবাব দিল আজিজ। তাকে আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে ইংরেজরা কখনও মুখ বন্ধ করে না। কিছু না কিছু তারা সর্বক্ষণই খায়। আজিজ তাই এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে প্রতি দুঘণ্টা অন্তর কিছু না কিছু খাদ্যবস্তু তাদের বিতরণ করা যায়, যতক্ষণ না লাঞ্চের সময় আসে।
'আপনার আয়োজন কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে।'
প্রশংসা করে বললো য়্যাডেলা। আজিজ তাকিয়েছিল ওর চোখের দিকে। সলজ্জ একটু হাসল মাত্র। তারপর বললো, 'প্রশংসা যা করার চন্দ্রপুরে ফিরে করবেন। আপনারা আমার অতিথি। সুতরাং ত্রুটি হলে সেটা আমারই প্রাপ্য।'
বেশ ভারিক্কি চালে কথা বলছিল আজিজ। কয়েক ঘণ্টার জন্যে এঁরা তার কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছেন। সুতরাং আজকের আয়োজনের সে-ই কর্তা। অবশ্য এর জন্যে সে ওঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। সুখের কথা, এই কাজে এখনো অব্দি কোন বাধা আসে নি। সবই নিয়মমত পালিত হচ্ছে। হাতীর খাবারও পরিবেশিত হয়েছে। সদ্য ভাঙা একটা গাছের ডাল মুখে পুরেছে হাতীটা। টঙ্গার শকট-দণ্ডদুটো আকাশের দিকে ওঠানো। একটা ছেলে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে। হাসান যথারীতি শোরগোল করে তদারকি করছে। একটা গাছের ডাল ভেঙে

সেটাকে ছড়ির মতন দোলাচ্ছিল মহম্মদ লতিফ। এটাই তার তখনকার কাজ। মোট কথা সব আয়োজনটাই যথাযথ প্ল্যানে চলেছে। কোথাও কোন অনুপপত্তি নেই। এককথায় বলা যায় যে আয়োজন সর্বাত্মক সফল। সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথায় এবং প্রায় অজ্ঞাতনামা একজন ভারতীয় যুবকের নেতৃত্বে সার্থক রূপ দেওয়া হয়েছে আয়োজনের। আজিজের এইটুকুই আত্মপ্রসাদ। তার মতন একজন অজ্ঞাতপরিচয় যুবক যে দুজন বিদেশিনীদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছে সেটাই যথেষ্ট। সব ভারতবাসীই মনে মনে এই সুযোগটুকু পেতে চায়। এমনকি যারা মহম্মদ আলির মতন ইংরেজ বিদ্বেষী তারাও। অবশ্য এ সুযোগ সবাই পায় না। কিন্তু আজিজ পেয়েছে এবং সুযোগের সদ্ব্যবহারও তাকে করতে হবে। এখন এঁদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখাই তার কর্তব্য। তাতেই তার সম্মান। এঁরা যদি অখুশি হন তবে যথার্থই মর্মাহত হবে আজিজ।

অবশ্য আতিথিসেবার ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে আজিজ। ভেবেছিল এর দরুন ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা থেকে যে দূষিত অধিকারবোধ জন্মায় আজিজ তা জানতো না। অবশ্য আজিজকে দোষ দেওয়া যায় না কারণ এটাই হলো এ দেশের আতিথিসেবার নমুনা। ফীলডিং বা মিসেস মুর যখনই তার কাছাকাছি এসেছেন তখনই আজিজ তা বুঝতে পেরেছে। সে উপলব্ধি করলো যে এঁদের কাছে দেয়ার চেয়ে নেয়ার সুখ অনেক বেশি। মাঝে মাঝে সে অবাক হয়ে ভাবে, এঁদের স্থান তার মনের এত কাছাকাছি কি করে হলো ? দুজন বিদেশীর জন্যে এই প্রীতির প্রসার শুধু বন্ধুত্ব নয়, যেন আরও কিছু। এই অতিরিক্ত কিছু হামিদ্‌উল্লার জন্যেও যেন সঞ্চিত নেই। তাই হামিদের চেয়েও এঁরা তার অনেক কাছের মানুষ, মনের মানুষ এঁরা। অনেক বাধার পাহাড় পেরিয়ে তবে সে পৌঁছতে পেরেছে এখানে। এঁদের যে ভাবমূর্তি সে তার মনে গড়ে তুলেছে তা কখনও মরবে না। জীবনের শেষ দিনটি অব্দি এই সম্পদ তার মনকে সমৃদ্ধ করে যাবে। বৃদ্ধার দিকে তাকিয়েছিল আজিজ। ডেক্‌-চেয়ারে বসে একটু একটু করে চা খাচ্ছিলেন মিসেস মুর। চেয়ে থাকতে থাকতে বিশুদ্ধ আনন্দে ছেয়ে গেল আজিজের মন। ইচ্ছে হচ্ছিল বলে, "বলুন! আর কি করতে পারি আপনার জন্যে ?" আজিজের চোখের দুটো কালো তারা তখন বেদনায় ভরে উঠেছে। গভীরভাবে বৃদ্ধার দিকে চেয়ে সে বললো, 'আমাদের সেই মসজিদের কথা আপনার মনে পড়ে মিসেস মুর ?'

'খুব মনে পড়ে বাবা। খুউব !' অত্যুৎসাহে ছেলেমানুষ হয়ে উঠলেন বৃদ্ধা।

'সেদিন আমি খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলুম আপনার সঙ্গে। অথচ কত স্নেহময়ী ছিলেন আপনি।'

'তা হোক। তবুও খুব ভাল লেগেছিল তোমাকে। তোমারও ভাল লেগেছিল নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ। আলাপের পর দুজনেই খুশি হয়েছিলুম। আর ওইভাবে আলাপ হয়েছিল বলেই আমাদের মধ্যে প্রীতির এই সম্পর্কটা আজও রয়ে গেছে।

তাই না ?' একটু চুপ করে আজিজ ফের বললো, 'আপনার অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ হলে তাদের সঙ্গেও এমনি প্রীতির সম্পর্ক হতো। কিন্তু তা কি হবে?'

এতক্ষণ চুপ করে এদের কথাবার্তা শুনছিল য়্যাডেলা। বৃদ্ধার অন্য ছেলে-মেয়েদের কথা হতেই সে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি ওদের কথা জানেন? আমায় উনি ওদের কথা কখনও বলেন নি!' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে ফেললো য়্যাডেলা।

'র‍্যাল্‌ফ্‌ আর স্টেলার কথা তো? হ্যাঁ। সব জানি। কিন্তু কেভ্‌স্‌ দেখবেন তো? ওই জন্যেই যে এখানে আসা ভুলে যাবেন না! আপনারা দুজনে আজ আমার অতিথি। এ আমার কত বড় সৌভাগ্য তা যদি জানতেন! আমার জীবনের একটা স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে আজ। তাই নিজেকে সম্রাট বাবরের মতন মনে হচ্ছে।"

চকিতে তাকালো য়্যাডেলা। বললো, 'কেন, তাঁর মতন কেন?'

'সে এক কাহিনী।' যেন স্মৃতিচারণ করছে এইভাবে বলতে শুরু করলো আজিজ। 'আফগানিস্তান থেকে বাবরের সঙ্গেই আমার পূর্বপুরুষরা এদেশে এসেছিলেন। হেরাত্‌ নামে একটা জায়গায় বাবরের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিল। বাবরের সঙ্গে প্রায়ই একটার বেশী হাতী থাকতো না। তবুও লোকের উপকার না করে তিনি থাকতে পারতেন না। পাহাড় খুব ভাল-বাসতেন। ঠিক আমাদের মতন। যুদ্ধেই যান বা শিকারেই যান পাহাড়ের কাছে একবার দাঁড়াবেনই। অতিথিসেবায় কখনও অবহেলা করেন নি তিনি। যৎসামান্য খাদ্যবস্তু থাকলেও সমানভাবে সকলের মধ্যে ভাগ করে নিতেন। যদি একখানা বাদ্যযন্ত্রও থাকতো তাহলে যন্ত্রীকে দিয়ে মধুর সুর বাজাতেন। তাই এই আশ্চর্য মানুষটিকেই আমি আমার আদর্শ পুরুষ করেছি। গরিব হয়ে জন্মেছিলেন বটে কিন্তু মহান সম্রাট বলতে যা বোঝায় একমাত্র তিনিই ছিলেন।'

আজিজের আবেগময় বক্তৃতা থামলে য়্যাডেলা বললো,

'আমি মনে করেছিলাম অন্য একজন সম্রাট আপনার আদর্শপুরুষ। নামটা ভুলে গেছি। তবে ফীলডিংএর বাড়িতে আপনি তাঁর নাম করেছিলেন। ঔরঙ্গজীব না কি যেন নাম বইয়েতে।

'ও! আলমগীরের কথা বলছেন? হ্যাঁ, তিনিও মহান এবং ধার্মিক সম্রাট ছিলেন। তবে বাবর ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা। জীবনে যিনি কোন বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি, তাঁকেই আমি স্মরণ করেছি। এতবড় সম্রাটের মৃত্যুও হয়েছিল মহান। যুদ্ধে মরার চেয়েও এ মৃত্যু গৌরবময়। কিভাবে জানেন? ছেলের জন্যে নিজের প্রাণ দান করেছিলেন। তিল তিল করে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। ছেলেকে নিয়ে কাবুল থেকে আসছিলেন বাবর। তখন দারুণ তাপপ্রবাহ চলছে। গরম লেগে ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাবরের উচিত ছিল তখুনি কাবুলে ফিরে যাওয়া। কিন্তু সরকারী প্রয়োজনে ফিরে যেতে পারলেন না। আগ্রায় এসে বেশিরকম অসুস্থ হয়ে পড়লেন

হুমায়ুন। মুমূর্ষু অবস্থা হুমায়ুনের। বাবর তখন হুমায়ুনের মৃত্যু শয্যার চারপাশে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন আর মন্ত্রোচ্চারণের মতন বিড়বিড় করে বললেন, 'ওর রোগ জ্বালা সব আমিই নিলুম।' সত্যিই তাই হলো। হুমায়ুন সুস্থ হলেন বটে কিন্তু বাবর অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়লেন। শেষমেশ এতেই তাঁর মৃত্যু হলো। তাই আলমগীরের চেয়ে বাবরকেই আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি। হয়ত তা করা উচিত নয়। তবুও আমি করি। কিন্তু আর দেরি নয়। এবার আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। আপনারাও রেডি তো?'

'মোটেই না।' বলতে বলতে মিসেস মুরের পাশে ধপ করে বসে পড়লো য়্যাডেলা। তারপর বললো, 'এই ধরনের ইতিহাসের কথা শুনতে খুব ভাল লাগছে আমাদের। আপনি আরও বলুন।'

আজিজও কৃতার্থ। এখন সে যা বলেছে তা তার জানা বিষয়। ফীলডিংএর বাগান বাড়িতে যেমনটি বলেছিল সেইরকম আকর্ষণীয় করেই গল্প বলতে লাগল আজিজ। মেয়েরাও তাই চায়। প্রাচ্যবিদ্যায় কুশলী একজন গাইডের খুব দরকার ছিল তাদের।

আজিজ খুশি। বললো, 'সত্যি বলতে কি, মোগল সম্রাটদের কথা বলতে খুব আনন্দ পাই আমি। প্রথম ছ'জন মোগল সম্রাটই বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাই এ'দের একজনের কথা বললে অন্য পাঁচজনের কথা আপনা থেকেই এসে পড়ে। তখন অন্য কিছুর কথা মনে থাকে না। আর একটা আশ্চর্যের কথা কি জানেন? এইভাবে পিতাপুত্রের সম্পর্ক নিয়ে পর পর ছ'জন সম্রাট আর কোন দেশের সিংহাসনে বসেন নি।'

'আপনি আমাদের আকবর সম্বন্ধে কিছু বলুন।' বললো য়্যাডেলা।

'বাঃ! আপনি আকবরের নাম শুনেছেন? ভাল। খুব ভাল। আপনি তো হামিদ্উল্লাকে চেনেন। ওর সঙ্গে দেখা হলে ও বলবে যে সম্রাটদের মধ্যে আকবরই শ্রেষ্ঠ। অবশ্য আকবর যে বিস্ময়কর প্রতিভা তাতে সন্দেহ নেই। তবে অর্ধেক হিন্দু ছিলেন তিনি। যথার্থ মুসলমান বলতে যা বোঝায় তিনি তা ছিলেন না। হামিদ্ অবশ্য মানতে চায় না তা। তর্ক করে বলে যে তেমনটি ভাবলে বাবরও যথার্থ মুসলমান ছিলেন না। কারণ তিনি মদ খেতেন। হয়ত তাই। কিন্তু কৃতকর্মের দরুন বাবর পশ্চাত্তাপ করেছিলেন। আকবর কখনও তা করেন নি। পবিত্র কোরাণের বদলে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। কোরাণের ওপরে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর নতুন ধর্মকে। কিন্তু এই ধৃষ্টতার জন্যে কোন অনুতাপ হয় নি তাঁর।'

'কিন্তু আকবরের নতুন ধর্ম কি চমৎকার নয়? সারা ভারতবর্ষকে একটা ধর্মসূত্রে গাঁথা যেত যদি ওটা চলতো।'

একটু যেন অসহিষ্ণু হলো আজিজ। য়্যাডেলার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললো, 'ওসব শুনতেই ভাল। কিন্তু ঘোর নির্বুদ্ধিতা। প্রত্যেকের ধর্ম আলাদা। আপনি আপনার ধর্ম রক্ষা করুন, আমি আমারটা। সারা দেশের সব মানুষের ধর্ম এক হতে পারে না। তাই এই ধরনের ধর্মবিশ্বাস দিয়ে ভারতবর্ষকে এক করে বাঁধা যায় না। আকবর এখানেই ভুল করেছিলেন।

মস্ত ভুল।'

'না। না। এ আপনি ঠিক বলছেন না ডাক্তার আজিজ।' বেশ গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিল য়্যাডেলা। আরও বললো, 'এতবড় আপনাদের দেশ একটা বিশ্বজনীন ভাবনা থাকবে বৈকি! আমি বলছি না যে সেটা ধর্মই হবে। কারণ, আমার নিজেরও ধর্মবিশ্বাস নেই। তবে কোন একটা বিশ্বাস, কল্যাণময়ী বিশ্বাস দেশের সব মানুষের জন্যে থাকবে এটাই বাঞ্ছনীয়। নইলে মানুষে মানুষে ভেদবাধা ভাঙবে কি করে?'

য়্যাডেলা যা বলতে চাইছিল তা বোধহয় বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। এইরকম একটা বিশ্বজনীন ভাবনার স্বপ্ন আজিজও প্রায়ই দেখে। কিন্তু আজিজের ধারণা এসব ঠুনকো বিশ্বাসকে ব্যবহারিক রূপ দিতে গেলেই তার অন্তর্নিহিত সত্য-বস্তু মিথ্যে হয়ে যায়। য়্যাডেলা আরও বললো, 'আমার কথাই ধরুন।' উজ্জ্বল চোখে চেয়ে কথা বলছিল য়্যাডেলা। বোধহয় নিজের কথা বলছিল বলেই এই সজীবতা। য়্যাডেলা বললো. 'শুনেছেন কিনা জানি না। রনী হীস্‌লপের সঙ্গে শীগগিরই আমার বিয়ে হচ্ছে।'

ঝকমক করে উঠলো আজিজের চোখদুটো। বললো, 'আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো।' য়্যাডেলা হাসিমুখে শুভেচ্ছা গ্রহণ করলো। তারপর মিসেস মুরের উদ্দেশ্যে বললো, 'মিসেস মুর! ডাক্তার আজিজকে কি আমাদের সমস্যার কথা বলতে পারি? মানে আমাদের য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমস্যা?'

'বাছা! ওটা তোমার সমস্যা। আমার নয়।'

'তা ঠিক।' য়্যাডেলা এবার আজিজকেই সরাসরি প্রশ্নটা করলো, 'আচ্ছা! রনী হীস্‌লপকে বিয়ে করার পর আমি কি য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হবো?'

আজিজ সজোরে প্রতিবাদ করে বললো. 'অসম্ভব। নিজের সম্বন্ধে ওই ইতর উক্তিটা করবেন না। প্লিজ। ফিরিয়ে নিন ওটা।'

'কিন্তু এ তো অনিবার্য! ঠেকাবো কি করে? বিয়ের পর আমি তো মার্কা-মারা হয়ে যাব' তাই না? যেটা আমি এড়াতে পারি. তা হলো মনোবৃত্তি। নিশ্চয়ই ওদের মতন, মানে......' য়্যাডেলা চুপ করে গেল। ইচ্ছে করেই নাম-গুলো উল্লেখ করলো না। অবশ্য দিন পনেরো আগে হলে সে নির্দ্বিধায় মিসেস টারটন্‌ বা মিসেস ক্যালেণ্ডারের নাম বলতে পারতো। একটু ভেবে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, 'আমি জানি আমাদের সমাজে কিছু মহিলা আছেন যাঁরা ভারতীয়দের অত্যন্ত হেয় চোখে দেখেন। এ'দের মনোভাব অত্যন্ত অনুদার। আমার আশঙ্কা বিয়ের পর যদি তাঁদের মতন হয়ে উঠি, তবে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না। আমার সমস্যা সেইখানেই, ডাক্তার আজিজ।'

'কিন্তু!'

'দাঁড়ান। আপনি কি বলবেন আমি জানি। কিন্তু আমার তো তেমন চরিত্রবল নেই যা দিয়ে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবো—সঙ্গদোষ এড়াতে পারবো! আমার চরিত্রে এমন অনেক ত্রুটি আছে যা শুনলে আপনি হতাশ হবেন। এটাই আমার সমস্যা। আর এইজন্যেই আকবরের পরিকল্পিত কোনো

আন্তর্জাতিক ধর্মবোধ বা ওইরকম কোনো বিশ্বজনীন ভাবনার আশ্রয়ে থাকতে চাই—যাতে আমার আদর্শ অপরিচ্ছন্ন হবে না। ইট কাঠের মতন জড় করে দেবে না আমার মনটাকে। কি বলতে চাইছি তা নিশ্চয়ই বুঝেছেন ?'

য়্যাডেলার কথাগুলো শুনতে খুব ভাল লাগছিল তার। মেয়েটা সম্বন্ধে যেন নতুন করে ভাবতে ইচ্ছে করছে আজিজের। কিন্তু ওর বিয়ের কথা শুনে তার মনটা কুঁকড়ে গেছে। তবুও মনে মনে স্থির করলো ওর বিয়ের ব্যাপারে নিজেকে সে জড়াবে না। তাই অন্যভাবে কথাটার জবাব দিল আজিজ। বললো, 'ওসব আপনাকে ভাবতেই হবে না। বিয়ের পর আপনি নিশ্চয়ই সুখী হবেন। কারণ, যাঁর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ হয়েছে তিনি মিসেস মুরের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। ওঁর সম্পর্কের কোন মানুষের সঙ্গে আপনার বিয়ে হলে আপনি অসুখী হবেন না।'

'কিন্তু সেটা তো অন্য প্রশ্ন। আমি চেয়েছিলুম এই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমস্যা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে। বলুন, এর কোন সমাধা আছে কি ?'

'সমস্যাই নেই তো সমাধান ! আপনার যা ধাত তাতে অন্যদের মতন আপনি হতেই পারবেন না। এদেশের মানুষের সঙ্গে আপনি যে কখনও খাবাপ ব্যবহার করবেন না, সে ভরসাটুকু আমি এখনই আপনাকে দিতে পারি।'

'কিন্তু ওরা যে বলে বিয়ের একবছরের মধ্যেই আমি বদলে যাব। পরিবেশই আমায় বদলে দেবে !'

'ভুল বলে ওরা। মিথ্যা বলে।' বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললো আজিজ। কারণ য়্যাডেলার কথার নিহিত সত্যটুকু একেবারে খাঁটি। কোন ভেজাল নেই তার মধ্যে। এই বিশেষ পরিবেশে ওর মন্তব্যটাই আজিজের কাছে দারুণ অবমাননাকর মনে হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিল আজিজ। এবং সমস্ত ব্যাপারটা পরিহাসলঘু করতে হা হা করে হেসে উঠলো। য়্যাডেলাও নিজের ভুল বুঝে সঙ্গে সঙ্গে আলোচনাটা মাঝপথে থামিয়ে দিল। বোধহয় এটাই তাদের সভ্যতার ধরন। আজিজ ততক্ষণে ওদের দুজনের দিকেই তার হাতদুটো বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই ভাবেই সে বললো, 'নিন। উঠুন !' অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওরা দুজনে আজিজের বাড়ানো দুটো হাত ধরে উঠে দাঁড়ালো। প্রথম গুহার উচ্চতাটা মোটামুটি চলনসই। তাই খুব একটা অসুবিধে হলো না। ওদের একটা মজা ডোবার, ধার ধরে খানিকটা এগোবার পর চড়াই। পাহাড় ভেঙে ওরা যত ওপরে উঠছে, ততই অসহ্য রোদের তাতে পিঠ যেন ঝলসে যাচ্ছে। এইভাবে চলতে চলতে পাহাড়ের অভ্যন্তরে হারিয়ে গেল ওরা। মাথা নিচু করে হাঁটতে হচ্ছিল ওদের। ইতিমধ্যে গুহার কালো প্রবেশমুখের কাছে এসে পড়েছে ওরা। গুহামুখ যেন হাঁ করে আছে। সামনে দাঁড়াতেই শুষে নিল ওদের। খাড়া পাহাড়ের উদ্ধত মাথার উপরে চটচটে আকাশ। একটা বলিষ্ঠ শঙ্খচিল পাহাড়ের ফাঁকে বিশ্রীভাবে ডানা ঝাপটে উড়ছে। যেন ওর কদাকার চেহারাটা দেখাবার জন্যেই ও এইভাবে উড়ছে। মানুষ জন্মাবার আগে পৃথিবীর চেহারাটা নিশ্চয়ই এইরকম ছিল। পৃথিবীর

যা কিছু সাজগোজ সব মানুষেরই হাতে তৈরি তার সৌন্দর্যবোধের আদিখ্যেতার দরুনই পৃথিবী সুন্দর হয়েছে। ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে শঙ্খচিল উড়ে গেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গিরিগুহার ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন মিসেস মুর।

গুহার ভিতরের অভিজ্ঞতাটা মিসেস মুরের কাছে যে মোটেই সুখকর হয় নি সে কথা চেপে রাখতে পারলেন না বৃদ্ধা। ভিতরে ঢুকে প্রায় অচৈতন্য হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। প্রথম থেকেই অস্বস্তি হচ্ছিল। ভিতরটা তখন মানুষের ভিড়ে গাদাগাদি। গ্রামের লোকজন, সঙ্গের চাকরবাকর মিলে এক বিরাট দল তাঁর পেছনে পেছনে গুহার মধ্যে ঢুকেছিল। তাদের সকলের নিশ্বাস, ঘন অন্ধকার আর পচা দুর্গন্ধে গুহার ভেতরটা তখন বীভৎস হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে আজিজ যেন কোথায় হারিয়ে গেল। বৃদ্ধা তখন বুক-ভরে নিশ্বাস নিতেও পারছেন না। কে তাঁকে ছুঁলো, তিনি কাকে ছুঁলেন বোঝাও যাচ্ছিল না। হঠাৎ নরম মতন কি একটা জঘন্য বস্তু যেন তাঁর মুখের ওপর থপাস করে আছড়ে পড়লো। গা শিরশির করে উঠল তাঁর। তখন বাস্তবিকই অত্যন্ত অসহায় অবস্থা তাঁর। গুহামুখের আলো দেখে সেই দিকে এগোতে গেলেন। কিন্তু হৈহৈ করে গ্রামবাসীদের আর একটা দল তখন ঢুকছিল। তাদের ধাক্কায় আছড়ে পড়লেন গুহার দেয়ালে। মাথায় দারুণ চোট পেলেন। তখন যেন পাগল হয়ে গেছেন তিনি। কাকে মারছেন কাকে ধাক্কা দিচ্ছেন জানেন না। বাইরের সুস্থ বাতাসের জন্যে প্রাণ তাঁর হাঁপিয়ে উঠেছিল। শুধু যে দুর্গন্ধ আর বীভৎস অন্ধকারে ধাক্কাধাক্কি তাই নয়, তখন সব থেকে ভীতিকর যা মনে হচ্ছিল তা হলো গুহাভ্যন্তরের প্রতিধ্বনি।

এই প্রতিধ্বনির কথাটা গড়বোলে বলেন নি, সম্ভবত তাঁর মনে তেমন দাগ কাটে নি ঘটনাটা। ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও এমন কিছু প্রতিধ্বনির শব্দ আছে যা শুনে মানুষ চমৎকৃত হয়। বিজাপুরের গোল গম্বুজের মধ্যে যে প্রতিধ্বনি ফেরে তা যেন অস্ফুট কোন স্বর, নিশ্বাসের চেয়েও যা কোমল। আবার মাণ্ডু গিরিগুহার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। সেখানে প্রতিধ্বনিত শব্দ যেন বাতাসে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় আর বক্তার কাছে অবিকল ফিরে আসে। মাড়াবার গিরিগুহার প্রতিধ্বনি এমনটি নয়। এর কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। এখানে যা উচ্চারিত হয় তা প্রথমে শোনায় একঘেয়ে গর্জনের মতন। তারপর প্রতিধ্বনিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে গুহার দেওয়ালে প্রতিহত হয় ও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। মানুষের তৈরি বর্ণমালা যে ধ্বনিই প্রকাশ করুক তার প্রতিধ্বনি একটি নিরবয়ব শব্দে অভিব্যক্ত হয়, 'ব্যোম।' কোমল, কর্কশ ক্ষীণ অশ্রুত সব ধ্বনিরই একটিই প্রতিধ্বনি। একটা দেশলাই কাঠি জ্বালানোর শব্দও এমন গর্জনের সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয় যে, একটা ছোট্ট কীটও ত্রস্ত হয়ে কুণ্ডলীকৃত হতে শুরু করে। হয়ত ছোট বলে পোকাটা আত্মরক্ষার জন্যে পুরোপুরি গোল হতে পারলো না, যদিও আক্রমণের আশঙ্কায় সর্বক্ষণই সতর্ক হয়ে থাকে। আবার সবাই যখন একসঙ্গে কথা বলছিল তখন

তার প্রতিধ্বনি হচ্ছিল বিশাল গর্জনের মতন। এক প্রতিধ্বনি থেকে আর একটা, তা থেকে আবার একটা, এইভাবে যেন শব্দের অসংখ্য সরীসৃপ সারা গিরিগুহার অভ্যন্তরে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।
মিসেস মুর বেরিয়ে আসার পর অন্যরাও বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আসার ইঙ্গিতটা বৃদ্ধাই প্রথম দিয়েছেন। অন্য সবাই তাঁকে অনুসরণ করলো শুধু। য়্যাডেলা এবং আজিজ বেরোল হাসতে হাসতে। ওদের দিকে চেয়ে বৃদ্ধাও হাসলেন। ওঁর মনের বিরূপ ভাবটা গোপন করতেই চাইছিলেন তিনি। তবে আতঙ্কটা তখনও মন থেকে চলে যায় নি। তাই সন্দিগ্ধ চোখে প্রত্যেক মানুষটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। যে লোকটা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তাঁর মুখটা চেপে ধরতে চেয়েছিল সে মোটেই সৎ লোক নয়। তাকে খুঁজে বার করা দরকার। কিন্তু যাদের দেখলেন তাদের একজনকেও দুর্বৃত্ত মনে হলো না। শান্ত সরল মানুষগুলোর অপাপবিদ্ধ মুখের মিছিল দেখে তাঁর মনে হলো, এরা কেউ শয়তান নয়। বরং আন্তরিক ভাবেই এরা তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করছে। এদের মনমুখ আলাদা নয়। একটু পরেই তার সন্দেহ দূর হলো। আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন মিসেস মুর। তাঁর মুখের ওপর নরম মতন যে বস্তুটা এসে পড়েছিল সেটা একটা শিশু। শিশুটা এখন মায়ের কোলের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে দিব্যি খেলছে। মনে মনে খুব স্বস্তি পেলেন বৃদ্ধা। বুঝলেন যে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে গুহার মধ্যে কেউ ঢোকে নি। তবে গুহার ভেতরে ঢুকে তিনি যে একটুও আনন্দ পান নি, সে কথাও ঠিক। তাই মনে মনে ঠিক করে ফেললেন যে পরের গুহা দেখতে তিনি যাবেন না।
য়্যাডেলা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। বললো, 'আজিজ যখন দেশলাই কাঠি জ্বালালো তখন দেয়ালের গায়ে তার প্রতিফলন দেখেছিলেন? চমৎকার, তাই না?'
'আমার ঠিক মনে পড়ছে না।' খুব নিস্পৃহ গলায় বললেন বৃদ্ধা।'
'আজিজ বলছিল যে এর থেকেও ভাল গুহা আছে কাউয়া দোল পাহাড়ে। সেখানকার রীফ্লেক্‌শন্‌ আরও চমৎকার।'
'তা হোক। তবে আমি আর কোথাও যাচ্ছি না। পাহাড় ভাঙতে শরীরে কুলোবে না।'
'এখনই যাবার দরকার কি! ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম করি। তারপর ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাব'খন।' য়্যাডেলা বললো।
'না বাছা তার দরকার নেই। আজিজ মনঃক্ষুণ্ণ হবে। এত করছে ও বেচারি। তার চেয়ে তুমিই ঘুরে এস। আমি এখানে রইলুম। আমার জন্য ভেব না।'
'বোধহয় সেটাই ভাল।' য়্যাডেলারও সেইরকম ইচ্ছে। তবুও নিস্পৃহ থাকবার চেষ্টা করছিল ও।
ততক্ষণে মহম্মদ লতিফের তাড়া খেয়ে চাকরবাকরেরা ক্যাম্পের কাছে এসে জড়ো হয়েছে। আজিজও ব্যস্ত। একটা বড় কাজই বাকী। অতিথিদের নিয়ে কাউয়া দোল-এ উঠতে হবে এখুনি। প্রচণ্ড উৎসাহ তখন তার। ছটফট করে

বেড়াচ্ছিল সে। সমস্ত ব্যবস্থাটা ত্রুটিহীন করতে হবে তাকে। এরই মধ্যে সে শুনেছে যে সামান্য কিছু অদলবদল হচ্ছে তাদের প্ল্যানে। মিসেস মুর যেতে পারবেন না এবং ম্যাডেলাকে নিয়ে তাকেই যেতে হবে। একসময় সে ম্যাডেলাকে বললো, 'একটুও ভাববেন না। ওঁকে বেশিক্ষণ একলা থাকতে হবে না। আমরা তাড়াতাড়িই ফিরবো। তবে ফেরার জন্যেও তাড়াও করবো না খুব।'

বৃদ্ধা শুনেছেন আজিজের কথা। বললেন, 'ঠিক বলেছ বাবা। দেখেশুনে ফিরো। অত্যন্ত দুঃখিত আমি। তোমাদের সঙ্গে যেতে পারলুম না। অতখানি পথ হাঁটবার শক্তি আমার নেই।'

আজিজ বললো, 'যতক্ষণ আপনি আমার অতিথি ততক্ষণ আমি কাউকে পরোয়া করি না। অবশ্য আপনি যাবেন না শুনে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছি ঠিকই। কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষী ভেবে আপনি যে আমায় মনের কথা বলেছেন, তার জন্যে মনে মনে আমি ভীষণ খুশি।'

বৃদ্ধাও অভিভূত। ছেলেটি যে শুধু ভদ্র তাই নয়। ভারী মধুর ওর স্বভাবটা। দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। আজিজের হাতে হাত রেখে বললেন, 'হ্যাঁ, বাবা। আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী। এ নিয়ে মনে কোন খেদ রেখ না। তবে একটা ছোট্ট প্রস্তাব দিই, ভেবে দেখ।'

'বলুন।'

'একসঙ্গে অত লোক নিয়ে গুহার ভেতরে যেও না। এতে তোমারই অসুবিধে হবে।'

'ঠিক বলেছেন আপনি। এখুনি ব্যবস্থা করছি।' এই বলে আজিজ অন্যধারে ছুটে গেল। তারপর একজন মাত্র গাইড ছাড়া অন্য সবাইকে নিষেধ করে বৃদ্ধার কাছে ফিরে এল। মৃদু হাসলেন মিসেস মুর। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, এবার তোমরা আনন্দ করে সব ভালভাবে দেখতে পাবে। কিন্তু ফিরে এসে আমায় সব বলবে তো?'

'নিশ্চয়ই!'

ওরা চলে গেল। বৃদ্ধাও তাঁর ডেক-চেয়ারের মধ্যে আত্মভাবনায় ডুবে গেলেন। তাঁর মনে হলো কাউয়া দোল্ পাহাড়ের সব গুহাগুলো দেখে ওদের ফিরতে এক ঘণ্টা সময় লাগবে। সেই অবসরে তিনি একটা চিঠি লেখা শেষ করে ফেলবেন। কলম এবং চিঠি লেখার প্যাড বের করে শুরু করলেন চিঠিটা। 'কল্যাণীয় স্টেলা ও র‍্যাল্‌ফ্‌।' এইটুকু লিখেই বন্ধ করলেন চিঠি লেখা। অবিস্মরণীয় অদ্ভুত এই গিরিউপত্যকার দিকে তাকিয়ে তিনি। মনে হচ্ছিল এই বিশালতার কাছে কত তুচ্ছ, নগণ্য তাঁরা। কত অক্ষম তাঁদের এই অভিযান। এমনকি বিশালদেহী ওই কারিণীটাও মনে হচ্ছে যেন একটা খেলনা হাতী। উত্তুঙ্গ শৈলশিখর থেকে দৃষ্টি ফিরে এল গুহামুখে। একটু আগেই তিনি এখানে ঢুকেছিলেন। এখন সেকথা মনে হতেই মনে মনে শিউরে উঠলেন বৃদ্ধা। না। সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি তিনি চান না। উঃ! কী বীভৎস সেই অভিজ্ঞতা! এখন যেন স্মৃতিটা আরও ভীষণ

মনে হচ্ছে। গুহার ভেতরের সেই পচা দুর্গন্ধটা হয়ত ভুলে যাবেন কোনদিন। কিন্তু যা কখনও ভুলতে পারবেন না তা ওই প্রতিধ্বনি। জীবনের ওপর থেকে সব অধিকারটাই যেন কেড়ে নিয়েছিল ওই বীভৎস শব্দের তাড়না। গুহার ভেতরে যখন তাঁর চৈতন্য প্রায় হারিয়ে যাচ্ছিল, তখন বিদ্যুৎচমকের মতন করুণ, প্রেম, শৌর্য প্রভৃতি মানুষের মহৎ বৃত্তিগুলোর কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু অস্ফুটে কে যেন তাঁর কানে কানে বলে দিল এসব বৃত্তির আলাদা কোন দাম নেই। এদের সঙ্গে মিশে আছে আবিলতা নোংরামিও। সব এক এবং অভিন্ন। গুহার মধ্যে ঢুকে কেউ যদি অশ্লীল কোন শব্দ উচ্চারণ করে বা কেউ যদি মন্ত্রোচ্চারণ করে, দুটোর প্রতিক্রিয়াই একরকম হবে। প্রতিধ্বনিত হবে একটা শব্দে 'ব্যোম।' এটা যেন তাঁর জীবনের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত—যে অভিজ্ঞতা এই দীর্ঘ জীবনেও তিনি কখনও অর্জন করতে পারেন নি। পৃথিবীতে যত অসুখী মানুষ আছে—যত তাদের দুঃখবোধ আর ভুল বোঝাবুঝি, যা ছিল, আছে এবং থাকবেও—যদি দেব-দূতের ভূমিকা নিয়ে কেউ তাদের বলে, যে এই ভোগ অনিবার্য যতই সে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করুক না কেন, তাহলেও যোগফলটা একই হবে। শব্দের অসংখ্য সরীসৃপ যারা গুহার অভ্যন্তরে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াবে, যতক্ষণ না সেটা দেয়ালে প্রতিহত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। মাড়াবার গিরিগুহা নিয়ে কেউ কখনও রোমাণ্টিক কল্পনা করবে না। কারণ অসীম আর অনন্তকে ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে ফেলেছে মাড়াবার। অসীমের মূর্ছনা এখানে অগৌণ। তবুও মাড়াবারের এই সীমাবদ্ধ রূপই হাতছানি দিয়ে মানুষকে ডাকে।

মিসেস মুর চিঠি লেখার কাজটা শেষ করতে চাইছিলেন। কিন্তু পারলেন না। বার বার বয়স এসে তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে তিনি অক্ষম হয়ে গেছেন। সে কথা অবশ্য ঠিক। সেই কোন্ সকালে উঠেছেন, এতটা পথ এসেছেন, পরিশ্রম করেছেন। শরীর মন দুইই তাই অবশ। এখন যদি মনে কোন শূন্যতাবোধ আসে সেটা একান্তই তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। এমনকি যদি তিনি মরেও যান জগতের কিছুই যাবে আসবে না তাতে। ঠিক তখনই তাঁর মনের সীমান্তে অধ্যাত্ম ভাবনার উদয় হলো। তাঁর মনে হলো তাঁর ধর্ম সেই কথা সর্বস্ব খ্রীস্টিয়্যানিটি তাঁকে যা শিখিয়েছে—সেই 'লেট দেয়ার বি লাইট্' থেকে শুরু করে যত নির্দেশ আছে—সেই সব কিছুর নিষ্কর্লিতার্থ হলো 'ব্যোম।' এই গুরুমন্ত্রের চেতনাই তাঁর মনে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তহীন রূপের আভাস দিয়েছে। কিন্তু না ; এই বিশাল অন্তহীনতার কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করতে চান না। তাঁর মানবী মন ভয়ে শিউরে উঠলো চারপাশের এই নিঃশব্দ সীমাহীনতার দিকে তাকিয়ে। না এখানে তাঁর শান্তি নেই। যার আদি নেই অন্ত নেই সেই বিশালতার মধ্যে মুক্তি তিনি চান না। তিনি কিছুই চান না। র‍্যাল্ফ্ স্টেলাকে চিঠি লিখতে নয়— ঈশ্বরকে অনুভব করতেও নয়। জড়ের মতন সেই স্তব্ধতার মধ্যে বসে রইলেন বৃদ্ধা। কখন বৃদ্ধ লতিফ কাছে এসেছে জানতেও পারেন নি। তখনও

তেমনি স্থাণুর মতন তিনি বসে। হয়ত লতিফও এই অবস্থাটা দেখে গেল। একসময় তাঁর মনে হলো হয়ত তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। যদি তা হয় তাহলে ভালই হয়। ধীরে ধীরে এই অপার্থিব পরিবেশের কাছেই নিজেকে সঁপে দিলেন মিসেস মুর। তখন এই পৃথিবীর কোন কিছুতে অনুরাগ রইলো না। ভুলে গেলেন সকলের কথা—স্টেলা, র‍্যাল্ফ্, আজিজ সকলের কথা। এমনকি পুত্রবৎ আজিজকে স্নেহবশে যা বলেছেন তাও নয়। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল আজিজকে যা বলেছেন তা তাঁর নিজের কথা নয়—বিচিত্র এই পরিবেশই কথাগুলো তাঁকে দিয়ে বলিয়েছে।

১৫

র‍্যাডেলা, আজিজ আর গাইডকে নিয়ে শুরু হলো ক্লান্তিকর চড়াইয়ের পথ। ওদের যাত্রার এই অংশটা প্রায় একঘেয়ে। তাই মোটামুটি নিঃশব্দেই পথ চলছে ওরা। সূর্য এখন অনেকখানি মাথার ওপর উঠে গেছে। বাতাসে বেশ উষ্ণতার আঁচ। সর্বক্ষণই ঘাম ঝরছে গা দিয়ে। উষ্ণস্নান হয়ে যাচ্ছে ওদের। বেলা যত বাড়ছে গরমও তীব্র হচ্ছে। বড় বড় বোল্ডারগুলোর বুক থেকে দীর্ঘশ্বাসের মতন আক্ষেপোক্তি উঠছে। ওরা যেন বলছে 'আমি বেঁচে আছি।' ছোট নুড়িপাথরগুলোও একই কথা বলছে। পাহাড়ের খাঁজে ছোট ছোট বন্য উদ্ভিদ। ওদের সাধ ছিল শীর্ষের বড় দোলনা পাথরটা অব্দি লতিয়ে ওঠার। কিন্তু সাধ্য নেই। তাই যতটুকু উঠেছে তাতেই খুশি। পাহাড় ভেঙে ওঠার পথে ওরা অসংখ্য গুহা দেখতে পেল। প্রতিটি গুহাই আলাদা, বিচ্ছিন্ন। গাইড চাইছিল ওরা প্রতিটি গুহার মধ্যে ঢুকে দেখুক। কিন্তু যথার্থই তার মধ্যে দেখবার কিছু নেই। অবশ্য দু-একটার মধ্যে ওরা ঢুকলো। গুহার মসৃণ দেওয়ালের গায়ে আলোর প্রতিফলনও দেখলো। পরখ করলো প্রতিধ্বনি ফেরে কি না। তারপর আবার পথ চলা শুরু করলো। আজিজ সুনিশ্চিত ছিল যে প্রাচীন ভাস্কর্যের কিছু নিদর্শন কোন গিরিগুহায় দেখা যাবেই এবং মনে মনে এইরকমই কামনা সে করছিল। অবশ্য মনের গভীরে আজিজের তখন অন্য ভাবনা। ব্রেকফাস্টের আয়োজনটা চাকরদের হাতে ছেড়ে এসেছে। ক্যাম্প ছাড়ার সময় আজিজ লক্ষ্য করেছিল যে ওদের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা এসেছে। আজিজের দুশ্চিন্তা সেখানেই। মনে মনে দ্রুত খাদ্য তালিকাটা মিলিয়ে নিল সে। সম্পূর্ণ ইংরিজি মেনু—পরিজ, মাটন্ চপ সঙ্গে একটা ভারতীয় খাদ্যবস্তু এবং সবশেষে পান। মিসেস মুরের কথাও মনে পড়ে গেল। চমৎকার মানুষটি। খুব ভাল লাগে ওঁকে। তুলনায় মিস কোয়েস্টেডকে তেমন পছন্দ করে না সে। তাই চলার পথে যতটা সম্ভব কম কথাবার্তা বলছিল আজিজ। আরও একটা কারণও আছে। দিন কয়েকের

মধ্যেই একজন খাস ইংরেজ রাজকর্মচারীর বধূ হতে যাচ্ছেন মিস কোয়েস্টেড। একে ওপরওলা তায় রাজপুরুষ—সুতরাং সেদিক থেকেও এড়িয়ে চলা দরকার।

আজিজের মতন য়্যাডেলাও চুপচাপ। আজিজ যেমন ব্রেকফাস্টের কথা ভাবছে, সে ভাবছে তাদের বিয়ের কথা। আগামী হপ্তায় সিমলা যাচ্ছে সে। সেখানে তার প্রথম কাজ হবে এ্যান্টনীকে তাড়ানো। সিমলা থেকে নাকি তিব্বতের চমৎকার ভিউ দেখা যায়। য়্যাডেলা মনে মনে হৃষ্ট। তবে সব থেকে ক্লান্তিকর বোধহয় বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো। বিয়ের পর অক্টোবর নাগাদ তারা সবাই মিলে আগ্রায় যাবে—সেখান থেকে বোম্বাই। তারপর মিসেস মুরকে জাহাজে চড়িয়ে বিদায় দেবে। মিছিল করে ছবিগুলো যেন তার চোখের ওপর ভেসে উঠলো। কিন্তু এই মুহূর্তে য়্যাডেলার কাছে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তাদের বিয়ের পরের দিনগুলো। চন্দ্রপুরের সেই দৈনন্দিন জীবন-যাপনের গ্লানি থেকে সে কি উত্তীর্ণ হতে পারবে? সে বা রনী কেউই মুক্ত মনের মানুষ নয়। নিজের নিজের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই তারা আবদ্ধ। আসল প্রতিবন্ধ এখানেই। তবে য়্যাডেলা মনে মনে স্থির করেছে যে এ প্রতিবন্ধ কাটিয়ে উঠবে সে। রাগী খিটখিটে মেজাজটা যথাসম্ভব শাসন করে রাখবে এবং কিছুতেই মুখোমুখি কলহে প্রবৃত্ত হবে না। অন্যদের মতন যেমন য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মনোবৃত্তির হীন উপাসক হবে না, তেমনি অকারণ বিরোধিতাও করবে না। যাতে তাদের বিবাহিত জীবন সুখী হয় তার দায় নিতে হবে তাদেরই। জীবনটা যে কল্পনা বিলাসিতা নয় এই ঘোর বাস্তব সত্যটা বুঝতে হবে তাদের। আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিটি সমস্যা বিচার করতে হবে। বিশ্বস্ত হতে হবে নিজের কাছে, রনীর কাছেও। মনে করতে হবে যে কারো মধ্যেই শুভেচ্ছার অভাব নেই. এবং তখনই সার্থক ভাবে তারা জীবনতরীর হাল ধরতে পারবে।

কিন্তু প্রেম, ভালবাসা? উল্টে রাখা বেকাবের মতন একটা বড় পাথরের ওপর ওঠবার চেষ্টা করছিল য়্যাডেলা। আর তখনই বিদ্যুৎচমকের মতন প্রশ্নটা খোঁচা দিল তার মনে। পাদানির মতন দুটো পাথরের খাঁজে আটকে আছে বড় পাথরটা। জোড়া পাদানির চেহারাটা দিন কয়েক আগের একটা ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিল তাকে। রীতিমত ইঙ্গিতগর্ভ এই দৃশ্য। য়্যাডেলা ভাবতে চেষ্টা করছিল কোথায় অনুরূপ দৃশ্যটা দেখেছে! ও হ্যাঁ। মনে পড়েছে। নবাব বাহাদুরের গাড়ির চাকায় ধুলো ঢাকা রাস্তায় এইরকমই একটা নকশা তৈরি হয়েছিল। নবাব বাহাদুরের গাড়ির মধ্যে ছিল সে আর রনী। রনী? নাম গোত্র মিলিয়ে মানুষটার চেহারাও অবিকল ভেসে উঠলো য়্যাডেলার মনে। আর তখনই সে উপলব্ধি করলো তাদের দুজনের কেউ ই আর একজনকে যথার্থ ভালবাসে না।

য়্যাডেলা নিপুণ আত্মগোপনকারিণী নয়। হয়ত সেই কারণেই মনের এই বিধ্বস্ত ভাবটি তার মুখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। থমকে দাঁড়াল য়্যাডেলা। পিছন ফিরে তাকিয়ে আজিজ অবাক। একি বিধ্বস্ত মুখের চেহারা

য়্যাডেলার ? খুব কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে পাহাড়ে উঠতে ? সে কথা জিজ্ঞেসও করলো সে। 'মিস কোয়েস্টেড্, আমি কি আপনাকে খুব তাড়া দিয়ে হাঁটাচ্ছি ?' য়্যাডেলা স্তব্ধ। 'প্রেম নেই,' এই আবিষ্কারটাই তার জীবনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা—যেন পর্বতারোহণের দড়িটা ছিঁড়ে গেছে এবং সে নিমজ্জিত হলো কোন্ এক গহ্বরে। যাকে সে ;ভালবাসে না তাকে নিয়ে সংসার করবে কেমন করে ? এখন তাকে বিকল্প একটা কিছু ভাবতে হয়। কি করবে সে এখন ? সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে পাথরটা। পাথরটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল য়্যাডেলা। ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই সম্বন্ধটা ভেঙে দেবার। চুকেবুকে যাক সব। কিন্তু না। অন্যের অসুবিধে করে এমন একটা চরম সিদ্ধান্ত সে নেবে না। তাছাড়াও একটা প্রশ্ন আছে। সংসার করতে গেলে প্রেম কি অনিবার্য ? বিবাহিত জীবনে ভালবাসার কতটুকু দাম ? যদি তা থাকত তবে হনিমুনের পর কয়টা বিয়ে টিকে থাকতো ? ততক্ষণে মন স্থির করে নিয়েছে য়্যাডেলা। আজিজের দিকে চেয়ে বললো, 'মোটেই না। আমি ঠিক আছি। আমার জন্যে একটুও ভাববেন না।' এই বলে আজিজের বাড়ানো হাতটা ধরলো য়্যাডেলা। তারপর আবার হাঁটা শুরু করলো। গাইডটা তখন গিরগিটির মতন পাহাড়ের ঢালু গায়ের সঙ্গে সেঁটে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ওপরে উঠছিল।

য়্যাডেলার কিন্তু যথেষ্ট পরিশ্রম হচ্ছিল চড়াই ভাঙতে। একবার থামছে, একবার হাঁটছে। এইভাবে খানিকটা পথ উঠলো। সামনেই আজিজ। তাকে দেখতে দেখতে চলেছে সে। কি খেয়াল হলো হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি বিয়ে করেছেন ডাক্তার আজিজ ?'

'নিশ্চয়ই। দেখবেন আমার বিবিকে ? তাহলে আসুন না একদিন ?'

হঠাৎ তার মনে হলো তার স্ত্রী যে মৃত এই পরিচয়টা এই মুহূর্তে অগৌণ। সুতরাং সত্য গোপন থাকাই শিল্পসম্মত হবে।

য়্যাডেলা শুনলো অন্যমনস্ক হয়ে। আজিজ ফের বললো, 'আমার বিবি অবশ্য এখন চন্দ্রপুরে নেই।'

'ও।' য়্যাডেলা তখনও অন্যমনস্ক। খানিকটা নিরাসক্ত হয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার ছেলেমেয়ে নেই ?'

'আছে বৈকি। তিন ছেলেমেয়ে আমার।'

'ওরা খুব আদরের। তাই না ?'

হেসে উঠলো আজিজ, বললো, 'স্বাভাবিক। খুব ভালবাসি ওদের আমি।'

'আমারও তাই ধারণা।'

কথাটা বলে নিঃশব্দ হয়ে গেল য়্যাডেলা। কিছুক্ষণ আজিজকে দেখলো। হঠাৎ তার মনে হলো পুরুষদের মধ্যে আজিজ যথেষ্ট সুন্দরকান্তি। এক-মাথা ঘন চুল, চকচকে গায়ের চামড়া। ছোটখাট মানুষটা, কিন্তু মানানসই। নিশ্চয়ই ওর বিবি, ওর ছেলেমেয়েরাও ওর মতন সুশ্রী। সাধারণত সেইরকমই হয়। বাপ মা সুশ্রী হলে ছেলেমেয়েরাও দেখতে ভাল হয়। কিন্তু সে কি আজিজের ওপর আসক্ত হয়েছে ? না না। তা নয়। প্রবল ভাবে

অস্বীকার করলো সে নিজের মনে। আজিজকে দেখে তার রক্ত উন্দাম হয় নি। তবে একথা ঠিক যে, রমণীরম্য আকর্ষণ করবার দেহসৌন্দর্য আজিজের আছে। তার নিজের সমাজের অনেক নারীর মনে দোলা সে জাগিয়েছে নিশ্চয়ই। য়্যাডেলার দুঃখ হচ্ছিল যে, সে বা রনী দুজনের কেউ-ই আজিজের মতন সুশ্রী নয়। আহা! কি সুন্দরকান্তি ওই যুবাপুরুষ! নারী-পুরুষের সম্পর্ক গড়তে গেলে সুন্দর অসুন্দরের এই প্রভেদটা অনেকখানি ক্রিয়া করে। হঠাৎ য়্যাডেলার মনে হলো সুশ্রী আজিজের নিশ্চয়ই একাধিক বিবি আছে। তার ধারণা মুসলমান সমাজের সবাই বহুপত্নীক হয়। মিসেস টারটনের কাছ থেকেই এই ধারণাটা অর্জন করেছে সে। তার ইচ্ছে হলো সরাসরি আজিজকেই প্রশ্নটা করবে। এই নিঃশব্দ পাহাড়টা অনন্তকাল ধরে এমনি নিঃশব্দ হয়ে পড়ে আছে। কেউ কথা বলে নি। তারাও বলছিল না। কারণ, এই পরিবেশে কথা মানায় না। তবুও য়্যাডেলার মনে হলো এই নৈঃশব্দের মধ্যে এমন কথার স্বাক্ষর রেখে যাবে যা গভীর সত্য উম্ঘাটিত করবে। মনের লাগাম ছেড়ে দিল য়্যাডেলা। নিঃসঙ্কোচে আজিজকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা! ডাক্তার আজিজ! আপনার কি অনেক বিবি?'
আজিজ স্তম্ভিত। অত্যন্ত আহত হলো সে বিদুষী মহিলার কথা শুনে। এরা কি জানে না যে তাদের সমাজেও নতুন ভাবনার উদয় হয়েছে? পুরনো সংস্কার তারাও কাটিয়ে উঠছে? ভারী কোমল জায়গায় ঘা দিয়েছে মেয়েটা। মনটা তাই এত বেদনাময়। এর বদলে মেয়েটা যদি জিজ্ঞেস করতো, 'আপনারা কি বহু ঈশ্বর মানেন?' তাহলেও এতটা ব্যথা আজিজ পেত না। একজন শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত মুসলমান যুবকের বিরুদ্ধে বহুপত্নীত্বের অভিযোগ করা রীতিমত হীন এবং বীভৎস চক্রান্ত। অত্যন্ত এলোমেলো হয়ে গেল আজিজের মানসিক অবস্থা। এখন কি করবে সে? কেমন করে মনের ক্ষোভ গোপন করবে? অথচ এঁরা তার অতিথি। উত্তর তাকে দিতেই হবে। তাই কোনরকমে বললো, 'না না। আমার একজনই বিবি।' উত্তরটা দিয়েই বিতৃষ্ণায় মেয়েটার হাত ছেড়ে দিল। তারপর মনের বিতৃষ্ণা কাটাতে হনহন করে রাস্তার ধারে পরপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লো। য়্যাডেলার এই কৌতূহল কিন্তু একেবারে নিষ্পাপ। অত্যন্ত সরল মনেই তার ঔৎসুক্য নিবারণ করতে চেয়েছিল সে। তাই বুঝতেই পারলো না কেমন নিষ্ঠুরের মতন এই মুসলমান যুবকের গোপন ব্যথার জায়গাটিতেই আঘাত করেছে। আজিজ তখন অদৃশ্য। এদিক ওদিক চেয়ে তাকে খুঁজে পেল না য়্যাডেলা। তার ধারণা হলো পথের ধারের কোন একটা গুহার মধ্যে নিশ্চয়ই ঢুকেছে সে। এই ভেবে যে গুহাটা সামনে দেখলো তার মধ্যেই য়্যাডেলাও ঢুকে পড়লো। অন্যমনস্ক য়্যাডেলা গভীর ভাবে আত্মচিন্তায় বিভোর। বিবাহ নামক এই সামাজিক অনুষ্ঠানটা তার মনের অর্ধেকটা জুড়ে ছিল তখন। নিসর্গ শোভা দেখার মতন মনের অবস্থা তার তখন নয়।

১৬

গুহার ভেতরে আজিজ বোধহয় মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে ছিল। সেই অবস্থাতেই একটা সিগারেট ধরাল। উদ্দেশ্য য়্যাডেলার কাছে যা হয় একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া, কেন সে হঠাৎ গুহার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। মিনিট খানেকের মধ্যেই বেরিয়ে এল আজিজ। বাইরে এসে দেখলো গাইডটা একা দাঁড়িয়ে, য়্যাডেলা নেই। মাথাটা একদিকে হেলিয়ে একাগ্র কিছু শোনার চেষ্টা করছে লোকটা। আজিজও শুনেছে শব্দটা। একটা মোটর গাড়ি যেন এদিকে আসছে। কাউয়া দোল পাহাড়ের যেখানে তাবা দাঁড়িয়ে সেখান থেকে নিচের কিছু দেখা যায় না। অন্তত বিশগজ পথ আরও উঠতে হলো তাদের। এখান থেকে নীচের সমভূমির অনেকখানি স্পষ্ট দেখা যায়। আজিজ দেখলো চন্দ্রপুরের রাস্তা ধরে তাদের দিকে একটা মোটর গাড়ি আসছে। কিন্তু সবটুকু দেখা গেল না। সরল খাড়া পাহাড়টার শীর্ষদেশ এমনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে যে সোজাসুজি পাহাড়ের পাদদেশের কিছুই দেখা যায় না। তাই কাছাকাছি আসবার পর গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তবে এটা অনুমান করা যায় যে গাড়িটা ঠিক পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে শুরু হয়েছে কাঁচা রাস্তা।

য়্যাডেলাকে গাড়ির খবরটা দিতে আজিজ আবার ফিরে এল। কিন্তু কোথায় য়্যাডেলা? গাইডকে জিজ্ঞেস করতে সে বললে যে একটা গুহার মধ্যে ঢুকেছে য়্যাডেলা। 'কোন্ গুহায়?' সার দিয়ে গুহাগুলো প্রাণহীন জড়-পিণ্ডের মতন দাঁড়িয়ে। এর কোন্‌টার মধ্যে য়্যাডেলা ঢুকেছে কে জানে! গাইডটাও একটা এলোমেলো জবাব দিল। সেও খুব সুনিশ্চিত নয়। আজিজ মনে মনে বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তোকে তবে আনা হয়েছে কি জন্যে? তাকিয়ে দেখবি তো কোন্‌টার মধ্যে উনি ঢুকলেন? এখানে অন্তত বারোটা গুহা আছে। সব কটাই এক রকম দেখতে। কি করে বুঝবো কোন্‌টার মধ্যে উনি আছেন? আমি কোন্‌টায় ঢুকেছিলাম?' লোকটা এবারও অনিশ্চিত ভাবে একটা গুহা দেখিয়ে দিল। আজিজের হঠাৎ আশঙ্কা হলো তারা ঠিক এই জায়গাতেই ছিল তো? যেদিকে তাকাচ্ছে সেদিকেই গুহা। দলবেঁধে গুহাগুলো হাঁ করে যেন ওৎ পেতে আছে। কাছে গেলেই গিলে নেবে। এই গুহাসমষ্টির মধ্যে কোন্ নির্দিষ্ট গুহায় সে ঢুকেছিল তার কোন হদিশ মেলাই ভার। আজিজের উদ্বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। মনে দারুণ দুশ্চিন্তা। য়্যাডেলা হারিয়ে গেল না তো? কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না! একটা ব্যবস্থা যা হয় করতেই হবে। গাইডটাকে নিয়ে খানিক-ক্ষণ নিরর্থক খোঁজাখুঁজি করলো। কিন্তু নিষ্ফল এই খোঁজাখুঁজি। আজিজ তখন লোকটাকে বললো 'চেঁচিয়ে ডাক্ মেমসাহেবকে!'

কিন্তু একটু পরেই আজিজ বুঝলো যে এ চেষ্টাও অর্থহীন। গুহার মধ্যে বাইরের শব্দ ঢুকবে না। প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ শুনতে পায় না গুহা। আজিজের মনের অবস্থা তখন সম্পূর্ণ বেসামাল। ভয় দুশ্চিন্তায় সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। সমস্ত জায়গাটা একটা জট পাকানো নকশার মতন। কোথাও সরল, কোথাও আঁকাবাঁকা, কোথাও সর্পিল পথের আঁকি-বুকি। ফলে কোথায় শেষ আর কোথায় শুরু তা বোঝা যায় না। প্রত্যেকটা গুহার মধ্যে ঢুকে দেখতে গেল আজিজ। কিন্তু অচিরেই গোলমাল্ল করে ফেললো। দলবেঁধে গুহাগুলো পর পর সাজানো—একটার পেছনে আর একটা। ফলে যে গুহার মধ্যে ঢুকছে পরক্ষণেই তা হারিয়ে যাচ্ছে।

বিমূঢ় আজিজ খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ে হিম হয়ে গেছে শরীর। কি করবে সে এখন? সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়লো গাইডের ওপর। শান্তভাবে লোকটাকে কাছে ডাকলো সে। তারপর সজোরে তার মুখে একটা চড় মারলো। চড় খেয়ে লোকটা এক মুহূর্ত স্থির ভাবে আজিজকে দেখলো, তারপর দৌড়ে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। লোকটা চলে যেতে সেই মহা-শূন্যতার মধ্যিখানে একা দাঁড়িয়ে আজিজের যেন কান্না এসে গেল। তার মনে হলো য়্যাডেলা নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছে এবং তার নিরুদ্দেশ হবার জন্যে সে-ই দায়ী। সে বুঝতে পারছিল তার জীবনেও বিপদ ঘনিয়ে আসছে এবং এ বিপদ থেকে সে মুক্তি পাবে না। হঠাৎই বিদ্যুৎচমকের মতন একটা সম্ভাবনার কথা মনে হলো তার। এমনও হতে পারে যে য়্যাডেলা হারিয়ে যায় নি। গাড়ি দেখে সে হয়ত নিচে নেমে গেছে। হয়ত গাড়ি করে মিস্টার হীসল্প্ এসেছেন। সম্ভাবনার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আগের জায়গায় গিয়ে ঝুঁকে একবার দেখবার চেষ্টা করলো আজিজ। মনে হলো পাকদণ্ডীর রাস্তায় দ্রুত নেবে যাচ্ছে একটি মেয়ে। স্পষ্ট করে চেহারাটা দেখতে পেল না। তবে কাঠামো দেখে অনুমানে বুঝলো যে এই মহিলাই য়্যাডেলা। নিচে নেবে আর একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল য়্যাডেলা। মনে মনে এতটা স্বস্তি পেল যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো তার। একবারও মনে হলো না যে য়্যাডেলা অনুচিত কাজ করেছে। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে তাকে অকারণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে। হয়ত পাহাড়ের এই নিষ্প্রাণ পরিবেশে এক-ঘেয়ে পথ হাঁটার ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতেই সে দৌড়ে নিচে নেবে গেছে। নিশ্চয়ই সাময়িক একটা উত্তেজনা হয়েছিল গাড়ি দেখে। তাই অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই সে চলে গেছে ওদের কাছে। যা হোক, আজিজকে এখন একা একাই ক্যাম্পে ফিরতে হবে। এই ভেবে দু-এক পা হাঁটতেই একটা জিনিস দেখে থমকে দাঁড়ালো সে। য়্যাডেলার সেই বড় দূরবীনটা একটা গুহার বাইরে পড়ে আছে। দূরবীনের আধখানা ঝুঁকে আছে পাহাড়ের ধারে। একটু আগে দেখতে পেলে হয়ত খুব ব্যাকুল হতো সে। দূরবীনটা তাড়াতাড়ি তুলে নিল আজিজ। এখন আর সে একটুও বিচলিত নয়, কারণ য়্যাডেলাকে সে নিজে নামতে দেখেছে। দূরবীনটা কাঁধে ঝোলাতে গিয়ে সে দেখলো তার স্ট্র্যাপ্‌টা ছেঁড়া। বাধ্য হয়ে তাই পকেটে ঢুকিয়ে নিল দূরবীনটা। হঠাৎ

তার মনে হলো মেয়েটা হয়ত আরও কিছু ফেলে গেছে। আবার ফিরে এল আজিজ। কিন্তু কিছুতেই আগের গুহাটা খুঁজে পেল না। ইতিমধ্যে মোটর গাড়ির স্টার্ট দেবার শব্দ শুনলো আজিজ। তাড়াতাড়ি নিচের দিকে হাঁটতে লাগল। খানিকটা গিয়েই দেখতে পেল চলে যাওয়া গাড়িটাকে। একবারই দেখতে পেল সে। তারপরেই পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। আজিজ ততক্ষণে অনেকখানি নেবে পড়েছে। ওই দেখা যাচ্ছে তাঁবুর চেহারাটা। লোকজনের কথাবার্তার শব্দও কানে আসছে। ক্রমে ওদের মুখ-গুলোও স্পষ্ট হলো। আরে! মাথায় টুপি পরা ওই সাহেবটা কে? ফীলডিং না? উঃ! কি মজা! 'ফীলডিং!' চেঁচিয়ে উঠলো আজিজ। খুশির তোড়ে 'মিস্টার' সম্বোধনটাও ভুলে গেল সে। তাড়াতাড়ি বন্ধুর দিকে এগোতে এগোতে বললো, 'তোমাকে আমি ভীষণভাবে চাইছিলুম ফীলডিং।'

বন্ধুকে দেখে ফীলডিংও উচ্ছ্বসিত। প্রায় ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো আজিজকে। দুই বন্ধুর এই মিলন এমন মধুর, এমন ছলনাহীন যে চেয়ে দেখার মতন। ভৃত্য-খানসামার দল তাই অবাক হয়ে এই যুগল মিলন দেখছে। দুজনেই কেউ-ই পদমর্যাদা নিয়ে এতটুকু পীড়িত নয়। কুণ্ঠাহীন-ভাবে তারা নিজেদের অসুবিধার কথা বলছিল। ট্রেনটা হঠাৎ মিস্ করায় বেজায় মুষড়ে পড়েছিল ফীলডিং। রাস্তায় মিস ডেরেকের সঙ্গে দেখা। তার গাড়িতেই এখানে এসেছে সে। সত্যি! চমৎকার মেয়ে এই ডেরেক। ও! তাহলে অন্য মহিলাটি ডেরেক! কিন্তু কোথায় সে? শোফারের সঙ্গে গাড়িতে বসে? ছি! ছি! কেউ তাকে আনতে যায় নি! এখুনি ব্যবস্থা করছে আজিজ। রীতিমত অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবে তাকে। দরকার হলে হাতী পাঠাবে সে। আয়োজনের এতটুকু ত্রুটিও হতে দেবে না আজিজ। ফীলডিং তখন ভীষণ ক্লান্ত। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। আজিজকে জিজ্ঞেস করলো, 'যা হোক একটা কিছু পানীয় খাওয়াতে পার আমায়?'

'না। পারি না।' এই বলে আজিজ নিজেই ছুটলো পানীয় আনতে।

আজিজ গেছে পানীয় আনতে। ফীলডিং একা দাঁড়িয়ে। তখনই মিসেস মুর ডাকলেন। এসে অব্দি বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করার অবকাশ হয় নি ফীলডিংএর। তখন বন্যার মতন পাহাড় থেকে নামছে আজিজ। সেই তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল মিসেস মুরের কাছে।

'গুড মর্নিং মিসেস মুর।'

'গুড্ মর্নিং ফীলডিং। আপনি কি আমাদের মিস কোয়েস্টেডকে দেখেছেন?'

'আমি তো এই এলুম। কোথায় তিনি?' বলল ফীলডিং।

'জানি না বাবা।'

মিসেস মুর না জানতে পারেন, কিন্তু আজিজ নিশ্চয়ই জানবে। তাই আজিজকেই জিজ্ঞেস করলো সে। 'আজিজ! মিস কোয়েস্টেডকে কোথায় রেখে এলে?'

আজিজের হাতে পানীয়। ফীলডিংকে দেবে বলে নিয়ে এসেছে। প্রশ্নটা শুনে এক মুহূর্ত থমকাল। কিন্তু পরমুহূর্তেই খুশিতে ভরে উঠল সে।

একটু আধটু বিপত্তি এলেও পিকনিক মোটামুটি সফল। তার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। তাছাড়া ফীলডিংকে পাওয়া যেন অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ। সঙ্গে আবার একজন অতিথিও নিয়ে এসেছে সে। সুতরাং খুশি মনেই আজিজ বললো, 'উনি ঠিক আছেন। কোন ভাবনা নেই। মিস ডেরেককে দেখেই উনি নিচে নেবে গেছেন।'

এই বলে ফীলডিংএর হাতে পানীয় তুলে দিল আজিজ। হাসতে হাসতে বললো, 'গুড্ লাক্!'

ইতিমধ্যে যারা অভ্যর্থনা করে ডেরেককে আনতে গিয়েছিল তারা ফিরে এসেছে। সঙ্গে ডেরেকের শোফার। লোকটা বললে যে আর একজন মেম-সাহেবকে নিয়ে ডেরেক মেমসাহেব চন্দ্রপুরে ফিরে গেছে। ডেরেক নিজেই গাড়ি চালিয়ে গেছে। সব শুনে আজিজ বললো, 'খুব স্বাভাবিক। হয়ত একটু ঘুরতে গেছে গাড়ি নিয়ে।'

'তাই বলে চন্দ্রপুর? লোকটা ঠিক বলছে তো?' ফীলডিং প্রায় আঁতকে উঠলো।

'কেন? ঠিক না বলার কি আছে?' আমতা আমতা করে বললো আজিজ। নিরাশ সে হয়েছে এ কথা ঠিক। এই চারজন বিদেশী অতিথিকে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট দিতে পারলে সে-ই সব থেকে খুশি হতো। কিন্তু অতিথিরা তো কয়েদী নয়! তাদেরও স্বাধীন ইচ্ছা থাকবে বৈকি! সুতরাং নিরাশ হলেও মেনে নিল আজিজ। কোন অস্বাভাবিকতাও দেখালো না। বেশ হাল্কা মনেই সে ব্রেকফাস্টের আয়োজন করতে গেল।

ফীলডিং কিন্তু ঘটনাটা অত সহজ করে নিতে পারল না। গাড়িতে আসার সময় সারাক্ষণ এই পিকনিকের কথা বলেছে ডেরেক। নেমন্তন্ন না পেলেও এই ধরনের আয়োজনে আসতে পারাটা তার কাছে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য। তাই ডেরেকের ওইভাবে চলে যাওয়াটা ফীলডিংএর কাছে কেমন কেমন লাগছিল। মিসেস মুরের দিকে তাকাল ফীলডিং। বৃদ্ধা নিঃশব্দ। একটু ভারী ভারী লাগছে ওঁর মুখখানা। দুজন যুবতীর ওইভাবে চলে যাওয়াটা তাঁরও মনঃপুত হয় নি। বেশ ঝাঁঝ নিয়ে বললেন, 'ওই ডেরেক মেয়েটা ভীষণ হুজুগে। সব সময়ই ওর তাড়া—সব সময়ই নতুনত্ব খুঁজছে। এত কিসের তাড়া বাপু?'

ফীলডিংএর কিন্তু খারাপ লাগে নি ডেরেককে। বেশ প্রাণবন্ত মেয়ে! তবে হুজুগে। ফীলডিং বললো, 'কিন্তু ডেরেকের এত ফেরার তাড়াই বা কেন? গাড়ি থেকে নেবে যখন ক্যাম্পের দিকে আসছি তখন তো দিব্যি ছিল। চন্দ্রপুরে ফেরার কথা তো কিছু বললো না আমায়? আমার মনে হয় মিস কোয়েস্টেডেরই বোধহয় ফেরার তাড়া ছিল।'

বৃদ্ধার উষ্মা আরও বেড়ে গেল ফীলডিংএর কথায়। বললেন 'য়্যাডেলা? মোটেই অমন হুজুগে মেয়ে সে নয়। কোন ব্যাপারেই ও তাড়া করে না। সে ধাতই ওর নয়।'

আপত্তি করলো ফীলডিং। বললো, 'কিন্তু আমার মনে হয় মিস

কোয়েস্টেডেরই ফেরার তাড়া ছিল। আর কেন এই তাড়া তা আমরা একটু পরেই জনাতে পারবো।' বেশ বিরক্ত মনে হচ্ছিল ফীলডিংকে। সকাল থেকেই বিরক্তি চলছে—সেই ট্রেন মিস্ করার সময় থেকেই। অথচ সম্পূর্ণ নির্দোষ সে। তারপর এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মিস কোয়েস্টেডের রহস্যময় অন্তর্ধানের খবর শুনে মেজাজ চড়ে গেল। বেচারা আজিজ! এত আয়োজন সব পণ্ড হয়ে গেল। হঠাৎ মিসেস মুরের দিকে চেয়ে ফীলডিং বললো, 'কিন্তু আজিজ বেচারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। অথচ এই চমৎকার মানুষটার ভোগান্তির শেষ নেই।

ছাই ভুলতে ভুলতে মিসেস মুর হাল্কা গলায় বললেন, 'তা জানি।'

'আয়োজন যা করেছে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন। আর তার জন্যে কত ভোগান্তি সইতে হচ্ছে বেচারাকে।'

মিসেস মুর কোন উত্তর দিলেন না। কথাবার্তাও বিশেষ এগোল না। দুজনের কেউই দুজনের কাছে তেমন পরিচিত নন। তা ছাড়া আলাপের মধ্যে অজান্তেই ভারতীয় অভারতীয় প্রসঙ্গ এসে পড়ল। জাতিগত সংস্কারের বাধাটা এই মুহূর্তে দুজনের কাছেই কেমন যেন অনতিক্রমণীয় মনে হচ্ছিল। আজিজকে কেন্দ্র করে একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষাভাব দেখা দিল দুজনের মধ্যে। বিশেষ করে বৃদ্ধার মনে সংশয়টা আরও তীব্র যেন। তাই ফীলডিং চাইলেও মিসেস মুরকে আলোচনায় প্রবৃত্ত করা গেল না। এই অস্বস্তি থেকে ওদের উদ্ধার করলো আজিজ—ব্রেকফাস্টের জন্যে ডেকে এনে।

ঘটনাটা নিয়ে আজিজও ভাবছিল। অন্তত যেটা রূঢ় বাস্তব তার কথা। তার মনে হলো এইভাবে আত্মগোপন করে য়্যাডেলার চলে যাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক। তবে পাছে ওরা দুশ্চিন্তা করে তাই উল্টো কথা বললো। 'এ নিয়ে ভাবছেন কেন? এমন কিছু অস্বাভাবিক কাজ উনি করেন নি। আমরা যখন কথা বলতে বলতে ওপরে উঠছি, তখনই গাড়িটা দেখতে পেলুম আমরা। মিস কোয়েস্টেডও দেখলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই নিচে নেবে গেলেন উনি।'

ডাহা মিথ্যে এবং এমন মিথ্যে যা শুধরে নেওয়াও যায় না। তবে এমন অসত্য উক্তিটা অপ্রয়োজনে করে নি সে। য়্যাডেলা সম্বন্ধে মনে কোনরকম বিরূপ ভাব পুষে রাখতে চায় নি সে। অনেকক্ষণ থেকেই মেয়েটা তাদের সামাজিক অনাচার নিয়ে ব্যঙ্গ করছিল। পুরুষদের বহুবিবাহ নিয়ে খোঁচা দিচ্ছিল। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে তাকেও ব্যঙ্গ করেছে মেয়েটা। একজন বিদেশিনী হয়ে এমনভাবে অন্য দেশের সামাজিক আচার ব্যবহার নিয়ে ব্যঙ্গ করাটা উচিত হয় নি তাঁর। আলোচনাটা যাতে ব্যক্তিগত না হয়ে পড়ে, তাই বাধ্য হয়ে আজিজ একটা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। অবশ্য য়্যাডেলা যে খারাপ মানুষ নয় তা সে জানে। আর সেইজন্যেই মেয়েটাকে যাতে কেউ ভুল না বোঝে, তাই এই ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে আজিজকে। গেরো ছাড়িয়ে সহজ করে নিল ব্যাপারটা। আগাছা তুলে জমি পরিষ্কার করলো। তাই ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে এমনি আরও অনেক মিথ্যে সে হাসতে হাসতে

বলে গেল।

কিন্তু আজিজ যতই মিথ্যের প্রলেপ দিক ফীলডিং বা মিসেস মূর নিজের নিজের গোঁ ছাড়লেন না। ভীষণ রাগ হচ্ছিল ফীলডিং-এর। তার ধারণা সমস্ত গোলমালের মূলে আছে মেয়েরা। সাধে বলে পথি নারী বিবর্জিতা! অন্যদিকে মিসেস মূরের ধারণা, ফীলডিং নামে মানুষটার জন্যেই এই সব বিপত্তি। লোকটা নিজে সময়মত ট্রেন ধরতে না পেরে অন্যের ঘাড়ে তার দায় চাপাচ্ছে। অবশ্য মিসেস মূরের যুক্তি দুর্বল। ধোপে টেঁকে না। তাছাড়া এসব নিয়ে ভাবতেও ভাল লাগছিল না তাঁর। গুহার মধ্যের সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার স্মৃতি এখনও অমলিন হয়ে আছে। দেশটা সম্বন্ধে যেটুকু কল্পনা-বিলাসিতা ছিল তা এখন ঝরে গেছে। কেমন যেন নিষ্ঠুর রকমের উদাসীন হয়ে গেছেন তিনি। প্রথম দিকের সেই শ্রদ্ধা বিস্ময়ের এতটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। উত্তপ্ত দিনের পর স্নিগ্ধ শীতল রাতের সেই স্নেহস্পর্শ, আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে থাকা সেই অনন্ত অসীমের ব্যঞ্জনা—এগুলো যেন অতিরিক্ত আকর্ষণ নিয়ে তাঁর কাছে আর প্রকাশিত হচ্ছিল না। নিজের মধ্যেই ধীরে ধীরে গুটিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

ফীলডিং একটাই গুহা দেখলো। প্রথম গুহাটা। কিন্তু একটুও ভাল লাগলো না তার। একবার ঢুকেই বেরিয়ে এল সে। ইতিমধ্যে পিকনিকের আয়োজন সব গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। এবার যাবার পালা। ওরা যত নামছে ততই গরমের ঝাঁঝ গায়ে লাগছিল তাদের। একসময় দলবল ফিরে এল যেখান থেকে চড়াই শুরু হয়েছে সেখানে। ফীলডিং চিনতে পারলো জায়গাটা। এই অব্দি তাদের গাড়িটা এসেছিল। এখান থেকেই কাঁচা রাস্তা শুরু। এখানে পৌঁছেই ফীলডিং একটু যেন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। খাড়া পাহাড়টার দিকে চেয়ে একটা সন্দেহ উঁকি দিল মনে। কাছেই আজিজ দাঁড়িয়েছিল। তাকে ডেকে বললো, 'আচ্ছা আজিজ! মিস্ কোয়েস্টেডের সঙ্গে ঠিক কোন্ জায়গাটায় তোমার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল মনে আছে?'

'কেন থাকবে না? ওই তো, ওখানে!'

কাউয়া দোল্-এর খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়ের একটা জায়গা দেখাল আজিজ। ফীলডিং অবাক। হাঁ করে কিছুক্ষণ খাড়া পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইল সে। কোথাও পথের চিহ্নমাত্র নেই। ক্ষীণ এক জলধারা পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। জলধারার দুপাশে বুনো আগাছা আর কাঁটা গাছ। কোন মহিলার পক্ষে এই পথে নামা বেশ কষ্টকর। হয়ত গাইডের সাহায্য নিয়েছিল য়্যাডেলা। কিন্তু তাহলেও এ কাজ প্রায় দুরূহ। নিঃসন্দেহ হতে সে জিজ্ঞেসও করলো আজিজকে। 'ওপর থেকে নাববার রাস্তা আছে?'

'এক আধটা নয়। অসংখ্য।'

হাসতে হাসতে বললো আজিজ। ফীলডিং অবশ্য পাহাড়ের খাঁজ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। পৃথিবীর বুক থেকে খাড়াই উঠেছে পাহাড়ের কঠিন গা আর মধ্যাহ্ন সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে সেই প্রতিফলিত আলো।

ফীলডিংএর মনের দ্বিধা তখনও কেটে যায় নি। আজিজকে বললো, 'তুমি দেখলে যে গাইডকে নিয়ে মিস কোয়েস্টেড নিরাপদে নেবে গেলেন?'
'নিশ্চয়ই!'
'তারপর কি দেখলে?'
'নিচে নেবে মিস ডেরেককে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন উনি। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিল।'
'আর গাইড? সে কি ফিরে এল?'
'ঠিক তাই। একটা সিগারেট খাওয়াবে?'
ফীলডিং সিগারেট দিল। পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলধারা মাটিতে পড়ে চওড়া হয়ে গেছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ফীলডিং বললো, 'আমার মনে হয় মিস্ কোয়েস্টেড বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই অমন তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন। তোমার কি মনে হয়?'
'অসুস্থ হলে আমি অন্তত জানতে পারতুম।'
'তা বটে।'
আজিজ তাকিয়েছিল ফীলডিংএর দিকে। সে বুঝতে পারছে মনে মনে দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ফীলডিং। বললোও সে কথা, 'দেখে মনে হচ্ছে তোমার ভীষণ অশান্তি হচ্ছে। তাই না?'
'তা হচ্ছে।'
'কিন্তু কেন? আমার জন্যে?' তাহলে বরং অন্য কথা বলি আমরা।' একটু চুপ করে আজিজ ফের বললো, 'একটা কথা তোমায় বলি বন্ধু। মিস কোয়েস্টেড আমার মাননীয় অতিথি। তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই মনে করছি না। তাছাড়া এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না।'
'তাই বলে তিনি তো অভদ্র ব্যবহার করতে পারেন না। এইভাবে পার্টি থেকে চলে যাওয়াটা তাঁর মোটেই উচিত হয় নি। ডেরেকেরও উচিত হয় নি ওঁকে নিয়ে যাওয়া।'
ব্যাপারটা যথার্থই স্পর্শকাতর। কিন্তু আজিজ এমনভাবে নিজেকে দুর্ভেদ্য করে রেখেছে যে তাকে যেন এসব স্পর্শই করলো না। কল্পনার ডানা মেলে আকাশচারী বিহঙ্গের মতন মাটির অনেক উর্ধ্বে তার অবস্থান। তুচ্ছ ক্ষুদ্র এই কাতরতার কোন স্পর্শই তাকে এখন বিচলিত করতে পারে না। নিজেকে মোঘল সম্রাটদের মতন অবিচল কর্তব্যনিষ্ঠ মনে করে সে। তাদেরই মতন মহান সে। তুচ্ছ আবেগের বন্দীত্বের মধ্যে বদ্ধ বিড়ম্বিত তার জীবন নয়। হাতীর পিঠে চড়ে পাহাড় থেকে নামতে নামতে এইসব ভাবছিল আজিজ। চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে মাড়াবার শৈলশ্রেণী। ওরা যত মাটির কাছাকাছি আসছে ততই চেনা দৃশ্যগুলো চোখে পড়ছিল আজিজের। রুক্ষ মাটি, মিষ্টি আকাশ, এগুলো তার চেনা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আজিজের সান্ত্বনা যে তার অতিথিরা এই অভিযানে আনন্দ পেয়েছেন। হয়ত কিছু কিছু নিয়মভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু সে দায় তাদেরই। আজিজ যথাসম্ভব তার দায় পালন করেছে। হাওদার রেলিংয়ে ভর দিয়ে

মিসেস মুর ঘুমোচ্ছিলেন। লতিফ তাঁকে যত্ন করে আগলে রেখেছে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে। আজিজের পাশে স্থির গম্ভীর হয়ে চুপচাপ বসেছিল ফীলডিং। অবশ্য সেই-ই প্রথম কথা বললো।

'আজিজ, পিকনিকে কত খরচ পড়লো তোমার ?

'চুপ বন্ধু। ওসব জিজ্ঞেস করো না। ধরে নাও বেশ কয়েকশো। ঠিক ঠিক হিসেব অবশ্য করি নি। তবে সে অঙ্ক শুনলে আঁতকে উঠবে। আমার বন্ধুর লোকজনেরা আমায় পথে বসিয়ে দিয়েছে। আর হাতী ! সে তো রাজকীয় ব্যাপার। কথায় বলে হাতীর খোরাক। তবে আমার পক্ষে সবচেয়ে ভীতি-জনক হয়েছে আমারই আত্মীয় এম্. এল্ !'

'এম্. এল্ ? কে সে ?'

'সস্ ! চুপ। শুনতে পাবে।' ফিসফিস করে কথাটা বললো আজিজ। তারপর ইসারায় মহম্মদ লতিফকে দেখিয়ে দিল।

'আমি আগেই বলেছিলাম লোকটা ভাল নয়।'

'আমার পক্ষে ভাল নয়, তবে ওর নিজের পক্ষে ভাল।' বেশ রহস্য করে জবাব দিল আজিজ। আরও বললো, 'ও যে অসৎ তা কি আমি জানি না ? তবে আমার উপকারও যথেষ্ট করেছে। সমানে আমার অতিথিদের দেখাশোনা করেছে। ওর ওপর এ কাজটা দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। তাছাড়া লতিফ আমাব আত্মীয়। আমারও উচিত ওকে দেখা। আমাদের উর্দুতে একটা সুন্দর প্রবাদ আছে। টাকা গেলে টাকা আসে। কিন্তু টাকা জমিয়ে রাখলে তাড়াতাড়ি মরতে হয়। নিশ্চয়ই শোনো নি প্রবাদটা। আমিও সবে জেনেছি এটা।'

'ওটা শুনি নি। তবে আমি যে নীতিকথাগুলো মেনে চলি সেগুলো আরও প্রচলিত। যেমন, যে পয়সটা বাঁচাবে সেটাই তোমার লাভ। কিংবা, সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের সাত ফোঁড়। অথবা দেখে শুনে ঝাঁপ দাও, ইত্যাদি। এতবড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা শুধু এই নীতিকথার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং এই এম্. এল্‌দের মতন অসৎ লোকদের দিয়ে তোমরা কোনদিনই আমাদের তাড়াতে পারবে না !'

একটুও না ভেবে আজিজ বললো, 'ওসব কথা উঠছে কেন ভাই ? কে বললে, আমরা তোমাদের তাড়াতে চাই ? অন্তত আমি চাই না। ওসব নোংরা ধান্দা করবে রাজনীতির লোকেরা। অবশ্য ছাত্রাবস্থায় একটু আধটু রাজনীতি যে করি নি তা নয়। তবে এখন আমি অন্য মানুষ। আমার কাজের স্বাধীনতা যদি থাকে আর ওপরওলার ব্যবহার যদি অভদ্র না হয়, তাহলেই আমি খুশি। এর বেশি কিছু চাইও না।'

'কিন্তু বেশিই তো তুমি চাইছ ? এদের নিয়ে পিকনিক করতে গেছ।'

আজিজ যেন থমকে গেল। ফীলডিংএর দিকে চেয়ে বললো, 'পিকনিকের মধ্যে ইংরেজ বা ভারতীয় বলে কি আলাদা কিছু আছে ? এ তো সবাইকে নিয়ে আনন্দ করা !'

এক সময় যাত্রা শেষ হলো। লোক-লস্কর হাতী মানুষের এক বিরাট শোভা-যাত্রা এসে থামলো প্ল্যাটফর্মের কাছে। যাত্রার সবটাই সুখের হয় নি। কাঁটার

খোঁচাও ছিল। ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে। অপেক্ষারত হিন্দু পাচককে নিয়ে দলবল ট্রেনে উঠলো। শুরু হলো যাত্রা। কণ্ঠভরা বিষ নিয়ে ধকধক করে চলছে যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা সরীসৃপ। মনে হচ্ছে বিংশ শতাব্দী নয়, সবাই ফিরে গেছে সেই ষোড়শ শতকে। মিসেস মুর তাঁর জেনানা কামরায়—অন্যরা আর একটা কামরায়। জানলার শার্সী ফেলে বিজলী পাখা চালিয়ে দিল যাত্রীরা। একটু ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না। সারাদিন অজস্র ধকল গেছে শরীরে। কামরার মধ্যে অস্পষ্ট আলোয় সবাইকে মড়ার মতন দেখাচ্ছে। ট্রেনটাও যেন সচল শববিশেষ। মাড়াবার পাহাড় অনেকখানি পিছিয়ে গেছে ততক্ষণে। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হচ্ছে তাকে ঘিরে থাকা জগৎ। এখন দূর থেকে মাড়াবারকে আশ্চর্য রোমান্টিক দেখাচ্ছে। এইরকমই হয়। দূর থেকে যা রোমান্টিক দেখায়, কাছে গেলে তার বাস্তব রূপ সইতে পারে না মানুষ। একটা ছোট্ট স্টেশনে ট্রেনটা থামলো। চুল্লীতে কয়লা ভরাই করা হলো। আবার শুরু হলো পথ চলা। ধকধক, ধকধক। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে মেন লাইন। হতোদ্যম বাষ্পযান এবার যেন নতুন করে বল পেল। নবশক্তির উন্মেষে বাষ্পযানের দেহে উৎসাহ সঞ্চারিত হলো। ট্রেনের গতি এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। গন্তব্যস্থান চন্দ্রপুর আর দূরে নয়। হয়ত তাই এই আস্ফালন। সিভিল লাইন্‌স্ ঘুরে, লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে ঝমঝম শব্দ করতে করতে এসে থামল ট্রেনটা। চন্দ্রপুর ! চন্দ্রপুর ! অভিযান শেষ।

আবার শুরু হবে সেই দিনযাপনের গ্লানি, সাদামাটা প্রত্যহের কলুষ। সকালবেলার সেই ঝলমল করা ঐশ্বর্য যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওরা সবাই তাই বিষণ্ণ। হঠাৎই হাট করে কামরার দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর হক্। আজিজের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ গলায় হুকুম করলো হক্।

'ডাক্তার আজিজ ! অত্যন্ত দুঃখজনক এক কর্তব্য পালন করতে এসেছি আমি।'

হাঁ করে চেয়েছিল আজিজ। হক্ বললো, "তোমায় য়্যারেস্ট করতে এসেছি।'

অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে অবস্থাটা বুঝে নিল ফীলডিং। তারপর এগিয়ে এল, 'হ্যালো মিস্টার হক্! আপনার ভুল হয় নি তো ?'

'স্যার। আমার ওপর ওইরকমই নির্দেশ আছে। এর বেশি কিছু জানি না আমি।'

'অভিযোগ ?'

'বলার হুকুম নেই স্যার।'

ফীলডিং এবার শক্ত হলো। বললো. 'ওসব শুনতে চাই না। ওয়ারেণ্ট বের করুন।'

হক্ বিব্রত হচ্ছিল। কোনরকমে বললো, 'এসব ক্ষেত্রে ওয়ারেণ্টের দরকার হয় না স্যার! আপনি মিস্টার ম্যাকব্রাইডকে জিজ্ঞেস করুন বরং।'

'তাই হবে। এস আজিজ! এ'র সঙ্গে অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে। মারাত্মক ভুল। মিস্টার ম্যাকব্রাইডকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানতে পারা যাবে।'

কিন্তু ফীলডিংএর কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইন্সপেক্টর হক্ দৃঢ়তার

সঙ্গে বললো, 'মাপ করবেন স্যার! আজিজকে আমাদের সঙ্গেই যেতে হবে। গাড়ি এনেছি আমরা।'

আজিজের চোখ তখন জলে ভরে উঠেছে। হঠাৎ ফ‍ুঁপিয়ে উঠলো সে। এতক্ষণ ধরে সে স্তম্ভিত হয়ে দেখছিল। এই প্রথম গলা দিয়ে শব্দ বের হলো তার। হঠাৎ একটা বিচিত্র কাণ্ড করে বসলো সে। ইন্সপেক্টর হক্‌এর দিকে চেয়েই কামরার উল্টো দিকের দরজা দিয়ে লাফিয়ে পালাতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জনের মতন হাঁক দিল ইন্সপেক্টর হক্‌। 'ডাক্তার আজিজ! এরকম ব্যাপার হলে আমি কিন্তু বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হবো।'

ফীলডিংও দেখেশ‍ুনে থ হয়ে গেছে। চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'ঈশ্বরের দোহাই আজিজ......!' তার নিজেরও স্নায়‍ুপীড়ন শ‍ুর‍ু হয়ে গেছে ততক্ষণে। শক্ত পায়ে সে আজিজের দিকে এগিয়ে গেল, তারপর পেছন থেকে টেনে ধরে তাকে কামরার মধ্যে নিয়ে এল। কেলেঙ্কারির একশেষ হতো একমিনিট দেরি হলে। বাঁশি বাজতো, শিকারীর মতন ছ‍ুটে যেত হক্‌। ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জার ব্যাপার হতো! প্রায় বগলদাবা করে আজিজকে নিয়ে ইন্সপেক্টরের সামনে এসে দাঁড়ালো ফীলডিং।

'মিস্টার হক্‌! আমরা দ‍ুজনেই ম্যাকব্রাইডের কাছে যাচ্ছি। ঘটনাটা কি তা জানা দরকার। আজিজ আমার বন্ধ‍ু। তাকে আমি ভাল করেই চিনি। চমৎকার মান‍ুষ। ইচ্ছে করে ও কোন অপরাধ করতে পারে না। যদি কোন অপরাধ হয়েই থাকে, সেটা সম্প‍ূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। আমরা ব‍ুঝিয়ে বলবো ম্যাক-ব্রাইডকে। দরকার হলে ও ক্ষমা চাইবে।'

ততক্ষণে আজিজ প্রায় ভগ্নস্ত‍ূপে পরিণত হয়েছে। ডানা ভাঙ্গা পাখি যেন। নির্জীব স্বরে কোনরকমে বললো, 'আমার ছেলেমেয়ে.....আমার স‍ুনাম!'

'কিছ‍ুই নষ্ট হবে না। কিছ‍ু না। টুপিটা পরে আমার সঙ্গে এস। সব ঠিক হয়ে যাবে।' বন্ধ‍ুর দিকে সপ্রেমে চেয়ে কথাগ‍ুলো বললো ফীলডিং। প‍ুলিশ ইন্সপেক্টরও অনেকটা নিশ্চিন্ত। সত্যি! কর্তব্য অপ্রিয় হলে তা পালন করা কত কঠিন! মনে মনে আল্লাকে ধন্যবাদ দিল সে।

ওরা দ‍ুজনে হাত ধরাধরি করে ট্রেন থেকে নাবলো। দ‍ুপ‍ুরের চড়া রোদ ফেটে পড়েছে প্ল্যাটফর্মের ওপর। থিকথিক করছে লোক। মালবাহক, যাত্রী, প‍ুলিশ, সরকারী আমলা—ভরে গেছে প্ল্যাটফর্ম। রনী হীসলপ্‌ যত্ন করে ট্রেন থেকে নাবাচ্ছিল মিসেস ম‍ুরকে। আড়চোখে একবার চেয়ে দেখে নিল ফীলডিং আর আজিজকে। মহম্মদ লতিফ কপাল চাপড়াচ্ছে আর হাউমাউ করে চেঁচাচ্ছে। শোরগোল পড়ে গেছে চন্দ্রপ‍ুর স্টেশনে। এরই মধ্যে পথ করে আজিজকে নিয়ে এগোচ্ছিল ফীলডিং। কিন্তু হলো না। মিস্টার টার্‌টনের হ‍ুকুম নিয়ে একজন ছ‍ুটে এল ফীলডিংএর কাছে। লোকটা টারট্‌নের কাছে নিয়ে গেল ফীলডিংকে। আর বিম‍ূঢ় আজিজকে কড়া প‍ুলিশ প্রহরায় ঢাকা প্রিজন্‌ভ্যানে তোলা হলো।

১৭

কালেক্টর মিস্টার টার্‌টন্‌ যে এতক্ষণ ওয়েটিং রুমের ভিতরে বসে জালির দরজা দিয়ে সব লক্ষ্য করছিলেন তা বোঝা যায় নি। আজিজকে প্রিজন-ভ্যানে তুলে দেবার পর ফীলডিংকে নিয়ে একজন ভৃত্য ওয়েটিং রুমে ঢুকলো। দরজা খুলেই ফীলডিং দেখলো মন্দিরের ভেতরে বিগ্রহের মতন সামনেই বসে টার্‌টন্‌। রাগে থমথম করছে মুখটা। ফীলডিংকে দেখে একটা কথাও বললেন না। মাথার ওপর টানা পাখা চলছে। তার নোংরা ঝালরটা মৃদু মৃদু উড়ছে। টারটনের মুখখানা বেয়াড়া রকমের সাদা। কেমন যেন ক্ষ্যাপাটে দেখাচ্ছিল তাঁকে। অনুমান করা যেতে পারে প্রথম প্রথম ইংরেজরা এইরকম মুখ করেই চন্দ্রপুরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। মানুষটা বেশ সাহসী মনের-স্বভাবটাও স্বার্থপর নয়। তার ওপর পরার্থপরতার ঝোঁক চেপে যাওয়ায় বেশ ঝলমল করছিল মুখখানা। মনে হচ্ছিল যে কোন মূল্যে জাতিগত অবমাননার প্রায়শ্চিত্য করতে প্রস্তুত। ফীলডিং একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল টার্‌-টনের দিকে। টার্‌টনই প্রথম কথা বললেন ; ফীলডিংএর দিকে চেয়ে সখেদে বললেন, 'আমার দীর্ঘ কর্মজীবনের সবচেয়ে খারাপ ঘটনা আজ ঘটলো। মাড়াবার গুহার মধ্যে ওদের হাতে শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিত হলেন মিস কোয়েস্টেড।' ফীলডিং প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো।

'না। না। কখনই না।'

'ঈশ্বরের পরম করুণা যে মিস কোয়েস্টেড পালিয়ে আসতে পেরেছেন।'

'না। হতে পারে না তা। অন্তত আজিজ নয়।'

মাথা নাড়তে নাড়তে বলছিল ফীলডিং। প্রায় আর্তনাদের মতন শোনাচ্ছিল তার স্বর। আরও বললো, 'সম্পূর্ণ মিথ্যে। পুরো ব্যাপারটাই সাজানো বীভৎস ষড়যন্ত্র।'

মিস্টার টার্‌টনের মুখ সেইরকমই ভাবলেশহীন। বললেন, 'আপনাকে কেন ডাকিয়ে এনেছি জানেন? এই কথাগুলো বলবার জন্যে নয়।'

'মানে ?'

'আপনি যদি আজিজের সঙ্গে ভ্যানে উঠতেন, তাহলে আমাদের সমাজের লোকেরা আপনার নিন্দে করতো। তাই এখানে ডাকিয়ে এনেছি।'

ফীলডিং তখন পুরোপুরি বাকশক্তিহীন হয়ে গেছে। নির্বোধের মতন সে শুধু 'না না' বলে যাচ্ছিল। এটা সে বুঝতে পেরেছে যে সাময়িক ভাবে একটা পাগলামিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে মানুষগুলো। একটা নিষ্ঠুর অন্ধ উন্মত্ততা, যার কোন বিবেক নেই। বিবেচনা নেই। কিন্তু কি করে এই প্রবৃত্তির হাত থেকে সে এদের মুক্তি দেবে ? ফীলডিং নিজে কখনও এমন অন্ধ প্রবৃত্তির শিকার হয় নি। বিপদের সময়েও বুদ্ধি স্থির রেখে সে কাজ

করেছে। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ বিপদমুক্তি হচ্ছে ততক্ষণ কোনরকম আবেগ বা প্রবৃত্তির প্রশ্রয় সে দেয় না। কিন্তু এই মানুষগুলো সম্পূর্ণ আলাদা ধাতের। কোন মিলই নেই তার সঙ্গে। তবুও যথাসম্ভব শান্ত মনে সে জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু আজিজের নামে এতবড় অপবাদটা দিল কে ? অভিযোগটাই বা কি ?'

'মিস্ ডেরেক, আর......' জবাব দিতে গিয়ে প্রায় ভেঙে পড়লেন টার্টন্। কথাটাও শেষ করতে পারলেন না।

ফীলডিং ফের জিজ্ঞেস করলো, 'আর ?'

'যিনি লাঞ্ছিতা হয়েছেন তিনি নিজে। অর্থাৎ মিস্ কোয়েস্টেড নিজে এই অভিযোগ এনেছেন।' কথাটা বলে টার্টন্ সবেগে তাঁর মুখখানা ঘুরিয়ে নিলেন।

'তাহলে বলবো যে মহিলা প্রলাপ বকেছেন।'

ফীলডিংএর জবাব শুনেই টার্টনের আচ্ছন্নতা কেটে গেল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন তিনি, 'যা বললেন এই মুহূর্তে তা ফিরিয়ে নিন। আমি লক্ষ্য করছি মিস্টার ফীলডিং, যেদিন থেকে আপনি চন্দ্রপুরে এসেছেন সেদিন থেকেই এই ধরনের উক্তি আপনি করে আসছেন।'

'অত্যন্ত দুঃখিত স্যার। আমি নিঃশর্তে কথাটা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

'মিস্টার ফীলডিং! আমি অবাক হচ্ছি কার প্ররোচনায় কথাটা অমনভাবে বলতে পারলেন আমায় ?'

'কারো প্ররোচনায় নয়। খবরটা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। তাই হয়ত অসৌজন্য প্রকাশ হয়ে গেছে। আমায় মার্জনা করুন স্যার। আমি কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে আজিজ অপরাধী।'

অসহিষ্ণু টার্টন্ টেবিলের ওপর সজোরে ঘুষি মেরে বললেন, 'ওই কথাটা— ওই কথাটাই আমার পক্ষে অমর্যাদাজনক। আপনি আবার আমায় অপমান করলেন।'

ফীলডিংও যেন নিজের ওপর সংযম হারিয়ে ফেলছিল ক্রমশ। তবুও যথা-সাধ্য চেষ্টায় নিজেকে দমন করে দৃঢ়ভাবে বললো, 'মহিলা দুজন সম্বন্ধে আমি কোন বিরূপ উক্তি করতে চাই নি। হয়ত তাঁরা সরল বিশ্বাসেই ঘটনার কথা বলেছেন। কিন্তু আজিজ সম্বন্ধে যে অভিযোগ তাঁরা এনেছেন তাতে ভুল থাকতে পারে, এবং মাত্র পাঁচ মিনিটেই এই ভুল শুধরে নেওয়া যায়। মানুষটাকে আমি ভাল করেই জানি স্যার। আর জানি বলেই বলছি যে এ ধরনের অপরাধ সে করতে পারে না।'

'তার মানে, আপনি বলছেন যে ভুল করে অভিযোগ করা হয়েছে ? হতে পারে তা।' টার্টনের স্বর ক্ষীণ হলেও তাতে জ্বালা ছিল। 'শুনুন মিস্টার ফীলডিং! এ দেশে আমার পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা।' টার্টন্ একটু চুপ করলেন। তারপর ফের বললেন, 'এই পঁচিশ বছর ধরে আমি দেখে আসছি যে যখনই ইংরেজ আর ভারতীয়রা ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে, তখনই ইংরেজদের চরম লাঞ্ছনা হয়েছে। শুধু দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে এই ক্ষতি হয় না। কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই বিপদ হয় এবং তার দৃষ্টান্ত

তো এখনই পেলেন। তাই আমার সব অধিকার এবং কর্তৃত্ব দিয়ে আমি এই চেষ্টার বিরোধিতা করে এসেছি এবং ভবিষ্যতেও করবো। চন্দ্রপুরে আমি দু'বছর ধরে কালেক্টর্ হয়ে আছি। এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে কোন অপ্রীতি-কর ঘটনা কখনও ঘটে নি। দু সমাজের মানুষই পরস্পরকে শ্রদ্ধা করেছে। কেন সম্ভব হয়েছে জানেন? কেউ-ই নিয়ম ভেঙে কাছাকাছি হবার চেষ্টা করে নি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। সেই বেড়াটা আপনার মতন অর্বাচীনদের প্ররোচনায় ভেঙে যাচ্ছে। এত বছর ধরে তৈরি করা ঐতিহ্য আপনারা মানলেন না। এক কথায় ভেঙে দিলেন। ফল কি হয়েছে নিজেই দেখুন! চন্দ্রপুরের এতদিনের সম্মান খ্যাতি সব ভেসে গেল। এর শেষ কোথায় আমি জানি না। দেখতেও চাই না। আপনি আধুনিক ভাবধারার মানুষ—আপনি অবশ্যই দেখবেন। সেই অনাগত দিনের অপেক্ষায় আমি বেঁচে থাকতেও চাই না। আমি বুঝতে পারছি আমার যুগ শেষ হয়ে আসছে। আমার কাছে সবচেয়ে দুঃখের কারণ হলো যে আমারই চোখের ওপর একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা. যিনি সবে এদেশে এসেছেন আমারই প্রিয় সহকর্মীর বাগদত্তা হয়ে, তিনি এমনভাবে লাঞ্ছিতা হলেন! আমি বেঁচে থাকতে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটলো! ইস!...'

আবেগে ভেঙে পড়লেন টার্টন্। যা বললেন, তা যেমন নিষ্ঠুর সত্য তেমনি করুণ। মনকে যথার্থই স্পর্শ করে তাঁর কথাগুলো। কিন্তু এর সঙ্গে আজিজের কি সম্পর্ক? ফীলডিংএর ধারণা যে এর মধ্যে আজিজের কোন ভূমিকাই নেই। দুভাবে কোন ট্র্যাজেডিরই বিচার হয় না। যেখানে টার্টনের উদ্দেশ্য হলো মিস কোয়েস্টেডের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া. সেখানে তার লক্ষ্য হলো আজিজকে রক্ষা করা। আর সেইজন্যেই ম্যাকব্রাইডের সঙ্গে তার এখুনি দেখা করা দরকার। ম্যাকব্রাইড তার বন্ধু মানুষ। কথা বললে শুনবে এবং বোঝবার চেষ্টা করবে। অন্তত মানুষটার ওপর এটুকু আস্থা সে রাখতে পারে।

টার্টন্ আরও বললেন. 'আপনার জন্যেই আমার এখানে আসা। রনী তার মাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আপনাকে দেখবার কেউ নেই। তাই আমি এসেছি. যতটা পারি সাহায্য করবো। শুনুন, আজ সন্ধ্যেবেলায় এই ব্যাপার নিয়েই ক্লাবে একটা মিটিং ডাকা হয়েছে। আমার ধারণা, আপনি হয়ত মিটিংএ আসবেন না। কারণ ক্লাবে আপনি কদাচিৎ আসেন।'

ফীলডিং আহত হলো। তাড়াতাড়ি বললো, 'না স্যার। আমি আসবো। নিশ্চয়ই আসবো। আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আপনি আমার জন্যে অনেক কিছু করলেন। যদি অভয় দেন. একটা কথা জিজ্ঞেস করি। মিস কোয়েস্টেড এখন কোথায়?'

টার্টন মুখে জবাব দিলেন না। তবে ভাবে ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি অসুস্থ। তীব্র অনুভূতির সঙ্গে ফীলডিং বললো, 'খারাপ, খুব খারাপ। রীতিমত ভয়ের ব্যপার!'

কালেক্টর সাহেব শক্ত চোখে তাকিয়েছিলেন ফীলডিংএর দিকে। আশ্চর্য!

লোকটা এখনও ঠাণ্ডা মাথায় নিজের জিদ ধরে রেখেছে! এদেশে নতুন আসা একজন ইংরেজ মহিলার লাঞ্ছনার কথা শুনেও মানুষটা একটুও উত্তপ্ত হলো না! অন্য মানুষগুলোর মতন ফীলডিংও যদি উত্তপ্ত হতো সেটাই হতো স্বাভাবিক। মেয়েটির লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাটা বাস্তব সত্য। এই বাস্তব সত্যটা না মেনে তার কারণ খুঁজতে যাওয়ার চেষ্টা রীতিমত অপরাধ। একজন ইংরেজের কাছে এখানকার য়্যাংলো ইণ্ডিয়া সমাজ এটুকু দাক্ষিণ্য আশা করতে পারে বৈকি! যুক্তির শিখাটি যেখানে নিবিয়ে দেবার পরোয়ানা বেরিয়ে গেছে, সেখানে তা উসকে দেওয়ার চেষ্টা ঘোরতর অন্যায়। ফীলডিং-এর তা জানা দরকার। সেদিন চন্দ্রপুরের সব ইউরোপীয়ান তাদের ব্যক্তিগত ভাবনা সরিয়ে সমষ্টির কথা ভাবছিল। রাগ বিতৃষ্ণা করুণা ঘৃণায় মাথামাখি হয়ে গিয়েছিল সকলের মন। কিন্তু দুই দুই মিলিয়ে চার করার ক্ষমতাটুকু তাদের ছিল না। ব্যতিক্রম ছিল একজনই, ফীলডিং।

সুতরাং আলোচনা ইতি করে দিলেন কালেক্টর সাহেব। তারপর সোজা প্ল্যাটফর্মের ওপর এসে দাঁড়ালেন। রনীর পাঠানো একজন চাপরাশী মহিলাদের ফেলে আসা কিছু টুকিটাকি ব্যবহারের জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছে। লোকটাকে রনীই হয়ত পাঠিয়েছে। দলের সঙ্গে ক্যাম্প অব্দি গিয়েছিল সে। লোকটা দুষ্ট প্রকৃতির। যা মেয়েদের নয় সেগুলোও তুলছিল সে। মহম্মদ লতিফ সব দেখলো. কিন্তু বাধা দিল না। হাসান তার পাগড়ি খুলে হাউ-হাউ করে কাঁদছে। আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের যেসব জিনিস তারা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেগুলোও প্ল্যাটফর্মের ওপর চড়া রোদে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কেউ চেয়েও দেখছে না। কালেক্টর সাহেবের নজর কিন্তু এড়াল না। এদের স্বেচ্ছাচারিতা দেখে নতুন করে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর কড়া হুকুমে তখনকার মতন লুটপাট বন্ধ হলো। বাংলোয় ফেরার পথে কালেক্টর সাহেবের আর একবার ধৈর্যচ্যুতি হলো যখন দেখলেন কুলিরা নালার ধারে শুয়ে দিব্যি দিবানিদ্রা দিচ্ছে। অবশ্য তাঁকে দেখেই দোকানীরা দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করলো। কালেক্টর সাহেব ফিরেও দেখলেন না। তিনি তখন মনে মনে অন্য কথা বলছিলেন. 'তোমরা কি চিজ্ তা আমি বুঝেছি। কিন্তু এবার তোমরা উচিত শিক্ষা পাবে। এমন শিক্ষা যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে হবে।'

১৮

চন্দ্রপুরের সরকারী আমলাদের মধ্যে সেরা হলো ম্যাকব্রাইড। লেখাপড়া জানা লোক বলে খ্যাতি আছে শহরে। তা ছাড়াও মানুষটা চিন্তাশীল এবং লোকের কাছে খাতির পায় সেইজন্যে। তবে লোকটার বিবাহিত জীবন বড় অসুখী। তাই জীবন সম্বন্ধে তার একটা নিজস্ব দর্শন আছে। দর্শনটা মানবিক নয়।

সেই অর্থে ম্যাকব্রাইডকে সিনিক বলা যায়, কারণ মানবপ্রেমী সে নয়। কিন্তু সিনিক হলেও ম্যাকব্রাইড অত্যাচারী শাসক নয় এবং কারণ না ঘটলে সে কারও প্রতি নির্দয়ও হয় না। আজিজকে ওরা যখন নিয়ে এল তখন ম্যাকব্রাইড তার সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করে নি। ভদ্রভাবেই জানিয়ে দিল যে জামিন না পাওয়া অব্দি আজিজকে হাজতে আটক থাকতে হবে। তবে আজিজের বন্ধুরা নিশ্চয়ই জামিনের ব্যবস্থা করছে। হাজত বাসের সময় আজিজের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবরা তার সঙ্গে দেখাও করতে পারে। ম্যাকব্রাইড পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে কিছু খবরের ভিত্তিতে আজিজকে সে গ্রেফতার করেছে। এর বেশি সে জানে না। তাছাড়া সে বিচারকও নয়। শেষ কথা বলার অধিকারও তার নেই। আজিজ কাঁদছিল। মানুষটার মানসিক নির্যাতন দেখে দুঃখিত হয়েছে ম্যাকব্রাইড। তবে ম্যাকব্রাইড জানে যে ভারতীয়দের এই চরিত্রহীনতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই কোন ভারতীয় সম্বন্ধেই সে অবাক হয় না। এ ব্যাপারে তার নিজস্ব একটা থীয়োরি আছে। তার ধারণা, ৩০ ডিগ্রি অক্ষরেখার দক্ষিণে যারা বাস করে তারা সবাই মনে মনে অপরাধী। তাদের এই অপরাধপ্রবণতা কখনও প্রকট কখনও সুপ্ত। এর জন্যে অবশ্য নেটীভরা দায়ী নয়। দায়ী তাদের পরিবেশ। 'আমরাও হয়ত ওদের মতন হতাম যদি এখানে পাকাপাকি বাস করতাম। আবহাওয়া-নির্ভর এই থীয়োরি তার নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত ছিল, কারণ তার জন্মস্থান করাচি। এবং এই অসঙ্গতিটা বিষণ্ণ একটু হেসে মেনেও নিয়েছে ম্যাকব্রাইড।

কথাবার্তা শেষ করে যখন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট লিখতে বসেছে ম্যাকব্রাইড, তখনই ফীলডিং ঘরে ঢুকলো। ম্যাকব্রাইড কিছুই গোপন করলো না। যা জানে সব বললো। ডেরেক আর মিস কোয়েস্টেড মুদকুল স্টেটের গাড়ি নিয়ে সোজা এখানে চলে আসে। দুজনেরই মানসিক অবস্থা ভয়ানক। ওদের এজাহারের ভিত্তিতেই আজিজের নামে পরোয়ানা বার করেছে ম্যাকব্রাইড।

'কিন্তু সঠিক অভিযোগটা কি?' জিজ্ঞেস করলো ফীলডিং।

ম্যাকব্রাইড গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, 'গুহার মধ্যে মিস কোয়েস্টেডকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেছিল আজিজ। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সে যখন এগোচ্ছিল তখন হাতের বড় দূরবীনটা দিয়ে মিস কোয়েস্টেড তাকে আঘাত করেন। আজিজ সেটা ধরে ফেলে। টানাটানিতে চামড়ার স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যায়। আর সেই সুযোগে মিস কোয়েস্টেড কোনরকমে পালিয়ে যান। আজিজের পকেট সার্চ করে দূরবীনটা আমরা পেয়েছি।'

'না। কখনই তা হতে পারে না। ব্যাপারটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিটে যাবে।' ফীলডিংএর কথাগুলো প্রায় আর্তনাদের মতন শোনাচ্ছিল তখন।

'কিন্তু প্রমাণ তো দূরবীনটা? ওটা দেখতে পারেন।'

স্ট্র্যাপটা সদ্য ছিঁড়েছে বোঝা যাচ্ছিল। অতএব সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে বলা যায় যে আজিজই অপরাধী।

'মিস কোয়েস্টেড আর কিছু বলেছেন?'
'হ্যাঁ। গুহার মধ্যে তখন শব্দ হচ্ছিল। মানে প্রতিধ্বনি। উনি তাতে ভয় পেয়ে যান। আপনি কি গুহার ভেতরে গেছেন?'
'গেছি। একটার মধ্যে। প্রতিধ্বনি হয় ঠিকই। তাতে ভয় পাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। ওঁর কি তাতেই স্নায়ুপীড়ন হয়েছে?'
'এত প্রশ্ন আমি করি নি। কারণ, মনের অবস্থা তাঁর ভাল নয়। তাছাড়া মামলায় তো এসব প্রশ্ন উঠবেই।' খানিক থেমে ম্যাকব্রাইড বললো, 'আমাদের ক্লাব থেকে মাড়াবার পাহাড়টা খুবই নিরীহ দেখায়। যতদূর জানি পুরো পাহাড়টাই, একসময় সমুদ্রের তলায় ছিল। ভয় পাবার কিছু আছে কি ওখানে? মানে অপ্রাকৃত কিছু?' ওদের কথার মধ্যেই চাপরাশী একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে গেল। উকিল মহম্মদ আলির নাম লেখা কার্ড। আজিজের তরফের উকিল। দেখা করতে চাইছে আজিজের সঙ্গে ম্যাকব্রাইড অনুমতি দিল তারপর ফীলডিংএর দিকে চেয়ে বললো, 'মিস্ ডেরেক অবশ্য খোলাখুলি আরও কিছু আমায় বলছে।'
ফীলডিং কৌতূহলী হয়ে ম্যাকব্রাইডের দিকে চেয়ে আছে। ম্যাকব্রাইড বলল, 'আপনি যখন গাড়ি থেকে নেবে ক্যাম্প খুঁজতে গেলেন, ঠিক তখনই কাউয়া দোল্ পাহাড়টার গা বেয়ে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পায় ডেরেক। তাকিয়ে দেখে কাঁটাগাছ আর বুনো ঝোপঝাড় মাড়িয়ে পাগলের মতন নেবে আসছেন মিস কোয়েস্টেড। তখন পুরোপুরি বেসামাল অবস্থা। রীতিমত বিপজ্জনক ভাবে পাহাড়ের গা বেয়ে নেবে আসছেন। ডেরেক তাড়াতাড়ি খানিকটা উঠে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললো। মিস কোয়েস্টেড তখন একেবারে ভেঙে পড়েছেন। মাথার টুপিটা খুলে পড়ে গেছে কোথায়.....'
'কোন গাইড সঙ্গে ছিল না?'
না। কয়েকটা কাঁটা গাছের মধ্যে উনি জড়িয়ে যান। হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিলেন। সময়মত ডেরেক গিয়ে ওঁকে উদ্ধার করে। ডেরেক তখনই না পৌঁছলে উনি হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়তেন পাহাড় থেকে। ওরা তারপর নিচে নেবে আসে গাড়ির কাছে। কিন্তু ভারতীয় ড্রাইভারকে দেখে উনি কিরকম যেন আতঙ্কিত হয়ে যান। ডেরেককে বলেন ওকে সরিয়ে দিতে। ডেরেক লোকটাকে তাই আপনার কাছে পাঠিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে সোজা এখানে আসে বন্ধুকে নিয়ে। তারপর আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা রিপোর্ট করে।' খানিক চুপ করে ম্যাকব্রাইড বলে, 'এই হলো সমস্ত ঘটনা। এর বেশি আমি কিছু জানি না। লোকটাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে ডেরেক বুদ্ধির কাজ করেছিল। আপনি কি বলেন?'
ফীলডিং হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, মিস কোয়েস্টেডের সঙ্গে আমার বোধহয় দেখা হওয়া সম্ভব নয়?'
'প্রায় না বললেই হয়।'
'আমার আশঙ্কা ছিল আপনি না বলবেন। কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার দরকার ছিল।'

'ঠিক দেখা করার মতন মনের অবস্থা ওঁর নেই। তাছাড়া আপনার সঙ্গে তো ওঁর তেমন আলাপও নেই।' বললো ম্যাকব্রাইড।

'তেমন আলাপ নেই। তবে......' একটু চুপ করে ফীলডিং আবার বললো, 'আমার ধারণা মহিলা মারাত্মক একটা ভ্রমের মধ্যে আছেন। হতভাগ্য ছেলেটা, মানে আজিজ, সত্যিই নিরপরাধ।'

ম্যাকব্রাইড বেশ অবাক হয়ে তাকাল ফীলডিংএর দিকে। মুখের ওপর দিয়ে একটা ছায়া সরে গেল যেন। ম্যাজিস্ট্রেটের নামে সই করা এজাহারাটা সামনেই পড়ে আছে। লিখিত ওই বয়ানটার দিকে তাকিয়ে ম্যাকব্রাইড বললো, 'আপনার অনুমানটা আমার জানা ছিল না ফীলডিং।'

ফীলডিং নিঃসংশয়ে বললো, 'দূরবীনের প্রমাণটা আমায় খানিকক্ষণের জন্যে ভাবিয়ে তুলেছিল ঠিকই। কিন্তু একটু পরেই মনে হলো যে কুমতলবে গুহার মধ্যে গিয়েছিল, সে কখনই পকেটের মধ্যে দূরবীনটা ঢুকিয়ে রাখবে না। অসম্ভব।'

'মোটেই অসম্ভব নয়। নেটীভরা যখন অপরাধ করে তখন তারা চরম নষ্ট চরিত্র হয়। তাদের ব্যবহার আচরণও অদ্ভুত হয়ে ওঠে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'কি করে বুঝবেন ? ক্রাইমের কথা হলেই ইংরেজদের ক্রাইম-বৃত্তির কথা মনে হবে আপনার। কিন্তু এ দেশের অপরাধ-বৃত্তির ধরন আলাদা। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, লোকটা যখন পাহাড় থেকে নেবে আপনার সঙ্গে দেখা করল, তখন সে একেবারে ভালমানুষ। এটাই এদের স্বাভাবিক চরিত্র। মিউটিনির রেকর্ডগুলো যদি পড়েন, তবে মনে হবে ভগবদ্গীতা না হলেও যেন বাইবেল পড়ছেন—এত সব ভাল ভাল তত্ত্বকথা সেখানে আছে। অবশ্য আমি নিশ্চিত জানি না একটার সঙ্গে অন্যটা মেলান ঠিক হচ্ছে কি না! আমার মতামতগুলো খুব খারাপ লাগছে—তাই না ?' একটু চুপ করে ম্যাক-ব্রাইড ফের বললো, 'ফীলডিং! আপনি পেশায় শিক্ষক। আপনার কাছে যারা পড়তে আসে তাদের ভাল দিকটাই আপনি দেখেন। কিন্তু এটা আপনার ভুল শিক্ষা। তাছাড়া ছেলেবেলায় সবাই মোটামুটি সৎ থাকে। কিন্তু আমি যখন তাদের দেখি, তারা তখন বড়সড় মানুষ এবং অল্পবিস্তর অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠেছে। একটা ছোট্ট প্রমাণ দেখাই আপনাকে।' এই বলে আজিজের পকেট-কেস থেকে একটা চিঠি বের করল ম্যাকব্রাইড। তারপর ফীলডিংএর দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি ওর কাগজ-পত্তর সব ঘেঁটে দেখেছি। ভাল বা মহৎ বলতে যা বোঝায় সে সব কিছুই দেখলুম না। তবে চিঠিটা পেলুম।'

'কি আছে চিঠিতে ?'

'আজিজের এক বন্ধুর লেখা চিঠি। কলকাতা থেকে লিখেছে। লোকটা সেখানে একটা বেশ্যালয় চালায়। শুনবেন একটু ?'

'না। ব্যক্তিগত চিঠি শোনার প্রবৃত্তি আমার নেই ?'

স্পষ্ট করে জবাব দিল ফীলডিং।

'কিন্তু প্রমাণ হিসেবে এটা আমায় কোর্টে দাখিল করতে হবে। কারণ, এটাই হবে লোকটার নৈতিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত। কলকাতার সেই বন্ধুকে দিয়ে লোকটা মেয়েছেলে যোগাড় করে, তা জানেন?'

'চুপ করুন। চুপ করুন।' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ফীলডিং।

ফীলডিংএর আর্তনাদ শুনে ম্যাকব্রাইড যেন থমকে গেল। তার ধারণাগুলো এই মানুষটা যেন ওলোটপালট করে দিচ্ছে। ম্যাকব্রাইড জানত যে দুজন সাহেব একত্র হলে নেটীভদের কেচ্ছা খুঁড়ে তোলাই প্রধান কর্তব্য মনে করে। তাই ফীলডিংএর আপত্তির ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। বলল, 'আমি জানি এসব শুনতে ভাল লাগছে না আপনার। যারা এসব করে তাদের আপনি ক্ষমা করতেন না। অবশ্য আমার কথা আলাদা। কারণ, এককালে আমিও ওদের মতন ছিলুম।'

পুলিশ সাহেবের অতীতটা বোঝা গেল। কিন্তু আলাপের মতিগতিটা পুলিশ সাহেবেরও পছন্দ হচ্ছিল না। বিশেষ করে ফীলডিংএর পরের প্রশ্নটা একেবারে অপ্রত্যাশিত মনে হল। ম্যাকব্রাইডকে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, 'আপনি নিশ্চিতই বলছেন যে মিস কোয়েস্টেডের সঙ্গে দেখা করা যাবে না?'

'কিন্তু কেন আপনি দখো করতে চাইছেন তা তো আমায় বলেন নি?'

'যদি ক্ষীণ কোন সম্ভাবনা থাকে তাঁর অভিযোগ তুলে নেবার। অন্তত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্টটা পাঠাবার অগেও যদি দেখা করা যেত, তাহলে হয়ত মামলাটা ঠেকান যেত। নয়ত সব চেষ্টাই বিফল হবে। শুনুন মিস্টার ম্যাকব্রাইড, আর আপত্তি করবেন না। একটা ভাল কাজ অন্তত করুন। কাজটা কিছুই নয়। আপনার স্ত্রী বা মিস ডেরেককে টেলিফোন করে জানুন, দেখা করা যাবে কি না। এতে আপনার কিছু যাবে আসবে না।'

একটু ভাবল ম্যাকব্রাইড। তারপর টেলিফোনের দিকে হাতটা বাড়াতে বাড়াতে বলল, 'ফোন আমি করছি। কিন্তু বিশেষ কাজ হবে না। দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারটা ঠিক করছেন মেজর ক্যালেণ্ডার, কারণ তিনিই এখন মিস কোয়েস্টেডের চিকিৎসা করছেন।'

কিন্তু ফীলডিং তখন মরিয়া। বলল, 'আমি জানি তিনি রাজি হবেন না। তবুও ফোন করুন।'

অবাক হলেও ম্যাকব্রাইড ফোন করল। প্রত্যাশিত জবাবই এল সঙ্গে সঙ্গে। মেজর ক্যালেণ্ডার চান না তাঁর রুগীকে এখন কেউ বিরক্ত করুক। ফীলডিং স্তব্ধ। একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, 'আমি শুধু মিস কোয়েস্টেডের কাছে জানতে চাইতুম গুহার মধ্যে তিনি নিশ্চিতভাবে আজিজকে চিনতে পেরেছিলেন কিনা!'

'বোধহয় আমার স্ত্রী একথাটা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন।'

'কিন্তু আমি নিজে তাঁকে একথাটা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'তাতে তফাৎটা কি হবে?'

'তফাৎ আছে। মিস কোয়েস্টেড এখন যাদের সঙ্গে আছেন তারা কেউ-ই

ভারতীয়দের সৎ বলে মনে করে না।'

'কিন্তু তিনি তো নিজের কথাই বলবেন। তাই না?'

'তা জানি। কিন্তু তিনি যা বলেছেন তা আপনাদের কাছেই বলেছেন!'

ম্যাকব্রাইড ভুরু কুঁচকে তাকাল ফীলডিংএর দিকে। বিড়বিড় করে বলল, 'অদ্ভুত জটিল মানুষ দেখছি! যাক সে কথা। শুনলেন তো, ক্যালেণ্ডার অনুমতি দিল না। কারণ মিস কোয়েস্টেড এখনও বিপদমুক্ত হন নি।'

ফীলডিং চুপ। ম্যাকব্রাইডও নিঃশব্দ। ইতিমধ্যে আর একটা কার্ড এসে পৌঁছল ম্যাকব্রাইডের কাছে। এবার বন্দীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হামিদ্‌উল্লা। অর্থাৎ বিপক্ষ দলও যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে। কথাটা মনে হতেই ম্যাকব্রাইড বলল, 'ফীলডিং, এ রিপোর্টটা আমি এখুনি পাঠাতে চাই।'

'না পাঠালেই ভাল করবেন।' বলল ফীলডিং।

'কিন্তু কেন পাঠাতে বারণ করছেন?'

'আমার ধারণা আমরা সবাই সর্বনাশের দিকে ছুটে যাচ্ছি মিস্টার ম্যাকব্রাইড। এর ফল মোটেই ভাল হবে না। আচ্ছা! আপনার বন্দীর সঙ্গে আমি বোধ-হয় দেখা করতে পারি?'

একটু দ্বিধা করে ম্যাকব্রাইড বলল, 'এখন ওর নিজের লোকজনের সঙ্গে ও দেখা করবে।'

'ওদের পর।'

'বেশ, আপনি ওদের আগেই যাবেন। কিন্তু কি লাভ? কেন নিজেকে এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলছেন?'

'আমি বলছি আজিজ নির্দোষ।' বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল ফীলডিং।

'নির্দোষ হোক আর দোষী হোক, আপনার কি? আপনি কেন এর মধ্যে আসছেন?'

ফীলডিং চেঁচিয়ে উঠল। বলল, 'ও ভগবান! কেন বাধা দিচ্ছেন সবেতে? কেন বুঝছেন না, একজন মানুষের মাঝে মাঝে যাচাই করে দেখতে ইচ্ছে করে যে সে বেঁচে আছে কি না? অন্তত আমার ইচ্ছে করে। মিস কোয়েস্টেডের সঙ্গে দেখা করত পারব না। হয়ত আজিজের সঙ্গেও দেখা হবে না। আজিজকে কথা দিয়েছিলুম, তাকে নিয়ে আপনার কাছে আসব। কিন্তু তাও হলো না। ঠিক আসার সময়েই টার্‌টন্‌ আমায় ডেকে পাঠালেন।'

ম্যাকব্রাইড হঠাৎ যেন আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল। বলল, 'টার্‌টন্‌ যা করেছেন তা আমাদের স্বার্থের কথা ভেবেই করেছেন। আমি তাঁকে দোষ দিতে পারি না।' তারপর টেবিলের ওপাশ থেকে ফীলডিংএর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল ম্যাকব্রাইড। আবেগভরে বলল, 'আপনার চেয়ে এদেশে আমি বেশিদিন চাকরি করছি। এ দেশটা কতখানি বিষাক্ত তা আপনার জানা নেই। আমি বলছি শুনুন, সামনে যে দিনগুলো আসছে সেগুলো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দিন। চন্দ্রপুরের সাধারণ জীবনযাত্রা খুব খারাপ হয়ে উঠবে।'

'সে কথা একটু আগে আমিও বলেছি।' বলল ফীলডিং।

অসহিষ্ণু হয়ে উঠল ম্যাকব্রাইড। বলল, 'বলেছেন মানছি। কিন্তু এইরকম অবস্থায় ব্যক্তিগত মতামতের কোন দাম নেই। একটা লাইন ধরে সবাইকে এগোতে হবে। যে তা করবে না, সে হারিয়ে যাবেই।'
ফীলডিং তীক্ষ্ণ চোখে চেয়েছিল। বলল, 'আপনি কি বলতে চান আমি তা বুঝেছি।'
'না। সবটুকু বোঝেন নি। লাইন যে ধরবে না সে নিজে মরবে তার সহযাত্রীদেরও মারবে। শুনুন ফীলডিং, লাইন থেকে বেরিয়ে গেলে যে ফাঁক হবে সেগুলোই খুঁজে বেড়াচ্ছে এই শেয়ালের দল।' উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠল ম্যাকব্রাইড তারপর টেবিলের ওপর পড়ে থাকা সাক্ষাৎপ্রার্থীদের কার্ডগুলো ইঙ্গিতে দেখাল। কিন্তু ম্যাকব্রাইডের এই অসহিষ্ণুতার কোন দামই দিল না ফীলডিং। চোখে চোখ রেখে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আজিজের সঙ্গে দেখা করতে পারি ?'
'না।' প্রায় হুঙ্কার দিল ম্যাকব্রাইড। এখন সে কালেক্টর টারটনের মনের ভাব জেনে গেছে। এটুকু বুঝেছে যে ফীলডিং লাইন ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। সুতরাং নির্দ্বিধায় ম্যাকব্রাইড' বলল, 'ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার নিয়ে আপনি দেখা করতে পারেন। তবে আমার দায়িত্বে বলছি এই দেখা করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এর ফলে ঘটনা আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।'
ফীলডিং চুপ করে ভাবছিল। তার মনে হল সে যদি দশ বছরের ছোট হত বা এই দেশটায় দশ বছর বেশি থাকত, তাহলে হয়ত ম্যাকব্রাইডের উপদেশটা সে মেনে নিত। কিন্তু এখন সে পারবে না। সুতরাং সরাসরি ম্যাকব্রাইডের দিকে চেয়ে ফীলডিং বলল, 'অর্ডারের জন্যে কার কাছে দরখাস্ত করতে হবে ?'
'সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।'
ইতিমধ্যে আজিজের বাংলো থেকে আরও সাক্ষ্য প্রমাণ খুঁজে এনেছে একজন সার্জেন্ট। যুদ্ধজয়ী বীরের মতন দেখাচ্ছিল সার্জেন্টটাকে। সেগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা ছবি পেল ম্যাকব্রাইড। মহিলার ছবি। উল্লসিত হল ম্যাকব্রাইড। বলল, 'বাঃ! মেয়েমানুষের ছবি দেখছি!'
আহত হল ফীলডিং। বলল। 'উনি আজিজের স্ত্রী।'
'কি করে জানলেন ?'
'আমায় বলেছে আজিজ।'
ম্যাকব্রাইড মৃদু হাসল। অবিশ্বাসের হাসি। ড্রয়ারের জিনিসপত্তর ওলটপালট করে আরও প্রমাণ খুঁজছিল সে। ফীলডিং তাকিয়েছিল। কেমন যেন পাষণ্ডের মতন দেখাচ্ছে মানুষটাকে। ম্যাকব্রাইড তখন মনে মনে ভাবছিল, 'আজিজ, ছোকরা খুব চালু। মেয়েছেলেকে বউ বলে চালাতে চায়। এমন বউ সে অনেক দেখেছে।' মুখে অবশ্য অন্য কথা বলল। ফীলডিংএর দিকে চেয়ে সুন্দর করে হেসে বলল, 'আপনি আসুন ফীলডিং। আমাকে এবার যেতে হবে। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন। আমাদের সকলের মঙ্গল করুন।'
হঠাৎ মন্দিরে কাঁসর ঘন্টা বেজে ওঠায় ফীলডিং অবাক। অসময়ে কেন ? তবে কি ম্যাকব্রাইডের প্রার্থনা শুনতে পেয়েছেন হিন্দু বিগ্রহ ? হবেও বা।

১৯

পর্নলিশ সর্নপারের ঘর থেকে বেরিয়ে যার সঙ্গে ফীলডিংএর প্রথম দেখা হল সে হামিদ্‌উল্লা। সর্নপার সাহেবের বাংলোর বাইরে অপেক্ষা করছিল হামিদ। ফীলডিংকে দেখেই সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়াল। হামিদ্‌উল্লাকে দেখে ফীলডিংও খর্নশি। সাগ্রহে বলল, 'সবটাই ভুল।'

'তেমন কিছর্ন প্রমাণ পেলেন?' ফীলডিংও সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

ফীলডিং ততক্ষণে হামিদ্‌উল্লার হাত দর্নটো জড়িয়ে ধরেছে। সেই অবস্থাতেই বলল, 'পাই নি। তবে পাব।'

'যাক্‌। অনেকখানি ভরসা দিলেন মিস্টার ফীলডিং। তবে কি জানেন? যখন কোন ভারতীয় গ্রেফতার হয় তখন জল অনেক দর্নর গড়ায়। এর শেষ কোথায় হবে কে জানে!' হামিদ্‌উল্লা আরও বলল, 'সকলের সামনে আপনি আমায় যা বললেন তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু ওই সিটি ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের পাত্তা দেন না। সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া লোকটা কিছর্নই মানতে চায় না। আচ্ছা! আজিজের সঙ্গে দেখা করার দরখাস্তটা দেখে ম্যাকব্রাইড বিরক্ত হন নি তো? এর দরর্নন আজিজের কোন ক্ষতি হবে না তো? তেমন বর্নঝলে দরখাস্তখানা ফিরিয়ে নিতুম।'

ফীলডিং অবাক। বলল, 'বিরক্ত হয় নি বলেই মনে হয়। আর বিরক্ত হলেই বা কি হত?

হামিদ্‌উল্লা রীতিমত সন্ত্রস্ত। বলল, 'সে কি কথা? এদেশে আমাদের বাস করতে হবে না?'

হামিদ্‌উল্লা খেলো মানর্নষ নন। ক্যামব্রিজের ডিগ্রিধারী মানর্নষটি পেশায় আইনজ্ঞ। সামাজিক একটা প্রতিষ্ঠা আছে তার। এইরকম একটা মানর্নষও যেন ফীলডিংএর সব ভাবনাচিন্তা বিশর্নংখল করে দিচ্ছে। তাছাড়া আজিজকে ভালওবাসে হামিদ। এও হয়ত জানে, আজিজের নামে যে কলঙ্ক রটেছে তা আজিজের পাওনা নয়। তবর্নও মনে মনে পর্নরোপর্নরি বিশ্বাস করে না হামিদ্‌উল্লা, আর সেইজন্যেই প্রমাণ সাক্ষী নীতিবোধ এই সব আবোল তাবোল বকছে। হামিদ্‌উল্লার মনের এই সংশয়ের জন্যে ফীলডিংও বিষণ্ন বোধ করছিল। তার নিজেরও দর্ন-একটা ব্যাপারে দর্নশ্চিন্তা আছে। দর্নরবীন আর গাইডের ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবনা হচ্ছিল ফীলডিংএর। কিন্তু দর্নর্ভাবনাটাকে মনের গভীরে সংক্রমিত হতে দিল না ফীলডিং। উদ্দেশ্য একটাই। আজিজ যে নির্দোষ তা প্রমাণ করতে হবে আগে। যারা তাকে দোষী মনে করে তারা ভুল। কিন্তু তাদের এই ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করা সম্পর্নর্ণ অর্থহীন, কারণ তারা মানবে না। এখন এদেশের মানর্নষদের সঙ্গে তার ভাগ্য জড়াতে গিয়ে ফীলডিং বর্নঝতে পারছে যে তার ও এদের-মধ্যে

কি দুস্তর ব্যবধান। এরা সব সময়েই হতাশ, ভগ্নমনোরথ। কাজের মধ্যেও সেই নৈরাশ্য। পুলিশ দেখে পালিয়ে যেতে গেল আজিজ। মহম্মদ লতিফ এমন হতাশ হয়ে পড়ল যে তার চোখের সামনেই জিনিসপত্তর লুটপাট হয়ে গেল সব। আর হামিদ্উল্লা! রাগ বিদ্বেষ হারিয়ে মানুষটা যেন ইঁট কাঠের মতন জড় হয়ে গেছে। কিন্তু এরা এমন নির্জীব কেন? কেন নির্ভয়চিত্ত হতে পারে না? ভারতীয়রা কি স্বভাবভীরু? ঠিক তা নয়। কোন কাজেরই আরম্ভটা ওদের ভাল হয় না। তখন মাঝে মাঝে তাদের উজ্জীবিত করতে হয়। আসলে এতবড় জাতিটার সর্বস্তরেই ভয়। ব্রিটিশরাজ একেই মূলধন করে তার ইমারত গড়েছে। ফীলডিং যে এদের মনে সমাদরের ঠাঁই পেয়েছে তার কারণ অজান্তেই এরা তাকে ভালবেসেছে। যা হোক, হামিদ্উল্লাকে বোঝাবার চেষ্টা করল ফীলডিং। বলল, ভেঙে পড়লে চলবে না। জয় করে ভয় ভাঙতে হবে। নয়ত সাফল্য আসবে না। ফীলডিং-এর কথা শুনে হামিদ্-উল্লাও মনে মনে উজ্জীবিত হলো। তার মনে হলো অকারণে সে ভেঙে পড়ছিল। লাইন ছাড়লে ফাঁক সৃষ্টি হবে বলে ম্যাকব্রাইড যে মন্তব্য করেছিল ফীলডিং তা হাতেনাতে প্রমাণ করল হামিদ্উল্লাকে উদ্দীপ্ত করে।

'আমাদের প্রথম কাজ হবে জামিনের ব্যবস্থা করা।' ফীলডিং বলল। তার ইচ্ছে সেদিনই দরখাস্ত পেশ করা হোক। এর দরুন যে জামিননামা দেওয়া দরকার তা সে-ই দেবে। হামিদ্উল্লার অন্যরকম ইচ্ছে। সে নবাব বাহাদুরকেও এর মধ্যে জড়িয়ে রাখতে চায়।

'কিন্তু তাঁকে এর মধ্যে টানা কেন?' ফীলডিং বলল।

শুধু তিনি কেন, হামিদ্উল্লা চাইছিল আরও অনেক মানুষ এর মধ্যে আসুক। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তারা এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকুক। তার লক্ষ্য হলো হিন্দু মুসলমানদের এক ছাতার তলায় টেনে আনা। তার ফলে সংগ্রামের ক্ষেত্র ব্যাপক হবে। তাদের নিরাপত্তাবোধ বাড়বে। তাই কলকাতা থেকে হিন্দু ব্যারিস্টার অমৃত রাওকে আনতে চাইছিল হামিদ্উল্লা। ব্যবহার-জীবী হিসেবে অমৃত রাও খুব সফল মানুষ। যথেষ্ট সুনাম তাঁর। তাছাড়া ঘোর ইংরেজবিদ্বেষী। আরও একটা কারণ হলো যে স্থানীয় মানুষ নন বলে এখানকার মানুষজন তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না।

ফীলডিং ইতস্তত করছিল। এ যেন যুদ্ধের হুমকি। কিন্তু লক্ষ্য তো আজিজকে মুক্ত করা! যুদ্ধ করা নয়। জাতিবিদ্বেষ যত কম ছড়ান যায় ততই ভাল। অমৃত রাওয়ের নাম সে ক্লাবে শুনেছে। লোকটার ইংরেজবিদ্বেষের কথা সবাই জানে। এমন মানুষকে নিয়োগ করার অর্থ হলো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। কিন্তু হামিদ্উল্লা তা মানতে চাইল না। সে বলল, 'এই-রকম লোকই আমাদের দরকার। সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই না করলে আজিজকে কলঙ্কমুক্ত করা যাবে না। যখন দেখলুম একজন পুলিশকে দিয়ে আজিজের ব্যক্তিগত কাগজপত্তর নিয়ে যাচ্ছে, তখনই মনে মনে ভেবে নিয়েছি যে অমৃত রাওকেই আমাদের প্রয়োজন।'

দুজনেই চুপ। যেন শোকস্তব্ধ ওরা। দীর্ঘ কঠিন দুপুরটা সবে শেষ হয়েছে।

এখন অপরাহ্ন। মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা সমানে বেজে চলেছে। অত্যন্ত কর্কশ শোনাচ্ছিল শব্দটা। রাজশক্তির শাসনের চাকা অবিরাম ঘুরে চলেছে। আর সেই ঘূর্ণন অব্যাহত রাখতে একজন অশ্বারোহী দূত পুলিশ সাহেবের কুঠি থেকে সই করা রিপোর্ট নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোর দিকে ছুটে গেল। চন্দ্রপুরের ধুলোর মধ্যে অশ্বারূঢ় দূতের দেহটা মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়েছিল ফীলডিং। লোকটা অদৃশ্য হবার পর হামিদ্-উল্লার কাছে এসে দাঁড়াল ফীলডিং। তারপর অনুরোধের সুরে বলল, 'ঘটনাকে নিজের গতিতেই চলতে দিন হামিদ্উল্লা। অযথা জটিল করার দরকার নেই। আমরা জিতবোই। মিস কোয়েস্টেড অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবেন না।'

ফীলডিংএর কথাটা হামিদ্উল্লাকে যেন নতুন করে উদ্দীপ্ত করল। অকপট ভাবেই সে বলে উঠল, 'সত্যি! বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে ইংরেজের জুড়ি নেই।'

ফীলডিংও খুশি। বলল, 'আমি তাহলে এখন আসি হামিদ্উল্লা। আজিজকে আমার প্রীতি শুভেচ্ছা দেবেন। তাকে বলবেন যেন দুশ্চিন্তা না করে। আমি কলেজেই থাকব। দরকার হলে টেলিফোন করবেন। না পারলেও ক্ষতি নেই। কলেজে আজ সারাদিনই ব্যস্ত থাকব।'

'ধন্যবাদ ফীলডিং। আপনি তাহলে আমাদের দিকেই থাকছেন তো?'

'নিশ্চয়ই।' বলল ফীলডিং।

বলল বটে, কিন্তু মনে মনে এই দলবদলের ব্যাপারে খুব অশান্তি হচ্ছিল ফীলডিংএর। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে যাবার সময় কুলোর বাতাস নিয়ে যেতে সে চায় না। তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্টের অভিযোগ আনলে সেটা তার কাছে বাঞ্ছনীয় হবে না। সে জানে এখন থেকে তার জাতের লোকজন তাকে বিদ্রোহী মনে করছে—ভাবছে ব্রিটিশ স্বার্থের বিরোধী সে। অবশ্য কিছু যাবে আসবে না তাতে। কিন্তু তার মহৎ উদ্দেশ্যটা খাটো হয়ে যাবে এই অপপ্রচারে। শুধু তাই নয়, অকারণ আবর্ত সৃষ্টি হবে। ইতিমধ্যেই ছোট ছোট অনেক গ্রন্থি সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলো শিথিল না হয়ে ক্রমেই বড় হচ্ছে। তবে আবর্ত দেখে সে ভয় পায় না। কারণ তার মন স্বাধীন এবং যে কোন প্রতিরোধকেই স্বাধীনভাবে মোকাবিলা করার শিক্ষা তার আছে।

তার দিনটা শেষ হলো গড়বোলের সঙ্গে অর্থহীন আলোচনার মধ্যে। আলোচনার যেন শেষ নেই। বেশিটাই সর্পঘটিত। কয়েক সপ্তাহ আগে একটা বিষধর সাপের আবির্ভাব হয়েছিল একজন পার্শী মাস্টারমশাইয়ের ক্লাস রুমে। মাস্টারমশাইটির তেমন সুনাম নেই। জনপ্রিয় শিক্ষকও সে নয়। তবুও অভিযোগটা মন দিয়ে শুনতে হচ্ছিল ফীলডিংকে। এই কলেজের সে প্রিন্সিপ্যাল। তাছাড়া রাসেল ভাইপার খুব বিষধর সাপ। কেমন করে এমন বিষধর সাপের আবির্ভাব হলো বা কবে সেটি প্রথম দেখা যায়, এসব তর্কে গেল না ফীলডিং। গড়বোলের সব কথাটাই মন দিয়ে শুনল। তবে কান

খোলা রাখলেও শ্রুতি তঞ্চকতা করেছিল ফীলডিংএর সঙ্গে। মন তখন অন্য ভাবনায় আকুল। ফীলডিং ভাবছিল আজিজের ব্যাপারে মিস কোয়েস্টেডের কাছে সে কোন অনুরোধপত্র লিখবে কি না। ঠিক তখনই গড়বোলের সর্প-বৃত্তান্ত শেষ হলো, এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিনীত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'তাহলে স্যার আমি কি এখন আসতে পারি?' ফীলডিং বুঝতে পারল যে আলোচনা তখনও সমাপ্ত হয় নি এবং বৃদ্ধ গড়বোলের শেষ কথাটা তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। অভিজ্ঞ ফীলডিং তাকিয়েছিল গড়বোলের দিকে। একটু অস্বস্তি হচ্ছিল বৃদ্ধের। তবুও বললেন, 'শেষ পর্যন্ত আপনি মাড়াবার অব্দি পৌঁছেছিলেন শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। আমার জন্যেই আপনি ট্রেন মিস করলেন। নিজেকে তাই অপরাধী মনে হচ্ছিল সকাল থেকে। ভাগ্যিস মিস ডেরেকের গাড়িটা ছিল, তাই কোনরকমে পৌঁছতে পারলেন' তা, আপনাদের অভিযানটা নিশ্চয়ই উপভোগ্য হয়েছিল?'

ফীলডিং ঠায় চেয়েছিল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দিকে। সেই ভাবেই বলল 'মনে হচ্ছে আপনি শোনেন নি?',

'নিশ্চয়ই শুনেছি।'

'না, শোনেন নি।' একটু চুপ করে ফীলডিং ফের বলল, 'আজিজের খুব বিপদ। শুনেছেন সে কথা?'

'হ্যাঁ শুনেছি।'

'তাহলে বলুন, যেখানে এমনটি ঘটে সেই অভিযানকে উপভোগ্য বলা চলে কি?'

'তা বলতে পারব না। কারণ আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না।'

ফীলডিং তখনও তাকিয়ে ছিল। জটিল চরিত্রের এই মানুষটির মনের গহ্বর থেকে কিছু একটা খুঁড়ে আনার চেষ্টা করছিল ফীলডিং। কিন্তু বৃথাই তার চেষ্টা। তার মনে হলো কোন সন্ধানী দৃষ্টিও এই অতলতার সন্ধান পাবে না। তবুও এই মানুষটির মন আছে, হৃদয় আছে এবং অনেকেই না জেনে তাঁর ওপর ভরসা করে। চেয়ে থাকতে থাকতে ফীলডিং হঠাৎ বলল, 'আমি একটা ভয়ঙ্কর ত্রাসের মধ্যে আছি মিস্টার গড়বোলে।'

ঘরে ঢুকেই তা টের পেয়েছি আমি।' বললেন গড়বোলে। আরও বললেন, 'তাই আপনাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না। তবে আমার ব্যক্তিগত একটা সমস্যা আমায় বড় পীড়া দিচ্ছে। সেই ব্যাপারে আপনার একটু সাহায্য চাই।'

'বলুন!'

'আপনি তো জানেন শীগগিরই আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি?'

'জানি। দুঃখিত।'

'আমি ঠিক করেছি মধ্যভারতে আমার জন্মভূমিতে ফিরে যাব এবং লেখাপড়া শেখাব। একটা হাই স্কুল খোলবার ইচ্ছে আছে। ইংরিজি মাধ্যম স্কুল। এখানকার সরকারী স্কুলের মতন।'

'বেশ তো।' বলল ফীলডিং। আগ্রহ না থাকলেও তাকে দেখাতে হচ্ছিল।

'আমার দেশ মউতে একটাই স্কুল আছে। দিশি ভাষার ইস্কুল। সেটাকে

বদলে ইংরিজি স্কুল করার ইচ্ছে আছে। মহামান্য লাটসাহেবের কাছে আবেদন করব যাতে আমাদের জেলা শহরে তিনি একটা সরকারী স্কুল খোলার অনুমতি দেন। যদি সম্ভব হয় তবে সব পরগণাতেই এইরকম স্কুল খোলার ইচ্ছে আছে।'

দুহাতে মাথা ধরে মাটির দিকে তাকাল ফীলডিং। সত্যি, ভারতীয়রা মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে।

গড়বোলে কিন্তু দৃকপাতহীন। নিজের মনেই কথা বলে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'আপনার কাছে কেন এসেছি জানেন? আমার স্কুলের একটা নামকরণ করে দিন। বেশ চমৎকার একটা নাম।'

'স্কুলের নামকরণ?' স্তম্ভিত হয়ে গেছে ফীলডিং। রীতিমত অসুস্থ বোধ করতে লাগল সে, ঠিক যেমনটি হয়েছিল ওয়েটিং রুমে ঢুকে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা নাম। সাধারণের কাছে একটা পরিচয় দিতে হবে তো, নইলে লোকে চিনবে কি করে?'

'মিস্টার গড়বোলে! আমায় ক্ষমা করবেন। এখন হতভাগ্য আজিজ ছাড়া আমার মাথায় আর কোন চিন্তা নেই। আপনি কি জানেন না যে হতভাগ্য মানুষটা জেলে বন্দী হয়ে আছে?

'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি। তবে এখুনি আপনার জবাব চাইছি না। অবসর সময়ে আমার কথাটা একটু ভাববেন, তাহলেই হবে। দুটো কি তিনটে নাম। যেমন ধরুন, "মিস্টার ফীলডিং হাই স্কুল", কিংবা "মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ হাই স্কুল"—এইরকম একটা কিছু।

অসহিষ্ণু ফীলডিং চেঁচিয়ে উঠল বিতৃষ্ণায়। 'গড়বোলে!'

বৃদ্ধ গড়বোলে চকিতে হাত দুটো জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত ধূর্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। ফীলডিং তাঁর চোখের দিকে চেয়েছিল। বলল, 'আজিজ নিরপরাধ না অপরাধী?'

'আজ্ঞে, সেটা তো আদালতের বিচার্য বিষয়। তবে এটা ঠিক যে প্রমাণ-সাক্ষী যেমন দেবেন, তেমনি আদালতের রায় হবে।'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। তা জানি। কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত মত কি? আমরা দুজনেই মানুষটাকে চিনতাম। পছন্দ করতাম। শ্রদ্ধা পাবার মতন স্বভাব তার। শান্ত-শিষ্ট মানুষ। নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যেত। এখন বলুন, এইরকম একজন মানুষ অপরাধ করতে পারে কিনা?'

'এটা আলাদা প্রশ্ন এবং প্রশ্নটা বেশ কঠিন। আমাদের দর্শনেও প্রশ্নটা কঠিন।' বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ করে কথাগুলো বলছিল গড়বোলে। ফীলডিং উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়েছিল। গড়বোলে বলে চলল, 'ডাক্তার আজিজ যোগ্য লোক, কাজের লোক। তার ওপর আমার অঢেল শ্রদ্ধা। কিন্তু আপনার প্রশ্নটা অন্যরকম। একজন মানুষের পক্ষে ভাল বা মন্দ কাজ করা সম্ভব কি না। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন।' ফীলডিং অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বলল, 'আমি জানতে চেয়েছিলুম আজিজ নামে মানুষটা এ কাজ করছে কি না! বুঝেছেন এবার? আমি মনে করি এ অপরাধ সে করে

নি। সুতরাং এখান থেকেই আমি আমার অনুসন্ধান শুরু করেছি। আশা করছি, দিন কয়েকের মধ্যেই আমার ব্যাখ্যার জবাব পাব। আমার শেষ অনুমান হলো যে গাইডটা শেষ পর্যন্ত ওঁদের সঙ্গে ছিল। মিস কোয়েস্টেড যে বিদ্বেষবশত অভিযোগ করেছেন তা নয়। যদিও হামিদ্উল্লা সেইরকমই মনে করে। ভয় পাবার কারণ নিশ্চয়ই ঘটেছিল। কিন্তু কি সেটা ? বলতে পারেন ? ও! আপনার কাছে তো আবার ভালমন্দ আলাদা নয়!'

'না। ঠিক তা নয়। আমাদের দর্শন বলে যে বিচ্ছিন্নভাবে কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। যখন একটা ভাল কাজ অনুষ্ঠিত হয় তখন সবাই ভাল কাজ করে। আবার যখন একজন একটা মন্দ কাজ করে, তখন মন্দ কাজের মিছিল শুরু হয়। যেমন ধরুন এই ঘটনাটা। আমি শুনেছি মাড়াবার পাহাড়ের গুহায় একটা অন্যায় কাজ হয়েছিল। যার দরুন একজন ইংরেজ মহিলা দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমার ধারণা কুকর্মটি ডাক্তার আজিজ করেছিলেন।' গড়বোলে চুপ করলেন। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে আবার বললেন। 'সেই গাইডটাও এ কাজ করতে পারে। এমন কি আপনি পারেন, আমি পারি, আমার ছাত্ররাও পারে এ কাজ করতে।' গড়বোলে আবার চুপ করলেন। দুঃসাহস, ধৃষ্টতা, লজ্জা সব মিলিয়ে মানুষটাকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এমনও হতে পারে যে মহিলা নিজেই এ কাজটা করেছেন। আসল কথা হলো, যখন কোথাও অন্যায় সংঘটিত হয় তখন বিশ্ব-জুড়ে তার প্রতিক্রিয়া হয়। তেমনি যখন কোন সৎকাজ হয়..... '

'অথবা কেউ যখন দৈহিক বা মানসিক যাতনা ভোগ করে।' বিরক্ত ফীলডিং গড়বোলেকে থামিয়ে বলে উঠল। গড়বোলের অনুমাননির্ভর দার্শনিক ব্যাখ্যায় ফীলডিংএর পায়ের তলায় মাটি যেন আলগা হয়ে গেছে। তার দরকার শক্ত মাটির অবলম্বন। সে দৃঢ়ভাবে বলল, 'অর্থাৎ যখন সবকিছুই একটা যা হোক কিছু কিংবা কিছুই কিছু না এই তো?'

গড়বোলে তখন উদ্‌ভ্রান্তের মতন নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। বললেন, 'আমরা কিন্তু ফের আলোচনার কেন্দ্র থেকে সরে যাচ্ছি মিস্টার ফীলডিং। আমরা ভাল মন্দ, সৎ অসৎ নিয়ে আলোচনা করছিলুম। যাতনা বা ক্লেশ-- ভোগ হলো ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপার। কোন যুবতী মহিলা যদি অসুস্থ হন তাতে পৃথিবীর কিছু যাবে আসবে না। এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা—মহিলার নিজস্ব অনুভূতি। যদি তিনি ভাবেন কষ্ট নেই, তাহলে নেই। সেখানেই মিটে গেল ব্যাপারটা। কিন্তু সৎ-অসৎ বা ভাল-মন্দর ব্যাপারটা অন্যরকম। তাদের সম্বন্ধে আমরা কে কি ভাবলাম সেটা বড় কথা নয়। তারা যেমন আছে তেমনি থাকবে এবং আমরা সবাই কিছু না কিছু তাতে যোগ করে যাব।'

'তার মানে আপনি বলছেন যে ভাল বা মন্দ আলাদা নয়। তারা এক এবং অভিন্ন।'

'মাপ করবেন, আবার আমায় ভুল বুঝছেন। আমি বলি নি যে ভাল মন্দর অস্তিত্ব এক। তাদের নামেই বোঝায় যে তারা ভিন্ন সত্তা। আমি বলতে চাই যে ঈশ্বরের দুই অভিব্যক্তি তারা। একটার মধ্যে তিনি আছেন অন্যটায়

তিনি নেই। কিন্তু তাঁর এই থাকা আর না থাকার মধ্যে তফাৎটা খুব সূক্ষ্ম। এত সূক্ষ্ম যে মানুষের মন তা গ্রহণ করতে পারে না। নেই বা অনস্তিত্ব কোন অবস্থা নয়। তাই বারবার আমাদের বলতে হয়, "আছেন, আছেন।" কিন্তু জটিল দর্শন ব্যাখ্যা শেষ করেও গড়বোলের উৎসাহ শেষ হলো না। একই নিশ্বাসে বলে উঠলেন, 'মাড়াবারের প্রাচীন ঐতিহ্যের কিছু নিদর্শন দেখলেন ?'

ফীলডিং চুপচাপ। দার্শনিক ব্যাখ্যার আঁচে উত্তপ্ত হয়ে গেছে তার মস্তিষ্ক। মন ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছিল সে। তাই জবাব দিল না। গড়বোলে ফের বলল, 'ক্যাম্পের মাঠে একটা মজা পুকুর দেখেছেন ?'

'দেখেছি দেখেছি।' অসহিষ্ণুভাবে জবাব দিল ফীলডিং। তার মাথার মধ্যে অন্তত আধ ডজন চিন্তা কিলবিল করছে তখন।

'ভাল। খুব ভাল যে পুকুরটা দেখেছেন। ওটার কি নাম জানেন ? তলোয়ার তালাও। ভারি সুন্দর একটা কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে পুকুরটার সঙ্গে। শুনবেন ?' দিন পনেরো আগে এই ঘরেই চায়ের আসর বসেছিল। গড়বোলে যদি সেদিন কাহিনীটা শোনাতেন তাদের ভাল লাগত। ফীলডিং হয়ত বিশ্বাসও করে নিত গল্পটা। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মানসিক অবস্থা অন্যরকম। তবুও চুপ করে বসে রইল ফীলডিং। কিংবদন্তীর গল্পটা এই-রকম। এক হিন্দু রাজা তার আপন বোনের ছেলেকে হত্যা করে। যে তলোয়ার দিয়ে সে খুন করেছিল সেটি তার হাতে আটকে যায়। অনেক চেষ্টা করেও তলোয়ারটা খুলতে পারে না রাজা। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। একদিন রাজা মাড়াবার পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তৃষ্ণার্ত রাজা জল পান করতে গিয়ে দেখে যে একটা গাভীও জল খেতে এসেছে। রাজা তখন নিজে জলপান না করে আগে গাভীকে জলপান করতে দিল। আর কি আশ্চর্য ! গাভীর তৃষ্ণা দূর হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজার হাতের তলোয়ারটি খুলে পড়ল। এই অলৌকিক ঘটনার স্মরণে রাজা এখানে একটি তালাও খনন করার আদেশ দেন। সেই থেকে এই পুকুরের নাম তলোয়ার তালাও। ফীলডিং চুপ করে শুনছিল এই কিংবদন্তীর গল্প। গল্প শেষ হলে তার মনে হলো, এই হিন্দু ব্রাহ্মণের কথাবার্তার মধ্যে প্রায়ই গাভীর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। হয়ত এই ভাবেই তিনি তাঁর সমস্যার সমাধান করেন।

সন্ধ্যের দিকে আজিজের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেল ফীলডিং। কিন্তু মানসিক যাতনাক্লিষ্ট আজিজের মনের দোরগোড়াতেও পৌঁছতে পারল না সে। তাকে দেখে একটাই কথা বলল আজিজ, 'আমায় ছেড়ে গেলে বন্ধু !' কলেজে ফিরে এসে মিস কোয়েস্টেডকে লেখা চিঠিটা সে শেষ করল। হয়ত এ চিঠি শেষ পর্যন্ত মিস কোয়েস্টেডের হাতে পৌঁছবে না। ম্যাকব্রাইড দম্পতি চিঠিটা আটক করবে সম্ভবত। মিস কোয়েস্টেডের সঙ্গে তার সামান্যই পরিচয়। তবে যেটুকু জেনেছে তাতে বুঝেছে যে বুদ্ধিমতী এই শক্ত মেয়েটার মনে কোন বিদ্বেষ নেই। বোধহয় চন্দ্রপুরের শেষ বিদেশিনী যে অন্যায়ভাবে ভারতীয়দের সব ব্যাপারে দায়ী করে না।

২০

ইংরেজ সমাজে মিস কোয়েস্টেডের জনপ্রিয়তা না থাকলেও তার এই হৃদয়-বিদারক দুঃখ দেখে মেয়েদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। তাদের মনের সব মহৎ গুণগুলো যেন টেনে বার করে এনেছে মিস কোয়েস্টেডের দুঃখ। বেশ কয়েক ঘণ্টা তারা বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল। অবশ্য বেশিক্ষণ এই ভাব স্থায়ী না হলেও পুরুষদের চেয়ে তারা যে বেশি মর্মাহত হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছিল। সবাই উৎসুক : আহা! তাদের এই প্রিয় বোনটির জন্যে কিছু কি করা যায় না? এমন কিছু যাতে তার দুঃখভার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। দুপুর রোদে পুড়তে পুড়তে ছুটে এসেছে মাদাম ক্যালেণ্ডার আর মাদাম লেসলী। রুগীর ঘরে প্রবেশের অধিকার আছে শুধু কালেক্টর গিন্নী মিসেস টারটনের। মিস কোয়েস্টেডের ঘর থেকে যখন তিনি বেরিয়ে এলেন তখন নিঃস্বার্থ বেদনাবোধে মহীয়সী দেখাচ্ছিল তাঁকে। অপেক্ষারত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ছলছল চোখে শুধু বললেন, 'আমার মেয়ের মতন তো!' কটা দিন আগেই মেয়েটা সম্বন্ধে তিনি দু-একটা কটু মন্তব্য করেছেন। রনী হীস্‌লপের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে শুনে আপত্তি করেছিলেন। বেশ রাগ করেই বলেছিলেন যে মেয়েটা একদম সৎ নয়। এখন সে সব কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মহিলার চোখ জলে ভরে গেল। কালেক্টর পত্নীকে কাঁদতে দেখে মেয়েরা সবাই অবাক। মিসেস টারটন্ কাঁদছেন? তিনি কাঁদতে জানেন তাহলে? নিশ্চয়ই জানেন। তবে অবস্থা পাত্র বিবেচনা করে তিনি অশ্রু বিসর্জন করেন। অশ্রুর ভাঁড়ার থেকে বিনা দরকারে এক ফোঁটা চোখের জলও তিনি খরচ করেন না। আজ যেই দরকার হয়েছে, তাই চোখ নিঙড়ে জল বার করছেন মহিলা। আহা! একটু যদি ভালবাসা দিয়ে মেয়েটাকে কাছে টেনে নিতেন! প্রেমে ভরা এই হৃদয়টার কতটুকু বা খরচ হয়! যেটুকু হয় তাও পশ্চাত্তাপের তাগিদে। যেমন আজ তাঁর হচ্ছে। অবশ্য মেজর ক্যালেণ্ডার ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। আর নাকি কিছুই করার নেই। তবুও মেয়েটার এই দুঃসহ দুঃখের দিনে কিছু দায়িত্ব তাঁদের থেকে যায় বৈকি! কেন তাকে নিজেদের মতন গড়ে নিতে পারলেন না তাঁরা? সে দায়িত্ব তো মিসেস টারটনদেরই! এই অবহেলাটুকু তাঁরা করেছেন এবং ত্রুটিটুকু যে সংশোধনের অতীত হয়ে গেছে তা তাঁরা বুঝলেন। এমনকি ডেরেকের মতন হাউড়ে স্বভাবের মেয়েও স্বীকার করল সে কথা। কথায় কথায় সে বলেও ফেলল, 'অন্যদের কথা আমরা আরও গভীরভাবে ভাবি না কেন?' অবশ্য ওদের মনের এই শুদ্ধভাব বেশিক্ষণ বজায় থাকল না। সূর্যাস্তের আগেই অন্য নানা ভাবনার ভেজাল ঢুকে গেল এবং মনের এই অপরাধবোধ ধীরে

ধীরে ক্ষয় হতে লাগল।
সভ্যরা একে একে ক্লাবে ঢুকছে। মুখে এতটুকু বৈরিভাব নেই। স্থির শান্ত মুখের চেহারা। যদিও মনের মধ্যে উত্তেজনার চাপা আঁচ চেষ্টার্জিত এই ভাবটুকু আনতে অনেক আয়াস করতে হয়েছে তাদের। তারা যে উত্তেজিত এটা যেন নেটীভরা বুঝতে না পারে। ক্লাবে ঢুকেও এই জোর করা ভাবটুকু বজায় রাখল সবাই। নিজেদের মধ্যে পানীয় বিনিময় করল, হালকা কথাবার্তা বলল। কিন্তু সবটাই কেমন যেন স্বাদহীন, বেসুরো। ক্যাকটাসের বেড়ার দিকে তাকিয়েছিল ওরা। মনে হচ্ছে ক্যাকটাসের কাঁটা যেন মেটে আকাশটার কণ্ঠদেশ বিদীর্ণ করতে চাইছে। সবাই অনুভব করছিল হাজার হাজার মাইল দূরে নিজেদের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে কোথায় তারা এসে পড়েছে! স্বজন-বান্ধবহীন এ যেন এক শত্রুপুরী। সেই পরিচিত পরিবেশের পটভূমি থেকে এখানটা কত আলাদা।
ক্লাবঘরে আজ ঠাসা মানুষ। অন্যদিনের চেয়ে অনেক মানুষ এসেছে আজ। এরা সবাই এসেছে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবে বলে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘরদোর ফেলে চলে এসেছে ওরা। মিউটিনির সময় লক্ষ্মৌ রেসিডেন্সির মতন হয়ে উঠেছে চন্দ্রপুরের এই ক্লাবঘরটা। দলের মধ্যে ব্ল্যাকিস্‌টনের বউও আছে। মক্ষীরাণীর মতন সকলের মধ্যে বসে আছে এই সুন্দরী মেয়েটা কোলের বাচ্চা নিয়ে। মেয়েটার দারুণ রূপ কিন্তু নিরেট বোকা। তার ধারণা নেটীভরা বাড়ি চড়াও হয়ে তার ইজ্জৎ নষ্ট করবে। তাই পালিয়ে এসেছে ক্লাবে। মেয়েটার স্বামী রেলের ছোট মাপের অফিসার। এখন ট্যুরে গেছে। একে সুন্দরী তায় ভরা যৌবনবতী। আতঙ্কটা সেই কারণেই। ইংরেজ সমাজে মেয়েটার তেমন কৌলীন্য নেই, কারণ স্বামী সাধারণ চাকুরে। কিন্তু সেদিন তার অন্য রকম খাতির। আতঙ্কে তিরতির করে কাঁপছে পাতলা ঠোঁট, ওঠানামা করছে ভরাট বুক। এক মাথা সোনালি চুল এলোমেলো হয়ে ছড়ান। এখন এই মুহূর্তে তার এই বিপর্যস্ত চেহারা দেখে পুরুষের রক্তে যেন দোলা লেগে গেছে। 'যায় যাক জীবন' বলে যে কোন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়াও পুরুষের কাছে অতি তুচ্ছ আত্মত্যাগের সামিল। তাদের কাছে এই নারী যেন মিস কোয়েস্টেডের চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী সুখের প্রতীক। সুতরাং পুরুষরা তাকে আশ্বস্ত করতে যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল। বাইরে মহরমের বাজনা বাজছে। কাড়ানাকড়ার আওয়াজ শুনে চমকে চমকে উঠছে সুন্দরী। কোন নতুন বিপদের সূচনা নয় তো? পুরুষরা সবাই একবার করে মেয়ে-টাকে আশ্বস্ত করে গেল। মিসেস টার্‌টন্‌ আরও এক মাত্রা সাহস যোগ করলেন মেয়েটার মনে। বললেন যে তাঁর বাংলোয় মেয়েকে নিয়ে সে রাত কাটাতে পারে। মেয়েটির পাশে মিসেস টার্‌টন্‌কে তখন গ্রীক দেবী প্যালাস এথনীর মতন মহীয়সী দেখাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, মনে মনে তিনি ঠিক করে নিয়েছেন যে ভবিষ্যতে কারো সঙ্গে নাক উঁচু ব্যবহার করবেন না।
কালেক্টর সাহেব দুহাতে তালি দিয়ে সবাইকে কাছে ডাকলেন। এখন তাঁকে অনেক সৌম্য দেখাচ্ছে। খানিক আগে ফীলডিংএর সঙ্গে সেই উদ্ধত ব্যবহারের

এতটুকুও অবশিষ্ট নেই। সবাই কাছে এলে কালেক্টর বললেন, আমি মেয়েদেরই বিশেষ করে বলছি। আপনারা যতটা সম্ভব শান্ত থাকার চেষ্টা করবেন। আতঙ্কের কোন কারণ নেই। তবে বিনা দরকারে বাইরে বেরো-বেন না। যেটুকু না হলে নয় সেটুকুই করবেন। শহরের দিকে যাবেন না আর চাকর-বাকরদের সামনে কথা বলবেন না। ব্যস! তাহলেই হলো।'

মিসেস টার্‌টন্ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যারী! শহর থেকে কোন খবর এসেছে? পেয়েছ কোন খবর?'

একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন কালেক্টর পত্নী। কিন্তু কথাটা বললেন অত্যন্ত সাবধানে। বাকীরা সবাই চুপচাপ। উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে তারা। এদের মহান বাক্যালাপ থেকে না জানি আরও কত তথ্য বেরিয়ে আসে!

স্ত্রীর দিকে চেয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে টার্‌টন্ বললেন, 'শহরের সব কিছু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।'

'আমিও তা শুনেছি। ঢাকের শব্দ যেটা শুনলুম সেটা মহরমের।'

'পরবের মিছিল বেরোবে পরের হপ্তায়। এটা তারই প্রস্তুতি।'

'হ্যাঁ। সোমবারের আগে মিছিল বেরোবে না শুনেছি।'

'শুনলুম মিস্টার ম্যাকব্রাইড নাকি ছদ্মবেশে মিছিলের সঙ্গে ঘুরছেন?' হঠাৎ প্রশ্ন করল মিসেস ক্যালেণ্ডার।

কালেক্টর সাহেবের মুখে চোখে বিরক্তি ফুটে উঠল। রূঢ় চোখে প্রশ্ন-কারিণীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আঃ! মিসেস ক্যালেণ্ডার! এসব কথা এখানে নয়। স্থান-কাল-পাত্র বুঝে কথা বলবেন এখন থেকে। বিশেষ এইরকম সময়ে।'

আমতা আমতা করতে লাগল মিসেস ক্যালেণ্ডার। কালেক্টরের মৃদু ভর্ৎসনায় সে যে খুব আহত হয়েছে তা নয়। বরং তাঁর শক্ত মনোভাবের দরুন মহিলা বেশ নিরাপদ বোধ করল মনে মনে।

'আর কারও কিছু জানবার আছে? মানে দরকারী প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন।'

কাঁপা কাঁপা স্বরে মিসেস লেসলী জিজ্ঞেস করল, 'সে লোকটা—কোথায় সে এখন?'

'জেলে। জামিন পায় নি। আবেদন নামঞ্জুর হয়েছে।'

এরপর প্রশ্ন করল ফীলডিং। সে জানতে চাইল মিস কোয়েস্টেড এখন কেমন আছেন। এ ব্যাপারে কোন সরকারী বিজ্ঞপ্তি কি বেরিয়েছে না সবটাই গুজব? ফীলডিংএর প্রশ্নে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল। এতক্ষণ কেউ মিস কোয়েস্টেডের নাম ধরে কোন প্রশ্ন করে নি। আজিজের মতন তাঁর নামও ভাববাচ্যে আলোচিত হচ্ছিল। ফীলডিংই প্রথম রীতিভঙ্গ করল। কালেক্টর শান্তভাবে বললেন, 'আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই মেজর ক্যালেণ্ডার তাঁর এখানকার অবস্থা জানিয়ে দেবেন।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এটা কি করে দরকারী প্রশ্ন হলো?' অসহিষ্ণু মিসেস টার্‌টনের প্রশ্নের জবাব দিলেন না মিস্টার টার্‌টন্। আবার সবাইকে

চুপ করতে বলে শেষ আদেশ দিলেন, 'শুনুন! মেয়েরা এবার ধূমপানের ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যেতে পারেন। আর যা বললাম মনে রেখেছেন তো? সময়টা খারাপ যাচ্ছে। আমরা আপনাদের সাহায্য চাই। মোটেই উত্তেজিত হবেন না। স্বাভাবিক থাকবার চেষ্টা করবেন। আপনাদের ওপর ভরসা করতে পারি তাহলে?'

সবাই ভরসা দিল তাঁকে। সমস্বরে বলল, 'নিশ্চয়।'

দল বেঁধে বেরিয়ে গেল সবাই। খানিকটা দমে গেছে ওরা। দলের মাঝখানে মিসেস ব্র্যাকিস্‌টন। অগ্নিশিখার মতন ঝলমল করছে মেয়েটা। কালেক্টরের সহজ কথাগুলো তাদের মনে নাড়া দিয়েছে। বুঝেছে যে তারা এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমান্তের অধিবাসী, অচ্ছুৎ। য়্যাডেলার জন্যে করুণার পাশাপাশি আর একটা ছোট্ট ভাবনার উদয় হয়েছে। এই ভাবনাটাই একদিন হয়ত বিরাট শ্বাসরোধকারী আতঙ্কের রূপ নেবে—লক্ষণগুলো যেন দেখতে পেল তারা। ধূমপানকক্ষ থেকে বেরিয়েই তাসের টেবিলে বসে গেলেন মিসেস টার্‌টন্‌। তাঁর হাসিঠাট্টার শব্দ কানে আসছে। একধারে বোনা নিয়ে বসেছে মিসেস লেসলী।

ধূমপানঘর এখন ফাঁকা। একটা টেবিলের ধার ঘেঁসে বসেছেন কালেক্টর মিস্টার টার্‌টন্‌। এমনভাবে বসেছেন যাতে সবাইকে দেখতে পান। দুটো পরস্পরবিরোধী চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন তিনি। মিস কোয়েস্টেডের লাঞ্ছনার উপযুক্ত জবাব দিতে হবে এবং ফীলডিংকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। ফীলডিংকে শাস্তি পেতেই হবে, নইলে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা রক্ষা পাবে না। কোনরকম প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে যে তিনি এমন কথা ভাবছেন তা না। যা করবেন আইন বাঁচিয়ে করবেন। কিছু নেটীভকেও শাস্তি পেতে হবে। তাদের অপরাধও শাস্তিযোগ্য। তবে এমন কিছু করবেন না যাতে শান্তি বিঘ্নিত হয়, সেনাবাহিনী ডাকতে হয়। প্রশাসন বিশৃঙ্খল হলে তার দায় এসে পড়বে তাঁরই ওপর। সেনাবাহিনীর হাতে প্রশাসন তুলে দেবার অর্থ হলো আরও বিশৃঙ্খলা ডেকে আনা। তারা একটার জট খুলবে তো আর দশটা সমস্যার সৃষ্টি করবে। তাছাড়া অসামরিক প্রশাসন হাস্যাস্পদ হবে সেনাবাহিনীর হাতে। পদে পদে লাঞ্ছিত হবে তারা। সেনাবাহিনীর লোকেরা নিরপেক্ষ হয় না। তাদের পছন্দ করেন না টার্‌টন্‌। তিনি জানেন আজ ক্লাবে এইরকম একজন লোক এসেছে। লোকটা গোর্খা রেজিমেন্টের একজন ছোট মাপের অফিসার। ছিটকে ঢুকে পড়েছে সে। মদ্য পানের দরুন সামান্য অপ্রকৃতিস্থ লোকটা। তিনি জানেন এদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস পড়ল তাঁর। পুরনো সেই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল। তখন মান সম্মান রাখতে ইংরেজ যা করত তার কৈফিয়ত দিতে হতো না তাকে। এখন দিনকাল অনেক বদলে গেছে। এই দিন-বদলের সময় হীস্‌লপ পুরনো ধারার প্রত্যাবর্তন চাইছে। বেচারা! এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেল। আজিজের জামিনেব আবেদন ঝোঁকের মাথায় না-মঞ্জুর করে দিয়েছে ছেলেটা। কিন্তু কাজটা বোধহয় ভাল করে নি। শুধু যে নবাব

বাহাদুরের দলবল ক্ষুব্ধ হবে তা নয়। ভারত সরকারও এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবে। সর্বোপরি আছে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নামক আস্তাখানার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। উৎকেন্দ্রিক কিছু মানুষ এই আস্তাখানায় বসে শ্যেনদৃষ্টিতে তাঁদের কাজকর্ম লক্ষ্য করছে। কোন কিছুই এদের গৃধ্রদৃষ্টি এড়ায় না। আজিজ ছোকরা এখন বিচারাধীন। সুতরাং আইনের চোখে সে এখনও অপরাধী হয় নি। এ কথা তিনিও মানতে বাধ্য। কিন্তু হীস্‌লপ কি কথাটা ভেবে দেখে নি? ভাবতে ভাবতে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন কালেক্টর।

ক্লাবের অন্য মানুষগুলোর মধ্যে তেমন কোন অস্বভাবিকতাই দেখা গেল না। তাদের দায় নেই দায়িত্বও নেই। বউ ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার কথা বলতে বলতেই তারা অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ল। সবাই ভাবছে কেমন করে তাদের প্রিয়জনদের নিরাপদে রাখা যায়, নেটীভদের কি করে শায়েস্তা করা যায়। মধুর চিন্তা সন্দেহ নেই। অন্তত পারিবারিক সুখ শান্তির কথা ভেবে মশগুল হয়ে আছে তারা। ইতিমধ্যে কখন যে মন থেকে মিস কোয়েস্টেডের চেহারাটা হারিয়ে গেছে তারা জানতেও পারে নি। কালেক্টর টার্‌টনের মনে হচ্ছিল এই অর্থহীন গুঞ্জন থামিয়ে দেওয়া দরকার। অকরাণেই ওরা উন্মত্তের মতন আচরণ করছে। কিন্তু তেমন উৎসাহ পেলেন না। তিনি জানেন গ্রীষ্মাবকাশের দরুন এদের অনেকেরই স্ত্রী পুত্র শৈলাবাসে যাবে। সে কথা উঠতে কয়েকজন প্রস্তাব দিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে এদের পাঠাবার ব্যবস্থা করা হোক।

স্পেশ্যাল ট্রেনের কথাটা মাতাল ফৌজী অফিসারটার কানে যেতেই হৈহৈ করে উঠল সে। জড়ান গলায় বলল, 'খাসা ব্যবস্থা। যত তাড়াতাড়ি পারেন পল্টন আনাবার ব্যবস্থা করুন।' (তার ধারণা স্পেশ্যাল ট্রেন এবং সেনাবাহিনী পরস্পর অবিচ্ছেদ্য) লোকটা আরও বলল, 'বারাব্বাস পাহাড়ে যদি পল্টনের ছাউনি থাকত তাহলে এমন অঘটন ঘটত না। সব গুহার বাইরে গুর্খা বসিয়ে রাখতুম।' এই সময় কে যেন বলল, 'মিসেস ব্ল্যাকিস্‌টন বলছেন গুহার বাইরে যদি গোরা পল্টনের ডিউটি থাকত তাহলে সবচেয়ে ভাল হত।'

নেশার ঝোঁকে ফৌজী লোকটা তার আনুগত্যবোধ গুলিয়ে ফেলল। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'না। না। এসব ক্ষেত্রে গোরাদের দিয়ে কাজ হয় না। এখানে দরকার সত্যিকার পাহারাদার জাত। দিশি পল্টন। এখানে চাই গুর্খা, রাজপুত, শিখ, পাঞ্জাবী, জাঠ, ভিল, আফ্রিদী। পাঠান—এদের যে কোন কাউকে আমার হাতে তুলে দিন স্যার। তারপর দেখুন কেমন অসম্ভব সম্ভব করি।'

মাতালটার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে কুণ্ঠিত একটু হাসলেন কালেক্টর। তারপর সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনারা কেউ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘুরবেন না। আমি চাই যেমন চলছে চলুক, যতক্ষণ না অবাঞ্ছিত কিছু ঘটছে। যারা পারেন তাঁরা মেয়েদের পাহাড়ে পাঠিয়ে দিন। তবে এ নিয়ে হৈ চৈ করবেন না। আর ঈশ্বরের দোহাই, ওই স্পেশ্যাল ট্রেনের মতলব মাথা থেকে বার

করে দিন। জানবেন, আমারও দুশ্চিন্তা আছে। বিচ্ছিন্নভাবে একজন ভারতীয় একটা অপরাধ করার চেষ্টা করেছিল মাত্র।' এই অব্দি বলে কালেক্টর চুপ করলেন। হাতের আঙুল দিয়ে কপালে টোকা দিচ্ছিলেন কালেক্টর। সবাই বুঝতে পারছিল, ব্যাপারটা নিয়ে তাঁরও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সুতরাং এমন কিছু তারা করবে না, যাতে কালেক্টর সাহেবের অসুবিধে হতে পারে। খানিক পরে কালেক্টর নিজেই বললেন, 'যেটুকু ঘটেছে শুধু সেটুকুর কথাই ভাবুন আর সেইভাবে চলুন। যা ঘটে নি তার কথা ভাববার দরকার নেই। আর একটা কথা। সব ভারতীয়কে অপরাধী ধরে নেবেন না। তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবেন। মনে করবেন তাদের ভেতরেও সৎ মানুষ আছে।'

কালেক্টরের শেষ কথাটা সকলের মনে ধরেছে। সবাই বলাবলি করতে লাগল, 'ঠিক কথা। আগে থেকে কি করে বলি যে ওরা সবাই খারাপ।' ফৌজী অফিসারটাও তাই বলল, 'আমিও ওই কথাটাই বলতে চেয়েছিলুম। আরে নেটীভ মাত্রেই কি খারাপ? লেসলী! তোমাদের মাঠে একজনের সঙ্গে পোলো খেলেছিলুম, মনে আছে? লোকটা তো অদ্ভুত ভালমানুষ। আসলে, যারা খেলোয়াড় নয় তারা খারাপ হয়। খারাপ লোক হয় শিক্ষিত নেটীভগুলো। যাকে মার্কা মারা বদমাশ বলে, ওরা তাই। কি বললাম্ বুঝেছেন?'

এই সময় ধূমপানঘরের দরজা ঠেলে দলবল নিয়ে ঢুকলেন মিসেস টার্‌টন্। তাঁর পিছনে মহিলার দল এবং সবশেষে মেজর ক্যালেণ্ডার। মিসেস টার্‌টন্ ঘরে ঢুকেই স্বামীর দিকে সগর্বে চেয়ে বললেন, 'য়্যাডেলা ভাল আছে।'

'ভাল আছে! আঃ!' সবাই একঝলক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সিভিল সার্জন মেজর ক্যালেণ্ডার নিজে এই সুসংবাদ বয়ে এনেছে। সবাই কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে আছে সিভিল সার্জেনের বিশাল চটচটে মুখখানার দিকে। সিভিল সার্জেনের মুখখানা কিন্তু বিরক্তিতে থমথম করছে। সেই অবস্থাতেই ঘরের সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সার্জনসাহেব। ফীলডিংকেও দেখল। একটা নিচু চৌকির ওপর বসে আছে ফীলডিং। ফীলডিংকে দেখেই সিভিল সার্জেনের মুখখানা আরও জটিল হয়ে উঠল। গম্ভীরভাবে আপন মনে বলে উঠল 'হুম!'

সবাই আরও বিশদ জানতে চাইছে ব্যাপারটা। কতটা ভাল আছে মিস কোয়েস্টেড। সত্যিই বিপদমুক্ত কিনা ইত্যাদি। ক্যালেণ্ডার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। গমগমে গলায় বলল, যতক্ষণ রুগীর শরীরে জ্বর আছে ততক্ষণ তার বিপদ কাটে নি, ধরে নিন।'

লোকটার কাটা কাটা জবাব শুনে সবাই অবাক। যারা তাকে ঠিকমত চেনে না তারা অবাকই হলো। তবে কি রুগীর ভাল হওয়াটা ওর পছন্দ নয়? টার্‌টন্ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মেজর ক্যালেণ্ডারকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন. 'বসুন মেজর। তারপর সব খুলে বলুন।'

'সব কথা খুলে বলতে সময় নেবে।'

'মিসেস মুর কেমন আছেন?'

'তাঁরও জ্বর।'
'আমার স্ত্রী বলছিলেন উনি নাকি ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন?' লেসলীর প্রশ্নে চটে উঠল মেজর ক্যালেণ্ডার। কড়া স্বরে বলল, 'হতে পারে তা। সে তো আমার দায় নয়! তাছাড়া লেসলী, আপনারা আমার ওপর চড়াও হচ্ছেন কেন?'
'না। না। তা নয়। আমি দুঃখিত মেজর ক্যালেণ্ডার।'
'হীস্লপ পেছনেই আসছে। যা জিজ্ঞেস করার তাকেই করুন।'
হীস্লপ আসছে শুনে সবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মিস কোয়েস্টেড শিকার হয়েছেন ঠিক, কিন্তু অপরাধের দায় ঘাড়ে নিয়ে হীস্লপ হয়েছে সত্যিকার শহীদ। দেশটার সেবা করতে এসে তার সব ঘৃণা যেন নিজেই আত্মস্থ করেছে বেচারি। অথচ মানুষটার অসহায়তার দিনে তারা কেউ এগিয়ে যেতে পারল না। আইনের দিকে তাকিয়ে নরম গদির ওপর বসে আছে স্বার্থপরের মতন।
মেজর ক্যালেণ্ডার তখন হুঙ্কার দিয়ে বলছিল, 'আমার সহকারী রত্নটিকে আমি যে ছুটি দিই নি, তার জন্যে ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ। তখন ছুটি দিলে দায়টা আমারই হত এবং সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় হত না। পরে অবশ্য তাকে ছুটি দিয়েছি, কিন্তু চাপে পড়ে। সেক্ষেত্রে আমার দায়িত্ব অনেক কমে গেছে।'
মেজর ক্যালেণ্ডার যখন কথা বলছিল ফীলডিং তখন মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে সেটার দিকে তাকিয়েছিল। মনে হলো ফীলডিং যেন চিন্তিত। মেজর ভাবলো ফীলডিং অস্বস্তি বোধ করছে। তাই তাকে শুনিয়ে মেজর ফের বলল, 'আমি শুনেছি ওদের সঙ্গে একজন ইংরেজের যাবার কথা ছিল। আমি তাই ছুটি দিতে রাজী হই।'
'আপনাকে তার জন্যে কেউ দায়ী করছে না মেজর।' বললেন কালেক্টর। আরও বললেন, 'একদিক থেকে দোষ আমাদের সকলের। আমাদের জানা উচিত ছিল যে ওদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা মোটেই যথেষ্ট নয় আর তাই এই অভিযানটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা তা করি নি। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি খানিকটা আঁচ করেছিলুম। তাই সকালে মেয়েদের স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। সেদিক দিয়ে ভেবে দেখলে আমরা সবাই দায়ী, আপনি ছাড়া। এ ব্যাপারে আপনার এক বিন্দু দোষও নেই।'
'আমি কিন্তু তা মনে করি না।' বলল মেজর। আরও বলল, 'দায়িত্ববোধ বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। দায়িত্ব পালনে যদি কেউ অবহেলা করে তাহলে আমার কাছে সে মানুষের কোন মূল্য নেই।'
মেজর কথাটা বলল ফীলডিংএর দিকে চেয়ে। অনেকেই জানত যে ফীলডিংএরও ওদের সহগামী হবার কথা ছিল। কিন্তু ট্রেন মিস্ করার দরুন সে তখনই যেতে পারে নি। তারা বলাবলি করছিল যে, ইংরেজ চরিত্রের এই শৈথিল্য ক্ষমাহীন অপরাধ। তবে এই শৈথিল্য অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ নেটীভদের

সঙ্গে একটু বেশি অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে ফীলডিং। ফলে স্বাভাবিক কারণেই চরিত্রহানি হয়েছে মানুষটার এবং শুধু চরিত্রহানি নয়, মর্যাদাহানিও। কালেক্টর সাহেব অবশ্য কোন মন্তব্য করলেন না। হয়ত প্রকৃত ঘটনাটা তাঁর জানা ছিল। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ফীলডিং শেষ পর্যন্ত তাঁদের লাইনেই এসে দাঁড়াবে। ততক্ষণে আলোচনার মোড় ঘুরে গেছে। সবাই নতুন করে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার কথা বলাবলি শুরু করেছে। এই অবসরে ফৌজী অফিসারটাকে ফীল্ডিংএর বিরুদ্ধে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করল মেজর। মেজরের প্ররোচনায় মাতলামির আশ্রয় নিয়ে লোকটা নানাভাবে ফীলডিংকে উত্তেজিত করতে লাগল।
এইভাবে ঘুঁটি সাজিয়ে নতুন উদ্যমে ফীলডিং বিরোধী প্রচারে নামল মেজর।। কালেক্টরকে লক্ষ্য করে মেজর হঠাৎ বলল, 'মিস কোয়েস্টেডের চাকরটার কথা শুনেছেন তো?'
'না। সে আবার কি করল?'
'ষড়যন্ত্রের প্রথম শিকার তো সেই লোকটা!'
'তার মানে?'
'হীস্‌লপ লোকটাকে বলে দিয়েছিল যেন এক মুহূর্তের জন্যেও মিস কোয়েস্টেডকে সে চোখের আড়াল না করে। আজিজ ছোকরা ঘুষ দিয়ে চন্দ্রপুর স্টেশন থেকেই তাকে সরিয়ে দেয়। হীস্‌লপ পুরো ঘটনাটা এখনই জেনেছে। কাকে দিয়ে ঘুষ দিয়েছে, কত টাকা ঘুষ দিয়েছে—সব বৃত্তান্ত তার জানা। ঘুষ দিয়েছে, মহম্মদ লতিফ নামে একটা বুড়ো দালালকে দিয়ে। লোকটা নাম করা দালাল।' সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে মেজর ক্যালেন্ডারের দিকে। লোকটা যেন রহস্য গল্প বলছে। মেজর একটু চুপ করে প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করল। তারপর বলল, 'এ তো গেল চাকরটার কথা। এবার শুনুন আমাদের মান্যবর ইংরেজ বন্ধুটির কথা। তিনিও গেলেন না। কেন? এও কি টাকার খেলা?'
রাগে ক্ষোভে দাঁড়িয়ে উঠল ফীলডিং। যারা শুনছিল তারাও স্তম্ভিত। না না। তা হতে পারে না। ফীলডিং এত অসৎ চরিত্রের মানুষ নয়। সকলের অনুক্ত প্রতিবাদটা লক্ষ্য করে মেজর তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। বলল, 'মাপ করবেন। প্লিজ, আমায় ভুল বুঝবেন না আপনারা। আমি বলছি না যে ওরা মিস্টার ফীলডিংকে ঘুষ দিয়েছে।'
'তাহলে কি বলতে চাইছেন আপনি?'
'আজিজের লোকেরা আপনাকে ঘুষ দেয় নি। তারা ঘুষ দিয়েছে গড়বোলেকে। লোকটা যাতে পুজোর ভান করে দেরি করে পৌঁছয়।'
'অসম্ভব। সম্পূর্ণ বাজে কথা।' রাগে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল ফীলডিং। মেজর ক্যালেন্ডার রহস্যময় একটু হেসে বলল, 'আরও আছে। হীস্‌লপ্ আরও তথ্য পেয়েছে মিসেস মুরের কাছে। একদল ভাড়া করা নেটীভ দিয়ে গুহার মধ্যে মিসেস মুরকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল। কোনরকমে বেঁচে গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছেন বৃদ্ধা। চমৎকার প্ল্যান।

একেবারে নীট্। অথচ সন্দেহ করার কিছু নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে আজিজ গুহার মধ্যে মিস কোয়েস্টেডকে নিয়ে...একমাত্র সাক্ষী একটা উটকো গাইড। ওই দালাল লতিফেরই যোগান একটা লোক। আর সব থেকে মজার কথা —ঘটনার পর থেকে সেই গাইডটাও বেপাত্তা। চমৎকার!' হঠাৎ ভীম গর্জন করে উঠল মেজর। তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এখন বসে বসে ভাববার সময় নয়। এর উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। সেনাবাহিনী ডাকান, তারপর বাজার তছনছ করে অপরাধী খুঁজে বার করুন।'

সাধারণত মেজরের লম্ফঝম্প নিয়ে কেউ তেমন আমল দেয় না। কিন্তু আজ তার অন্যথা হলো। সবাই বুঝতে পারছে যতটুকু অপরাধ হয়েছে তার চেয়ে আড়ালের ষড়যন্ত্র আরও ব্যাপক ও গভীর। ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহের পর এত ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র এই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো। ফীলডিংও রাগ ভুলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠল। কথা কানে হাঁটে। সুতরাং নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে এই অপপ্রচার। যা অসত্য তার একটা সাময়িক প্রভাব আছেই—আছে একটা নিজস্ব অস্তিত্ব। ফীলডিংকে চিন্তিত দেখে প্রতিপক্ষ মেজর ক্যালেন্ডার ভাবল যে সে বোধহয় সত্যিই বিপদগ্রস্ত। তাই লেসলীর দিকে চেয়ে চোখ টিপে মেজর বলল, 'আশা করি এখানে যা আলোচনা হলো তা বাইরে বেরোবে না।'

'কেন বেরোবে?' জবাব দিল লেসলী।

'তা জানি না। তবে শুনলুম,' মেজর অপাঙ্গে ফীলডিংকে নজর করে বলল, 'শুনলুম আমাদের একজন ইংরেজ বন্ধু আজই বিকেলে বন্দীর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। তা দু নৌকোয় পা দিয়ে তো চলা যায় না? আপনারা কি বলেন?'

'আমাদের মধ্যে? কে সে?'

ফীলডিং চুপ করে বসে রইল। নিজেকে এই নোংরামির মধ্যে জড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। অনেক কিছুই বলার আছে তার। কিন্তু যা বলার ঠিক সময়ে বলবে। তাছাড়া কালেক্টরের কাছেও ব্যাপারটা অশোভন মনে হলো। কৌশলে তিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুটা অন্য দিকে সরিয়ে দিলেন। তখনকার মতন আলোচনা সরে যাওয়ায় ফীলডিংও নিশ্চিন্ত হলো। আর তখনই মেয়েদের কলগুঞ্জন শোনা গেল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকছে রনী হীস্‌লপ।

হীস্‌লপ্‌কে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। একেবারে ভেঙে পড়েছে সে। আগের সেই দেমাকী ভাবও নেই। তুলনায় অনেক ভদ্র অনেক সংযত মনে হচ্ছিল তাকে। সাধারণত গণ্যমান্যদের অসম্মান সে করে না। তবে অন্য সময় যেটা নিছক বাহ্যাচার, লোক দেখান রীতি, এখন সেটা আন্তরিক মনে হলো। সে যেন তার এই অপমানে তাদের সাহায্য চাইছে। অন্তত মুখের সেই অসহায় করুণ ভাবটা থেকে সবাই তাই মনে করল। তাই রনী হীস্‌লপের মুখের দিকে চেয়ে নিজেদের অজান্তেই সবাই দাঁড়িয়ে উঠে তার সম্মান জানাল। তবে যেহেতু ভারতবর্ষের কোন কিছুই ব্যক্তিগত নয়, এমন কি ভদ্রতা শিষ্টাচার ইত্যাদির ওপরও সরকারী ছাপ পড়ে, তাই হীস্‌লপ্‌কে মর্যাদা দেখাতে

গিয়ে তারা আজিজ এবং ভারতবর্ষকে যেন অকারণ অপমান করল। একমাত্র ফীলডিংই ব্ঝল ব্যাপারটা আর ইচ্ছে করেই নিজের জায়গায় বসে রইল। উঠে দাঁড়াল না। হয়ত এটা অবাঞ্ছিত, দৃষ্টিকটুও বটে। কিন্তু ফীলডিং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে, আর সে সইবে না। প্রতিবাদ জানাবেই, নইলে নিজেকেই ছোট করে ফেলবে সে। রনী হীস্‌লপ্ বোধহয় ফীলডিংকে দেখে নি। অন্য সকলের দিকে চেয়ে অভিভূত স্বরে রনী বলল, 'আপনারা বসুন, বসুন। বলুন কি ঠিক করলেন? আমি জানতে এসেছি।'

কালেক্টর বললেন, 'শোন রনী, আমরা স্থির করেছি যে কোনরকম শক্তি-প্রয়োগ করব না। জানি না আমার সঙ্গে তুমি একমত হবে কি না। আদালতের রায় বেরোনর পর অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবা যাবে'খন। তুমি কি বল?'

'আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই হবে। এ ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। বলতেও পারব না কিছু।'

'তোমার মা এখন কেমন?'

'ভাল। ধন্যবাদ। আপনারা সবাই বসুন না?'

মাতাল ফৌজী লোকটা বলে উঠল, 'আমাদের ভেতর একজন আছে যে মোটেই দাঁড়ায় নি।'

কালেক্টর ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু পাছে অপ্রীতিকর কিছু ঘটে, তাই চাপা দিতে চাইলেন। রনীর দিকে চেয়ে বললেন, 'মেজর ক্যালেণ্ডার একটা সুখবর এনেছেন। মিস কোয়েস্টেড ভাল আছেন।'

'কিন্তু সকালের দিকে উনি বোধহয় ভাল ছিলেন না। বিপদের আশঙ্কা ছিল। তাই না মেজর? আপনার সেই রিপোর্টের ওপরেই আমি জামিনের আবেদন নাকচ করে দিই।'

মেজর ক্যালেণ্ডার হা হা করে হেসে উঠল। বলল, 'পরে আবার যদি জামিনের আবেদন আসে তবে এই বুড়োকে একটা খবর না দিয়ে সেটা মঞ্জুর করো না। এই বুড়োটার মতামত তোমার পছন্দ হোক না হোক, সে তোমায় সাহায্য করবে। অন্তত লোকটাকে যাতে জেলে পাঠান যায় তার ব্যবস্থা সে করবে।'

বলতে বলতেই মেজর তার কপট ভদ্রতাবোধের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল। তারপর বেশ রূঢ় স্বরে বলল, 'তোমায় একটা কথা জানিয়ে দিই হীস্‌লপ। আমাদের মধ্যে একজন আছেন যিনি ওই লোকটার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী।'

মেজরের কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাতাল ফৌজীটা মস্ত গলায় ফীলডিংকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'এই শালা! উঠে দাঁড়া!'

অত্যন্ত আকস্মিক এই আক্রমণ। ফীলডিং রীতিমত অবাক। তবে মনে মনে সেও প্রস্তুত। সেই সময় কালেক্টরও-যেন বিবাদে জড়িয়ে পড়তে চাইলেন। ফীলডিংকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মিস্টার ফীলডিং! উঠে দাঁড়াতে আপনার কোথায় আটকাচ্ছে বলবেন?'

এইটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল ফীলডিং। সেও চাইছিল বিবাদ বাধুক এবং কালেক্টর নিজেই জড়িয়ে পড়ুন এর মধ্যে। কালেক্টরের প্রশ্নে ফীলডিং বলল, 'স্যার, যদি অনুমতি দেন তবে আমার বক্তব্য নিবেদন করি।'

'নিশ্চয়ই! বলুন কি বলার আছে?'
ফীলডিং উঠে দাঁড়াল, তারপর আত্মসচেতন মানুষের মতন স্পষ্ট ভাষায় বলল, 'স্যার, আমার বিশ্বাস ডাক্তার আজিজ নিরপরাধ।' ফীলডিংএর বক্তব্যের মধ্যে এতটুকু অস্পষ্টতা ছিল না। ছিল না কোন ঠুনকো স্বাজাত্যবোধের আস্ফালন বা যৌবনোচিত ঔদ্ধত্য। একজন বিবেকসম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ স্কুল শিক্ষকের যেটুকু আত্মসম্মানবোধ থাকা বাঞ্ছনীয় সেটাই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন।
'আপনার তা মনে হতে পারে। কিন্তু ঠিক এই কারণেই কি আপনি হীস্-লপকে অপমান করতে চেয়েছিলেন?'
'তাহলে আমায় বক্তব্যটা শেষ করতে দিন।'
'বলুন।'
'আমি আদালতের বিচারের অপেক্ষা করছি। আজিজ যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তবে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাব। উপস্থিত ক্লাবের সদস্যপদ থেকে আমি পদত্যাগ করলাম।'
ফীলডিংএর নাটকীয় ঘোষণা শুনে কিছু মানুষ হৈহৈ করে উঠল। তারা অন্তত মানুষটার সৎসাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু টার্‌টন্ মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে টার্‌টন্ বললেন, 'আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি। মিস্টার রনী হীস্‌লপ সিটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি যখন ঘরে ঢুকলেন তখন আপনি উঠে দাঁড়ালেন না কেন?'
'স্যার, আমার যা বলার ছিল তা বলেছি। আলাদা করে সব প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।'
এই বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ফীলডিং। টার্‌টন্ তখনও সংযম হারান নি। সেই অবস্থাতেই আদেশের সুরে বললেন 'দাঁড়ান মিস্টার ফীলডিং। আপনি যখন সদস্যপদ ছেড়ে দিয়েছেন তখন আপনাকে আটকাব না। তবে যাবার আগে সকলের সামনে আপনাকে এই অপরাধের নিন্দে করতে হবে, আর হীস্‌লপের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।'
'এটা কি আপনার সরকারী হুকুম স্যার?'
কালেক্টর মিস্টার টার্‌টন্ নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না। রাগে ফেটে পড়লেন। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'বেরিয়ে যান। এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান এখান থেকে। স্টেশনে কেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম ভেবে লজ্জা হচ্ছে আমার। অকারণে নিজেকে ছোট করেছিলুম। আপনার সাঙ্গপাঙ্গদের মতন ইতর হয়ে গেছেন আপনি। আপনি একটা দুর্বল মানুষ; দুর্বল, ভীরু মানুষ। প্লিজ, চলে যান!'
'চলে যেতেই চাইছি স্যার। কিন্তু এই লোকটা পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে যে!'
মস্ত ফৌজী অফিসারটার দিকে আঙুল তুলে অত্যন্ত হালকা স্বরে বলল ফীলডিং। এই অপ্রীতিকর বাদানুবাদের সবটুকু বিষ গলায় ঢেলে স্তব্ধ

হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রনী হীস্‌লপ। চোখে প্রায় জল এসে গেছে তার। কোনরকমে বলল, 'ওকে যেতে দিন।'

হীস্‌লপের অনুরোধ ছাড়া সেদিনকার এই অবস্থা সামলান যেত না। তার অনুরোধে ফৌজী লোকটা দরজা থেকে সরে দাঁড়াল বটে, কিন্তু ফীলডিংএর বেরোবার সময় একটু ধস্তাধস্তি হলো। তার ফলে দরজার মুখ থেকে প্রায় ছিটকে সামনের ঘরে গিয়ে পড়ল ফীলডিং। মেয়েরা বসে তাস খেলছিল। ওইভাবে একটা মানুষকে ছিটকে পড়তে দেখে তারা সভয়ে উঠে দাঁড়াল। ভাগ্যিস সে পড়ে যায় নি বা রেগে ওঠে নি! তবে একটু রাগ তার হয়েছে। এর আগে কেউ রাগী বা দুর্বলচিত্ত বলে তাকে ছোট করে নি। তাছাড়া হীস্‌লপ যেন তার মাথায় আগুন ঢেলে দিয়েছে। যাহোক, হীস্‌লপের কথা ভেবে সে দুশ্চিন্তা করছিল না। এ নিয়ে সে ঝগড়াও করবে না। কারণ ভবিষ্যতে ঝগড়া করার আরও অনেক বিষয় সে পাবে।

সত্যিই ফীলডিংএর মাথার মধ্যে তখন যেন জ্বলন্ত আগুনের আঁচ। মনটাও বিক্ষুব্ধ। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ পেতে চাইছে দেহ মন। ফীলডিং তাই ক্লাবের দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। স্নিগ্ধ শীতল বাতাসের ছোঁয়ায় শরীর মন যেন জুড়িয়ে গেল তার। দূরে দাঁড়িয়ে অনুপম মাড়াবার শৈলশ্রেণী। এই দূরত্ব থেকে এই মুহূর্তে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে মাড়াবারকে। তার খাড়াই শৃঙ্গগুলো যেন গির্জার চূড়া। মনে হচ্ছে সাধুসন্তদের মিলনভূমি এই মাড়াবার। এর মধ্যে কোথায় সেই অপরাধবৃত্তি যা আইনের সাহায্য নিয়ে খুঁজে পেতে হবে? ফীলডিংএর অবচেতন মন সেই অপরাধীটাকেই খুঁজে বার করতে চাইছিল যেন। সেই গাইডটা কে? কোথায় সে লুকিয়ে থাকতে পারে? কিসেরই বা সেই প্রতিধ্বনি যা শুনে ভয় পেয়েছিল য়্যাডেলা কোয়েস্টেড? খবরগুলো এখনো তার জানা হয় নি। কিন্তু জানতে সে নিশ্চয়ই পারবে।

তখন শেষ সূর্যের আলো পড়েছে মাড়াবার পাহাড়ের গায়ে। ফীলডিংএর মনে হলো যেন সম্রাজ্ঞীর মতন মনোহর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মাড়াবার। অতঃপর সূর্যাস্ত হলো। অদৃশ্য হলো সন্ধ্যারাগ। কালো রাত্রির খামে ঢাকা পড়ল সমস্ত পৃথিবী। আগুনঝরা দিনের বদলে রাত্রির স্নিগ্ধ শীতলতা আশীর্বাদের মতন নেমে এল পৃথিবীর বুকে। কালো পাহাড়ের মতন দেখাচ্ছে বিশ্বচরাচর সেই রাতের অন্ধকারে। আকাশের গায়ে ঝিকমিক করে জ্বলছে অসংখ্য নক্ষত্র। যে কোন মানুষের জীবনে এ যেন এক পরম সুন্দর অভিজ্ঞতা। কিন্তু অচিরেই অদৃশ্য হলো এই দুর্লভ মুহূর্তটা। মনে হলো, তেমন ভাবে সে কিছুই ভাবছিল না। যেন সে এখানে এসেছে অন্য কাউকে খুশি করতে। কিন্তু কেন এই অতৃপ্তি? সে কি যথার্থই সফল মানুষ হতে পারে নি? চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে সে তার জীবন আর দর্শন গড়ে নেবার চেষ্টা করেছে। গড়ে নিয়েছে তার ব্যক্তিত্ব, বেঁধে নিয়েছে তার সীমাচিহ্ন, আবেগকে শাসন করেছে। সে জানে, যেমন নিছক ভাববাদী সে নয় তেমন কঠিন বাস্তববাদীও হতে পারে নি সে। জীবনের ঝুলিতে এ

এক বিস্ময়কর সংগ্রহ, সন্দেহ নেই। কিন্তু যথার্থই সে কী পেল ? বরং দিন যত গড়িয়ে যাচ্ছে ততই তার মনে হচ্ছিল যেন সেই আসল বস্তুটি সে এখনও পায় নি। কী সেই দুর্লভ বস্তু তা সে জানে না। হয়ত ভবিষ্যতেও কোনদিন জানবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে তার অভাববোধটাই তাকে যেন বিষণ্ণ করে তুলল। তাই গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার অন্তর্লোক।

২১

ঠিক এই মুহূর্তে এমন একটা বিষণ্ণ ভাবনায় আচ্ছন্ন হ'তে চাইছিল না ফীলডিং। পরিবেশ এবং সময়ের অনুপযুক্ত এই চিন্তা। সুতরাং মন থেকে সে ঝেড়ে ফেলে দিল বিষণ্ণ ভাবনাটা, তারপর তার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে রওনা হলো। ক্লাবের সঙ্গে সংযোগ কাটিয়ে দিয়ে ভালই করেছে সে। ক্লাবে গেলেই নানা কথা কানে আসত এবং সেগুলো নিয়ে হয়ত তার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার লোভ সামলাতে পারত না সে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তেমন অবস্থায় তাকে পড়তে হলো না। এখন সে অনেক হালকা হয়ে গেছে। ক্লাবের আকর্ষণ বলতে যা কিছু তা হয় বিলিয়ার্ড নয়ত টেনিস, কিংবা মাঝে মাঝে ম্যাকব্রাইডের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা। এসবের কোনটাই এমন গভীর কোন আকর্ষণ নয় যার জন্যে তার অনুশোচনা হতে পারে।

বাজারে ঢোকবার মুখে বাধা পেল ফীলডিং। মহরম উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। মিছিলের মহলা চলছে। গায়ে ডোরাকাটা বাঘছাল আর মুখে বাঘের মুখোশ পরে একটা ছেলে লম্ফঝম্প করছে। শহরময় মহরমের বাজনা বাদ্যি—বেশ জুৎসই একটা উৎসবের মেজাজ দেখে মনেই হয় না যে কারো মনে কোন ক্ষোভ আছে। ফীলডিংকে ওরা খাতির করে ওদের তৈরি একটা তাজিয়া দেখাল। খুবই খেলো শিল্পকর্ম। কে বলবে কারবালা মরুপ্রান্তরে তৃষ্ণার্ত মুমূর্ষু শহীদের সমাধি এটা। ছোট ছোট ছেলেরা দারুণ উৎসাহে তাজিয়ার গায়ে রঙিন কাগজ সাঁটছে। সারা বিকেল এবং সন্ধ্যেটা নবাব বাহাদুর, হামিদউল্লাদের সঙ্গে আলোচনায় কাটিয়ে দিল ফীলডিং। কলকাতার নাম করা ব্যারিস্টার অমৃত রাওয়ের নামে টেলিগ্রাম পাঠান হয়েছিল। কেস্ নিতে রাজী হয়েছেন তিনি। ঠিক হলো নতুন করে জামিনের দরখাস্ত পাঠান হবে। আশা করা যায় এবার আবেদন না-মঞ্জুর হবে না। কারণ মিস কোয়েস্টেড এখন বেশ ভাল আছেন। বেশ গভীর আলোচনাই চলছিল। কিন্তু একদল বেদেনী এসে আলোচনার মেজাজ নষ্ট করে দিল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মাটির পাত্র। তার মধ্যে নুড়ি পাথর। মেয়েরা সেগুলো ঝমঝম শব্দে বাজাচ্ছে আর নাচছে। বিরক্ত ফীলডিং চাইছিল এদের বিদায়

করতে। কিন্তু নবাব বাহাদুর রাজী হলেন না। অনেক পথ হেঁটে ওরা এসেছে এবং নিশ্চয়ই সৌভাগ্য নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে।

সেদিন অনেক রাতে কলেজে ফিরে এল ফীলডিং। হীস্‌লপের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইটা কৌশল হিসেবে ঠিক হয়েছে কিনা কে জানে! গড়বোলের সঙ্গে এ ব্যাপারে একটু আলোচনা করলে ভাল হতো। অন্তত তাঁর মতামতটা জানা যেত। কিন্তু ফীলডিং নিরাশ হলো। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। তা ছাড়া দু-এক দিনের মধ্যে নতুন চাকরি নিয়ে তিনি চন্দ্রপুর ছেড়ে যাচ্ছেন। আর কি তিনি নিজেকে এর মধ্যে জড়াতে চাইবেন? ফীলডিংএর হঠাৎ মনে হলো যে কোলাহলের ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা ভদ্রলোকের আছে এবং এ ক্রীড়াকৌশল তাঁর জন্মগত।

২২

বেশ কয়েকদিন ম্যাকব্রাইডের বাংলোয় য়্যাডেলাকে শুয়ে থাকতে হলো। সেদিন পাহাড় থেকে নামার সময় সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। একে চড়া রোদ তায় সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। ক্যাকটাসের শক্ত কাঁটাগুলো ছুঁচের মতন গায়ের সঙ্গে বিঁধে ছিল। ডেরেক আর মিসেস ম্যাকব্রাইড যত্ন করে শরীর থেকে একটি একটি করে কাঁটা তুলেছে, যাতে কাঁটার বিষ শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশে না যায়। ওরা যখন আতস কাচ দিয়ে কাঁটা তুলত, তখন শরীরটাকে ওদের হাতে ফেলে রাখত য়্যাডেলা। ব্যথা পেলেও একটু নড়ত না। শরীর বা মনের কষ্টের কথা একটুও ভাবত না। ইদানীং মনটাও নির্জীব হয়ে গেছে। কেমন যেন বোধহীন অবস্থা। উপলব্ধি, অনুভূতি ইত্যাদি মানসিক অবস্থাগুলো জড় হয়ে গেছে যেন। গুহার মধ্যে সত্যিই তাকে কেউ ছুঁয়েছে কি না বলতে পারত না। মনের কষ্টগুলো শরীরের বাইরে ফুটে উঠেছিল একটু একটু করে। মানুষ সম্বন্ধেও কোন ভালমন্দ বোধ ছিল না। আসলে গভীরভাবে ভাববার মতন মনের অবস্থা তার ছিল না।

কদিন ধরেই স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে এরা তার সেবা করে চলেছে। মানুষগুলো কত ভাল! অথচ যাঁকে সে অহরহ খুঁজছে সেই মিসেস মুর একদিনও তাকে দেখতে এলেন না। এরা শুধু তার বাইরের কষ্ট দেখছে। সেবা করছে শরীরটার। মনের কথা কেউ বোঝবার চেষ্টা করছে না। কথা বলতে বলতে কেন তার উত্তেজনা হচ্ছে, কেন ক্ষণে ক্ষণে সে মূর্ছা যাচ্ছে, তা নিয়ে এরা কেউ ভাবছে না। গুহার ভেতরে সেদিন যা ঘটেছিল অত্যন্ত নীরসভাবে তার বর্ণনা দিত য়্যাডেলা। 'গুহার ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই চাপ চাপ অন্ধকার আমায় ঢেকে দিল। হাতড়ে হাতড়ে দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর

নখ দিয়ে দেয়ালে আঁচড় কাটলাম। শব্দটা প্রতিধ্বনিত হয়ে বিকট হয়ে উঠল। হঠাৎ মনে হলো গুহামুখে কে যেন দাঁড়িয়ে। ঘুরে দেখলাম মানুষটার লম্বা ছায়া খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ক্রমে ছায়াটা আরও কাছে চলে এল। আমায় যেন চেপে ধরতে চাইল ছায়াটা। তখন মনে হচ্ছিল অনন্ত-কাল ধরে ছায়াটা আমার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে সময়টা আধ মিনিটেরও বেশি নয়। তখনই মন স্থির করে নিয়েছি। ছায়াটা আর একটু কাছে আসতেই আমার হাতের দূরবীনটা দিয়ে ছায়াটাকে আঘাত করলাম। দূরবীনের স্ট্র্যাপটা সে ধরে ফেলল আর আমায় ঘোরাতে লাগল। হঠাৎ স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে গুহামুখ দিয়ে আমি ছুটে বেরিয়ে এলাম। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে সময় লেগেছিল মাত্র আধ মিনিট। আমায় কিন্তু একবারের জন্যেও ছুঁতে পাবে নি লোকটা।' বলতে বলতে হুহু করে কেঁদে উঠত য়্যাডেলা। তখন আকুল হয়ে বলত, 'আমি যেন কেমন হয়ে গেছি। সব ওলটপালট হয়ে গেছে আমার। কি করে এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি পাব!' তখন একেবারে ভেঙে পড়ত য়্যাডেলা। মেয়েরা যারা পাশে থাকত তারাও কেঁদে আকুল হত। পাশের ঘরে পুরুষরা বসে বসে হাহুতাশ করত। সবাই ভাবত কেঁদে হালকা হচ্ছে য়্যাডেলা। কিন্তু কেউ ভাবত না কেন এমন অসহায়ের মতন চোখের জল ফেলে য়্যাডেলা নিজেকে হেয় করছে। য়্যাডেলা নিজেও তেমনভাবে বুঝত না। তার মনে হত যে মাড়াবার গিরিগুহায় যা ঘটেছে তার চেয়েও এই অসহায় কান্না আরও অবমাননাকর। এর ফলে সে নিজেকেই ছোট করছে। আত্ম-বিশ্বাস হারিয়ে নিজেকে ক্লীব করে ফেলছে—তার আধুনিক পরিণত দৃষ্টি-ভঙ্গী আর চরিত্রের স্বাভাবিক সততার অবমাননা করছে। য়্যাডেলা সর্বক্ষণ নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করত যে তার ওপর কোন লাঞ্ছনা হয় নি। ভুলে যাবার চেষ্টা করত এই দুঃস্বপ্নের ঘটনাটা। একটা মানসিক আঘাত সে পেয়েছিল ঠিক কথা। কিন্তু কী সেটা? তখন তার সব যুক্তি হারিয়ে যেত। যেন কানে শুনত সেই প্রতিধ্বনির শব্দ। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠত সে আর বলত সে উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। রনীর সহধর্মিণী হবার উপযুক্তা সে হারিয়ে ফেলেছে। তখন মনে মনে চাইত যার হাতে সে লাঞ্ছিত হয়েছে সে যেন কঠোরতম শাস্তি পায়। এমনি যখন মনের অবস্থা তখন ইচ্ছে হত দৌড়ে গিয়ে বাজারের প্রতিটি মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। কারণ তার যেন মনে হত আগের চেয়েও নোংরা এই পৃথিবীটা ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে। মনে হত এটা পুরোপুরি তারই পাপের ফল। এই অনিশ্চিত ভাবনাটা কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারত না যতক্ষণ আচ্ছন্ন ভাবটা থাকত। তারপর বুদ্ধিদীপ্ত একটা সজাগ চিন্তার স্পর্শ পেয়ে আচ্ছন্নতা যখন কেটে যেত, তখন সে বুঝতে পারত যা সে এতক্ষণ ভেবেছে, সব ভুল। তখন শুরু হয়ে যেত ঊষর ভূমিতে নতুন করে খোঁজার পালা।

একটিবার যদি সে মিসেস মুরের দেখা পেত! সে শুনেছে তিনিও অসুস্থ। রনী বলেছে সে কথা। বলেছে, তিনি ঘরের বাইরে বেরোতেই চান না।

য়্যাডেলার মন আবার দমে যেত। নতুন করে শুনত গুহার ভেতরের সেই প্রতিধ্বনি। রুদ্ধ অন্ধ সেই শব্দটা তার স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে— এমনকি জীবনের ওপরেও প্রভাব ফেলেছে শব্দটা। দেয়ালের গায়ে আঁচড় কেটে সে শব্দ সৃষ্টি করেছিল। নিছক খেয়াল সেটা। কিন্তু শব্দটা মিলোবার আগেই লোকটা তার পিছু নেয়। তারপর সেই চরম মুহূর্ত এল, যখন সে হাতের দূরবীন দিয়ে ছুঁড়ে মারল লোকটাকে এবং গুহার ভেতর থেকে ছুটে পালিয়ে এল। সেই থেকে শব্দটা তাকে তাড়া করে চলেছে। এখনও সেই শব্দ থেকে মুক্তি পেল না সে। অনন্ত প্রবাহিণী নদীর মতন ধীরে ধীরে জীবনটা ঢেকে ফেলেছে সেই শব্দ। একমাত্র মিসেস মুরই পারতেন এর উৎস-মুখ বন্ধ করে দিতে। এমনি করে দিনের পর দিন একটা বিষণ্ণ মানসিকতা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল য়্যাডেলা। চারপাশে যারা আছে তারা কেউ তার মনের এই হতাশা কাটিয়ে তুলতে পারত না। তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে নেটীভ-দের ক্ষতি করার হুমকি দিত। এদের পরামর্শ শুনে য়্যাডেলা মনে মনে শিউরে উঠত। তার মন আরও হতাশ হত।

এক এক করে কাঁটাগুলো তোলার পর য়্যাডেলার শরীর বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠল। জ্বর ছেড়ে গেল এবং রনীর ইচ্ছেমত তার বাংলোয় যেতে রাজী হলো য়্যাডেলা। রনী যেদিন তাকে নিতে এল সেদিন মানুষটার ঝোড়ো চেহারা দেখে মনে মনে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল য়্যাডেলার। আহা! এমন দুরবস্থা হয়েছে ওর! তার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল হতভাগ্য মানুষটাকে ভালবাসায় ভরিয়ে দিতে। কিন্তু যতটা ভালবাসতে চাইছিল, ততটা ভালবাসতে পারল না দুজনের কেউ। সম্পর্কটা যেন হাস্যকর হয়ে উঠল দুজনের কাছে। আত্ম-সচেতন হলে প্রেম দুর্বার হয় না. আর প্রেম যদি দুর্বার না হয়, তবে তার চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে। তাই প্রেমের কথাগুলো যন্ত্রণাদায়ক মনে হওয়ায়, ওরা কাজের কথা আলোচনা করতে লাগল। রনীর সঙ্গে ম্যাকব্রাইডও ছিল। যে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো তার অসুখের সময় বলা যায় নি সেগুলো প্রথম শুনল য়্যাডেলা। তার অবাক লাগছিল যখন শুনল যে, মহরমের শেষ দিনে একটা দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়েছিল। মিছিল নিয়ে ওরা সিভিল লাইন্স্-এ ঢোকার চেষ্টা করে। টেলিফোনের তার কেটে দেয়। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মিছিলের মধ্যেও। কিন্তু ম্যাকব্রাইড আর তাঁর পুলিশ বাহিনীর তৎপরতায় ব্যাপারটা বেশিদূর গড়ায় নি। ম্যাকব্রাইডের খুব প্রশংসা করছিল রনী। য়্যাডেলা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারল। মামলাটা এখন আদালতে বিচারাধীন আছে। একজন ভারতীয় উকিল তাকে নাকি জেরা করবে এবং কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অপরাধীকে সনাক্ত করতে হবে তাকে। সব শোনার পর য়্যাডেলা শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস মুর আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন তো?'

'নিশ্চয়ই আমিও থাকব।' বলল রনী। আরও বলল, 'মামলা অবশ্য আমার কোর্টে উঠবে না। ওরা ব্যক্তিগত কারণে আপত্তি করেছে। তবে মামলা চন্দ্রপুরেই থাকছে। একসময় অবশ্য আমার মনে হয়েছিল যে মামলা এখান

থেকে অন্য কোথাও সরে যাবে।'

ম্যাকব্রাইড বলল, 'মিস কোয়েস্টেড বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। মামলা উঠছে দাসের কোর্টে।'

কোন্ দাস? যে একসময় রনীর সহকারী ছিল? মিসেস ভট্টাচার্যের আপন ভাই এই দাস। গত মাসে ভট্টাচার্যদের গাড়ি নিয়ে বিভ্রাটের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যায় নি য়্যাডেলা। তবে দাস লোকটা বুদ্ধিমান এবং ভদ্র। আর সাক্ষী প্রমাণ ঠিকঠাক থাকলে তাঁর বিচারটা যথাযথ হয়। তবে ব্যাপারটার সঙ্গে একটা মর্যাদার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আগে কখনও একজন ভারতীয় জজ-সাহেব কোন ইংরেজ ভদ্রমহিলার বিচার করে নি। স্বভাবতই এ নিয়ে ইংরেজ মহিলা সমাজে একটা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নরের স্ত্রী লেডি মেল্যানবীর নামে চন্দ্রপুরের মহিলারা প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছে।

য়্যাডেলার কাছে ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না। সে শুধু বলল, 'কিন্তু একজন তো কেউ আমার বিচার করবেন!'

'তা ঠিক। ব্যাপারটা ওইভাবে দেখাই উচিত। আপনি ঠিকই বলেছেন মিস কোয়েস্টেড।' বলল ম্যাকব্রাইড।

রনীর মতে এসব হলো গণতন্ত্রের কুফল। আগেকার দিনে ইংরেজ মহিলা-দের প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়িয়ে এজাহার দিতে হত না। কোন ভারতীয় উকিলের দুঃসাহস হত না তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে জেরা করার। কারণ, একজন ইংরেজ মহিলার ব্যক্তিগত মানমর্যাদার প্রশ্নটি এর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এখন দিনকাল বদলেছে—বদলেছে দেশের অবস্থাও। তাই য়্যাডেলার কাছে রনী ক্ষমা চেয়ে নিল। য়্যাডেলা কেঁদে ফেলল। তার অশ্রুসিক্ত মুখ-খানা দেখে রনী ভীষণ উত্তেজিত। ভাবল, হয়ত বা মেয়েটার সম্মানবোধ আহত হয়েছে। ফুলতোলা কাশ্মিরী কার্পেটের ওপর রনীকে উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে দেখে য়্যাডেলা বলল, 'আমি কাঁদছি অন্য কারণে। সেই ঘটনার পর থেকে মাঝে মাঝেই আমি কাঁদি। অবশ্য ইদানিং আমার কান্না অনেক কমে গেছে।' কথা শেষে রুমালে নাক ঝাড়ল য়্যাডেলা। তারপর বলল, 'এবার বোধ হয় আমি ভাল হয়ে উঠব। মাঝে মাঝে কি যে আমার হয়! মনে হয় একটা কিছু করি। আর তখনই কেঁদে ফেলি। তোমাদের উপহাসের পাত্র হই।'

'না না, তা কেন। কান্না দেখে আমরা মোটেই আপনাকে উপহাস করি না। বরং আপনাকে যত দেখছি তত আশ্চর্য হচ্ছি।' অত্যন্ত সরল ভাবে বলল ম্যাকব্রাইড। আরও বলল 'কোনভাবে আপনার উপকারে এলাম না বলে খারাপ লাগছে। কটা দিন আমার বাংলোয় ছিলেন—তাতেই ধন্য হয়ে গেছে আমার বাড়ি...' শেষের কথাগুলো বলার সময় ম্যাকব্রাইডের গলার স্বর আবেগরুদ্ধ হয়ে গেল। বাকীটুকু বলা হলো না। খানিক পরে আবেগ কমলে ম্যাকব্রাইড বলল, 'একটা কথা আপনাকে বলা হয় নি।'

য়্যাডেলা শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল পুলিশ সুপারের দিকে। ম্যাকব্রাইড বলল,

'দিন কতক আগে আপনার নামে একটা চিঠি আসে। তখন আপনি খুবই অসুস্থ। চিঠিটা আমি খুলে পড়েছি। আমার অপরাধ স্বীকার করছি। যদি পারেন ক্ষমা করবেন।'
'কার চিঠি?'
'ফীলডিং-এর।'
'তিনি কেন আমায় চিঠি লিখবেন?'
'সেটাই সবচেয়ে লজ্জার। আসামীপক্ষ তাকে দলে টেনে নিয়েছে। ওদের প্রধান ভরসা এখন সেই।'
রনী অবশ্য তেমন গুরুত্ব দিল না ব্যাপারটাকে। হালকা সুরে বলল, 'আরে ও একটা পাগল, ছিটগ্রস্ত মানুষ! ওর কথা বাদ দিন।'
ম্যাকব্রাইড কিন্তু অতটা লঘু করে ব্যাপারটা দেখছিল না। রনীর কথার জবাবে সে বলল, 'মানুষ ছিটগ্রস্ত হতে পারে কিন্তু তার জন্যে তাকে কি নীচ হতে হবে? মিস কোয়েস্টেডের জানা উচিত ও আপনার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছে। আপনি না বললেও অন্য কেউ জানিয়ে দেবে ওঁকে।' এই বলে ম্যাকব্রাইড সব ঘটনাটা খুলে বলল য়্যাডেলাকে। রনী চুপ করে ছিল। ম্যাকব্রাইড শেষমেষ বলল, 'ফীলডিং এখন ওদের প্রধান খুঁটি বলতে পারেন। যেন আমরা সবাই অত্যাচারী শাসক দলের প্রতিভূ, আর সেই সত্যিকার খাঁটি ইংরেজ।' শুধু উষ্মা নয়, ম্যাকব্রাইডের কথায় ব্যঙ্গও ছিল। ম্যাকব্রাইড বলে চলল, 'ফীলডিং এখন রোজ নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশছে, খবর সংগ্রহ করছে। অদ্ভুত বিচিত্র সব মানুষ এরা। এক মুখ পান চিবোয় আর হাতে আতর মেখে ঘুরে বেড়ায় এরা। কি করে ওরা ফীলডিং-এর মনের নাগাল পেল কে জানে! শুনলুম ওর ছাত্ররা নাকি স্ট্রাইক করেছে। ফীলডিং-কে নিয়ে এত তাদের উৎসাহ যে লেখাপড়াই বন্ধ করে দিয়েছে। সেদিন মহরমের মসয় যে গোলমালটা হলো, সেও তার জন্যে। এই একটা লোক আমাদের সমাজের অনেক ক্ষতি করে দিচ্ছে। চিঠিটা দিন দুই আমার টেবিলে পড়ে ছিল। ইতিমধ্যে আপনার শরীর আরও খারাপ হয়ে যায়। তখন ঠিক করি চিঠিটা খুলব। যদি কাজে লাগার মতন কোন সূত্র পাই।'
'পেয়েছেন কিছু?' ম্যাকব্রাইডের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দুর্বল স্বরে বলল য়্যাডেলা।
'কিছু না। লোকটা নির্লজ্জের মতন আপনাকে উপদেশ দিয়ে লিখেছে আপনি নাকি ভুল করছেন।'
'হয়ত তাই।' এই বলে ফীলডিং-এর চিঠিটা হাতে নিয়ে তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল য়্যাডেলা। খুব সুতর্কতাব সঙ্গে সর্বদিক বেঁধে চিঠিটা লেখা। শুরু করেছে সরাসরি। 'ডাক্তার আজিজ নির্দোষ।' এইটুকু পড়েই হু-হু করে উঠল য়্যাডেলার মন। কাঁপা স্বরে সে বলে উঠল, 'রনী, আমার জন্যে তোমায় কত অপমান সইতে হচ্ছে! এ ঋণ কি দিয়ে শুধব? আমার তো কিছুই দেবার নেই! তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ করার যোগ্যতা আমার হলো না রনী। আমরা কেউ ভাল নই। ভাল হতে কেউ শিখি নি। বরং যা এতদিন

শিখেছি সব ভুল। সব মিথ্যে। হাজার বছর ধরে আমাদের মরুভূমিতে সভ্যতার বাইরে গিয়ে থাকা দরকার। তবে যদি কিছু শিখি। নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে হবে আমাদের। যা শিখেছি তা নিয়ে আমরা কেউ এগোতে পারব না। এগুলোর কোনটাই যথার্থ উপলব্ধি নয়। আমি তোমার যোগ্য নই রনী। আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়াই মঙ্গল। ভেব না যে, ফীলডিংএর চিঠি পড়ে এসব কথা বলছি। ফীলডিং যেমন খুশি ভাবতে পারে, যেমন খুশি লিখতে পারে। কিন্তু তোমার সঙ্গে অমন রূঢ় ব্যবহার করার কোন অধিকার তার নেই। চল, এবার যাওয়া যাক। না। না। আমায় ধরতে হবে না। আমি ভালই হাঁটতে পারছি।'

য়্যাডেলার যাবার সময়টাতে অত্যন্ত স্নেহকাতর হয়ে উঠল মিসেস ম্যাকব্রাইড। এই কদিনে অবশ্য মহিলার ঘনিষ্ঠতাটা একটুও ভাল লাগে নি য়্যাডেলার। কোন ব্যাপারেই তার সঙ্গে মিল হয় নি। অথচ দিনের পর দিন এদের নিয়েই তাকে থাকতে হবে। যতদিন না এদের স্বামীরা কাজ থেকে অবসর নিচ্ছে ততদিন অব্দি য়্যাংলো-ইণ্ডিয়া সমাজের আসল স্তম্ভ হলো এই সব মহিলা-রাই। ভালই হলো এই সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলার অভিনয় তাকে করতে হবে না। তার পথ আলাদা এবং এই পৃথক যাত্রাপথটি সে আগেই স্থির করে নিয়েছে। মিসেস ম্যাকব্রাইডের আন্তরিক বিদায় সম্ভাষণের উত্তরে তাকেও ধন্যবাদ দিতে হলো। মিসেস ম্যাকব্রাইডও উৎসাহিত হয়ে বলল, নিশ্চয়ই! আমাদেরই পরস্পরকে দেখতে হবে যেমন সুখের দিনে তেমনি দুঃখের দিনেও। 'ফুল-আর কাঁটা পাশাপাশিই থাকবে।' মিসেস ম্যাকব্রাইডের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল আহ্লাদী ডেরেক। মামলায় সাক্ষী দেবার জন্যে ডেরেককে এখন চন্দ্রপুরে থাকতে হচ্ছে। তাই মুকুল স্টেটের মোটর গাড়িটা সে ফেরত পাঠিয়ে দেয় নি। গাড়ির শোকে মহারাজা আব রানীমা কেমন শোকার্ত হবেন, তার একটি মজাদার বাস্তব ছবি সে হাস্যোদ্দীপক ভাবে বর্ণনা করছিল। হাসি ঠাট্টার মধ্যে পরিবেশটা হালকা করবার চেষ্টা করছিল ডেরেক। অবশেষে বিদায়ের পালা এল। য়্যাডেলাকে চুম্বন করে ওরা বিদায় জানাল। তাকে নিয়ে রনী যখন গাড়িতে উঠল, তখন সবে সূর্যোদয় হচ্ছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রোদের তাত বাড়বে ; তখন মানুষের চলাফেরাও সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে। তাই উষা লগ্নেই ওরা বেরিয়ে পড়ল।

ফেরার পথে রনীর মনে হলো য়্যাডেলার কাছে মিসেস মুরের বর্তমান মনের অবস্থাটা যথাযথ বলে দেওয়া দরকার। একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল, তবুও সে-ই কথাটা পাড়ল। 'শোন য়্যাডেলা! মা তোমায় দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছেন ঠিকই। তবে তিনি বুড়ো মানুষ, যেমন ব্যবহার আশা করছ তেমন ব্যবহার না পেলে নিরাশ হয়ো না।'

য়্যাডেলা চুপ করে শুনল, কিন্তু তখনই কোন কথা বলল না। মিসেস মুরের সঙ্গে তার সম্পর্কটা যে ঠুনকো নয়, তা কি জানে না রনী? যা-ই ঘটুক না কেন, এত সহজে সে সম্পর্কের সুর কেটে যাবে না। তাই অল্পক্ষণ চুপ করে থাকার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে য়্যাডেলা বলল, 'বল, কি করলে তোমার

সুবিধে হবে' এতটা আশা করে নি রনী। অভিভূত স্বরে আদর করে বলল, 'আমার সোনা মেয়েটা! শোন! মা আজকাল বেশ খিটখিটে হয়ে গেছেন। দেখলেই বুঝতে পারবে। আমাদের পরিবারের সবাই এইরকম খিটখিটে মেজাজের। আমি নিজেও এইরকম। তাই মা'র কাছে যতখানি আবদার করি তা না পেলে মেজাজ রুক্ষ হয়ে যায়। আমার ধারণা, তোমার মনের মতন হবার চেষ্টা করলেও, সবটুকু হতে পারবেন না তিনি। তাই বলছি বেশি চেও না, তাতে নিরাশ হবে না।'

রনীর বাংলোটা সামনেই দেখা যাচ্ছে। ঠিক ম্যাকব্রাইডের বাংলোর মতন। হুবহু এক। ওই রকমই লাল রংয়ের জমকাল গম্ভীর চেহারা। ওরা ঘরে ঢুকে দেখল একটা সোফায় বসে আছেন মিসেস মুর। কেমন শক্ত রূঢ় মুখের ভাব। ওরা ঢুকতে তাকিয়ে দেখলেন, উঠে দাঁড়ালেন না। য়্যাডেলা সত্যিই আশ্চর্য হলো। 'তোমরা দুজনেই এলে তা হলে?'

য়্যাডেলা তাঁর পাশে বসে পড়ল, তারপর বৃদ্ধার হাতটা টেনে নিল। বৃদ্ধা সরিয়ে নিলেন তাঁর হাত। বৃদ্ধার শক্ত ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ য়্যাডেলাও সরিয়ে নিল নিজেকে। মায়ের আচরণে রনীও বিরক্ত হয়েছিল। তবুও যথাসম্ভব শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ মা? যাবার সময় তো ভালই দেখেছিলাম।'

'আমি ভাল আছি।' গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন বৃদ্ধা। আরও বললেন, 'ফেরার টিকিটটা কবে পাব তার অপেক্ষা করছি। টিকিটটা সব জাহাজেই চলবে। ফলে আমি অনেকগুলো ফেরার জাহাজ পাব।'

'তোমার ফেরার কথাটা পরে আলোচনা করলে হয় না!'

'না। র‍্যাল্‌ফ্‌ আর স্টেলা আমার ফেরার অপেক্ষায় বসে আছে।'

'তাব অনেক সময় আছে মা। সে সব পরে ঠিক করা যাবে। এখন বল য়্যাডেলাকে কেমন দেখছ।'

মিসেস মুর কিছু বলার আগেই য়্যাডেলা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমি কিন্তু আপনার ভরসাতেই এখানে এসেছি। আপনার কাছে আবার আসতে পারলুম এ আমার অনেক ভাগ্য। এখানে আর সবাই আমার অপরিচিত।'

কিন্তু য়্যাডেলার এই আকুলতা বৃদ্ধাকে এতটুকু স্পর্শও করল না। বরং এক ধরনের অসন্তোষ ফুটে উঠল তাঁর মুখে। আগের সেই সদয় স্নিগ্ধতা আর নেই। যেন হারিয়ে গেছে ধর্মভীরু মানুষের সেই স্নেহকোমল ভাব। পরিবর্তে ব্যবহারের মধ্যে ফুটে উঠেছে একটা অন্য রকমের উগ্রতা। কত ঘটনা ঘটে গেছে সেদিনের পর থেকে। আজিজ গ্রেফতার হয়েছে। মহরম নিয়ে দাঙ্গার আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এত যে ঘটনা ঘটল তা নিয়ে একটা প্রশ্নও করেন নি বৃদ্ধা। সমস্ত মানব জাতির বিরুদ্ধে একটা তীব্র আক্রোশ নিয়ে নিঃশব্দ হয়ে ছিলেন। এমনকি মহরমের রাত্রে সেদিন যখন রনীর বাংলো আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, সেদিনও এতটুকু বিচলিত হন নি। রনীর অনুরোধ সত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে নড়েন নি। য়্যাডেলা ফের বলল, 'সেদিনকার ঘটনাটা হয়ত এমন কিছু নয়। অন্তত আমি জানি না কোথায় কি হয়েছিল।'

রনী ভাবল, য়্যাডেলার আক্ষেপটা যে কোথায় তা সে বুঝতে পেরেছে।

তার সঙ্গে কথা বলে রনী প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিল যে য়্যাডেলা নিশ্চিতভাবে গুহাটাকে চিনতে পারে নি। এটাও ঠিক যে নির্দিষ্ট করে বলতে না পারলে সাক্ষ্য টিকবে না। প্রতিপক্ষের জেরার মুখে ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে উঠবে। সুতরাং য়্যাডেলাকে আশ্বস্ত করা দরকার। তাকে বলা দরকার যে ইতিমধ্যেই এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে। গুহাগুলো একরকম দেখতে বলে গুহার বাইরে সাদা রঙ দিয়ে নম্বর লেখার ব্যবস্থা হচ্ছে। রনীর কথা শুনে য়্যাডেলা বলল, 'আমিও ঠিক ওই কথাই বলতে চেয়েছিলুম। তবে গুহার ভেতরের সেই প্রতিধ্বনির শব্দটা যেন এখনও কানে লেগে আছে।'

মিসেস মুর তাকালেন। এই প্রথম মনোযোগ দিলেন ওদের কথায়। য়্যাডেলার দিকে চেয়ে বললেন 'ও! কি ভয়ংকর সেই শব্দ!' তাঁর কথায় মনে হলো, বোধহয় শব্দটা এখনও তাঁর কানে বাজছে।

য়্যাডেলাও সেই কথাই বলল। 'কিসের সেই শব্দ জানি না তবে তা থেকে কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছি না আমি।'

'বোধহয় পাবেও না।'

'আপনি জানেন কিসের ওই শব্দ ?'

'তুমি জান না ?'

'না। কিসের শব্দ ? য়্যাডেলা কৌতূহলী হলো। বলল 'আমার মনে হয়েছিল আপনি ব্যাপারটা জানেন। আপনার কাছ থেকেই শুনব আমি।'

মিসেস মুর খুব একটা উৎসাহ দেখালেন না। উদাসীন ভাবে বললেন, 'যখন জান না, তখন আর জেনে কাজ নেই। আমি বলতে পারব না।'

য়্যাডেলা আহত হলো। বলল 'অমন নিষ্ঠুর হবেন না আমার ওপর, প্লিজ!'

কিন্তু মিসেস মুর যেন নতুন করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন হ্যাঁ, বল, নিষ্ঠুরই বল তোমরা। যা খুশি বল। আমি তো শুনতেই এসেছি। সারা জীবনটা শুধু শুনেছি আর জ্বলেপুড়ে মরছি। যত বলেছি তার চেয়ে ঢের বেশি শুনেছি। কিন্তু আর শুনতে পারছি না। এবার তোমরা আমায় একটু শান্তি দাও। আর অমন করে দগ্ধে মেরো না। আমি জানি, তোমরা চাইছ আমি মরি। তবে এখুনি মরতে চাই না আমি। আমার কিছু কাজ আছে। তোমাদের বিয়ে হোক, আমার আর দুই ছেলেমেয়ের বিয়ে থা চুকুক, তারপর নিজেই একদিন আমার মনের গুহায় হারিয়ে যাব। কথা বলব না, শুনবও না।' ম্লান একটু হাসলেন বৃদ্ধা। তারপর শান্তস্বরে বললেন 'এমন নিভৃত একটা স্থান কি পাব না যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারি ? তোমাদের কৌতূহলেরও জবাব দিতে হয় না ?'

মিসেস মুরের দার্শনিক উক্তি রনীর ভাল লাগছিল না। সে উত্তপ্ত স্বরে বলল, তা না হয় হলো। কিন্তু যে মামলাটা এখন চলছে, যেখানে আমরা সবাই ঠিক করছি যে ভিন্নমত হব না, সেখানে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তুমি কি এইসব কথা বলবে নাকি ?'

'কাঠগড়ায় আমি কেন দাঁড়াব ?'

'আমরা যে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করব সেগুলো তুমি সমর্থন করবে।'
বৃদ্ধা আবার রেগে উঠলেন। বললেন, 'তোমাদের ওই সব মোকদ্দমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমায় ওর মধ্যে টেন না।'
অপ্রস্তুত য়্যাডেলা রনীর উদ্দেশে বলল, 'সেই ভাল। আমি চাইছি না ওঁকে এর মধ্যে আনতে। আমার জন্যে ইতিমধ্যেই ওঁর অনেক অশান্তি হয়েছে। ওঁর সাক্ষীর কোন দরকার নেই।' কথাটা বলে য়্যাডেলা ওঁর হাত ধরতে গেল। কিন্তু এবারও তিনি হাতটা টেনে নিলেন।
রনী তখনও উত্তেজিত। তবুও যথাসম্ভব সংযত স্বরে বলল, 'আমি ভেবে-ছিলুম তুমি নিজে থেকেই সাক্ষী দিতে রাজী হবে। তোমাকে কেউ জোর করছে না। কিন্তু এটা তো ঠিক যে প্রথম গুহাটার ভেতরে ঢোকার পরেই তুমি অসুস্থ হয়ে পড়! যদি অসুস্থ না হতে তাহলে নিশ্চয়ই তুমি ওর সঙ্গে থাকতে, কোন দুর্ঘটনাও হতো না। লোকটা এইরকম প্ল্যানই করেছিল। আর তুমিও ফীলডিংএর মতন ওর ফাঁদে পা দিয়েছ। একটু চুপ করে রনী ফের বলল, 'আদালত সম্বন্ধে তোমার বিদ্বেষের কোন কারণই নেই। সে অধিকারও তোমায় কেউ দেয় নি। ইচ্ছে করলে তুমি সাক্ষী না দিতেও পার। তবে শরীর যখন তোমার সুস্থ, তখন তোমার সাক্ষী দেওয়াই উচিত এবং আমরাও তাই মনে করি।'
রনীর কথায় ব্যস্ত হয়ে উঠল য়্যাডেলা। তাড়াতাড়ি উঠে এল বৃদ্ধার কাছে। তারপর বৃদ্ধার একটা হাত ধরে আন্তরিকভাবে বলে উঠল, 'না রনী। ওঁকে আর কষ্ট দিও না। ভাল থাকুন আর না থাকুন ওঁকে আর এর মধ্যে টেন না।' কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল য়্যাডেলা তারপর ধপ করে আবার সোফায় বসে পড়ল। রনী মনে মনে খুশি হয়েছিল। কারণ বুড়ো মানুষের মনের হাবভাব বুঝে কথা বলছিল য়্যাডেলা। আসলে সে নিজেও তার মায়ের কাছে সহজ হতে পারে না। বাইরের মানুষের কাছে করুণাময়ী হলেও মানুষটি বেশ শক্ত ধাতের। এবং এদেশে এসে মা যেন আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছেন।
নিজের পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বৃদ্ধা বললেন, 'তোমাদের বিয়ের সময় থাকব। তবে কাঠগড়ায় দাঁড়াব না। তখন আমি ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাব।'
'কিন্তু তুমিই বলেছিলে যে মে মাসে তুমি ইংল্যাণ্ডে ফিরবে না।' খানিকটা রাগ করেই বলল রনী।
'আমি মত বদলেছি।'
সক্রোধে মায়ের দিকে তাকাল রনী। তারপর বলল, 'ঝগড়া আমি করব না। কিন্তু মনে হচ্ছে সব জেনেও ইচ্ছে করে তুমি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছ। বেশ তাই হবে।' বৃদ্ধা স্থির চোখে ছেলের উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়েছিলেন। পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কেন বুঝতে চাইছ না বাবা, এই শরীরটাই বাদ সাধছে! আমি হাঁটতে পারি না, কাজ করতে পারি না। মাথায় যন্ত্রণা হয়, চলতে হাঁপ ধরে। সব সময় তোমাদের দরকারে আমায় লাগাতে চাইছ। তোমাদের সব কাজের ধকল তুলে দিয়েছ আমার ঘাড়ে।

কিন্তু কেন? কেন আমার স্বাধীন ইচ্ছে থাকবে না? কেন আমার নিজের মতে চলতে ফিরতে কাজ করতে কথা বলতে পারব না? কেন তোমরা আমায় শান্তি দেবে না?' কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে কেমন যেন নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন বৃদ্ধা। কঠিন স্বরে বললেন, 'বিয়ে তো একটা অর্থহীন অনুষ্ঠান! বিয়ে যদি যথার্থই মন বোঝাবুঝি হত, তাহলে হাজার বছর আগেই সমস্ত মানবজাতি একটা মানুষে পরিণত হত। কিন্তু তা হয় নি। অথচ প্রেম-ভালবাসা নিয়ে আবেগের আবর্জনা জমেই চলেছে। গির্জায় প্রেম, গুহায় প্রেম—সর্বত্রই এই পরিহাস চলছে। আর এই তুচ্ছ মান অভিমান দেখতে তোমাদের দরকারের বলি হয়ে থাকতে বলছ আমায়। কিন্তু কেন?'

রনী স্তম্ভিত। উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'কি চাইছ তুমি, বলবে তো?'

এক পলক তাকালেন বৃদ্ধা। তারপর আশ্চর্য স্বরে বললেন, 'কিছু না। আমার তাসটা দাও।'

রনী তখনও উত্তেজিত। বৃদ্ধা উঠে গেলেন। একধারে য়্যাডেলা বসে নিঃশব্দে কাঁদছে। অসহায় দেখাচ্ছিল তাকে। হঠাৎ রনী দেখল শার্সির ওপাশে মালিটা যেন কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে। রনীও যেন কেমন অসহায় হয়ে উঠল। একমুহূর্ত চুপ করে বসে রইল সে। তার মনে হচ্ছিল কেন সে বৃদ্ধাকে এদেশে এনেছে? বৃদ্ধার মানসিকতাও জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। আর যদিও তিনি এলেন কেন তাঁকে সে তাদের ব্যাপারে অনধিকার প্রবেশ করতে দিল? না, ওঁর ব্যাপারে আর তার কোন দায়িত্ব রইল না।

রোরুদ্যমানা য়্যাডেলার বিষণ্ণ চেহারাটা যত দেখছে ততই খারাপ লাগছিল রনীর। একসময় সে তার কাছে উঠে এল। তারপর অনুতপ্ত স্বরে বলল, 'এমন নিষ্ঠুর একটা অপমানকর অবস্থার মধ্যে যে তোমায় পড়তে হবে তা জানতাম না য়্যাডেলা। মা যেন ঝগড়া করবার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।'

য়্যাডেলা আর কাঁদছে না। তবে মুখের চেহারাটা কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। একটা বীভৎস দৃশ্যের আধখানা যেন দেখছে সে। আর বাকী আধখানা যেন পরম স্বস্তির ছবি। সেই অবস্থাতেই আনমনে সে বার কয়েক আজিজের নাম উচ্চারণ করল। রনীর অবাক লাগছিল। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে ওরা কেউ মানুষটার নাম ভুলেও উচ্চারণ করে নি। নামটার সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেছে সেই অশুভ ঘটনাটা। তাই য়্যাডেলার মুখে আজিজের নাম শুনে রনী একটু অবাকই হলো যেন। রনী তাকিয়ে আছে দেখে য়্যাডেলাই কথাটা তুলল। আপন মনে বলে উঠল, 'আজিজ......আমি কি ভুল করেছি?'

'তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত য়্যাডেলা। তোমার বিশ্রাম দরকার।' রনী বলল।

'মনে হচ্ছে ভীষণ একটা ভুল করেছি আমি। আজিজ নির্দোষ।'

'তুমি এখন একটু বিশ্রাম কর য়্যাডেলা। প্লিজ।' রনী ঘরের চারপাশে তাকাল। দুটো চড়াই দৌড়োদৌড়ি করছে। বাধ্য অনুগত মেয়েটির মতন য়্যাডেলা তখন রনীর হাত দুটো ধরেছে। রনী আলতো একটু চাপ দিল। তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল যেন। য়্যাডেলা হঠাৎ বলল, 'জান রনী! আমি এখন সেই ভুতুড়ে শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি না।'

ঠিক হবে! দেখ না আর ক'দিনেই তুমি একেবারে ভাল হয়ে উঠবে। মামলার সময় তোমায় সুস্থ থাকতেই হবে। তাছাড়া আমরা তো তোমার পাশেই আছি।'

'কিন্তু রনী! আমার মনে হয় এ মোকদ্দমা না হলেই ভাল হত।'

'কেন বলছ এ কথা? তুমি কি বুঝতে পারছ না কত বড় অপরাধ ঘটতে যাচ্ছিল?'

'কিন্তু আজিজ তো অপরাধী নয়! তবে কেন সে শাস্তি পাবে? ওকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত।'

হঠাৎ অসহ্য জ্বরে মানুষ যেমন কেঁপে ওঠে তেমনি কেঁপে উঠল রনীর শরীরটা। আজিজ সম্বন্ধে য়্যাডেলাব ধারণাটা যে ভুল তা বোঝাতে সে বলল, 'ওকে ছেড়ে দেওয়াই হযেছিল কিন্তু শান্তি শৃঙ্খলা রাখতে ওকে আবার জেলে পুরতে হয়েছে।' য়্যাডেলা ঘটনাটা জানত না। অবাক হয়ে চেয়ে ছিল সে। রনী তখন ঘটনাটা বলল। মহরমের ক'টা দিন আগে নবাব বাহাদুরের গাড়িটা নিয়ে নুরুদ্দিন আর আজিজ নাকি হাওয়া খেতে বেরোয়। জোরে গাড়ি চালাতে গিয়ে রাস্তার ধারে একটা খাদের মধ্যে গাড়িটা উল্টে পড়ে। তারপর পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে। আহত নুরুদ্দিনকে মিণ্টো হাসপাতালে পাঠিয়ে আজিজকে আবার হাজতে পুরে দেয় পুলিশ।

'কেন?'

'সে নাকি চিৎকার চেঁচামেচি করে মানুষের শান্তিভঙ্গ করছিল।'

গল্পটা শুনে য়্যাডেলা যেন কিরকম হয়ে গেল। রনী তাকিয়েছিল তার দিকে। হঠাৎ সে উঠে গেল। তারপর পাশের ঘর থেকে মেজর ক্যালেণ্ডারকে ফোন করে বলল যেন সময় করে সে একবার য়্যাডেলাকে দেখে যায়। ফিরে এসে রনী স্তম্ভিত। কেমন অস্থির হয়ে তাকিয়ে আছে য়্যাডেলা। সারা চোখেমুখে দারুণ বিধ্বস্ত একটা ভাব। রনী আসতেই তার ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল য়্যাডেলা। তারপর রনীর হাতখানা ধরে মিনতি করে বলল, 'শুনলে তো মা কি বলে গেলেন?'

'কি বলে গেলেন?'

'আজিজ সম্পূর্ণ নির্দোষ। কথা দাও তাকে ছেড়ে দেবে?'

'মা একথা বলেন নি। তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি।' বেশ জোর দিয়ে বলল রনী।

'কিন্তু আমি যে নিজের কানে শুনেছি তা?'

'ভুল শুনেছ। সম্পূর্ণ ভুল। ওটা তোমার মনের ভ্রম। তাছাড়া তোমাব যা মনের অবস্থা তাতে অমন একটা ধারণা বানিয়ে বলাও তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'হয়ত তাই।'

রনী আরও বলল 'শোন, সোনা মেয়ে! মা যা বলেছেন সব আমি শুনেছি অন্তত যেটুকু শোনার মতন তা শুনেছি। সব শুনে আমার ধারণা হয়েছে, মা'র অনেক চিন্তাই অসংলগ্ন। মা'র ভাবনাচিন্তা আর প্রকৃতিস্থ নয়।'

য়্যাডেলা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'শেষের দিকে যখন ওঁর গলার স্বর নেবে এসেছিল, যখন প্রেম ভালবাসা নিয়ে কথা বলছিলেন, তখনই উনি বললেন, "আজিজ এ কাজ কখনই করতে পারে না।"

রনী তখন স্তব্ধবাক হয়ে গেছে। অবাক হয়ে বলল, 'তিনি ওই কথাটা বললেন?'

'ঠিক হুবহু ওই কথাটা নয়। তবে ওই ভাবটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল তাঁর কথার মধ্যে।'

'ভাব!' রনী অনেকখানি স্বস্তি পেয়েছে মনে হলো। ফের বলল, 'শোন য়্যাডেলা! এটা তোমার মনের ভুল। আমরা কেউই ওই নামটা ভুলেও উচ্চারণ করি নি। ফীলডিংএর চিঠির মধ্যে ওর নামটা ছিল। তুমি তাই গোলমাল করে ফেলেছো।'

রনীর কথায় য়্যাডেলা বুঝতে পারল যে ভুলটা সে-ই করে ফেলেছে। ফীলডিংএর চিঠির কথা মনে পড়ল তার। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ঠিক বলেছ তুমি। অনেক ধন্যবাদ তোমায়। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল কোথায় যেন নামটা শুনেছি। তুমি পরিষ্কার করে দিলে ব্যাপারটা। নইলে মনে ভীষণ অশান্তি হত। ভাবতাম বুঝি মনের রোগ ধরেছে আমার।'

রনী আরও কাছে সরে এল য়্যাডেলার। তারপর গভীর প্রেমের সঙ্গে বলল, 'তাহলে যেখানে সেখানে যখন তখন বলে বেড়িও না লোকটা নির্দোষ। তাতে আমাদের মামলার ক্ষতি হবে। আমার বাড়ির প্রত্যেক চাকরটা স্পাই। তারা ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে যাতে ওদের মনোমত খবর যোগাড় করতে পারে।' বলতে বলতেই প্রায় ছুটে সে জানলার কাছে গেল। মালিটা নেই, তবে দুটো বাচ্চা ছেলে জায়গাটার জিম্মা নিয়ে বসে আছে। যদিও ওদের ইংরিজি জানা অসম্ভব, তবুও ধমক দিয়ে ওদের তাড়িয়ে দিল রনী। ফিরে এসে রনী বলল, 'এরা সবাই এখন আমাদের ঘেন্না করছে। তবে মামলা মিটে গেলে ওদের যা বলব তাই ওরা বুঝবে। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন ওরা জলের মতন টাকা খরচ করবে খবর সংগ্রহের জন্যে। সুতরাং আমাদের এখন খুবই সতর্ক থাকতে হবে। একটা ভুল পদক্ষেপ হলেই, সেটা ওদের স্বপক্ষে চলে যাবে। ওরা বলে বেড়াবে যে পুরো ব্যাপারটাই সাজান। এর মধ্যে এতটুকু সত্য নেই। কি বলতে চাইছি নিশ্চয়ই তা বুঝেছ?'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই মিসেস মুর ফিরে এলেন। সেই রকমই বিরক্ত রাগী মেজাজ। ধপ করে তাস খেলার টেবিলের পাশে বসলেন। রনী ভাবল মিসেস মুরকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করবে যে আজিজের নাম তিনি করেছেন কি না। বৃদ্ধা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি। পরে বুঝিয়ে বলতে বিরক্ত স্বরেই বললেন, 'না। ওর নাম আমি করি নি।' বলে পেশেন্স খেলতে লাগলেন।

অপ্রস্তুত একটু হেসে রনী বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, তুমি হয়ত বলেছ যে আজিজ নির্দোষ। কিন্তু কথাটা ফীলডিং তার চিঠিতে লিখেছে। তুমি বল নি।'

'বলি নি কিন্তু এখন বলছি। আজিজ সম্পূর্ণ নির্দোষ।'
অত্যন্ত উদাসীনভাবে কথাটা বলে বৃদ্ধা আবার তাস খেলতে লাগলেন। বৃদ্ধার কথাটা কানে যেতেই চকিত হলো য়্যাডেলা। রনীর দিকে চেয়ে বলল, 'দেখলে রনী, আমি ঠিকই বলেছিলাম।'
'না। তুমি ঠিক বল নি। মা সে কথা কখনও বলেন নি।'
'বলেন নি। কিন্তু ভেবেছিলেন।'
'ওঁর ভাবা বা না ভাবায় কি এল গেল! উনি অনেক কিছু ভাবতে পারেন। ফীলডিংও ভাবতে পারে যা খুশি। কিন্তু আদালতের কাছে যা গ্রাহ্য হবে তা প্রমাণ।'
'আমি তা জানি। কিন্তু—'
মিসেস মুর দুজনের দিকেই বিরক্ত চোখে তাকিয়েছিলেন। বললেন 'স্পষ্টই বুঝতে পারছি তোমরা চাও যে আমি কথা বলি। তাই কি?' উদ্ধত স্বরে রনী বলল, 'যদি যুক্তির কথা হয় তবে বলতে পার।'
বৃদ্ধা চুপ করে ভাবছিলেন। একটু আগেই এদের প্রেম ভালবাসা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। অনুভবময় মনটা অনেক দূর থেকে তাকিয়েছিল এদের দিকেই। সেই মনটাই এখন কথা বলল। রনীর উদ্ধত প্রশ্নের জবাবে শান্তভাবে বললেন, 'কেন বার বার তোমাদের ব্যাপারে আমায় টেনে আনছ? আমার কাছে এসব এখন মূল্যহীন। আমি মুক্তি পেতে চাই তোমাদের হাত থেকে। কে বা কারা গুহার মধ্যে ছিল সে ভাল না মন্দ, এসব আমার কাছে অনাবশ্যক খবর। তারপর সেই প্রতিধ্বনির শব্দ......'
বৃদ্ধার কাছে এসে দাঁড়াল য়্যাডেলা। তারপর বলল, 'ভয়ঙ্কর শব্দটা আর শুনতে পাচ্ছি না। আপনিই তাড়ালেন শব্দটা। আপনি কখনও ভাল বই মন্দ করেন না কারও। কত ভাল আপনি।'
বৃদ্ধা ততক্ষণে অনেক শান্ত হয়ে গেছেন। টেবিলের ওপর তাস সাজাতে সাজাতে বললেন, 'না মা আমি ভাল লোক নই। আমি খারাপ ভীষণ খাবাপ। একটা বদ স্বভাবের বুড়ি যাকে কেউ ভালবাসে না। তবে ছোট ছেলেরা আমায় ভালবাসে। ওই ভারতীয় যুবকটিও আমায় ভালবাসে। ওর সঙ্গে মসজিদে দেখা হয়েছিল। আমি চাই সে সুখী হোক। এরা সাধারণ মানুষ। এরা সুখী হতে চায়। কিন্তু তাদের কাছে এগুলো যেন স্বপ্ন। কিন্তু যে অপরাধ সে করে নি তার সাজা সে পেতে পারে না। এ ব্যাপারে তোমায় আমি সাহায্য করতে পারব না, মা। হয়ত এটা আমার মন্দ কাজ। কিন্তু আমার এই মন্দটা তোমারটার চেয়ে ঢের ভাল।'
বৃদ্ধার শেষ কথাটা রনীর রক্তে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। ছেলেমানুষের মতন উত্তেজিত হয়ে ওপরওলার আদেশ দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'আসামীর পক্ষে যদি তোমার তেমন কিছু বলার থাকে তাহলে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই তা বলো। কেউ তোমায় বাধা দেবে না।'
'আমি শুনেছি এখানকার সব মানুষ, তা সে ইংরেজ বা ভারতীয় যে-ই হোক, ওর সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করে। এমন একজন মানুষ অত নীচ

কাজ করতে পারে না।' বললেন বৃদ্ধা।
'ওটা কোন যুক্তিই নয়। আর হলেও অত্যন্ত দুর্বল। তাছাড়া এরকম সাক্ষ্য দিলে য়্যাডেলার প্রতি অবিচার করা হবে।' রনী বলল।
য়্যাডেলাও তখন যেন কেমন হয়ে গেছে। রনীর কথায় সায় দিল। বলল, 'ঠিক কথা। আমি যদি সেদিন ভুল করতাম তাহলে তা মারাত্মক হত। আমায় মরতে হত তাহলে।'
'ঠিক এই কথাটাই তোমায় আমি বলতে চেয়েছিলাম য়্যাডেলা। তুমি ঠিকই তাকে চিনেছ। এখানকার সবাই জানে সে কথা।'
য়্যাডেলা কিছুটা যেন মোহগ্রস্ত। বলল, 'হ্যাঁ সেই-ই......উঃ কি ভয়ঙ্কর! সেই-ই আমার পেছনে পেছনে গুহার মধ্যে ঢোকে। কিন্তু কোনভাবে তুমি কি মামলাটা তুলে নিতে পার না? ওই সাক্ষী দেওয়ার কথা শুনলেই আমার ভয় হয়। মেয়েদের কত অসুবিধে তা তো তুমি জান! কত আর বলব তোমায়?'
'হ্যাঁ। জানি। সব জানি। কিন্তু মামলা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দায়ের হয়ে গেছে। আর সে মামলা তুলে নেওয়া যায় না। মামলা এখন নিজের গরজেই চলবে।'
রনীর শক্ত কথাগুলো শুনতে শুনতে য়্যাডেলা প্রায় কেঁদে ফেলল। হায়! আর কিছুই সে কি করতে পারবে না? রনীর মাথায় তখন অন্য ভাবনা। জাহাজ কোম্পানীর লিস্টটা দেখতে দেখতে সে ভাবছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিসেস মুরকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে সে। এখানে থেকে তিনিও কারও উপকার করবেন না। তাঁর নিজের নয়, তাদেরও নয়।

২৩

চন্দ্রপুরের ইংরেজ মহিলাদের সই করা যুক্ত আবেদন পেয়ে লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের পত্নী লেডি ম্যালানবী খুশি হলেন খুব। কিন্তু তাঁর কিছু করার ছিল না এ ব্যাপারে। তাছাড়া দিনকয়েকের মধ্যেই ইংল্যান্ড ফিরে যাচ্ছেন তিনি। সেই নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তবে লেডি ম্যালানবী চমৎকার মহিলা। কোন না কোনভাবে সাহায্য করতে তিনি যে প্রস্তুত সে কথা জানাতে ভুল হয় নি তাঁর। মিসেস টার্‌টন্‌ তাই আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে জানিয়েছেন যদি কোনভাবে মিসেস মুরের ইংল্যান্ড ফিরে যাবার একটা ব্যবস্থা তিনি করেন। গভর্নরের পত্নী হলেও পি এ্যাণ্ড ও জাহাজ কোম্পানির আসন সংখ্যা বাড়াবার কোন ক্ষমতা মহিলার ছিল না। তবে একেবারে নিরাশও তিনি করলেন না। মিসেস টার্‌টন্‌কে জানালেন যদি বৃদ্ধার আপত্তি না হয় তবে

তাঁর নিজের কেবিনে সহযাত্রীনীরূপে মিসেস মূর তাঁর সঙ্গী হতে পারেন। রনী হ্যাস্‌লপের কাছে এ সৌভাগ্য যেন আশাতিরিক্ত। অজ্ঞাত কুলশীল মিসেস মূরের প্রতি গভর্ণরের পত্নী যে এতখানি সদয় হবেন, তা কে ভেবেছিল? রনীর মনে হলো সব দুঃখেরই সান্ত্বনা থাকে এবং ঈশ্বরদত্ত এই দান যেন সেই কথাই প্রমাণ করে। ঈশ্বর যথার্থই মঙ্গলময়। তাছাড়া বৃদ্ধা সম্বন্ধেও তার মনে কিঞ্চিৎ গর্ববোধ হচ্ছিল। য়্যাডেলার ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারী মহলে সে খানিকটা পরিচিত হয়ে গেছে। এখন মিসেস মূরের এই অভাবনীয় সৌভাগ্যলাভে সেই পরিচয়টাই আরও ঘন হয়ে উঠল। সংসারে এইরকমই ঘটে। যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে একজন চেনা জানা সাধারণ মানুষ রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যায়, তখন সব মহলেই তার খাতির সম্মান অনেকখানি বেড়ে যায়। এই ঘটনার পরে মিসেস মূরও নিজের ছেলের কাছে এমনি অসাধারণ হয়ে উঠলেন। তার মা যে নেহাৎ তুচ্ছ ব্যক্তি নন, সরকারী ওপর মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যোগ্যতা যে তার আছে মিসেস মূর যেন ছেলের কাছে তা নতুন করে প্রমাণ করলেন।

মিসেস মূরেরও সাধ মিটল। যা চেয়েছিলেন তাই হতে চলেছে। মামলা, বিয়ে এবং গ্রীষ্মের দাবদাহ—তিনটেই এড়িয়ে যেতে পারলেন তিনি। মান মর্যাদা নিয়েই দেশে ফিরতে পারবেন। ছেলেমেয়েদের দেখেও মনটা ভরবে। তবে ব্যাপারটা নিয়ে সোরগোল করতে চাইলেন না তিনি। আজকাল কোন কিছু নিয়েই তিনি উচ্ছ্বসিত হন না। সংসারেব ভয়াবহ দিকের ছবির সঙ্গে সংসারের ক্ষুদ্রতা নীচতাব ছবিও দেখেছেন। এই ছবির সঙ্গে জুড়ে থাকতে দেখলেন শত মানুষকে। এরা সবাই প্রমাণ বুদ্ধিব মানুষ। কিন্তু কী ভয়ংকর, নীচ, স্বার্থপর এরা। পৃথিবীটা যখন আমাদেব মনোমত হয় না, তখনই আমরা কোথাও না কোথাও আশ্রয় খুঁজে নিতে চাই। সেটা স্বর্গ নবক বা অস্তিত্ববিনাশী অন্য কোন লোক হতে পারে। আসলে পৃথিবী বা সংসারটা ভাল না লাগলে আমবা এইবকম কোথাও ঠাই নিতে চাই। আবার যখন পৃথিবী ভাল লাগে, মনোমত হয় সংসার তখন মনে হয় এই জীবনটাই সব। পৃথিবীর বাইয়ে অন্য কোন লোকের অস্তিত্ব মেনে নিতে আমাদের বাধে। কিন্তু আলো-ছায়ার প্রদোষে একটা আধ্যাত্মিক বিহ্বলতা মনকে আচ্ছন্ন করে। সেটা এমন এক মানসিক অবস্থা যা ভাষা দিয়ে বোঝান যায় না। সে অবস্থায় পেঁছিলে মনের কেমন যেন একটা জড়তা আসে। আদিঅন্তহীন একটা আধ্যাত্মিক নিশ্চেষ্টতা যার কাছে মন প্রাণ সঁপে দিতে সাধ যায়। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়ে এমন একটা ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছিল মিসেস মূরের মধ্যেও। তারপর যখন কল্লোলিনী গঙ্গার প্রবাহ দেখলেন, দেখলেন দুকূল ছাপানো মসজিদের জলধারাটা কিংবা রাত্রির শাল দিয়ে মোড়া অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশটা চাঁদের আলোয় ঝলমল করে উঠল তাঁর চোখের সামনে, তখন তাঁর মনে হয়েছিল এবার বুঝি তাঁর আত্মিক ইচ্ছেটা পূরণ হতে চলেছে। তাঁর মনে হলো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তিনিও একজন। নিজেকে মহান মনে করার কত উপকরণ ছড়িয়ে আছে

ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে মাটিতে। কিন্তু উপলব্ধি হলেও সামান্য কিছু বাধা ছিল। সেগুলো মানুষের পার্থিব কিছু কর্তব্য যা অবশ্যই পালনীয়। তেমন কিছু কাজ তাঁরও বাকী আছে। জীবনের প্যাক থেকে সব কটি তাস খুলে দেখা হয় নি। কিছু তাস তখনও বাকী আছে যা খুলে দেখতে হবে। মনটাকে সেইভাবেই তৈরি করছিলেন বৃদ্ধা। কিন্তু বাদ সাধল মাড়াবারের ঘটনাটা। ঘটনাটা যেন প্রচণ্ড শব্দে আঘাত করল তাঁকে। ছেঁড়াখোঁড়া হয়ে গেল তাঁর সব অধ্যাত্মতন্ময়তা।

গ্রানাইট পাথরে কোঁদা সেই প্রথম গিরিগুহার ভেতরে কি শুনেছিলেন তিনি? সেই প্রাণীটা কে? কোন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী যার নাকটা থ্যাবড়া, মনটা নীচ অনুদার? একথা ঠিক, সেদিনের সেই শব্দ শোনার পর থেকে তাঁর মনে কোন মহৎ চিন্তার বিকাশ হয় নি। সেদিন থেকে য়্যাডেলাকে ঈর্ষা করে এসেছেন। তাঁর মনে হয়েছে সামান্য একটা ঘটনা নিয়ে এরা অকারণ বাড়াবাড়ি করছে। একটা ভয় পাওয়া মেয়ের জীবনে সেটা কি আদৌ বড় করে দেখার মতন কোন ঘটনা? যদি কিছু ঘটেও থাকে অতি তুচ্ছ সে ঘটনা। তার চেয়েও ঘৃণ্য অপরাধ পৃথিবীতে নিত্যই ঘটছে। তপস্বিনীদের রসহীন শুকনো জীবনের মতন মরুময় হয়ে উঠেছিল মিসেস মুরের মনটা। যে মনে শুধু তৃষ্ণা শুধু হাহাকার। হয়ত গুহার অন্ধকারে যুবতী য়্যাডেলার প্রতি কেউ কামার্ত হয়েছিল। কিন্তু মিলনাভিলাষ তো প্রেমেরই অঙ্গ! সেদিন গিরিগুহায় যা ঘটতে গিয়েছিল তেমন ঘটনা তো গির্জাতেও ঘটতে পারত! সব শব্দেরই একই রকম অনুরণন, 'ব্যোম।' কামনার শব্দেরও সেই প্রতিধ্বনি। কল্পনায় মানুষ অনেক কিছু ভাবে। কিন্তু বাস্তবচিত্র অন্যরকম হয়। তখন অতল পাতালের অন্ধকারও তুচ্ছ মনে হয়, শব্দের সরীসৃপটাকে মনে হয় কীটাণুকীট। আসলে য়্যাডেলার মনের যে আতঙ্ক তার সবটাই কাল্পনিক। আর তাঁর ভাবী পুত্রবধূর এই কাল্পনিক আতঙ্ক নিয়ে ওবা লোক দেখান বাড়াবাড়ি করছে। অথচ তাঁর এই সীমাহীন দুঃখবোধের জন্যে ওরা কেউ সহানুভূতি দেখাচ্ছে না। অবশ্য যখন ওরা বৃদ্ধার প্রতি মনোযোগ দিতে গেল, তখন অসহিষ্ণু হয়ে ওদের তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে চন্দ্রপুরের অবস্থা ততদিনে আরও ভীষণ হয়ে উঠেছে। সব সরকারী কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক ভাবে শহরে থাকার আদেশ হয়েছে। তাই ইচ্ছে থাকলেও বোম্বাই অব্দি মায়ের সঙ্গী হতে পারল না রনী। কথা ছিল এ্যান্টনী তাঁর সঙ্গী হবে। কিন্তু যদি সাক্ষী দিতে সে না ফেরে সেই আশঙ্কা করে তাকেও পাঠান হলো না। সুতরাং বৃদ্ধাকে একাই যেতে হলো। ব্যবস্থাটা একদিক থেকে তাঁর মনঃপূত হয়েছে, কারণ ফেরার পথে পিছুটান কিছুই রইল না। এ এক পরম স্বস্তি যেন। সাময়িক ভাবে গরম কিছুটা কমেছে। তাই যাত্রাটিও দুঃসহ হলো না তাঁর। সেটা ছিল ভরা পূর্ণিমার রাত। চন্দ্রকিরণ ধৌত সমস্ত পরিবেশ আশ্চর্য মোহময় মনে হচ্ছে। গঙ্গার বুকে চাঁদের আলো যেন আবেশে ঢলে পড়েছে। রূপার ছোট ছোট পাতের মতন অসংখ্য প্রবাহ। একসময় ট্রেনের দিক বদল হলো। এখন চাঁদের আলো

ট্রেনের জানলা দিয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর গায়ের ওপর! মসৃণ ট্রেনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে রাত। একসময় শেষ হলো রাত। পরদিনটা সারা মধ্যভারত অতিক্রম করলেন বৃদ্ধা। শুকনো, তাপদগ্ধ ম্লিন চেহারা দেশটার। তবু ভাল লাগছে। এতদিন একঘেয়ে সমভূমি দেখে দেখে দৃষ্টি যেন ক্লান্ত হয়ে গেছে তার। এই বৈচিত্র্য ভাল লাগছে দেখতে। ভাল লাগছে দেখতে মানুষের জীবনযাপনের ছবি। মানুষের এই জীবনধারা অবিনশ্বর এক জীবন থেকে আর এক জীবনে বয়ে চলেছে এর প্রবাহ। গৃহমুখী মানুষ ঘর বানিয়েছে ; শুধু নিজের নয় দেবতার ঘরও বানিয়েছে সেই সঙ্গে। কত না বিচিত্র তাদের মুখের গঠন। নিজের দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন এই চলমান জীবন। সন্ধ্যের দিকে গড়-বন্দী আশীরগড় দুর্গ দেখতে পেলেন। সন্ধ্যার বিলীয়মান আলোয় সুবিশাল দুর্গটা অরণ্যময় পাহাড়ের ওপর বিস্ময়কর স্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গের ডান পাশে একটা মসজিদ। তখন ট্রেনটা আশীরগড় দুর্গকে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করছে। বিশাল এই দুর্গটা কী ভয়ঙ্কর একা! নিজের সত্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সব কিছু থেকে আলাদা হয়ে। মিনিট দশেক পর দুর্গটা আবার চোখে পড়ল। তখন বাঁ দিকে চলে গেছে মসজিদটা। তাঁর মনে হলো দুবার দেখা দিয়ে দুর্গটা যেন তাঁকে চুপিচুপি বলছে 'আমি এখনও হারাই নি।' কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন খেয়াল নেই। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ট্রেনটা তখন পশ্চিমঘাট দিয়ে নামছে। সাগরতটে আছড়ে পড়া ঢেউ-য়ের মতন চাঁদের আলোর বন্যা। ট্রেন আরও এগোল। আবার সমভূমি স্বপ্ন-ক্ষণের অবকাশের মতন। আবার সমুদ্র এবং তারপরেই বোম্বাই শহরের আবছা ভোর। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেবে তার হঠাৎ মনে হলো এদেশের কত কিছুই দেখা বাকী অথচ যাত্রা শেষ। এবার ফেরার পালা। যেখান থেকে এলেন আর ফিরতে পারবেন না সেখানে। আর দেখতে পাবেন না আশীরগড় দুর্গ কিংবা রাজপুতনার সেই সব শহর যেখানে পায়ে পায়ে ঘুরছে ইতিহাস। দেখা হবে না আগ্রা বা দিল্লী বা আরও কত রহস্য-ময় দুর্জ্ঞেয় দ্রষ্টব্যস্থান। দেখা হবে না গীরনারের পাহাড়, মাণ্ডুর ধ্বংসা-বশেষ, বেলগোলার মর্মর মূর্তি বা খাজুরাহ মন্দিরের অনন্য শিল্পশৈলী। বোম্বাই শহরের পালিশ করা রাস্তার ওপর দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে চলে-ছেন বৃদ্ধা। তাঁর মনে হচ্ছিল পশ্চিমের অনুকরণে কত যত্ন করে শহরটা তৈরি করেছে ইংরেজরা। কিন্তু শহরটা নিয়ে আর কোন গর্ব নেই ওদের। তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা হচ্ছিল যাত্রা ভঙ্গ করে শত শত টুকরো টুকরো ভারতবর্ষ খুঁজে বার করেন। একসময় বোম্বাই বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ল। হাজার হাজার তালতমালের সারি সারি মাথাগুলো যেন হাতছানি দিয়ে বিদায় জানাচ্ছে তাঁকে। বাতাসে পাতার মর্মরধ্বনি। যেন ফিসফিস স্বরে তাঁর কানে কানে বলছে 'কি গো! দেখা হয়ে গেল ভারতবর্ষ? মাড়াবার গিরিগুহার প্রতি-ধ্বনির শব্দটাই শুধু শুনলে? আরও শব্দ আছে—অস্ফুট কত শব্দ! কান পেতে শোন!' হা হা করে হেসে উঠল যেন ওরা। 'কই! আমাদের দিকে

তাকালে না তো ? আমরা কি আলাদা নই ? ওদের সঙ্গে কতটুকু মিল আমাদের ? অথবা আশীরগড়ের সেই পরিত্যক্ত নিভৃতির সঙ্গেই বা কতটুকু মিল ওদের ? বিদায় মিসেস মূর ! বিদায় !'

ততক্ষণে জাহাজটা কোলাবা প্রদক্ষিণ করে অনেকখানি চলে গেছে। উপ-মহাদেশের তটরেখা ম্লান হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমঘাটের খাড়া পাড়। ডেকের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন বৃদ্ধা। বিষণ্ণ স্থির মূর্তি। কখন লেডি ম্যালানবী পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ফিসফিস করে বললেন, 'রোদে দাঁড়িয়ে অমন তন্গত হয়ে কি দেখছেন মিসেস মূর ? আমাদের সৌভাগ্য, নিরাপদে চলে আসতে পেরেছি। উঃ ! দেশ তো নয় ! তপ্ত কটাহ। আর আমাদের আগুনে জ্বলেপুড়ে মরতে হবে না।' মিসেস মূর তেমনি স্তব্ধ, দূরের দিকে তাকিয়ে আছেন যেন পাষাণ মূর্তি।

২৪

গীয়ার বদলে গাড়ির গতি হঠাৎ বাড়ানর মতন গ্রীষ্মের রোষও দারুণ বেড়ে গেল যেন। চন্দ্রপুরের সবাই তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। মিসেস মূরের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ঘটে গেল এই ঋতু বদল। তাপাংক উঠে গেছে ১১২ ডিগ্রি ফারেনহাইটে। বিজলী পাখার বাতাস গায়ে যেন ছুঁচ ফোটায়। খসখস পরদায় নিয়মিত জলের ঝারি দেওয়া হচ্ছে, বরফজল খাওয়া হচ্ছে কিন্তু ব্যবস্থাগুলো তখন যেন মামুলী হয়ে গেছে। বাইরের দিকে তাকালে বুক হিম হয়ে যায়। ধূসর রঙের আকাশ আর হলদে রঙের মরা মাটির রুক্ষ চেহারা যেন গিলতে আসছে মানুষকে। আকাশ ও মাটির মধ্যে ব্যবধানটা ধুলোর চাদর দিয়ে মোড়া। ইউরোপের মানুষ প্রচণ্ড শীতের সময় গৃহকোণে আশ্রয় নেয়। গৃহাভ্যন্তর হয়ে ওঠে কল্পনার মনোরম পরিবেশ। ফায়ার সাইডের ধারে বসে মানুষের মন কাব্যময় হয়ে ওঠে। কিন্তু তাপদগ্ধ প্রাচ্যের অভিজ্ঞতা বড় নির্মম। বিশ্বাসঘাতক সূর্যকে তখন আপনজন মনে হয় না। মনে হয় না যে সূর্যই আমাদের জীবনীশক্তি যোগাচ্ছে। তার হত্যাকারী চেহারা দেখে মানুষ পালাতে চায়। কিন্তু কোথায় সে আশ্রয় নেবে ? ঘাতকের চেহারা সুন্দর হয় না। কিন্তু তবুও মানুষ তাকে আপনজন মনে করতে চায়। এমন সুখ পেতে চায় যা হীন নয় ; এমন দুঃখ পেতে চায় যা মহান। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে সেই অনুভবের বড় অভাব। এপ্রিলের সূর্য কোপন-স্বভাব। তার অসহিষ্ণুতা তার লিপ্সা যেন দূষিত ক্ষতের মতন সারা গায়ে ছড়িয়ে যায় আর মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নগুলো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে কেবল মাছেরাই। পুকুরের জল তখন শুকিয়ে গেছে, মাটি কাঠফাটা—কাদার মধ্যে ডুবে তারা গ্রীষ্মের দাহ-

রোষ ঠেকায়। তারপর বর্ষায় শরীর থেকে কাদার আবরণ মুছে ফেলে। মানুষ ঋতুভেদে তার সামঞ্জস্যবোধ আর সহনশক্তি দিয়ে সব প্রাকৃতিক পরিবেশেই মানিয়ে নেয়। এই মানিয়ে চলার প্রবৃত্তি মানুষকে হীন করেছে। যেন মনে হয় বিজয়কেতন উড়িয়ে চলতে চলতে রথখানি হঠাৎ থেমে গেছে। চললে রথ, থামলে পর্বত। সভ্যতার রথের চাকা গতিহীন, নিশ্চল, অনড়। এদেশটাকে একদিন যারা সভ্য করতে এসেছিল তারা বিফল হয়ে আপোস করে নিয়েছিল এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে। সেই থেকে আজ অব্দি একই ট্র্যাডিশন চলেছে। আজকের ইংরেজরাও অস্তিত্ব হারিয়ে এদেশটাকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

অনেকদিন পর সেদিন সকালে হাঁটু মুড়ে প্রার্থনায় বসেছে য়্যাডেলা। এতদিন সে বুদ্ধি দিয়ে অদৃশ্যশক্তিকে বোঝাবার চেষ্টা করত। কিন্তু বিপদের সামনে পড়ে তার সেই মননবৃত্তি ভোঁতা হয়ে গেল। ব্যাপারটা অবশ্য তেমন দোষের নয়। সবাই এই রাস্তাই বেছে নেয়। কারণ ঈশ্বর নামক সেই অদৃশ্য শক্তির কাছে পৌঁছবার সহজতম রাস্তা আর নেই। হিন্দু কেরাণীরা যেমন লক্ষ্মীর পটের সামনে বসে বেতন বাড়ানর আর্জি জানায়, য়্যাডেলাও তেমনি যীশুর মূর্তির সামনে বসে মামলার সুফল কামনা করছিল। তার ধারণা ঈশ্বর নামক সত্তাটি যেমন রাজাকে দেখছেন তেমনি পুলিশকেও দেখবেন। যীশুর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে য়্যাডেলার মনে হলো যীশু বোধহয় সেইরকম সান্ত্বনাই দিলেন কিন্তু এতক্ষণ গরমে বসে থাকার দরুন তার মুখে ঘামাচি বেরিয়ে গেছে। গলার মধ্যে দলা পাকাচ্ছে একটা কাশির ধমক। মনোযোগ এমনিতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাছাড়া পাশের ঘর থেকে মিসেস টার্‌টনের হাঁকডাকেও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল য়্যাডেলা। উপাসনায় আর মনঃসংযোগ করতে পারল না। মিসেস টার্‌টনের হাঁকডাকে চেঁচিয়ে বলল 'আসছি আধ মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

টার্‌টন্‌রা এখন তার সঙ্গে দারুণ ভাল ব্যবহার করছেন। তাঁদের এই সৌজন্যবোধ যেন অবিশ্বাস্য। তার দুরবস্থা আর অসহায়তার কথা ভেবেই এ'রা করুণা করছেন, তা যেন বোঝা যায়। এর আগে ইংল্যান্ড থেকে সদ্য আসা কোন মেয়ের জীবনে এমন দুর্ঘটনা ঘটে নি। কিন্তু য়্যাডেলা কি চায়? কেউ কি মনের খোঁজ রেখেছে? কেউ তাকে বোঝেও না। বোঝবার সামান্য চেষ্টা করেছিল একমাত্র রনী। কিন্তু তাও অংশত। আসলে পদমর্যাদার উৎপাত থাকলে মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে মেশা যায় না। রনীর বাধা সেখানেই। মনের দুঃখে য়্যাডেলা একবার বলেওছিল সে কথা। একটু ঘুরিয়ে বলেছিল। 'রনী! আমার জন্যে তোমার দুঃখের শেষ নেই। মনে পড়ে, মাঠে বসে তোমায় কি বলেছিলাম?' রনী তাকিয়েছিল। য়্যাডেলা বলেছিল, 'সেদিন যা বলেছিলাম তাই-ই ঠিক। আমাদের সম্পর্কটা বন্ধুত্বের হলেই ভাল হত।'

রনী অবশ্য ভীষণভাবে আপত্তি করেছিল তার কথায়। তার মনে হয়েছিল য়্যাডেলা যত দুঃখ পাবে, ততই দুর্বার হবে তার প্রেম। কিন্তু য়্যাডেলা

কি সত্যিই ভালবাসে রনীকে? মাড়াবার গুহায় ঢোকবার আগে সেদিন এই প্রশ্নটাই তাকে পীড়িত করেছিল। আর আজ অব্দি এই প্রশ্নটাই অহরহ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার পক্ষে সত্যিই কি কাউকে ভালবাসা সম্ভব?

পাশের ঘর থেকে মিসেস টার্‌টন্‌ আবার ডাকলেন। 'কি মেয়ে! হলো তোমার? কি বলে ডাকব তোমায়? মিস কোয়েস্টেড না য়্যাডেলা? সাড়ে-সাতটা বাজল। এবার তো আমাদের রওনা হতে হয়। কি বল?'

মিস্টার টার্‌টন্‌ মৃদু ধমক দিলেন। বললেন, 'কেন তাড়া দিচ্ছ ওকে! ও উপাসনা করছে, বুঝছ না?'

'তাই নাকি? না না মেয়ে তুমি উপাসনা সেরে নাও। তোমায় ছোটাহাজারী দিয়েছে তো?'

'দিয়েছে। তবে খেতে পারি নি। একটু ব্র্যান্ডি পেলে ভাল হতো। যীশুর মূর্তির সামনে থেকে উঠতে উঠতে বলল য়্যাডেলা। কিন্তু ব্র্যান্ডি দেখেই বিতৃষ্ণা হলো য়্যাডেলার। হাত দিয়ে সরিয়ে দিল।

'কি হলো? সরিয়ে দিলে কেন? একটু খেয়ে নাও। ভাল লাগবে।'

'উঁহু। মনে হয় না।'

য়্যাডেলার বিশ্বাস যে সন্ধ্যে নাগাদ এই অস্থির ভাবটা কেটে যাবে। কারণ ততক্ষণে তার মনের এই তোলপাড় অবস্থার একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। য়্যাডেলা চুপচাপ থাকতে চাইছিল না পাছে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে যায়। তাই ম্যাকব্রাইডের সঙ্গে নতুন করে সেদিনের দুর্ঘটনাটা ঝালিয়ে নিতে লাগল। কেমন অবস্থায় সে গুহার মধ্যে ঢুকেছিল। লোকটা তখনই তার পিছু পিছু ঢুকেছিল কি না। য়্যাডেলা অবশ্য জোর দিয়েই বলল যে. লোকটা তাকে ছুঁতে পারে নি। তবে সব কথা বলার পরেও য়্যাডেলা স্বীকার করল যে ব্যারিস্টার অমৃত রাওএর জেরার সামনে সে ভেঙে পড়তে পারে। এঁদের সবাইকে তাহলে সে হাস্যাস্পদ করে তুলবে কারণ তার কানের মধ্যে সেই উন্মত্ত প্রতিধ্বনির শব্দটা এখনও লেগে আছে।

'একটা য়্যাসপিরিন খেলে হয় না?' বললেন মিসেস টার্‌টন্‌।

'এটা কি মাথার যন্ত্রণা?' মেজর ক্যালেন্ডারের ধমক খেয়ে চুপ করে গেলেন মিসেস টার্‌টন্‌। তবে মেজর সাহেবের ধারণা য়্যাডেলার মনের এই আতঙ্ক সম্পূর্ণ মনগড়া। সুতরাং ব্যাপারটাকে মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। বরং অন্য বিষয় আলোচনা করে তাকে খানিকটা হালকা করে দেওয়া দরকার। অভিজ্ঞ ডাক্তারের যুক্তিটা মনে ধরল সকলের। কালেক্টর মিস্টার টার্‌টনের ইঙ্গিতে সবাই অন্য কথা বলা শুরু করল। তখনও রোদ চড়া হয়ে ওঠে নি। ঠান্ডা ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। তবে মিনিট দশেকের মধ্যেই বাতাস গরম হয়ে উঠবে। সবাই তাই ভাবছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়বে। য়্যাডেলা অবশ্য বারে বারেই বলতে লাগল যে জেরার সামনে সে ঠিক ভেঙে পড়বে। মনে মনে সে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। সবাই তাকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করল। উৎসাহ দিতে লাগল। কিন্তু য়্যাডেলা যেন তেমন মনোবল

পাচ্ছিল না। মুখে উৎসাহ দিলেও টার্‌টন্‌ নিজেও জানতেন যে সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে যে রায় হবে সেটাই শেষ কথা নয়। এখানেই এর নিষ্পত্তি হবে না। এক আদালত থেকে আর এক আদালত, এইভাবে গড়াবে এই মামলাটা। কতদিনে এর নিষ্পত্তি হবে কেউ জানে না। তিনি শুনেছেন নবাব বাহাদুর অকাতরে টাকা ঢালছেন। আজিজকে বাঁচাতেই হবে। এদিকে চন্দ্রপুরের সাধারণ মানুষের মেজাজও অস্থির। টার্‌টন্‌দের গাড়িটা যখন কম্পাউন্ড পেরোচ্ছে তখন একটা ছোট্ট ঢিল এসে পড়ল গাড়ির ওপর। মসজিদের কাছাকাছি আসার পর বেশ বড় বড় কয়েকটা ঢিল পড়ল। ময়দানের ধারে দিশি পল্টনের একটা স্কোয়াড অপেক্ষা করছিল। তাদের প্রহরায় কালেক্টর সাহেবের গাড়িটাকে নিরাপদে বাজারটা পার করিয়ে দেওয়া হলো। এসব দেখে শুনে কালেক্টরের মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। প্রায় অনুচ্চ স্বরে প্রকাশ করে ফেললেন রাগটা। বুড়ো ম্যাকব্রাইড যেন মেয়েছেলেরও অধম হয়ে গেছে। অনুচ্চ হলেও মিসেস টার্‌টন্‌ শুনেছেন এই চাপা রাগ। তিনি প্রকাশ্যেই বলে উঠলেন, 'সত্যি কথাই তো! মহরমের পর অন্তত একটা লোকদেখান ফোর্সও রাখা উচিত ছিল। তাতে ক্ষতি কিছু হত না। আমরাও নিরাপদে থাকতে পারতুম। ওরা যে আমাদের ঘেন্না করে না তা কেউ বলতে পারে? তেমন ভাবটাই তো ছেলেমানুষি!'

'না ছেলেমানুষি নয়। অন্তত আমি ওদের ঘেন্না করি না। কেন করি না তা জানি না। তবে করি না।' বাস্তবিক তাই। নেটীভদের সম্বন্ধে ম্যাকব্রাইডের একটু অবজ্ঞা মেশান স্নেহ আছে। তবে সব নষ্টের মূল যে ইংরেজ রমণীকুল এ ব্যাপারে ম্যাকব্রাইডের কোন সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা যে মোটেই মনগড়া নয় তার প্রমাণও পাওয়া গেল। একটা পাঁচিলের আড়ালে কিছু নষ্টামি দেখতে পেল ম্যাকব্রাইড। সে এও বুঝেছে যে মিস কোয়েস্টেড সম্বন্ধে তার এই মনোযোগ মেয়ে মহলে নানারকম গুজবের প্রশ্রয় ইতিমধ্যেই দিয়েছে। তবে ব্যাপারটা নিয়ে সে তেমন চিন্তিত নয়। কারণ, কোন অসহায় যুবতীকে সাহায্য করতে পুরুষ যখন বীরত্ব দেখিয়ে এগিয়ে যায় তখন মেয়ে মহলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবেই। গাড়ি ততক্ষণে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের সামনে চলে এসেছে। ফীলডিংএর কলেজের ছেলেরা ইতিমধ্যেই জড়ো হয়ে আছে সেখানে। ম্যাকব্রাইডের নির্দেশে গাড়ি পিছন দিক দিয়ে আদালতে ঢুকল। ওদের এইভাবে পালিয়ে যেতে দেখে ছেলেরা চেঁচিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে লাগল। ছেলেদের দলে রফীও লুকিয়ে ছিল।

ওরা সবাই রনী হীস্‌লপের খাস কামরায় গিয়ে ঢুকল। দলের আর সবাই আগেই এসে জড়ো হয়েছে। নানারকম অদ্ভুত খবর আসতে শুরু করেছে। চন্দ্রপুরের ঝাড়ুদারেরা কাজে আসে নি। খাঁ খাঁ করছে শহর। জেলা শহর থেকে আর এক প্রস্থ ঝাড়ুদার আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। আশা করা যায় আজিজের ব্যাপারে এরা তেমন উৎসাহী হবে না এবং ধর্মঘট ভেঙে যাবে। আরও খবর আছে। চন্দ্রপুরের মুসলমান সমাজের মহিলারা আজিজের মুক্তির দাবিতে আমৃত্যু অনশন করবে। তারা অবশ্য এমনিতেই মুমূর্ষু হয়ে

আছে। নতুন করে মরার প্রশ্নই ওঠে না। তবুও খবরগুলো অশান্তির ইন্ধন যোগায় এবং সাদা চামড়ার মানুষগুলো স্বাভাবিক কারণেই মনে মনে অশান্ত হয়ে উঠছিল। একটা ব্যাপারে তারা সবাই একমত হয়েছে। তাদের ধারণা নেটীভদের স্বেচ্ছাচারিতার ইন্ধন যোগাচ্ছে ফীলডিংএর প্ররোচনা। আগে তারা ভাবত লোকটা বোধহয় ক্ষ্যাপাটে স্বভাবের। কিন্তু এটা তার মুখোশ। আসলে লোকটা বিশ্বাসঘাতক। জাতি এবং সাম্রাজ্য দুটোরই স্বার্থের পরিপন্থী। ক'দিন আগে অমৃতরাও আর মহম্মদ আলির সঙ্গে এক গাড়িতে ঘুরতেও তাকে দেখা গেছে। নেটীভদের রাজদ্রোহিতার উস্কানি দিচ্ছে ফীলডিং নিজে। কোন বিদেশী শক্তির গুপ্তচরও হতে পারে সে। অবশ্য আজকের রায় যে এদের ষড়যন্ত্র ভেঙে দেবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবুও লোকটাকে কিছুতেই যেন মার্জনা করা যায় না, কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে দিল লোকটা। সবাই যখন কোলাহল করে ফীলডিংএর নিন্দা করছে, তখন চোখ বুজে একটা ডেক-চেয়ারে চুপ করে বসেছিল য়্যাডেলা। হাতদুটো অলসভাবে চেয়ারের হাতলের ওপর রাখা। মুখে কোনরকম ভাববিকার নেই। বলা বাহুল্য য়্যাডেলাকে অমনভাবে চুপ চাপ বসে থাকতে দেখে কলহপ্রিয় মানুষগুলো বোধহয় একটু লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি ন্যান্সী ডেরেক য়্যাডেলার কাছে এসে বলল, 'কি গো! চুপচাপ বসে! বল কি করতে হবে?'

'কিছু না ভাই।' একটু থেমে য়্যাডেলা ফের বলল, 'বোধহয় আমি নিজেও আমার জন্যে এখন কিছু করতে পারব না।'

'না। না। অমন করে বলে না। তুমি একা নও। আমরা সবাই তোমার পেছনে আছি। সবাই কিছু করতে চাই।'

'ঠিক কথা।' সবাই সমস্বরে সায় দিল ডেরেককে। রনী চাইছিল আলোচনার বিষয়টা বদলে দিতে। গলার স্বর নিচু করে সে হঠাৎ বলল 'দাস সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। ওকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি।'

'ভুল কথা।' মেজর ক্যালেন্ডার আপত্তি করল। বলল, 'ওদের কাউকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না।'

'দাসকে করা যায়। ও ব্যতিক্রম।'

লেস্‌লী বলে লোকটা চতুর একটু হেসে বলল, 'অর্থাৎ, আসামীকে অভিযুক্ত না করলে দাসের চাকরি যেতে পারে, সুতরাং দাস বিশ্বাসযোগ্য এবং ওর হাতে আসামী মুক্তি পাবে না। এই তো বলতে চান?'

রনীও এই কথাটাই বলতে চেয়েছিল তবে একটু ঘুরিয়ে। নিজের অধস্তন কর্মচারীদের সম্পর্কে তার কিছু দুর্বলতা আছে। দাসের উপরেও দুর্বলতা আছে। তার ধারণা দাস লোকটার নৈতিক সাহস আছে। অনেকটা ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলে পড়া ছেলেদের মতন একরোখা সে। অতএব সত্যি কথা বলার সাহস তার হবে। আর একটা কথা ভাবছিল সে। মামলাটা দাসের হাতে গিয়ে ভালই হয়েছে। দাস এবং আজিজ দুজনেই ভারতীয়। আজিজ শাস্তি পাবেই কারণ অপরাধ প্রমাণ হবেই। তখন ব্যাপারটা নিয়ে হৈচৈ

হবে না। রনীর কথা শুনে মিসেস টার্টন্ অবাক। ঝাঁপিয়ে পড়লেন টনীর ওপর। বললেন, 'কি বলতে চাও শুনি? লেডি ম্যালানবীর কাছে সই করা আবেদন পাঠানো ঠিক হয় নি আমার? দোহাই হীস্লপ, যা বলার স্পষ্ট করে বল। এড়িয়ে যেও না।'

'আমি তা বলতে চাই নি।' অপ্রস্তুত রনী বলল।

'আমি তো কোন কৈফিয়ত চাইছি না।' 'মিসেস টার্টন্ চুপ। রাগে অপমানে থমথম করছে মুখখানা। ব্যাপারটা সহজ করতে লেস্লী বলল, 'বুঝলেন ম্যাডাম! এই নীগারগুলো স্রেফ শুয়রের জাত। সব সময় খুঁত খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই....'

ব্যাখ্যাটা বোধহয় ক্যালেণ্ডারের মনঃপুত হল। সে বলল, 'ঠিক বলেছ। যা হয়েছে তাতেই ওদের শিক্ষা হওয়া উচিত। তবে আমিও ওদের এমন শিক্ষা দেব যাতে ডাক ছেড়ে কাঁদতে হয়। ওদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছি। পাপের ভয়। হাসপাতালে গেলেই বুঝতে পারবে কি বলতে চাই। তোমাদের ওই তথাকথিত ভালমানুষ নবাব বাহাদুরের পেয়ারের নাতির চেহারাখানা দেখলেই বুঝতে পারবে। সেই ভুবনভোলানো রূপ আর নেই। দাঁতের পাটি থেকে দাঁত খুলে গেছে, নাকের ওপর গর্ত! সে এক বীভৎস চেহারা। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে কেঁদেই অস্থির। আমি তো হেসেই মরি। দেখলে তোমরাও না হেসে পারবে না। ছোঁড়াটাকে তো জানি। পয়লা নম্বরের লম্পট। সুতরাং ওর ওপর আমার এতটুকু দুর্বলতা নেই। যা হয়েছে ঠিক হয়েছে। উচিত শিক্ষা পেয়েছে ও!'

'তবু ভাল। সত্যি কথাটা আপনিই বললেন।' একটু ব্যঙ্গ করে বললেন মিসেস টার্টন্। ক্যালেণ্ডারও উৎসাহিত হলো। ফের বলল, 'আপনিই বলুন! ওরা যা করেছে তার চেয়ে নৃশংস আর কিছু কি হয়? অন্তত আমার জানা নেই।'

'ঠিক কথা।' তারপর উপস্থিত পুরুষদের মুখের দিকে চেয়ে মিসেস টার্টন্ ধমক দিয়ে বললেন, 'কথাটা আপনারা মনে রাখবেন। অত্যন্ত দুর্বল আপনারা। যখন দেখলেন নীগারদের সঙ্গে একজন ইংরেজ মহিলা পাহাড় দেখতে যাচ্ছেন তখন তাকে একলা ছাড়লেন কোন্ সাহসে? কার ভরসায় তাকে যেতে দিলেন? ওদের সঙ্গে দূরের কথা, কথা বলাও উচিত নয়। ওদের যে অপরাধ তাতে ওদের শূলে চড়ান উচিত। মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া উচিত ওদের। সেই ব্রিজ পার্টি থেকে শুরু হয়েছে আপনাদের এই আদিখ্যেতা।'

রাগে তখন মিসেস টার্টনের সারা শরীরে আগুন জ্বলছে। জ্বালা জুড়োতে বরফ দেওয়া এক বোতল লেমন্ স্কোয়াশ খেয়ে ফেললেন। য়্যাডেলার অপমানের চেয়ে তার সমস্যাটাই তাঁকে বেশি পীড়িত করছিল। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার আগেই মামলার ডাক উঠল।

ডাক শুনেই নড়েচড়ে উঠল সাহেবরা। চাপরাশিরা তাদের সাহেবদের জন্যে আগেভাগেই চেয়ার টেয়ার সাজিয়ে রেখেছিল কোর্টরুমে। কিছু বাকি ছিল। সেটা সম্পূর্ণ না হওয়া অব্দি এরা কেউ উঠল না। তারপর সারি দিয়ে ভাঙাচোরা কোর্টরুমের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। তাদের চালচলন ভাবভঙ্গির মধ্যে

এমন এক ভাব যেন ওরা ছাড়া আর সবাই অনুগ্রহপ্রার্থী। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কালেক্টার সাহেব নিচু স্বরে বোধহয় একটা ঠাট্টার কথা বললেন। যারা শুনল তারা সবাই মুখ চেপে হেসে উঠল। ওপাশে যে সব নেটীভরা বসে আছে তারা হাঁ করে তাকিয়েছিল এদের দিকে। ভাবল নিশ্চয়ই কোন নতুন ষড়-যন্ত্রের কথা হচ্ছে। নইলে সাহেবরা অমন মুখ চেপে হাসত না।

কোর্টরুমের ভেতরে উপচে পড়া ভিড়। অজস্র মানুষের নিঃশ্বাসের গরমে ভেতরটা উত্তপ্ত হয়ে গেছে। গরমের এই ঝাঁঝের মধ্যে ঘরে ঢুকল য়্যাডেলাও। প্রথমেই চোখে পড়ল পাঙ্খাওয়ালা লোকটাকে। সকলের অধম হয়ে একপাশে বসে নিঃশব্দে তার কাজ করে যাচ্ছে। আজকের এই মামলার সঙ্গে তার কোনরকম যোগই নেই। লোকটার ঊর্ধ্বাঙ্গে কোন পোশাক নেই। কোমরে অত্যন্ত ক্ষীণ একটা কটিবাস। খোলা শরীরটা দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুউন্নত চেহারাখানা মুগ্ধ হয়ে দেখবার মতন। কাঠের একটা উঁচু তক্তার ওপর বসে লোকটা পাখা টানছে। মনে হচ্ছে সমস্ত মামলাটা যেন সে-ই পরিচালনা করছে। মামলার সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও যেন আজকের নাটকের সে-ই প্রধান চরিত্র—তারই নির্দেশে সভার কাজ চলছে। ভারতবর্ষের নীচু জাতির লোকেদের কখনো সখনো এইরকম দৃপ্ত স্বাস্থ্য দেখা যায়। মনে হয় এরা মাটির কাছাকাছি থাকে বলে প্রকৃতি এদের প্রতি এত উদার। দীপ্তি, সুষমায় ঝলমল করে এদের স্বাস্থ্য। অথচ এরা অচ্ছুৎ। ধুলো বালি আর মাটি মেখে এরা বড় হয়। প্রকৃতি যেন মানুষের তৈরি জাতিভেদের প্রতি কটাক্ষ করতেই এখানে সেখানে এইরকম কয়েকজন দেবোপম মানুষ তৈরি করে রাখেন। যে কোন সমাজে, যে কোন পরিবেশেই এরা এসে দাঁড়ালে লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস! সমাজের আবর্জনার মধ্যে এরা জন্মায়, বড় হয় তারপর মরেও এই আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই। টানা পাখার দড়িটা নিজের দিকে টেনে ছেড়ে দিচ্ছে লোকটা। এই টানা পোড়েনেই মাথার ওপর বাতাসের আবর্ত সৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসটুকু নিজে নিচ্ছে না সে। সকলের আত্মার শুদ্ধিকরণ করছে এই বাতাস ছড়িয়ে। লোকটার সামনাসামনি উচ্চাসনে বসেছেন ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার দাস। ইনি রনী হীসলপের সহকারী। ছোটখাট মানুষটাকে আত্মসচেতন এবং মার্জিত দেখাচ্ছিল। পাঙ্খাওয়ালা লোকটা এর কোনটাই নয়। এমনকি সে যে বেঁচে আছে সে বোধটুকুও তার নেই। অন্যদিনের চেয়ে এই কোর্টরুমে আজ এত মানুষের সমাগম কেন হয়েছে তা সে জানে না। বলতে গেলে এই আদালতকক্ষে রোজ কত মানুষ আসে সে ধারণাও তার নেই। সে এও জানে না যে দড়ি টানার দরুন বাতাস সৃষ্টি হচ্ছে। সে শুধু জানে তার কাজ দড়ি টানা এবং এই কাজটিই সে পালন করে চলেছে। কি আশ্চর্য সংযম নিয়ে এই ব্যস্ত পৃথিবীর আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে মানুষটা। কি আশ্চর্য নিষ্ঠুর তার উদাসীনতা! য়্যাডেলা শুধু মুগ্ধ নয় কেমন যেন অবাক হয়ে মানুষটার নির্মোহ মূর্তির দিকে চেয়েছিল। মনে হচ্ছিল তার নিজের সমস্যাটা এই বিস্ময়কর উদাসীনতার কাছে কত তুচ্ছ। অথচ তার জন্যেই আজ ঘরভর্তি

মানুষ এসেছে। কিন্তু কোন্ গুণ দিয়ে য়্যাডেলা তাদের টেনে এনেছে? একটা কিছু বিশেষ দাবি আছে তার এবং এখানকার ধর্মধ্বজী মানুষগুলো তার সেই দাবিটার মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু এই মানুষগুলোর অধিকার কতটুকু? নিজেদের সভ্য বলে চালাবার দাপটটাই বা কে দিল তাদের? ভাবতে ভাবতে ছটফট করে উঠল য়্যাডেলার মন। ঘরের মধ্যে তন্নতন্ন করে মিসেস মুরকে খুঁজছিল তার অবসন্ন চোখদুটো। কিন্তু কোথায় তিনি? সমুদ্রের বুকে তখন তিনি ভাসতে ভাসতে চলেছেন। হয়ত য়্যাডেলার মনের এই দুর্জ্ঞেয় প্রশ্নের উত্তরটা তাঁরই জানা আছে। বৃদ্ধা চাইলে প্রশ্নটা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাও বলা যেত হয়ত। য়্যাডেলা যখন অপমানে বৃদ্ধার চিন্তায় ডুবে আছে, তখনই ওদের মামলায় শুনানী শুরু হল। পুলিশ সুপার ম্যাকব্রাইডের ডাক পড়ল বাদী পক্ষের হয়ে বক্তব্য রাখতে।

ম্যাকব্রাইড জানে সে বাগ্মী নয়, সুতরাং বক্তা হবার কোন চেষ্টাই সে করল না। ওই ব্যাপারটা আসামীপক্ষের জন্যে তোলা থাক। কারণ লোকটা যে অপরাধী নয় এটা প্রমাণ করতে ওদের আবেগময় বক্তৃতা দিতে হবে। ম্যাকব্রাইডের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন লোকটার অপরাধ প্রমাণ হয়েই গেছে। বাকী শুধু আন্দামানে চালান করার কাজ। সুতরাং কোনরকম আবেগ বা নীতিবোধের পরোয়া না করে ধাপে ধাপে সে আজিজ নামক লোকটার জঘন্য অপরাধের বৃত্তান্ত দিতে লাগল। ম্যাকব্রাইডের বক্তৃতা শুনতে শুনতে শ্রোতাদের একটা অংশ যে ক্ষণে ক্ষণে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল তা থেকেই প্রমাণ হয় তার এই চেষ্টার্জিত নিরপেক্ষতা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। ম্যাকব্রাইড বলল যে আসামীর অপরাধবৃত্তি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। সরকারী কলেজে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে যেদিন সে মহিলাকে দেখে সেদিন থেকেই তার মনে আদিম কামনার জন্ম হয়েছিল। লোকটা মূলত স্বেচ্ছাচারী। ব্যক্তিগত জীবনযাপনে উচ্ছৃঙ্খল। তার গ্রেফতারের পর যে সব কাগজপত্তর হস্তগত হয়েছে সেগুলোই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে যে লোকটা চরিত্রহীন। তাছাড়া লোকটার সহকারী ডাক্তার পান্নালাল এবং তার ওপরওলা হিসেবে মেজর ক্যালেণ্ডারের সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকেও তার অনুমান পাকা হবে। এই অব্দি বলে ম্যাকব্রাইড চুপ করল। এতক্ষণ পর্যন্ত তার বক্তব্য মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। প্রাচ্যের অপরাধবৃত্তির নিদান হাঁকতে হাঁকতে তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে বিষয়টা সম্বন্ধে তার বিশেষ অধিকার জন্মে গেছে। সুতরাং শেষ কথা বলার দাবি তার আছে। চোখ থেকে চালশের চশমাটা খুলে (সাধারণত চরম কোন সিদ্ধান্তের কথা বলার সময় অভ্যাসবশেই সে চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলে) নাটকীয়ভাবে সে ঘোষণা করল যে অপরাধের মূল কারণটি নাকি নিহিত হয়ে আছে একটা বিজ্ঞানসম্মত সত্যের ওপর। কী সেই বিজ্ঞানসম্মত সত্য? না। কোনরকম বর্ণবিদ্বেষ বশে ম্যাকব্রাইড এই মন্তব্য করছে না। এ সত্য সর্ববাদিসম্মত এবং পরীক্ষালব্ধ। এ হলো সাদা চামড়ার প্রতি কালো চামড়ার মানুষের স্বাভাবিক দেহগত আসক্তি। ব্যস! ম্যাকব্রাইডের এই একটা মন্তব্যেই যেন

মৌচাকে ঢিল পড়ল। সামান্য কলগুঞ্জন, একটু নড়াচড়া, তারপরেই যেন কোথা থেকে একটা ছোট্ট মন্তব্য সেই আপাত নিস্তরঙ্গ পরিবেশে উৎক্ষিপ্ত হলো। মনে হলো যেন ঘরের ছাত থেকে পাকা ফলের মতন টুপ করে খসে পড়ল মন্তব্যটা। 'মাপ করবেন! মহিলা যদি অত্যন্ত কুৎসিত হন তাহলেও?' কে? কে এই অশালীন উক্তি করল? এখুনি তাকে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হোক? রনী হুইস্‌লপের চড়া মেজাজের আজ্ঞা শোনামাত্রই একজন নেটীভ পুলিশ একজন নিরপরাধ লোককে হিড়হিড় করে টানতে টানতে কোর্টরুম থেকে বার করে দিল। ম্যাকব্রাইডেরও সেই চেষ্টার্জিত স্থিতধী ভাবটা আর অবশিষ্ট নেই। তাড়াতাড়ি চশমাটা চোখে লাগিয়ে সে কিছু বলতে গেল, কিন্তু বীণার তার তখন ছিঁড়ে গেছে, সুর উঠল না। য়্যাডেলাও অশান্ত। একঘর লোকের সামনে কুৎসিত বলায় রাগে অপমানে তখন থরথর করে কাঁপছে তার শরীর। ন্যান্সী ডেরেক তাড়াতাড়ি কাছে এসে শান্ত করার চেষ্টা করল। বলল, 'তোমার শরীর কি খুব খারাপ লাগছে য়্যাডেলা?'

'না ন্যান্সী। কিছুতেই আমি ভেঙে পড়ি না। এ অপমানও ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারব। কিন্তু কী জঘন্য নোংরামি এটা!'

প্রথম পর্যায়েব ঘটনা এখানেই শেষ। দৃশ্যান্তরে দেখা গেল য়্যাডেলাকে ঘিরে ছোট্ট একটা জটলা। সবাই তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। অনেকেই বিচলিত। মেজর ক্যালেণ্ডার স্বীকার করল তার ত্রুটি। অসুস্থ য়্যাডেলার জন্যে আরও ভাল বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল আমার। যেখানে বেচারি বসেছেন সেখানে একটুও হাওয়া নেই। প্ল্যাটফর্মের ওপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পাশে ওঁর বসার জায়গা করা যায় না?' সোজাসুজি প্রশ্নটা দাসের দিকে চেয়ে করল ক্যালেণ্ডার। মেজর ক্যালেণ্ডারের কথা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার দাস অসহায় চোখে সকলের দিকে তাকালেন। তাইত! এখন কি কর্তব্য? সবাই চেয়ে আছে তাঁর দিকে। যা হোক, বিব্রত ভাবটা কাটিয়ে দাস বললেন, 'নিশ্চয়ই! ওঁর শরীরের যা অবস্থা তাতে আমার কোনরকম আপত্তি নেই। আমি আনন্দের সঙ্গে ওঁকে আমার পাশে বসার অনুমতি দিলাম।' কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার শোনার ধৈর্য ছিল না পারিষদদের। তাদের ইঙ্গিতে চাপরাশিরা ততক্ষণে প্ল্যাটফর্মের ওপর একাধিক চেয়ার বসিয়ে দিয়েছে। দলবল নিয়ে কালেক্টর সাহেব মঞ্চের ওপর গিয়ে বসলেন। সবচেয়ে খুশি কালেক্টর পত্নী। বললেন, 'হ্যাঁ। এতক্ষণে ঠিক হলো বন্দোবস্তটা।'

মেজর ক্যালেণ্ডার একটু গর্বের হাসি হাসল। বলল, 'অনেকগুলো কারণের জন্যেই এই বদলটুকুর দরকার ছিল। মন্তব্যটা বিচারকের চেয়ারের পক্ষে অবমাননাকর। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট আপত্তি জানাতে ভরসা পেলেন না। চেয়ারে বসতে বসতে কালেক্টর সাহেব বেশ মুরুব্বীর ভঙ্গিতে দাসকে লক্ষ্য করে বললেন 'দুঃখিত মিস্টার দাস। আপনার কাজের একটু ব্যাঘাত হলো। আপনি এবার শুরু করতে পারেন।' মুলতুবী শুনানীর কাজ আবার শুরু হলো। ম্যাকব্রাইডের শুনানী যখন চলছে তখন অত্যন্ত অলস চোখে বসে থাকা

মানুষগুলোর দিকে তাকিয়েছিল য়্যাডেলা। নেহাৎই উদ্দেশ্যহীন তাকিয়ে থাকা পাছে দৃষ্টি পীড়িত হয়। প্রায় সবাই তার চেনা মুখ। সম্পূর্ণ অচেনা কিছু নতুন মুখও আছে দলে। প্ল্যাটফর্মের ঠিক তলাতেই বসে আছে সেই ভট্টাচার্য আর তার বউ। এই লোকটাই তাকে গাড়ি পাঠায় নি। নবাব বাহাদুরকেও দেখল। ব্রিজ পার্টিতে এদের অনেককেই দেখেছিল। মুখগুলো চেনা কিন্তু কি আছে ওদের মনের মধ্যে? তার দুর্ভাগ্য, এদের মধ্যে সে ভারতবর্ষকে খোঁজবার চেষ্টা করেছিল। ওই তো! স্বয়ং অপরাধীও কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে ওদের মধ্যে? ছোটখাট স্বাস্থ্যবান লোকটার এক মাথা কাল চুল। হাত দুটো কোলের ওপর আলতোভাবে পাতা। কোন বিশেষ আবেগ নিয়ে য়্যাডেলা তাকে দেখছিল না। শুধু তাকিয়ে আছে কেমন যেন ভালমানুষ চেহারা। চোখে পড়বার মতন লোকটার তেমন কিছুই নেই। তবে কি ওর এই ভালমানুষী ভাবটা একটা মুখোশ! আসলে পাকা শয়তান! তাই বা কি করে হয়? মুখেচোখে সেই পাপবোধটাই তো নেই? হঠাৎ তার মনে হলো এই লোকটাই, আসল অপরাধী তো? কোন ভুল করছে না তো সে? প্রশ্নটা বারে বারেই তাকে উত্যক্ত করেছে। কিন্তু বিবেকের তাড়না হয় নি। অন্তত মিসেস মুর চলে যাবার পর থেকে এ নিয়ে কোন বিবেক দংশন বোধ করে নি সে।

ম্যাকব্রাইডের অভিযোগের জবাব দিতে উঠল আসামী পক্ষের উকিল মহম্মদ আলি। প্রথমেই জিজ্ঞেস করল তার মক্কেলেরও উচ্চাসনে বসার যোগ্যতা আছে কি না। ভারতীয় হলেও আসামীর অসুস্থ হবার অধিকার আছে যদিও সরকারী হাসপাতালের অধিকর্তা মেজর ক্যালেণ্ডার তা না মানতেও পারেন। নিছক বাস্তব প্রশ্ন কিন্তু তীক্ষ্ন শ্লেষাত্মক. তাই খোঁচাটি অনেককেই বিদ্ধ করল। শুধু ন্যান্সী ডেরেকই ফিসফিস করে বলল, 'বাঃ! এদের রসবোধ চমৎকার দেখছি!' মেজর ক্যালেণ্ডার স্থির স্তব্ধ। তাঁর কাছে এটা কোন রসবোধের দৃষ্টান্ত নয়। রনী হীস্‌লপ তীক্ষ্ন চোখে তাকিয়ে আছে দাসের দিকে। দেখা যাক কি করে লোকটা! রনীর তীক্ষ্ন দৃষ্টির সামনে বিভ্রান্ত দাস হঠাৎ দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং মহম্মদ আলিকে সরাসরি ধমক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল কলকাতার নাম করা ব্যারিস্টার অমৃত রাও। সুপুরুষ এবং বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা ভদ্রলোকের। মাথার চুল কাল ও সামান্য কোঁচকান। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দিকে চেয়ে অমৃত রাও অভিযোগ করল, 'স্যার প্ল্যাটফর্মের ওপর অতজন ইংরেজ মহিলা এবং পুরুষের উপস্থিতিতে আমরা আপত্তি করছি।' অমৃত রাওএর জড়তাহীন খাঁটি উচ্চারণ এবং কথায় অক্সফোর্ডের টান শুনে সবাই একবার নড়েচড়ে উঠল। ম্যাজিস্ট্রেট দাস কোনরকমে বললেন, 'কেন?'

'আমার সাক্ষীরা ভয় পাবে। আমি তাই অনুরোধ করছি এঁরা যেন সাধারণের সঙ্গে এসে বসেন। অবশ্য মিস কোয়েস্টেড সম্বন্ধে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তিনি অসুস্থ। সুতরাং প্ল্যাটফর্মের ওপরেই তিনি বসবেন। শুধু তাই নয়, ওঁর স্বাস্থ্যের জন্যে আর যা দরকার তাও আমরা করব। অবশ্য

একটু আগেই পুলিশ সাহেব কি সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু তির্যক মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এগিয়ে যাব। তবে অন্যদের সম্বধে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে। তাঁরা অনুগ্রহ করে জনতার মধ্যে এসে বসুন, এই আমাদের অনুরোধ।'

রাগে গাঁকগাঁক করে উঠল মেজর ক্যালেন্ডার আর অভদ্রের মতন দাসের দিকে লাল চোখ করে চেয়ে রইল। দেখা যাক লোকটা কি বলে। তাকিয়ে ছিল বিশিষ্ট ব্যারিস্টার অমৃত রাও নিজেও। শুধু এরা দুজনই নয়। আরও অনেকে ঠায় চেয়ে আছে দাসের দিকে। তাঁর তখন প্রাণান্তকর অবস্থা। কিছু একটা বলতে হয় এবং এখুনি। কোনরকমে কাগজের আড়ালে মুখখানা লুকিয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'আমি আপনার আপত্তির সঙ্গে একমত। শুধু মিস কোয়েস্টেডকেই প্ল্যাটফর্মের ওপরে বসার অনুমতি আমি দিয়েছিলাম। সুতরাং ওঁর শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা যদি অনুগ্রহ করে নিচে নেমে বসেন তবে আমি বাধিত হব।'

সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লেও সত্যের খাতিরে প্রশংসা করতে হল রনীকে। দাসের দিকে চেয়ে কৃত্রিম স্বরে বলল, 'চমৎকার বিচার দাস! খাসা।'

কিন্তু এত সহজে অপমানটা হজম করে নিতে পারলেন না মিসেস টার্‌টন্‌। ফোঁস করে উঠলেন মহিলা। 'এত স্পর্ধা! নেবে যেতে বলল আমাদের!'

'আঃ মেরী! সীন্‌ কর না, প্লিজ! নেবে চল।' যথাসম্ভব শান্ত থাকার চেষ্টা করে বললেন কালেক্টর মিসেস টার্‌টন্‌।

কিন্তু মেজর ক্যালেণ্ডার তখনও চেষ্টা করে চলেছে। বিচারপতি দাসের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'কিন্তু আমার পেশেন্টটাকে তো একলা রেখে যেতে পারি না। তাহলে?'

দাসেরও বিপর্যস্ত ভাব। মূঢ়ের মতন সে জিজ্ঞেস করে বসল, 'মিস্টার অমৃত রাও! সিভিল সার্জন মেজর ক্যালেণ্ডার যদি প্ল্যাটফর্মে থাকেন তবে আপনার আপত্তি আছে?'

'আছে স্যার। কোনরকম উচ্চাসন মানেই বিশেষ অধিকার। আমাদের সেখানেই আপত্তি।'

স্থূল একটু হাসবার চেষ্টা করে টার্‌টন্‌ বললেন, 'প্ল্যাটফর্ম যদি একফুট উঁচু হয় বোধহয় তখনও। তাহলে আসুন, আপনারা সবাই নেবে আসুন।'

কালেক্টর সাহেবের ডাক শুনে সবাই হুড়মুড় করে উচ্চাসন ছেড়ে নেবে এল। মিস কোয়েস্টেডও ব্যতিক্রম হল না। ওদের এই অপমানের খবরটা ততক্ষণে কোর্টরুমের বাইরেও ছড়িয়ে গেছে। উৎকট উল্লাসে সবাই নাচানাচি করছে। ইতিমধ্যে প্ল্যাটফর্মের ওপর থেকে বিশেষ চেয়ারগুলো সরিয়ে আবার স্বস্থানে পাতা হয়ে গেল। মহম্মদ আলির তাতেও আপত্তি। কিসের অধিকারে সাহেব মেমরা...স্বতন্ত্র মর্যাদা পাবে। নিরপেক্ষ বিচারের নামে এ তো প্রহসন! তাছাড়া মানী লোকদের জন্যে যদি আলাদা ব্যবস্থা নেহাৎই অনিবার্য হয় তাহলে নবাব বাহাদুরকেও বাদ দেওয়া হচ্ছে কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। সারা কোর্টরুমে তখন এমনি হালকা কলগুঞ্জন চলছে। অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে

সবাই এইসব আলোচনাতেই মেতে রইল।

এই সাময়িক চিত্তবিনোদন মিস কোয়েস্টেডকে গভীরভাবে ভারমুক্ত করে দিল যেন। এখন সে অনেক সহজ। তার ধারণা এবার সে প্রতিপক্ষের সওয়ালের মুখোমুখি হতে পারবে। অহেতুক কোন সংকোচ তাকে বিব্রত করবে না। উৎসাহিত হয়ে কথাটা সে পার্শ্ববর্তিনী মহিলাকে বলতে গেল। কিন্তু রনী বা মিসেস টার্‌টন্‌রা ব্রিটিশের মান মর্যাদার প্রশ্ন নিয়ে তখন এত উত্তেজিত যে মিস কোয়েস্টেডের কথাটা তাদের কানেই ঢুকল না। মিস কোয়েস্টেড তার চেয়ারে বসে হলঘরের সবাইকে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে। বিপ্লবী ফীলডিংএর সঙ্গেও একবার চোখাচোখি হলো। লোকটার কোলের ওপর একটা বাচ্চা ছেলে বসে আছে। বাচ্চাটা ভারতীয়। মিস কোয়েস্টেড দেখল চোখোচোখি হতে ফীলডিং নিজেই চোখ সরিয়ে নিল।

ম্যাজিস্ট্রেট দাসও তখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত। মুলতুবী শুনানী আবার শুরু হয়েছে। প্ল্যাটফর্ম নিয়ে এতক্ষণ যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল তাতে তাঁর জয় হয়েছে। আগের চেয়ে আত্মবিশ্বাসও অনেক বেড়ে গেছে তাঁর। খোলা মন নিয়ে সওয়াল জবাব শুনছিলেন দাস। পুলিস সুপারের বক্তৃতার রথ দৃঢ়ভাবে এগোচ্ছিল। ভারতীয়দের মধ্যে তার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া যে এমনটি হবে তা সে জানত। আসলে যে জাত যত নিকৃষ্ট তাদের ধৃষ্টতার প্রকাশ তত উগ্র এবং বর্বর। আজিজ নামে মানুষটা তার সমকক্ষ নয়। সুতরাং তাকে ঘেন্না করার প্রশ্নই ওঠে না। সমানে সমানে না হলে কেউ ঘৃণার পাত্র হয় না। আজিজ তার অবজ্ঞার পাত্র। তুচ্ছতাচ্ছিল্য ছাড়া অন্য কোন পরিচয়ে তাকে মেনে নেওয়া যায় না।

জেলা সুপারের মূল লক্ষ্য ছিল আসামীর বহুমুখী চক্রান্তের একটা পরিচয় দেওয়া। লোকটা যে কতবড় ধূর্ত আর কৌশলী তার প্রমাণ দেওয়া। রঙ্গমঞ্চ থেকে সে একে একে ভালমানুষদের কৌশলে সরিয়ে দিয়েছে। প্রথমে ফীলডিং তারপর ভৃত্য এ্যাণ্টনী আর সবশেষে নবাব বাহাদুর। পুলিশ সাহেব ম্যাকব্রাইড যখন এই অংশটা আলোচনা করছিল, তখন মিস কোয়েস্টেড কেমন যেন বিড়ম্বিত বোধ করল। আসলে, মামলায় এই অংশটা নিয়ে তার মনে যথেষ্ট সংশয় আছে। সুতরাং এই অংশের মত ধারাবাহিক আলোচনা সে চাইছিল না। কিন্তু এরা যেন কোমর বেঁধে আসামীর অপরাধের বহর দ্বিগুণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তাই য়্যাডেলার অনুরোধ কর্ণপাতই করল না। আসামীর অপরাধ যে পূর্বপরিকল্পিত তা প্রমাণ করতে ম্যাকব্রাইড এবার মাড়াবার পাহাড়ের একটা মানচিত্র মেলে ধরল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। সামনের দিকে ঝুঁকে ম্যাজিস্ট্রেট দাস মানচিত্রখানা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন। ম্যাকব্রাইড বুঝিয়ে দিচ্ছিল কি ভাবে ওরা তালোয়ার তালাওর কাছে গিয়ে পৌঁছল এবং কোথায় ক্যাম্প করল। ম্যাজিস্ট্রেটও খুব উৎসাহ নিয়ে জায়গাটার প্রত্নতত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। ম্যাকব্রাইড তখন একটা গিরিগুহার ম্যাপ তাঁর সামনে মেলে ধরেছে। গুহামানচিত্রের গায়ের ওপর লেখা ছিল 'বুদ্ধিস্ট্‌ কেভ্‌'। ম্যাজিস্ট্রেট দাস হঠাৎ বলে উঠলেন, 'না। না।

বুদ্ধিস্ট কেভ্ এগুলো নয়। আমার মনে হয়. এগুলো সব জৈন্ কেভ্।'

কথাটা কানে যেতেই মহম্মদ আলি দাঁড়িয়ে উঠল। 'স্যার! তাহলে কোন্ গুহার মধ্যে অপরাধটা সংঘটিত হয়েছিল? বৌদ্ধ গুহায় না জৈনদের গুহায় ?'

'মাড়াবারের সব গুহাই জৈন গুহা।' বললেন দাস।

'তাহলে কোন্ জৈন গুহায় ?

বিব্রত দাস একটু কড়া সুরে বললেন, 'এ ব্যাপারে প্রশ্ন করার সুযোগ আপনি পাবেন মিস্টার আলি।'

ম্যাকব্রাইড বাঁকা একটু হাসল। নেটীভদের বুদ্ধির দৌড় তার জানা আছে। ওরা সবসময়েই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে মাতামাতি করে। মনে করে সেগুলোই বোধহয় আসল। ম্যাকব্রাইড জানত আসামী পক্ষ এখন মরিয়ার মতন একটা য়্যালিবাই খোঁজবার চেষ্টা করছে। একটা চাঁদনি রাতে ফীলডিংকে সঙ্গে নিয়ে হামিদ্উল্লা নাকি কাউয়া দোলএর কাছে গিয়ে কি সব মাপজোপও করে এসেছে! কিন্তু ম্যাকব্রাইড ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাবল না। ম্যাপটা গুটিয়ে রেখে সে এবার আসল ঘটনাটা বলতে শুরু করল। প্রথমে গুহার আকৃতির একটা পরিচয় দিল তারপর ঠিক কি ঘটেছিল তার বর্ণনা দিল। মিস কোয়েস্টেড গুহা থেকে বেরিয়েই মিস ডেরেককে দেখতে পেলেন। তখন পাগলের মতন তিনি পাহাড়ের শুঁড়িপথ ধরে নেমে আসছেন। মাটিতে নামবার পর একটা মুহূর্তও নষ্ট করলেন না ওঁরা। গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা চন্দ্রপুরে তাঁর বাংলোয় চলে এলেন। এখানে এসে প্রথমেই সই করে নালিশ দায়ের করলেন। অভিযোগের মধ্যে দূরবীনের উল্লেখ ছিল। আর সব থেকে বিস্ময়ের ঘটনা হলো। আসামীর পকেটের মধ্যে এই স্ট্র্যাপ ছেঁড়া দূরবীনটা পাওয়া গেল। ম্যাকব্রাইডের বক্তব্য শেষ। ঘরের মধ্যে থমথম করছে একটা নৈঃশব্দ। চোখ থেকে চশমাটা খুলে পুলিশ সুপার ম্যাকব্রাইড তার শেষ কথা বলল। একটু থেমে থেমে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'উপস্থিত আমার আর কিছু বলবার নেই। এবার আমি সাক্ষীদের এজাহার নিতে চাই। তাদের ডাকাবার ব্যবস্থা করা হোক।' একটু থেমে ম্যাকব্রাইড আরও বলল, 'ঘটনা এবং সাক্ষ্যই প্রমাণ করেছে যে অপরাধ কত মারাত্মক। আসলে, আসামী নিপুণ অপরাধী। তার দুটো সত্তা। তার অপরাধী মনটা সে লুকিয়ে রাখে ভালমানুষির আড়ালে। এই ভালমানুষিটাই কাজে লাগিয়ে সমাজে তার পসার প্রতিপত্তি। এটা দিয়েই সরকারী আপিসে সে একটা চাকরিও যোগাড় করেছে। কিন্তু আসলে সে অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের মানুষ এবং সংশোধনের বাইরে। শুধু মিস কোয়েস্টেড নয় আরও একটা অপরাধ সে করতে যাচ্ছিল। নিষ্ঠুর ভাবে আরও একজন ইংরেজ মহিলাকে সে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল যাতে কোন প্রমাণ না থাকে। নিজের লোকজন দিয়ে গুহার মধ্যেই তাঁকে খুন করার পরিকল্পনা সে করেছিল, কিন্তু পারে নি। যাক সে কথা।'

ম্যাকব্রাইড থামতেই ঘরের মধ্যে আবার গুঞ্জনের ঝড় উঠল। কে এই দ্বিতীয় মহিলা? এ মামলায় তাঁর নাম তো আগে উল্লেখ করা হয় নি? কে তিনি?

মিসেস মুর কি? মিসেস মুরের নামটা তখন আদালতে ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে ঘরের মধ্যে নতুন করে বিক্ষোভের ঝড় উঠল। ক্রোধে দিশাহারা হয়ে মহম্মদ আলি জানতে চাইল দ্বিতীয় মহিলার কি নাম। আসামীর বিরুদ্ধে কি ধর্ষণ ছাড়া নারী হত্যারও অভিযোগ আনা হচ্ছে? তা যদি হয় তাহলে দ্বিতীয় মহিলার পরিচয় কি? তাঁকেও ডাকা হোক।

ম্যাকব্রাইড বলল, 'এ মামলায় তাঁকে ডাকার দরকার বুঝছি না। তাই তাঁকে ডাকছি না।'

'ডাকছেন না নয়, ডাকতে পারছেন না। চন্দ্রপুর থেকে তাঁকে চুরি করে সরিয়ে দিয়েছেন কারণ তিনি সাক্ষী দিলে তা আপনাদের বিরুদ্ধে যেত। আমরা জানি তিনি কে। তাঁর নাম মিসেস মুর। এই মহীয়সী মহিলা যদি সাক্ষী দিতেন তাহলে আসামীর নির্দোষিতা প্রমাণ হতো। তিনি আমাদের দিকের লোক, সমস্ত ভারতবাসীর শুভানুধ্যায়ী তিনি।'

কিন্তু মহম্মদ আলির আবেগপ্রবণ কথার বিশেষ মূল্য দিলেন না ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'ইচ্ছে করলে আপনারাও তাঁকে সাক্ষী হিসেবে ডাকতে পারতেন। তা করেন নি। কোন পক্ষই তাঁকে সাক্ষী হিসেবে ডাকেন নি। সুতরাং এ মামলায় কোন পক্ষই তাঁকে উল্লেখ করতে পারবেন না। এই আমার আদেশ।' মহম্মদ আলি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বলল, 'এরই নাম ইংরেজের ন্যায়বিচার! এই তার নমুনা। না না স্যার। আপনি ফিরিয়ে নিন আপনার আদেশ। বিশ্বাস করুন, শেষমুহূর্তে ওরা ওই বৃদ্ধাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আমরা জানতেও পারি নি। অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যেও ওঁকে আদালতে হাজির করানোর ব্যবস্থা করুন। আসামী যে সম্পূর্ণ নির্দোষ তা একমাত্র ওঁর জবানবন্দীতেই প্রমাণ হবে। একমাত্র উনিই আমাদের বন্ধুকে বাঁচাতে পারেন। স্যার, আপনিও ছেলেমেয়ের বাবা। অন্তত আসামীর ছেলেমেয়েদের কথা ভেবেও আপনি ওঁকে আনাবার ব্যবস্থা করুন। ওদের জিজ্ঞেস করুন কোথায় ওঁকে ওরা লুকিয়ে রেখেছে।'

রনী এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। জবাব দেবার কথাও তার নয়। কিন্তু প্রতিপক্ষের অনর্থক জেদ আর নিষ্ঠুর কথার তাড়নায় অস্থির হয়ে সে বলে উঠল, 'এতই যখন জানতে চান তখন শুনুন, উনি এতক্ষণ এডেন বন্দরে পৌঁছে গেছেন।'

রনীর কথা শুনে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল আলি। ক্ষিপ্ত স্বরে বলল, 'আপনারাই ওঁকে সরিয়ে দিয়েছেন। কারণ আপনারা জানতেন যে তিনি সাক্ষী দিলে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ত। আপনাদের অসুবিধে হত।' মহম্মদ আলি তখন আর স্ববশে নেই। প্রকৃতিস্থতা হারিয়ে সে যখন বদ্ধ উন্মাদের মতন ব্যবহার করছে। সেই ভাবেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি জানি আমার সর্বনাশ করছি। কিন্তু কিছু এসে যায় না তাতে। একদিন না একদিন আমাদের সবারই সর্বনাশ হবে। কেউ রেহাই পাব না।'

আলির বেহাল অবস্থা দেখে বোধহয় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুকম্পা হলো। নিজেই

তাকে শান্ত হতে বললেন, 'অত আবেগপ্রবণ হলে মামলা লড়া যায় না মিস্টার আলি।'

'আমি মামলা লড়ছি না। আর আপনিও যথার্থ বিচার করছেন না। আমরা দুজনেই এদের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে দাসত্ব করছি। এদের সেবা করছি।'

ম্যাজিস্ট্রেট দাস এবার সত্যিই ক্রুদ্ধ হলেন। ধমক দিয়ে বললেন, 'মিস্টার আলি আপনাকে আমি সাবধান করছি। হয় আপনি বসুন নয়ত আমি আমার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হব।'

'আপনার যা খুশি করুন। আমার কাছে এই বিচার প্রহসন ছাড়া কিছু না। তাই এখুনি আমি আদালত ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' এই বলে ব্যারিস্টার অমৃত রাওয়ের হাতে কাগজপত্তর দিয়ে সক্রোধে বেরিয়ে গেল আলি। শুধু ঘর থেকে বেরোবার আগে আজিজের দিকে একবার তাকিয়েছিল। তখনই যেন নতুন করে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল সে। নাটকীয়ভাবে আজিজের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বলে উঠল, 'আজিজ! আর বোধহয় তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। বিদায় বন্ধু!'

আলি চলে যেতেই গোলমাল বাড়তে লাগল। মন্ত্রোচ্চারণের মতন সবাই তখন মিসেস মুরের নাম ধরে ডাকছে। তারা কি বলছে জানত না। সবাই ভাবছে বোধহয় কোন দেবীর আরাধনা করছে। শুধু কোর্টরুম নয়, বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নামটা লোকের মুখে মুখে। ম্যাজিস্ট্রেট ধমক দিলেন, ভয় দেখালেন, কিন্তু গোলমাল থামল না। বাধ্য হয়ে মামলা কিছুক্ষণের জন্যে মুলতুবী থাকল।

ইংরেজদের মধ্যেও ব্যাপারটা নিয়ে মৃদু উত্তেজনা হচ্ছিল। প্রতিক্রিয়াটা যে এরকম হবে তা কেউ ভাবে নি। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন কালেক্টর। বললেন, 'এ তো অপ্রত্যাশিত ব্যাপার!' রনী চেষ্টা করল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার। তার ধারণা মিসেস মুর মাঝে মাঝে যখন ঘোরের মধ্যে স্বগতোক্তি করতেন, বিশেষ করে বিকালের দিকে, তখন হয়ত আজিজ সম্বন্ধেও কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন। চাকরবাকরেরা সেই কথাগুলো দুচার আনা পয়সার লোভে মহম্মদ আলির কাছে পাচার করে দিয়েছে। এই ধরনের উঞ্ছবৃত্তিতে এদেশের লোকেরা খুবই অভ্যস্ত। সুতরাং এমন কিছু অপ্রত্যাশিত বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা এটা নয়।

'আমারও তাই মনে হয়েছিল।' লোকগুলোর হাঁ করা মুখের দিকে চেয়ে বললেন টার্টন্। আরও বললেন, 'একটা অভিনব কিছুর প্ল্যান করে ওরা এসেছিল আর সেটাই ঘটল। তবে যাই বল রনী, তোমার বুড়ো দাস কিন্তু একেবারে অচল।'

রনী জবাব দিল না। মিস ডেরেককে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছে। মেয়েটা সত্যিই দুঃখিত। রনীর দিকে চেয়ে বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে মিস্টার হীস্‌লপ্। আপনার মাকে নিয়ে ওরা কি বিচ্ছিরি কাণ্ডটাই না করল।'

'তা বটে। তবে সমস্তটাই ওদের চাতুরী, কৌশল। মহম্মদ আলিকে ওরা দলে নিয়েছিল এই জন্যেই, যাতে কোর্টরুমের মধ্যেই একটা সীন্ করতে পারে।

আলি লোকটা এসব কাজে খুব পাকা।' কথাটা ওইভাবে বললেও রনীরও খুব খারাপ লেগেছে ব্যাপারটা। সবচেয়ে অপছন্দের ব্যাপার হলো মিসেস মুরকে নিয়ে ওদের এই নাচানাচি। বৃদ্ধাকে প্রায় হিন্দু দেবী বানিয়ে ফেলেছে ওরা। সারা কোর্টরুম তখন বৃদ্ধার নামের বিকৃত উচ্চারণে সচকিত। সবারই মুখে মুখে ঘুরছে তাঁর নামটা। 'এস্‌ মিসেস মুর! এস্‌ মিসেস মুর!'
য়্যাডেলা হঠাৎ ডাকল, 'রনী!...'
'বল।'
'খুব অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না?'
'আমি শুধু তোমার কথা ভাবছি।' গাঢ় স্বরে বলল রনী।
'উঁহু। একটুও ভাববে না। এসবে আমার কোন দাগই কাটে নি।'
'না হলেই ভাল।' বলল রনী।
বাস্তবিক, অনেক সুস্থ আর ঝলমলে দেখাচ্ছিল তখন য়্যাডেলাকে। ওদের দিকে ঝুঁকে একটু চেঁচিয়ে সে বলল, 'আমার জন্যে ভাববেন না আপনারা। আমি এখন অনেক ভাল আছি। ধন্যবাদ আপনাদের। সবাইকে ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ।' কৃতজ্ঞ য়্যাডেলার কথাগুলো বাতাসে ভাসতে ভাসতে ওদের কানে এসে লাগল। ওরাও অভিভূত। আদালতকক্ষ তখনও সচকিত। হঠাৎ থেমে গেল সবার কলগুঞ্জন। ব্যারিস্টার অমৃত রাও উঠে দাঁড়িয়েছে। এক-মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল অতবড় কোর্টরুমটা। যেন প্রার্থনা শেষ, এবার পুজার্চনা দেওয়া হবে। সবাইকে চমকে দিয়ে অমৃতরাও প্রথমেই বলল, 'আমার সহকর্মী মহম্মদ আলির ব্যবহারের জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। তবে আমাদের মক্কেলের অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু তিনি। হয়ত সেইজন্যেই একটু বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন।'
ম্যাজিস্ট্রেট দাস গম্ভীর মুখে বললেন, 'মিস্টার আলিকে নিজে এসে ক্ষমা চাইতে হবে।'
অমৃত রাও তখুনি জবাব দিল। বলল, 'নিশ্চয়। তিনি নিশ্চয় ক্ষমা চাইবেন।' একটু থেমে রাও ফের বলল, 'কিন্তু স্যার, আমরা এইমাত্র জানতে পেরেছি যে মিসেস মুর অনেক দরকারী এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাছে আমাদের তরফ থেকে তাঁকে সাক্ষী করা হয়, তাই তাঁর ছেলে তাঁকে তড়িঘড়ি দেশের বাইরে চালান করে দেয়। এই খবর শুনেই আমার বন্ধু মিস্টার আলি অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের আর একজন ইংরেজ সাক্ষী আছেন। মিস্টার ফীলডিং। আমাদের আশঙ্কা হয়ত তাঁর ওপরেও জুলুম হতে পারে। একথা ঠিক মিস্টার আলি কথাটা হয়ত তুলতেনই না যদি ওঁদের তরফ থেকে মিসেস মুরের নাম উল্লেখ না হত।' ব্যারিস্টার রাও বসে পড়ল। ম্যাজিস্ট্রেটের মুখ বেজায় গম্ভীর। একবার অমৃত রাও আর একবার ম্যাকব্রাইডের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে মামলার বাইরের একটা বিষয়ের ওপর আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। মূল মামলার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধই নেই। কারণ সাক্ষী হিসেবে মিসেস মুরের কোন অস্তিত্বই নেই। সুতরাং সাক্ষী হলে তিনি কি বলতে পারতেন তা অনুমান করার

অধিকারও আপনাদের নেই। তিনি যখন নেই তখন আমরা ধরে নেব যে কিছুই তিনি বলতে পারেন না।'

'বেশ। তাই হোক। আমার বক্তব্য থেকে মহিলা সম্বন্ধে যা বলেছি তা তুলে নিলাম। এটা আমি আগেও করতে পারতাম যদি আমায় সুযোগ দেওয়া হত। কারণ আমার কাছে ওঁর সাক্ষ্যের কোন দাম নেই!' ম্যাকব্রাইডের গলার স্বর তখন ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। ব্যারিস্টার রাও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আগেই তুলে নিয়েছিলাম। এখন আবার সেই কথাই বলছি। আমার অনুরোধ, ওঁর নাম যেন আদালতের বাইরেও উল্লেখ না হয়।'

ম্যাজিস্ট্রেট মৃদু হাসলেন। বললেন 'আমাব ক্ষমতার দৌড় এই ঘরটুকু। তার বাইরে নয়। সুতরাং আপনার এ অনুরোধ আমি রাখতে পারছি না।'

এর পরেই মোটামুটি শান্ত হয়ে গেল কোর্টরুম। য়্যাডেলা যখন সাক্ষী দিতে উঠল তখন মামলার পরিবেশ শুরুর চেয়েও শান্ত। প্রাজ্ঞ ইংরেজরা অবাক হয় নি। নেটীভদের চরিত্র তারা ভাল করেই জানে। যুক্তির কোন সারবস্তু তাদের চরিত্রে নেই। কোনরকমে একটা অর্বাচীন গোঁ সম্বল করে এরা তাদের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করে। যে কোন তুচ্ছ আবেগকে আশ্রয় করে এরা জ্বলে উঠেই ফুরিয়ে যায়। আসল দুর্যোগ যখন আসে তখন তার সঙ্গে লড়াই করার মতন কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। প্রতিবাদীপক্ষ যা চেয়েছিল তা হলো প্রতিবাদ। বৃদ্ধাকে জোব করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এখন বিচারে যদি আজিজের নির্বাসনও হয় তাহলেও তারা খুব বেশি দুঃখ পাবে না।

কিন্তু আসল সংকটটা তখনও বাকি ছিল।

য়্যাডেলা যা বলতে চেয়েছিল তা সত্য খাঁটি সত্য। কিন্তু এটা যে তার কাছে কত কঠিন তা সে বুঝতে পারছিল। সেদিন গুহার মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছিল তার সঙ্গে সরু সুতোয় বাঁধা আছে আর একটা ব্যক্তিগত ঘটনা। রনীর সঙ্গে তার বিয়ে। বেশ মনে আছে গুহার ভেতরে ঢোকবার ঠিক আগেই ভালবাসার কথা মনে পড়েছিল তার। আজিজকে তাই জিজ্ঞেস করেছিল বিয়ে ব্যাপারটা কেমন। ভালবাসার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক কতটুকু। কিন্তু তার এই সরল কৌতূহলের জন্যেই কি আজিজের মনে পাপবোধ জেগে ওঠে? কিন্তু এতসব কথা ফাঁক করে সে বলবে কি করে? তার জীবনের এই ছোট্ট নৈরাশ্যটা সে সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাইছিল না। কিন্তু আশ্চর্য! যে মুহূর্তে সে সাক্ষী দিতে উঠল তখনই সে যেন অন্য মানুষ হয়ে উঠল। নিজের কথাব শব্দগুলো যখনই তার কানে ঢুকল, তখনই তার ভয় অনিশ্চয়তা সব দূর হয়ে গেল যেন। একটা অন্যরকম উত্তেজনা হচ্ছিল তখন। মনে হচ্ছিল কোন একটা অদৃশ্য শক্তি দুর্ভেদ্য বর্ম দিয়ে তাকে আড়াল করে রেখেছে। স্মৃতিনির্ভর হয়ে ঘটনার বিবরণ দেওয়া নয়: মনশ্চক্ষে সেই মাড়াবার অভিযানের ছবিটা তখন নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠছে। সে যেন চলে গেছে সেই পরিবেশে আর ম্যাকব্রাইডের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। সেই ভয়ঙ্কর দিনটা যেন সমস্ত সত্তা দিয়ে তার জীবনে আবার ফিরে এল। একবার মনে

হলো ঘটনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। পরক্ষণেই অন্যরকম মনে হলো। অবাক হয়ে ভাবছিল সেদিন এই অভিযানটা এত একঘেয়ে লেগেছিল কেন ? সে যেন তখন স্পষ্ট দেখল সূর্য উঠছে। নরম রোদের আলতো ছোঁয়া গায়ে লাগছে। তারপর হাতীর ওপর চড়ে তারা চড়াই ভাঙতে লাগল। চোখের সামনে দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে মরা পাহাড়ের দল। যত উপরে উঠছে তত যেন গরম বাড়ছে। একসময় এসে পেঁাছল প্রথম গুহার সামনে। সে ভেতরে ঢুকল। আজিজ তখন একটা দেশলাই কাঠি জ্বালল। ঝলমল করে উঠল গুহার ভেতরটা। পালিশ করা মসৃণ দেওয়ালে আলোর রোশনাই যেন ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল তার চোখ। কি অদ্ভুত সুন্দর এই আলোর রোশনাই ! তারপর গুহার ভেতর থেকে তারা বেরিয়ে এল। এইভাবে একটার পর একটা প্রশ্নের নির্ভুল জবাব দিয়ে যাচ্ছে য়্যাডেলা। হ্যাঁ, একটা তালাও সে দেখেছে। কিন্তু জানত না এটার নাম তলোয়ার তালাও। প্রথম গুহা দেখেই মিসেস মুর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন কি তিনি ওখানেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ? ঠিক তাই। একটা বড় পাথরের ছায়ায় বসে তিনি বিশ্রাম নিতে লাগলেন। অন্য গুহার ভেতরে ঢুকতে রাজী হলেন না।

প্রশ্নগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে আর য়্যাডেলা তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। বাধাহীন গতিতে সে যেন সত্যের পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। নিটোল সত্যের পথ রাজপথের মতন মসৃণ আর টানা পাখার মৃদু বাতাসের ঝাপটায় ভর দিয়ে য়্যাডেলা যেন উড়ে যাচ্ছে আকাশপথে। ম্যাকব্রাইড হঠাৎ প্রশ্ন করল 'এরপর আপনারা কাউয়া দোল্ পাহাড়টার দিকে গেলেন। সঙ্গে বন্দী আসামী আর একজন মাত্র গাইড। আর কেউ ছিল কি?'

'হ্যাঁ। সেই বিশাল পাহাড়টার আকৃতি অদ্ভুত। বিস্ময়করও বলতে পারেন।' বলল য়্যাডেলা। যখন সে পাহাড়টার কথা বলছে তখন মনে হচ্ছিল সে যেন চোখের সামনে দেখছে সেটা। রোদের তাতে পুড়ে যাচ্ছিল মুখটা। হঠাৎ সে বলল, 'হ্যাঁ, আমরা তিনজনই ছিলাম। আর কেউ ছিল না আমাদের সঙ্গে। তবুও কেমন যেন একা একা লাগছিল।'

'বাঃ !' ম্যাকব্রাইডের চোখদুটো অত্যুৎসাহে চকচক করে উঠল। সাক্ষীর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকতে থাকতে সে বলল, 'এরপর যেখানে গিয়ে পেঁাছলেন সেখানটা খাঁজের মতন। বেশ চওড়া একটা জায়গা। পাশ দিয়ে একটা নালা বয়ে যাচ্ছে। আর চারপাশে ছড়িয়ে আছে অনেকগুলো গুহা।'

'হ্যাঁ।'

'তারপর একা একাই একটা গুহার ভেতরে ঢুকলেন আপনি।'

'ঠিক তাই।'

'বন্দীও আপনাকে অনুসরণ করে গুহাটার মধ্যে ঢুকল।'

কোর্টরুমের প্রতিটি মানুষ রুদ্ধবাক। শুধু মেজর ক্যালেন্ডার চাপা উত্তেজনায় বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'শয়তানটাকে এবার আমরা ধরে ফেলেছি।' কিন্তু য়্যাডেলা একেবারে নির্বাক। একটা কথাও বলছে না। ঘরের সবাই অধীর আগ্রহে তার উত্তর শোনার অপেক্ষা করছে।

প্রশ্নটা আবার করল ম্যাকব্রাইড। এমনভাবে প্রশ্নটা করল যাতে প্রত্যাশিত উত্তরটা প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত থাকে। ম্যাকব্রাইড বলল, 'বলুন মিস কোয়েস্টেড! লোকটা আপনাকে অনুসরণ করে গুহার মধ্যে ঢুকল। তাই না?'

'আমায় আধ মিনিট সময় দিন মিস্টার ম্যাকব্রাইড। আমি বলছি।'

য়্যাডেলার চোখের উপর তখন সব কটা গুহার ছবি ভেসে উঠেছে। কল্পনায় সে দেখল যেন একটা গুহার মধ্যে সে ঢুকল। আবার তখনই বেরিয়ে এল। গুহার প্রবেশমুখের দিকে তীক্ষ্ন নজর রেখে দেখছিল আজিজ ভেতরে ঢুকেছে কিনা। কিন্তু কিছুতেই আজিজকে যেন চিনতে পারল না য়্যাডেলা। তাহলে? এই সংশয়টাই আশ্চর্য এবং নিবিড়। ঠিক যেন মাড়াবার পাহাড়-শ্রেণীর মতন নিবিড় এবং কঠিন। অথচ কি ভীষণ আকর্ষণীয় এই সংশয়। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে ম্যাকব্রাইড। একটা উত্তর শুনতে চাইছে লোকটা। সেদিকে চেয়ে য়্যাডেলা বলল, 'আমি এখনও খুব নিঃসন্দেহ নই মিস্টার ম্যাকব্রাইড।'

'তার মানে?'

'আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছি না '

ম্যাকব্রাইডের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল। জেরা করার ভঙ্গিতে বলল 'ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা। আপনি কি চওড়া ধাপের কাছে পৌঁছন নি? তারপর কি গুহাটার ভেতরে ঢোকেন নি ? ঢুকেছিলেন। বেশ। এবার বলুন। আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। বন্দীও আপনার পিছন পিছন গুহাটার মধ্যে ঢুকল। তাই না?'

য়্যাডেলা নিঃসংশয়ে মাথা নাড়ল। তারপর নীরস স্বরে বলল, 'না।'

য়্যাডেলার 'না' শুনে ঘরের সবাই তখন নড়েচড়ে উঠেছে। সামান্য কলরবও উঠল। কিন্তু ফীলডিং ছাড়া আর কেউ তা বুঝতে পারল না। শুধু ফীলডিংই বুঝতে পেরেছে এর প্রতিক্রিয়াটা। নির্ঘাৎ বেঁচে গেল আজিজ। কিন্তু মেয়েটা যেন কেমন অদ্ভুত একটা মানসিক অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে নির্বাক হয়ে গেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট দাসও অবাক। য়্যাডেলার দিকে ঈষৎ ঝুঁকে বললেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন তা আর একবার বলুন।'

'বোধহয় আমি ভুল করেছি।'

'কি ভুল?'

'ডাক্তার আজিজ আমায় ফলো করে গুহার ভেতরে ঢোকেন নি।'

কথাটা শুনেই রাগে বিরক্তিতে হাতের কাগজপত্রগুলো টেবিলের ওপর আছড়ে ফেলে দিল ম্যাকব্রাইড। কিন্তু কি ভেবে সেগুলো আবার তুলে নিল সে। তারপর শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল 'মিস কোয়েস্টেড, ঘটনার দুঘণ্টা পরে আপনি যে লিখিত এজাহার দিয়েছিলেন তা অন্য রকম। আমি পড়ছি শুনুন।'

কিন্তু বাধা দিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। বললেন, 'মাপ করবেন মিস্টার ম্যাকব্রাইড।

এভাবে আপনি সাক্ষীকে জেরা করতে পারেন না। বরং আমি নিজেই ওঁর সঙ্গে কথা বলছি।' ম্যাজিস্ট্রেটের চেহারাটা তখন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে হচ্ছিল। দর্শক শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা যদি শান্ত হয়ে বসে থাকতে না পারেন, তবে কোর্টরুম থেকে চলে যেতে হবে আপনাদের।' শেষ-মেশ সাক্ষী য়্যাডেলার দিকে/চেয়ে কোমল স্বরে বললেন, 'আপনি আমার কাছে বলুন মিস কোয়েস্টেড। আমিই এ মামলার বিচারক। তবে যা বলার ভেবেচিন্তে বলবেন কারণ সত্য বলতে আপনি অঙ্গীকারবদ্ধ।'

য়্যাডেলা নিঃসঙ্কোচে বলল, 'ডাক্তার আজিজ গুহার মধ্যে আমায় ফলো করে ঢোকেন নি।'

য়্যাডেলার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই টারটনের ইঙ্গিতে মেজর ক্যালেণ্ডার হেঁকে উঠল, 'সাক্ষীর স্বাস্থ্যের স্বার্থে এখুনি এই মামলা বন্ধ করে দেওয়া হোক। সাক্ষীর চিকিৎসক হিসেবে আমি এই দাবি রাখছি।' ক্যালেণ্ডারের কথা শুনেই ইংরেজরা দাঁড়িয়ে উঠল। তাদের বড়সড় চেহারার আড়ালে ম্যাজিস্ট্রেটের ছোটখাট চেহারাটা তখন ঢাকা পড়ে গেছে। তাদের দেখাদেখি ভারতীয়রাও দাঁড়িয়ে উঠল। তবে কি ঘটছে তা কেউ বুঝছিল না। সবাই নিজের মতন করে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল। এই মৃদু গোলমালের মধ্যেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চিৎকার করে বললেন, 'মিস কোয়েস্টেড! তাহলে আপনি কি অভিযোগ তুলে নিলেন?'

য়্যাডেলা বুঝতে পারছে একটা দুর্বার শক্তি যেন তাকে অধিকার করে একটা পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কল্পনার সেই রঙিন ছবি তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। নীরস কঠিন বাস্তব পরিবেশে ফিরে এসে সে বুঝতে পারছিল যে দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হলো তার। হয়ত এর জন্যে তাকে অনুতাপ করতে হবে। কিন্তু সে পরের কথা। এখুনি তার যা করা দরকার তা হলো ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের জবাব দেওয়া। তাই সে করল। দ্বিধাহীন স্বরে সে বলল, 'হ্যাঁ তাই। সব অভিযোগ আমি তুলে নিলাম।' ম্যাজিস্ট্রেটও যেন দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন। 'এর পরেও মামলা চালিয়ে যাবেন?'

ম্যাকব্রাইড অবাক হয়ে য়্যাডেলার দিকে চেয়েছিল। মেয়েটাকে তখন যেন একটা ভাঙাচোরা যন্ত্রের মতন দেখাচ্ছে। সেইভাবেই তাকিয়ে থাকতে থাকতে ম্যাকব্রাইড বলল, 'আপনি কি উন্মাদ হয়ে গেলেন মিস কোয়েস্টেড?'

ম্যাজিস্ট্রেট আপত্তি জানালেন। বললেন, 'ওঁকে আর কোন প্রশ্ন করার অধিকার আপনার নেই স্যার।'

'অন্তত আমায় একটু ভাবতে দিন।'

হঠাৎ দর্শকের ভেতর থেকে নবাব বাহাদুর চেঁচিয়ে উঠলেন 'সাহেব, আপনি এ মামলা তুলে নিন। ব্যাপারটা কেলেঙ্কারিতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।'

কিন্তু মিসেস টারটন্ তখন ঘোর উন্মাদিনী হয়ে উঠেছেন। রাগে প্রতি-হিংসায় টানটান হয়ে হেঁকে উঠলেন, 'না।. মামলা উনি তুলে নেবেন না। আমরা অন্য সাক্ষী ডাকছি। এর সঙ্গে আমাদের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।' রনী এগিয়ে গিয়ে মহিলাকে সামলাতে গেল। কিন্তু এক ঝটকায়

রনীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন মহিলা তারপর য়্যাডেলার উদ্দেশে কটু ভাষায় গালাগালি করতে লাগলেন।
অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে চেয়ে ম্যাকব্রাইড বলল, 'তাই হোক। আমি মামলা তুলে নিলাম।'
ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ দাস। সারাদিন অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ গেছে তাঁর। প্রায় অর্ধমৃত হয়ে গেছেন পরিশ্রমে। তবে সুখের কথা, মামলাটা নেহাৎ লাগাম-ছেঁড়া হয়ে যায় নি। মোটামুটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই ছিল। অন্তত এটা প্রমাণ করেছেন যে ভারতীয়রাও এ ধরনের মামলা চালাতে সক্ষম। আদালতকক্ষে তখন তুমুল শোরগোল চলছে। তার মধ্যেই দাসমশাই চেঁচিয়ে বললেন, 'বন্দীকে আমি সসম্মানে মুক্তি দিলাম। তাঁর বিরুদ্ধে যা কিছু অভিযোগ সব আমি অস্বীকার করছি। মামলার যা খরচপত্র হয়েছে তা অন্যত্র নিষ্পত্তি হবে।'
কোর্টঘরের পরিবেশ বিশুদ্ধ রাখার আস্ফালন তখন তুচ্ছ হয়ে গেছে। আর সেই নিয়ন্ত্রণ নেই। যার যা খুশি আচরণ করছে। কেউ হা হা করে হাসছে। পরস্পরকে আবেগে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করছে। কেউ ব্যঙ্গ করছে। ক্ষোভে ক্রোধে ঘৃণায় কেউ কাউকে অপমান করছে। কেউ বা হাউ হাউ করে কাঁদছে। একজায়গায় ইংরেজদের জড়ো করে আগলে রেখেছে তাদের ভারতীয় ভৃত্যারা। অন্যত্র দেখা গেল হামিদ্‌উল্লার হাতের মধ্যে সংজ্ঞাহীন হয়ে গেছে আজিজ। একদিকে জয়ের উল্লাস, অন্যদিকে পরাজয়ের গ্লানি, বিষাদ। অন্তত এই মুহূর্তে কোর্টঘরের পরিবেশ এই দুই বৈপরীত্যে মাখামাখি হয়ে গেছে। কিন্তু এই সাময়িক উত্তেজনা থাকবে না। জীবনযাত্রা আবার তার নিজস্ব জটিলতায় ফিরে আসবে। অনতিবিলম্বেই কোর্টঘর ফাঁকা হয়ে গেল। ধস্তা-ধস্তি করে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে। পড়ে রইল একজনই। সেই অর্ধনগ্ন দেবতা, পাঙ্খাওয়ালা। কি সুন্দর ছন্দোময় ওর শরীরটা! এতক্ষণ এখানে কি ঘটে গেল কিছুই সে জানল না। টানা পাখার রশি টানতে টানতে সে নীরবে তাকিয়ে ছিল মঞ্চের দিকে। মঞ্চ ফাঁকা হয়ে গেছে, বাহারী চেয়ারগুলো একপাশে উল্টে পড়ে আছে। মানুষের পায়ের ধুলোয় ভারী হয়ে উঠেছে ঘরের বাতাস আর টানাপাখার ছন্দোময় সঞ্চালনে তোলপাড় হচ্ছিল সেই ধুলিময় বাতাস।

২৫

কোর্ট থেকে বেরোবার সময় য়্যাডেলা নিজের লোকদের সঙ্গে গেল না। বাইরে যাবার সাধারণ দরজা দিয়ে ভারতীয়দের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। এ দলের সবাই প্রায় দোকানদার শ্রেণীর মানুষ। কোর্ট থেকে বেরিয়েই বাজার। পৃথিবীর সব বাজারেই একটা বিশেষ গন্ধ থাকে। এখানেও আছে এবং বাইরে বেরোতেই

গন্ধটা য়্যাডেলার নাকে লাগল। গন্ধটা যে ঠিক কেমন তা হয়ত বুঝিয়ে বলতে পারবে না য়্যাডেলা, তবে লণ্ডনের বস্তি অঞ্চলে যে গন্ধ ভেসে বেড়ায় তার মতন কটু নয়। বেশ জমজমাট বাজার। অনেক মানুষের হট্টগোল। বয়স্ক লোকেরাও কানে গন্ধওলা আতর গুঁজে পথ চলেছে। তাদের কালো ছোপ ধরা দাঁতের ফাঁকে জরদা দেওয়া পান। ভুরভুর করছে জরদার গন্ধ। কালো চুকচুকে মাথায় সুগন্ধী ফুলেল তেল জবজবে করে মাখা। পরিবেশ এবং লোকজন দেখলেই বোঝা যায় যে সুদূর প্রাচ্যের কোন এক অঞ্চলে সে এসে পড়েছে। ঐতিহ্যময় দেশটা এখন তুচ্ছ হয়ে গেছে। যেন এককালের মহান বাদশা অপযশ আর কলঙ্কের কালিমা গায়ে মেখে রাজপথে এসে নেমেছে। সুগন্ধী জরদা আতরের সঙ্গে মানুষের গায়ের গন্ধ মিশে একাকার। সবাই হাঁটছে, য়্যাডেলাও হাঁটছে : তবে এরা কেউ তার দিকে তাকিয়েও দেখছিল না। কখনও তার কাঁধের ওপর দিয়ে, কখনও বা তার শরীরটা সরিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। রাজপুরুষ বলে কোন আলাদা সম্ভ্রমবোধ দেখাচ্ছিল না। যেন সে-ও তাদেরই একজন। এইরকমই হয়। সাধারণ মানুষ যখন দেশের রাজাকে বাতিল করে তখন তার দিকে ফিরেও তাকায় না। এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হলো না। হঠাৎই ফীলডিংকে দেখেতে পেল তারা আর তখন য়্যাডেলার অস্তিত্ব টের পেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছুঁড়ে দিল ফীলডিংএর দিকে মেয়েটাকে।

ফীলডিং অবাক। য়্যাডেলার দিকে চেয়ে বলল, 'এখানে কি করতে এসেছেন ?'

ফীলডিংকে দেখেই য়্যাডেলা মন স্থির করে নিয়েছে। লোকটা যেহেতু শত্রুপক্ষের সুতরাং তাকে এড়িয়ে যাবে। তাই কোন জবাব দিল না। ফীলডিং ফের জিজ্ঞেস করল, 'একা একা কোথায় যাচ্ছেন ?'

'জানি না।'

'কিন্তু এভাবে ঘুরে বেড়াবেন না। গাড়ি কোথায় ?'

'আমি হেঁটেই যাব।'

'কি পাগলামি করছেন ? জানেন, পুলিশ আশংকা কবছে যে কোন মুহূর্তে দাঙ্গা বেধে যেতে পারে ? তখন কি হবে কেউ জানে না। আপনার সঙ্গের লোকজনই বা কোথায় ? তাদের সঙ্গে থাকলেন না কেন ?'

'আমায় কি সর্বক্ষণ ওদের সঙ্গেই থাকতে হবে ?'

কথাটা বলেই য়্যাডেলা কেমন যেন শূন্যতা বোধ করতে লাগল। সে বুঝতে পারছে কোন দলেই তার স্থান নেই। আসলে খুব খেলো হয়ে গেছে সে এখন। আর তার কোন গৌরববোধ নেই। য়্যাডেলার কথায় অবাক হলেও জোর দিয়ে ফীলডিং বলল, 'নিশ্চয়ই। তবে এখন আর তা সম্ভব নয়। দেরি হয়ে গেছে। তার চেয়ে আমার সঙ্গে চলুন। আমার গাড়িতে গিয়ে উপস্থিত বসুন। আসুন, এই দিকে।'

য়্যাডেলাকে সঙ্গে করে ফীলডিং যখন যাচ্ছে তখনই আজিজের চিৎকার শুনল।

'সিরিল ! ভাই সিরিল ! আমায় ফেলে যেও না প্লিজ !'

ফীলডিং হাত নেড়ে বলল, 'আসছি।' তারপর য়্যাডেলার নড়া ধরে তাকে

টানতে টানতে নিয়ে চলল তার ঘোড়ার গাড়ির দিকে। এভাবে হঠাৎ তার হাত ধরায় পাছে সে কিছু মনে করে, তাই চলতে চলতে য়্যাডেলাকে বলল. 'আশা করি কিছু মনে করছেন না। তবে এই মুহূর্তে আমি কারো ব্যক্তিগত মান মর্যাদার কথা ভাবছি না। যে কোন উপায়ে একটা নিরাপদ জায়গায় আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়াই আমার কর্তব্য। আর শুনুন, যখন খুশি গাড়িটা কাল পাঠিয়ে দেবেন।'

'কিন্তু গাড়ি চড়ে আমি যাব কোথায়?'

'যেখানে আপনার খুশি। তবে কোথায় যাবেন তা তো বলতে পারব না। সেটা আপনি জানেন।'

নিরিবিলি একটা গলির মধ্যে ফীলডিংএর টমটমখানা দাঁড় করান ছিল। ওরা গিয়ে দেখল গাড়ি আছে. কিন্তু ঘোড়া নেই। সহিসও অনুপস্থিত। মামলা যে এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে সহিস তা আশা করে নি। তাই নিশ্চিন্ত মনে ঘোড়া দুটো ছেড়ে লোকটা তার এক দোস্তের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। ফীলডিংএর অনুরোধে সেই অশ্ববিহীন শকটের মধ্যে য়্যাডেলা বাধ্য মেয়ের মতন গিয়ে বসল। ফীলডিং তাকে একলা ছেড়ে যেতে পারছিল না। প্রতি মুহূর্তেই গোলমাল বাড়ছে। তাছাড়া যে সব অঞ্চলগুলো অগ্নিগর্ভ বলে নির্দিষ্ট করা আছে। এটাও তার অন্যতম। বাজারের ভিতর দিয়ে যে প্রধান সড়কটা চলে গেছে সেটা ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে সিভিল লাইন্স্এ যাবার জন্যে ইংরেজদেরও গলিপথ ব্যবহার করতে হচ্ছে। লোক-গুলো ইংরেজদের দিকে চেয়ে আছে যেন শুঁয়োপোকা দেখছে। টিপে মেরে ফেললেই হলো। ফীলডিং হঠাৎ দেখতে পেল একটা কিশোর বয়সী ছেলে হাতে জুঁই ফুলের মালা নিয়ে তার দিকে দৌড়ে আসছে। ফীলডিং চেঁচিয়ে উঠল, 'এই! এখানে কি করছিস রে?

'স্যার আপনাকে পরাব বলে এই মালাটা এনেছি।'

ফীলডিং আঁতকে উঠল। বলল, 'না না। ওসব জঞ্জাল আমায় পরাবি না। পালা এখান থেকে!'

ততক্ষণে আর এক ছাত্র গাড়ির কাছে এসে হাজির। গাড়ির ডাণ্ডা দুটো দুহাতে ওপরে তুলে ছেলেটা বলল. 'স্যার! ঘোড়া হয়ে আপনার গাড়িটা চালাব?'

ফীলডিং চিনতে পারল তাকে। তার ছাত্র রফী। নিরুপায় হয়ে সে বলল, 'আমার সহিসটাকে একটু ডেকে দিবি বাবা?'

'না স্যার। আমরাই আপনার গাড়ি টানব। আমাদের কত বড় ভাগ্য এটা!' ফীলডিংএর আদেশ অনুরোধ কিছুই তারা মানল না। আজ্ঞাপালন করার চেয়ে খাতির করতেই তারা তখন ব্যস্ত। মালার ফাঁসে জড়িয়ে দিল ফীলডিংকে। জুঁই গোলাপের গোড়ের মালায় প্রায় ঢেকে গেছে ফীলডিংএর শরীরটা। একজন একটা উর্দু শ্যেরে আবৃত্তি করল তার সম্মানে। সরু নিরিবিলি গলিপথটা তখন লোকে লোকারণ্য। হৈ হৈ করছে ছেলেগুলো। এদের সবাই প্রায় তার ছাত্র। একজন চেঁচিয়ে বলল. 'আপনার গাড়িটা

মিছিলের আগে আগে টেনে নিয়ে যাব স্যার। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।' এই বলে প্রায় বস্তার মধ্যে পোরার মতন সবাই মিলে ফীলডিংকে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

গাড়ির মধ্যে একপাশে জড়সড় হয়ে বসে ছিল য়্যাডেলা। ধপ করে তার পাশেই বসে পড়ল ফীলডিং। তারপর অপ্রস্তুত একটু হেসে বলল, 'আমি জানি না আপনার এসব ভাল লাগছে কি না! তবে জানবেন এখন আপনি অনেক নিরাপদ।' ইতিমধ্যে গাড়িটাকে টেনেটুনে বাজারের মধ্যে নিয়ে এসেছে ওরা। য়্যাডেলার ওপর চন্দ্রপুরের মানুষ গোড়া থেকেই বিতৃষ্ণ। মেয়েটা যে জেনেশুনে প্রথম থেকেই মিথ্যে কথা বলে আসছে তার জন্যেই এই রাগ। এমনকি য়্যাডেলা যখন এজাহার দিতে উঠে তার অভিযোগ তুলে নিল তখনও তাদের ঘৃণা এতটুকু কমে নি। তাদের ধারণা মেয়েটার ওপর দেবীর ভর হয়েছিল বলেই শেষমেষ মিথ্যে বলতে পারে নি। মোটকথা য়্যাডেলা সম্বন্ধে চন্দ্রপুরের মানুষের মনে একটুও সমীহভাব ছিল না। কিন্তু এখন গাড়ির মধ্যে ফীলডিংএর পাশে তাকে দেখে তাদের মনের বিতৃষ্ণা একেবারে দূর হয়ে গেল। শুধু ফীলডিং নয় য়্যাডেলাকেও মালা দিয়ে সাজিয়ে দিল তারা। অবশ্য কিছু লোক মনে করেছিল যে বোধহয় এই মহিলাই মিসেস মুর, আর তাই এই উত্তেজনা। যা হোক, যুগলবন্দী ফীলডিং আর য়্যাডেলাকে সাজিয়ে গুছিয়ে গাড়িটাকে তারা আজিজের ল্যাণ্ডো গাড়ির পিছন পিছন নিয়ে চলল। জনতার জয়ধ্বনিতে সারা পথ মুখর। কেউ কেউ বিদ্রুপও করছে। ইংরেজরা জোড়বন্দী থাকে বলেই এই বিদ্রুপ। ফীলডিং প্রতিবাদ করল না। সে জানে এটুকু মেনে নেওয়াই মঙ্গল। নইলে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে এবং জনতার রোষের শিকার হতে পারে তারা। তেমন আশঙ্কা দেখা দিলে য়্যাডেলাকে রক্ষা করার দায় এসে পড়বে তারই ওপর। তবে মেয়েটার জন্যে জীবন দেবার চেয়ে আজিজের বিজয়োৎসবে যোগ দেওয়াটাই তার কাছে বেশি উপভোগ্য মনে হচ্ছিল।

কিন্তু কোথায় চলেছে এই মিছিল সুন্দরী? কোন পারে ভিড়বে এই সোনার তরী? শত্রু না মিত্র পক্ষের আড্ডায়? আজিজের বাংলো না কালেক্টার সাহেবের আস্তানায়? না কি মিণ্টো হাসপাতালে? অথচ দিল্লী বা সিমলা —কোথায়? ছাত্ররা ভাবল মিছিল বোধহয় তাদের কলেজের দিকেই যাচ্ছে। এই মনে করে একটা চৌরাস্তার সামনে এনে গাড়িটা থামাল। তারপর ডান-দিকের একটা ঢালু রাস্তা দিয়ে গাড়িটাকে কলেজের আমবাগানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ফীলডিং ও য়্যাডেলার পক্ষে ব্যাপারটা ভালই হলো। অন্তত অশান্তিটা কেটে গেল। চকচকে উজ্জ্বল সবুজ পাতায় ছেয়ে আছে সারা আমবাগান। ডালে ডালে ঝুলছে ছিপছিপে কাঁচা আম। দুপুরের রোদে পুকুরটা ঝিমোচ্ছে। অদূরেই দেখা যাচ্ছে নীল রঙের খিলানওলা মনোরম বাগানবাড়িটা। ওদের নামিয়ে দিয়ে ছেলেরা চলল অন্যদের আনতে। য়্যাডেলাকে নিয়ে ফীলডিং তার আপিসে এল। ম্যাকব্রাইডকে একবার টেলি-ফোন করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। ওরা আগেই টেলিফোনের তার

কেটে দিয়ে গেছে। চাকরবাকররা কেউ নেই। এ অবস্থায় য়্যাডেলাকে ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলে না। সুতরাং তার পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হলো ফীলডিংকে। ঘরে যা মজুত ছিল তাই খেতে দিল। তারপর য়্যাডেলাকে বিশ্রাম করতে বলে নিজেও বিশ্রাম নিতে গেল। তখন অনেক দূরে চলে গেছে মিছিল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে তার জয়ধ্বনি। ফীলডিং ভাবছিল এ কি রকম বিজয়োৎসব? যত না আনন্দ তার চেয়ে আতঙ্ক ঢের বেশি। আজিজের মতন সে নিজেও জিততে চেয়েছিল কিন্তু ঠিক এ ভাবে নয়।
ওদিকে আজিজের অবস্থাও শোচনীয়। একটা ল্যান্ডো গাড়ির মধ্যে গাদা-গাদি করে ঢুকিয়ে দিয়েছে তাকে। তাতে আছেন নবাব বাহাদুর হামিদউল্লা, মহম্মদ আলি ছেলের দল আর অজস্র ফুলের মালা। কিন্তু আজিজের মন ভরছে না। আরও লোক চাই। যারা তাকে ভালবাসে তাদের সবাইকে চাই। তার বিশেষ দরকার ফীলডিংকে। তাই ক্রমাগত 'সিবিল সিরিল' বলে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল আজিজ। জয়ের উল্লাস আর ভাল লাগছে না তার। এই কটা দিন অনেক মানসিক যাতনা সে সয়েছে। শুরু হয়েছিল ওর গ্রেফতারের দিন থেকে। সেই থেকে আহত জন্তুর মতন সে শুধু মার খেয়েছে। একবারও উঠে দাঁড়াতে পারে নি। গভীর নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত সে। এটা যে শাস্তির ভয় তা নয়। তার ধারণা হয়েছিল অভিযোগ মিথ্যে হলেও শাস্তি সে পাবেই। কারণ কোন ইংরেজ মহিলার জবানবন্দী আদালত উপেক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং এটাই বিধিলিপি। ভাগ্যের পরিহাস প্রায় মেনেই নিয়েছিল সে। তার এই মনোভাব আরও দৃঢ় হলো যখন মহরমের পর দ্বিতীয়বার সে গ্রেফতার হলো। তাই হঠাৎ মুক্তি পেয়ে তার আহত মন যা চাইছিল তা উল্লাস নয়, সকলের ভালবাসা। শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রেম। এই মুহূর্তে ফীলডিংকে তার সবচেয়ে বেশি দরকার। কিন্তু কোথায় সে? আসছে না কেন? তাহলে মিছিল ঘুরিয়ে দেওয়া হোক! কিন্তু চাইলেই মিছিলের মুখ ঘোরান যাবে না। বাজারের সরু রাস্তায় এঁকেবেঁকে মিছিল চলেছে। নালার মধ্যে চলতে গিয়ে সাপ যেমন মুখ ফেরাতে পারে না মিছিলেরও সেই অবস্থা। একমাত্র ময়দানে পৌঁছেই মিছিল মুখ ঘোরাতে পারবে। মিছিল পরিচালকরা তখন স্থির করবে কোন্ শিকারের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে।
গাড়ির ভেতর থেকে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠল মহম্মদ আলি। 'থেম না ভাইসব। এগিয়ে চল। আমাদের প্রথম লক্ষ্য কালেক্টর তারপর পুলিশ সুপার। নিপাত যাক, নিপাত যাক।'
নবাব বাহাদুর একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যুদ্ধো-ন্মত্ত মানুষগুলো তাঁর প্রতিবাদের কোন মূল্যই দিতে চাইল না। তিনি বুঝতে পারছিলেন ব্যাপারটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। তাছাড়া এ থেকে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। স্বখাত সলিলেই ইংরেজরা ডুবে মরেছে। শুধু শুধু মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া রণনীতি নয়। অন্য একটা কারণও ছিল। তিনিও অনেক ভূসম্পত্তির মালিক। জনতা হঠাৎ অরাজক হয়ে উঠলে

তিনিও রেহাই পাবেন না।
আজিজ তখনও ফীলডিংএর নাম ধরে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল 'সিরিল! তুমি আবার আমায় ছেড়ে গেলে ভাই!'
'তবুও একটা প্রতিবাদ করা দরকার। নইলে ওরা ভাববে আমরাই ভয় পেয়েছি।' বৃদ্ধ নবাবের দিকে চেয়ে হামিদউল্লা বলল।
জনতা তখন হুংকার দিচ্ছে। 'সিভিল সার্জন নিপাত যাক। নিপাত যাক। নুরুদ্দীনের মুক্তি চাই। মুক্তি চাই।'
বৃদ্ধ নবাবের তখন দিশাহারা অবস্থা। বললেন, 'আবার নুরুদ্দীনকে টানা কেন?'
'ওর ওপর ওরা অত্যাচার করেছে।' বলল আলি।
'তাই না কি? ছি ছি!' বলল হামিদ।
বৃদ্ধ হঠাৎ রেগে উঠলেন। বললেন, 'তাই বলে হাসপাতাল চড়াও! না। কখনই তা হতে পারে না। আমার নাতিকে আমি ভালভাবেই চিনি।'
'কিন্তু নুরুদ্দীনের ওপর যে অত্যাচাব হয়েছে তা তো ঠিক!'
'কি করে বুঝলে?'
'আমরা শুনেছি। মামলা বসার আগে ক্যালেণ্ডার বলছিল সে কথা।'
'কি বলছিল?'
'কালা নীগারটাকে আজ উচিত শিক্ষা দিয়েছি।'
'য়্যাঁ! নবাব বাহাদুরের নাতিকে কালা নীগার বলল? এতবড় ধৃষ্টতা!'
'শুধু তাই! ঘায়ের ওপর মলমের বদলে মরিচ ছড়িয়ে দিয়েছে।'
বৃদ্ধ সজোরে মাথা নাড়লেন। বললেন 'অসম্ভব। হতেই পারে না তা। আমার নাতিকে আমি চিনি। তাছাড়া দরকারে ছেলটার ওপর যদি একটু কঠোরও হয় তাতে ভালই হবে। ছোঁড়াটা একটু শুধরে যাবে।'
'তাই বলে মারিচ! ওরা কি এইভাবে আমাদের শেষ করতে চায় নাকি? কিন্তু তা হবে না। হতে দেব না আমরা।' হুংকার দিয়ে বলল মহম্মদ আলি।
জনতার রোষবহ্নিতে নতুন ইন্ধন পড়ল। এতক্ষণ অব্দি আক্রমণের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না এদের। কারণ সুস্পষ্ট অভিযোগ কোথায়? কিন্তু ময়দানে পেঁাছে মিণ্টো হাসপাতালটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই জনতা গর্জন করে উঠল। যেন হাসপাতাল নয় ওটা একটা কসাইখানা। তখন ভর দুপুর। আকাশ আর পৃথিবীর চেহারাটা তখন ক্ষ্যাপাটে দেখাচ্ছে। মনে হলো আবার সেই অশুভশক্তি যেন লম্বা লম্বা পা ফেলে ফিরে আসছে। কি করে নবাব এদের ঠেকাবেন? এতক্ষণ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, এখন হাল ছেড়ে দিলেন। গত সপ্তাহেই নাতিকে দেখে এসেছেন। দিব্যি ছিল ছেলেটা। কিন্তু ছেলেটার ওপর নির্যাতন কি তার পরে হয়েছে? যদি সত্যিই তা হয় তবে উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে হবে বৈকি? উদ্ধত উত্তেজনার স্রোতে নবাব বাহাদুরও ভেসে গেলেন।
জনতার এই প্রচণ্ড আক্রোশ হয়ত সর্বনাশ ঘটাতে পারত। কিন্তু কোনকিছুই

ঘটল না। আচম্বিতে বিপদ কেটে গেল এবং যে মানুষটির জন্যে তা সম্ভব হলো সে আমাদের ডাক্তার পান্নালাল।

মোকদ্দমায় বাদী পক্ষের হয়ে সাক্ষী দিতে রাজী হয়ে পান্নালাল নিজের আখের গোছাতে চেয়েছিল। তাছাড়া আজিজকে সে ঠিক সহ্য করতে পারত না। কিন্তু হঠাৎই মামলার গতি ঘুরে যাওয়ায় পান্নালালের মানসিক অস্বস্তি শুরু হয়ে যায়। লোকে বোঝার আগেই সে বুঝেছিল যে দুর্বার বেগে এবার তার ওপর সর্বনাশ ঝাঁপিয়ে পড়বে। জনতা চট করে তাকে রেহাই দেবে না। তাই মোকদ্দমা মেটবার আগেই আদালত থেকে সে পিছলে সরে পড়ে। চৌহদ্দীর মধ্যে সে নিরাপদ। তাছাড়া তাকে রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব ক্যালেণ্ডারেরও আছে, কারণ মেজর ক্যালেণ্ডারের অধীনেই সে কাজ করে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ; ক্যালেণ্ডার সেদিন হাসপাতালেই এল না। ঠিক এই সময়ই জনতার বিজয় মিছিল দেখতে পেল পান্নালাল। আর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে আর তার রেহাই নেই। এখন কি করবে সে ? হাসপাতালের বেয়ারা আর্দালীরা তখন এক একটি ক্ষুদে বিদ্রোহী। হাসপাতালের পিছনের দেওয়াল টপকে পালাবার উপায় নেই। এরা গাছে চড়িয়ে মই কেড়ে নেবে। উঁচু দেওয়াল থেকে লাফিয়ে নাবতে গিয়ে হাত পা ভাঙবে সে। রুগীরা হয়ত খুশি হবে, কিন্তু সে ? হঠাৎ সে যেন মনোবল ফিরে পেল। তার মনে হলো মানুষ তো একবারই মরে ! তবে এত ভয় কিসের ? এই ভেবে বাঁ হাতে ছাতা আর ডান হাতে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে সে সোজা গিয়ে দাঁড়াল আজিজের ল্যাণ্ডোর সামনে। তারপর কঁকিয়ে কেঁদে উঠে বলল, 'আজিজ্জ ভাই আমায় ক্ষমা করে দাও। তোমার সম্বন্ধে যা যা বলেছি সব মিথ্যে।' আজিজ চুপ। অন্যরা রাগে গজরাচ্ছে। স্থির হয়ে সবাই পান্নালালের দিকে তাকিয়ে। এক নজরে সবাইকে দেখে পান্নালাল এবার দ্বিগুণ জোরে কঁকিয়ে উঠল, বলল, 'বিশ্বাস কর আজিজ ভাই, ওরা সবাই আমায় ভুল বুঝিয়েছে। ভয় দেখিয়েছে। তোমার নামে নানান অপবাদ দিয়েছে। আমি সেসব বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলুম তখন। এখন বুঝছি সব মিথ্যে আমার ক্ষমা করে দাও ভাই। মনে করে দ্যাখ, তোমার অসুখের সময় কত সেবা করেছি। দুধ খাইয়েছি। বুড়োকে মাপ করে দাও ভাই! কি নবাব বাহাদুর ! আপনিও সদয় হবেন না ? তোমরা কি চাও ভাই ? আমার ডিস্‌পেন্‌স্যারির ওষুধ ? সব নিয়ে যাও তোমরা।' উত্তেজিত হলেও বুড়ো পান্নালাল চতুর দৃষ্টিতে জনতার মুখের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছিল। সে দেখল লোকগুলোর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। বোধহয় তার অদ্ভুত ইংরিজি শুনে। পান্নালালও মনে মনে খুশি। এটাই সে চাইছিল। এরপর সে অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল। ছাতাটা মাটিতে ফেলে তার ওপর দিয়ে নাকখত দিতে লাগল। সবাই স্তম্ভিত। এমন একটা দৃশ্য দেখবে কেউ ভাবতে পারে নি। কিন্তু আশ্চর্য ! কারো মনে গ্লানির ছোঁয়া লাগল না। যেন হীনমতি পান্নালালের পক্ষে কোন কাজই মানুষের অবমাননাকর কাজ নয়। তার চরিত্রেও এমন কিছু সম্পদ নেই যা হারালে তাকে অপদস্থ হতে হবে। তার চেয়ে বরং নিজেকে খেলো করে এদের মজাটাকে ভাবতে দিলে তার

পক্ষে নিরাপদ হবে সেটা। কারণ মানুষগুলোর মেজাজও তখন বাদশা বাদশা বনে যাবে। একটু পরেই পান্নালাল বুঝতে পারল যে জনতা যাকে খুঁজতে এসেছে সে নুরুদ্দিন। যেমনি তা বুঝতে পারল ওমনি মুরগীর মতন ছোট ছোট ক্ষিপ্র পায়ে সে নুরুদ্দিনকে এনে হাজির করল জনতার সামনে। সেদিনকার মতন হাসপাতাল রক্ষা পেল। বুড়ো পান্নালাল পরে ভেবেছে এতবড় একটা কাজের যোগ্য মর্যাদা কর্তৃপক্ষ তাকে দিল না। চাকরিতে একটা প্রমোশনও তার কপালে জুটল না। অথচ সেদিন যদি এইরকম উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় সে না দিত, তাহলে কখনই হাসপাতালটা বাঁচত না।

সারা মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা নুরুদ্দিনকে দেখেই জনতা উল্লাস করে উঠল। স্বস্তির উল্লাস। যেন নতুন করে বাস্তিল দুর্গের পতন হচ্ছে। এই সন্ধিক্ষণে নবাব বাহাদুরই এগিয়ে এসে ঘটনার হাল ধরলেন। নাটকীয় কায়দায় পৌত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মানবাধিকারের ওপর একটা আবেগময় বক্তৃতা দিলেন। মানুষের মুক্তি, শৃঙ্খল মোচনের জন্যে তার সংগ্রাম, তার শৌর্য, তার প্রজ্ঞা ইত্যাদি শব্দগুলো প্রত্যেকের মাথার মধ্যে এমনভাবে গেঁথে গেল যে, উত্তেজনার ব্যাপারগুলো কখন স্তিমিত হয়ে গেছে, জনতা তা বুঝতেই পারল না। সেই পরম মুহূর্তে নবাব বাহাদুর ঘোষণা করলেন যে এখন থেকে ইংরেজের দেওয়া নবাব বাহাদুর খেতাবটি আর তিনি ব্যবহার করবেন না। ভারতীয়দের অপমানের প্রতিবাদে খেতাবটি তিনি ইংরেজ সরকারকে ফিরিয়ে দেবেন। আবার তিনি জুলফীকর নামেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে জীবন যাপন করবেন। জনতা আবার উল্লাস করে উঠল। বলাবাহুল্য সংকট তখন কেটে গেছে। ল্যাণ্ডো গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হলো এবং একটা আবেগ নিয়ে হাসপাতালের চত্বর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল জনতা। মাড়াবার গুহার ঘটনা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের ওপর ক'দিন থেকেই একটা চাপ পড়েছিল। আজ তার ইতি হলো। কিন্তু এমন দীন একটা সমাপ্তি অনেকেরই পছন্দ হলো না। অন্তত কিছু মানুষের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো না, এইরকম অগৌরবের সমাপ্তিতে। তবে অনেক মানুষ সত্যিই স্বস্তি পেল। কারণ দেশটা দুটুকরো হলো না, এমনকি জেলাস্তরেও প্রশাসন ভাঙচুর হলো না।

ফেরার সময় নবাব বাহাদুর বললেন, 'বিজয়োৎসব হবে খানাপিনা হবে।' হামিদ্উল্লার ওপর ভার দিলেন যেন ফীলডিং এবং অমৃত রাওকে সে ডেকে আনে। অমৃত রাওএর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। কারণ সে হিন্দু। খানাপিনা হবে সন্ধ্যে নাগাদ। অতএব সবাই এখন যে যার ঘরে ফিরে যাক।

প্রত্যাশা মতই দুপুরের তাত বাড়ছে। রাস্তাঘাট জনমানবশূন্য। রোদের থাড়া আক্রমণে নেতিয়ে পড়েছে মানুষ। চন্দ্রপুরের বিপ্লবীরা ঘরে ফিরে কেউ আর প্রকৃতিস্থ থাকল না। যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। সিভিল লাইন্স্এর ইংরেজরাও একই পন্থা অনুসরণ করল। এখন ঘুম ছাড়া সময়টুকু কাটাবার অন্য কোন উপায় নেই। এতক্ষণ আতঙ্কে আতঙ্কেই

সময় কাটছিল তাদের। কিন্তু উপস্থিত আক্রমণের আশঙ্কা নেই। সংকট কেটে গেছে। সুতরাং নির্বিঘ্নেই নিদ্রাজগতের অন্দরমহলে তারা প্রবেশ করতে পারে। এ এক আশ্চর্য জগৎ। এখানে কারো প্রবেশের বাধা নেই। বস্তুত এই সুখনিদ্রার নিরিবিলি জগতে মানুষ তার জীবনের তিনভাগই কাটিয়ে দেয় স্রেফ স্বপ্ন দেখে। মন্দ কি! কারণ অনন্তলোকে যাবার আগাম আভাস তো মানুষ এখান থেকেই আস্বাদন করে!

২৬

য়্যাডেলার সঙ্গে ফীলডিংএর ফের দেখা হলো সন্ধ্যে নাগাদ। ঘুম থেকে উঠে ফীলডিং প্রথমেই তার খোঁজ করল। তার মনে হয়েছিল য়্যাডেলার লোকেরা তাকে বোধহয় এখান থেকে নিয়ে গেছে। কিন্তু কলেজটা যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে আলাদা হয়ে গেছে সেটা বোঝে নি। যা হোক, দেখা হতেই য়্যাডেলা জিজ্ঞেস করল, 'আমার ব্যবহারে আপনি অবাক হন নি?'

'না তো!' ছোট্ট জবাব দিল ফীলডিং। তবে বলল, 'অভিযোগটা যদি তুলেই নেবেন তাহলে সেটা করেছিলেন কেন?'

'ঠিক তাই। কেন করেছিলুম?'

'যাই হোক। তুলে নেবার দরুন আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার মনে হয়...'

কিন্তু ফীলডিংএর কথা শেষ করতে দিল না য়্যাডেলা। বলল, 'আপনার কৃতজ্ঞতা আমার চাই না। আমি চাই আপনি আমার কথা শুনুন।'

'সেটা কি উচিত হবে? আমি হলুম বিপক্ষ শিবিরের লোক।'

'তাহলে কি আমার কথা শুনতে আপনার ইচ্ছে হচ্ছে না?'

'তেমন নয়।' অত্যন্ত উদাসীনভাবে বলল ফীলডিং।

য়্যাডেলা মনঃক্ষুন্ন হল না। বরং অকপটেই বলল, 'আমার আর কোন গোপনতা নেই। যা শুনবেন তা আপনার বন্ধুদেরও বলতে পারেন। আপনাকে যা বলব তা সবাইকেই বলতে পারি। আজ সকাল থেকে অনেক ধকল গেছে আমার মনের ওপর। তবে এখন আমি সহজ হয়ে গেছি। ঈশ্বর আমায় করুণা করেছেন।' ফীলডিং অবাক হয়ে চেয়েছিল মেয়েটার দিকে। য়্যাডেলা বলে চলল, 'কানের ভেতরে সেই প্রতিধ্বনির শব্দটা গেছে। মুক্তি পেয়েছি আমি। এখন কি মনে হয় জানেন? বোধহয় মাড়াবার কেভ্‌স্‌ দেখতে যাবার দিন থেকেই আমার শরীরটা খারাপ ছিল। কিংবা হয়ত তার আগে থেকেই। কে জানে?'

য়্যাডেলার কথায় ফীলডিং যেন নতুন সন্ধান-সূত্র খুঁজে পেল। সে নিজেও ওইরকমই একটা কিছু ভেবেছিল। বলল, 'কিরকম শরীর খারাপ?'

মাথার একদিকে হাত দিল য়্যাডেলা। তারপর মাথাটা নাড়ল। ফীলডিং বলল,

'আমিও ওইরকম একটা কিছু ভেবেছিলাম। একধরনের প্রমাদ। ভ্রম। ভ্রান্ত বিশ্বাসও বলতে পারেন।'
'কি থেকে এই ভ্রম এল?'
নিজের অজান্তেই ফীলডিং কখন যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে বুঝতে পারে নি। য়্যাডেলার কথায় সে বলল, 'তিনটে সম্ভাবনার কথা আমার মনে হয়েছে। চারটেও বলতে পারেন। হয় আজিজ অপরাধী ; যা আপনার বন্ধুরা ভাবছেন। নয়ত বিদ্বেষবশত তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা আপনি বানিয়েছেন। আমার বন্ধুরা এইটেই মনে করে। কিংবা সবটাই আপনার ভ্রম। এখন আমার কি মনে হচ্ছে জানেন?'
'কি?'
'এখুনি আপনি যা বললেন সেটাই ঠিক।'
'কি বললাম?'
'আপনি আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। সাক্ষ্য প্রমাণের দিক থেকে আপনার এই স্বীকারোক্তিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিশ্বাস আপনি নিজেই দূরবীনের স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। গুহার মধ্যেও সারাক্ষণ আপনি একাই ছিলেন।'
খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল য়্যাডেলাকে। বলল, 'হয়ত তাই...।'
'ঠিক কবে থেকে আপনার মনের এই অবস্থা চলছে বলতে পারেন?'
'যেদিন এই গার্ডেন হাউসএ-টি পার্টি দিলেন। আমরা চা খেতে এলাম, সেদিন থেকে।'
'টি পার্টির অনুষ্ঠানটাই অশুভ ছিল। কেন না তার পরেই আজিজ এবং গড়বোলে অসুস্থ হয়ে পড়লেন।'
'আমার কিন্তু কোন শারীরিক অসুখ ছিল না।' বলল য়্যাডেলা। আরও বলল 'তবে মনের দিক থেকে আমি খুব সুস্থ ছিলাম না এবং কয়েকটা ব্যক্তিগত ঘটনার সঙ্গে এই মানসিক অসুস্থতাটা মিশে গিয়েছিল।'
'কি রকম?'
'মিস্টার গড়বোলের গানটা বেশ ভাল লাগছিল। কিন্তু গান শুনতে শুনতে মনটা হঠাৎই বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। ঠিক কি ধরনের বিষণ্ণতা তখন বুঝি নি। তবে সেটা কোন নিবিড় দুঃখবোধ নয়। মনের ওপর একটা হাল্কা চাপ পড়ছিল যেন। তারপর তো রনীর সঙ্গে পোলো খেলার মাঠে গেলাম। সেখানেও কিছু কিছু ঘটনা ঘটল। কিন্তু কোন কিছুর সঙ্গেই মানিয়ে নিতে পারছিলুম না। যখন মাড়াবার গুহা দেখতে যাই তখনও মনের এই অবস্থাই চলছে। অথচ আপনি বললেন যে সেদিন গুহার মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু দেখি নি। ওটা আমার মনের ভ্রম। হয়ত তাই। একটা সাময়িক মানসিক বিকলতায় আচ্ছন্ন ছিলুম তখন।'
ফীলডিং মন দিয়ে শুনছিল য়্যাডেলার কথা। শেষ হলে বলল, 'মনে হচ্ছে মনের অবস্থাটা সৎ ভাবেই বর্ণনা করলেন।'
'আমি মিথ্যে বলতে শিখি নি মিস্টার ফীলডিং। তবে এই সততার কোন

দাম পেলাম না।'
য়্যাডেলাকে এখন বেশ লাগছিল ফীলডিংএর। একটু হেসে বলল, 'পারেন। স্বর্গে যাওয়া কে আটকায়!'
'তাই নাকি?'
'হ্যাঁ। তবে স্বর্গ বলে কোন বস্তু যদি আদৌ থাকে।
য়্যাডেলা অপ্রতিভ হল। সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'আপনি স্বর্গ মানেন না—তাই না মিস্টার ফীলডিং?'
'না। মানি না। তবে সৎ মানুষরা যে স্বর্গে যায় তা মানি।'
'তা কি করে হয়?'
কিন্তু য়্যাডেলার এ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেল ফীলডিং। তারপর য়্যাডেলার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল 'আপনার ওই বিভ্রমের ব্যাপারটা কিন্তু স্পষ্ট হয় নি।' একটু থেমে ফীলডিং ফের বলল 'আজ সকালে আপনি যখন সাক্ষী দিচ্ছিলেন, তখন মন দিয়ে আপনার কথা শুনছিলাম আর আপনাকে দেখছিলাম।'
'কি দেখলেন?' অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে শুনতে চাইল য়্যাডেলা। তার চোখের দিকে চেয়ে ফীলডিং বলল, 'যদি ভুল না দেখে থাকি তো বলব যে আপনার ওই বিভ্রমটা হঠাৎই চলে গিয়েছিল। তাই না?'
আদালত কক্ষের ছবিটা মনে করবার চেষ্টা করছিল য়্যাডেলা। কিন্তু পারল না। যখনই সেটাকে তন্ন তন্ন করে বোঝবার চেষ্টা করেছে তখনই সেটা যেন তার মন থেকে হারিয়ে গেছে। ফলে স্পষ্ট করে সে কিছুই বলতে পারল না। শুধু বলল, 'তা জানি না। তবে এইটুকুই বলব যে ঘটনাগুলো এরপর আমার চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল।'
'আমিও মন দিয়ে আপনার কথা শুনছিলাম। ভেবেছিলাম হয়ত ঘটনাগুলো ঠিক ঠিক বলতে পারবেন না। কিন্তু তা হয় নি। আমার বিশ্বাস...' ফীলডিং চুপ করল। য়্যাডেলা তাকিয়েছিল। বলল, 'বলুন।'
ফীলডিং বলল, 'আমার বিশ্বাস ম্যাকব্রাইড আপনাকে মোহমুগ্ধ করেছিল। কারণ, আমি দেখছিলুম সে যেমনটি চাইছে তেমনটিই উত্তর দিচ্ছেন আপনি। তারপর যেই উত্তর দেওয়া শেষ হলো অমনি ভেঙে পড়লেন আপনি।'
'তবু ভাল। আমি ভাবলাম আপনি অন্য ইঙ্গিত করছেন। হয়ত বলে বসবেন আমার ওপর ভূতপ্রেতের ভর হয়েছিল।'
'না না। আমার কল্পনাশক্তি অত উর্বর নয়।' হাসতে হাসতে বলল ফীলডিং। য়্যাডেলা তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, 'কিন্তু যাঁদের আমি গণ্যমান্য মনে করি এমন অনেকেই ভূতে বিশ্বাস করেন। যেমন মিসেস মুর।'
'উনি বুড়ো মানুষ।' ফীলডিং বলল।
'আর সেইজন্যেই বুঝি ওঁর সম্বন্ধে বা ওঁর ছেলের সম্বন্ধে আপনি এত বিরূপ।'
ফীলডিং মোটেই অপ্রতিভ হলো না। বরং সকৌতুকে বলল 'বিরূপ কেন হব? আমি জানি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ অতি-

প্রাকৃতে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এটা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা। আমার কথাই ধরুন। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হলো। মাঝে মাঝে দারুন লোভ হয় এসবে বিশ্বাস করতে। সত্যি হোক আর না হোক, মরা মানুষ বেঁচে ওঠার গুজবে বিশ্বাস করাটাই তো অনেকখানি।'
'আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন?'
'না। করি না।'
'আমিও করি না।'
মিনিট খানেক দুজনেই চুপ। এটাই স্বাভাবিক। আবেগকে সরিয়ে দিয়ে মানুষ যখন যুক্তিবাদী হয় তখন স্তব্ধই হয়ে যায় মন। খানিক পরে ফীলডিং নিজেই রনীর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাইল। য়্যাডেলা তখনও অন্যমনস্ক। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, 'আমার সম্বন্ধে ডাক্তার আজিজের কি মনোভাব?'
'আজিজ?' একটু যেন অপ্রস্তুত হলো ফীলডিং। এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'তার যা মানসিক অবস্থা তাতে কারো সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ কোথায়? তবে স্বাভাবিক কারণেই তার মনের অবস্থা ভাল নয়।' আসলে, য়্যাডেলা সম্বন্ধে আজিজ অত্যন্ত অশোভন একটা মন্তব্য করেছিল তার কাছে। কিন্তু সে কথা তো ঢাক পিটিয়ে বলা যায় না! বলেছিল, 'ওর মতন কুরূপা মেয়ে-ছেলের সঙ্গে আমাকে জড়িও না। আমার লজ্জা হয়।' বেশ রাগ করেই কথাটা বলেছিল আজিজ। কারণ য়্যাডেলা সুন্দরী তো নয়ই, এমনকি তার কোন যৌন আবেদনও নেই। ফীলডিং অবাক। রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছিল সে। খানিকটা বিব্রতও। যে সব পুরুষমানুষ খোলাখুলি কামুক স্বভাবের হয়, তাদের তবু সওয়া যায়। কিন্তু এ যেন অন্য রকমের লাম্পট্য। সুন্দরী নারী যেন মোটরগাড়ির মতন ভোগের সামগ্রী। আর নারী যখন অসুন্দর তখন সে অস্পৃশ্য। তার সংস্পর্শে আসাও পুরুষের পক্ষে লজ্জাকর। পুরুষের এ এক বিচিত্র স্বার্থপরতা। বিষয় আশয়ের মতন নারীকেও অধিকারের সামগ্রী করে রাখা। একদিন যে বর্বর প্রথাটা পৃথিবীর সব সভ্যতা সংস্কৃতির মর্মস্থল কুরে কুরে খেয়েছিল সেটাই বুঝি আবার নতুন রীতিতে ফিরে এসেছে। যেন সুন্দরী নারী পুরুষের গৃহসজ্জার উপকরণ। ডেকে ডেকে লোক দেখানোর মতন সামগ্রী, যাতে সমাজে তার মর্যাদা বাড়ে। আজিজের এই মনোভাবটা ফীলডিংএর কাছে দুর্জ্ঞেয় মনে হয়। এইখানেই তার সঙ্গে প্রভেদ। পুরুষের যৌনক্ষুধা খুব একটা অপরাধ নয়। অপরাধ হল নারীকে দাসী করে রাখার সেই চিরন্তন মনোভাবটা। সমান মর্যাদা না দেওয়ার মনোভাব। আর এইটে এড়াবার জন্যেই সংসারধর্ম ছেড়ে সাধু মানুষরা বিবাগী হয়। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে আর যেন ভাল লাগছিল না ফীলডিংএর। তাই আলোচনার বিষয়টা বদলে দিতে চাইল। য়্যাডেলার দিকে চেয়ে বলল, 'তাহলে আলোচনাটা আমরা এইভাবে শেষ করতে পারি যে আজিজ মানুষটা নেহাৎ শয়তান নয়। এবং সেদিন যে ঘটনাটা আপনি দেখেছিলেন সেটাও আপনার মনের ভ্রম নয়। এখন বাকি থাকল চতুর্থ সম্ভাবনাটা। এবং তা

হোল, সেদিন গুহার মধ্যে কে ঢুকেছিল? লোকটা কে?'

'মনে হচ্ছে সেই গাইডটা।' বলল য়্যাডেলা।

'ঠিক কথা। আমারও তা মনে হয়েছে। কিন্তু লোকটা নেই। আজিজ তাকে একটা চড় মারার পর সে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। পুলিশের উচিত ছিল লোকটাকে খুঁজে বার করা।'

'তাই হবে। হয়ত সেই গাইডটাই গুহার মধ্যে ঢুকেছিল।' আবার বলল য়্যাডেলা।

'কিংবা তাড়া খাওয়া কোন পাঠানও হতে পারে? ফীলডিং জিজ্ঞেস করল।

'হতে পারে।' তেমনি নিস্পৃহ জবাব দিল য়্যাডেলা।

ওদের কথাবার্তার মাঝখানেই ঘরে ঢুকল হামিদ্‌উল্লা। এক নজর দুজনকেই দেখে নিল সে। ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে ওরা। খুব ভাল লাগল না ছবিটা। তাছাড়া ওদেব শেষ কথাবার্তার খানিকটা সে শুনে ফেলেছে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে। য়্যাডেলাকে প্রায় উপেক্ষা করেই সে ফীলডিংকে সরাসরি বলল, হ্যালো ফীলডিং, আপনি এখানে? আপনার কাছেই এলাম। এখুনি দিল-খুসায় যেতে হবে।'

'এখুনি?' একটু বিব্রত শোনাল ফীলডিংএর স্বর।

'তাতে কি হয়েছে? আপনি যান! আমিও এখুনি যাচ্ছি।' য়্যাডেলা বলল।

'কিন্তু যাবেন কোথায়? আর খবরই বা কি করে দেবেন? টেলিফোনটা তো বিকল হয়ে পড়ে আছে।'

'শুধু টেলিফোন কেন সভ্যতার অনেক সৃষ্টিই বিকল হয়ে গেছে। আর যা গেছে তা চট করে মেরামতও হবে না। তবুও ওঁকে সিভিল লাইন্‌স্‌এ পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। কারণ সভ্যতার সঙ্গতি একটা নয়, অসংখ্য।' সূক্ষ্ম শ্লেষের খোঁচা দিয়ে কথাটা বলল হামিদ্‌উল্লা এবং য়্যাডেলার দিকে না চেয়েই। এমনকি য়্যাডেলা যখন করমর্দনের জন্যে তার হাতটা এগিয়ে দেবার একটা ভঙ্গি করল, তাও উপেক্ষা করল হামিদ। ফীলডিং ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। পাছে এদের সাক্ষাৎটা অপ্রীতিকর হয় তাই কৈফিয়ত দেবার মতন বলল, 'মিস কোয়েস্টেডের সঙ্গে সকালের ব্যাপারটা নিয়ে কথা হচ্ছিল। উনি বোঝাচ্ছিলেন কেন উনি...'

'আমাদের দেশের দার্শনিকরা বলেন যেন সব কিছুর জন্যে আমরা তৈরি থাকি। সুতরাং আমি মোটেই অবাক হই নি। তাছাড়া আমার ধারণা, বোধহয় মির‍্যাক্‌ল্‌সএর যুগ আবার ফিরে আসছে।'

অপ্রস্তুত য়্যাডেলা হামিদের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনারা ঘটনাটা ওপর থেকে দেখেছেন বলেই অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ভুল করেছি। তাই দেরি না করে ভুলটা শুধরে নিলুম। বোধহয় সেই জন্যেই আমার আচরণে আপনারা অবাক হয়েছেন। অস্বাভাবিক মনে হয়েছে।'

'মনে হয়েছে! রাগে কেঁপে উঠল হামিদ। ঘুরে দাঁড়াল মুখোমুখি। কিন্তু তখনি নিজেকে সামলে নিল। তার মনে হলো হয়ত মহিলার এটাও একটা

চাল। ফাঁদে ফেলতে চায় তাদের। তাই সংযত হয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'দেখুন মিস কোয়েস্টেড! ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনার ব্যবহারের প্রশংসা করি। আর সেইজন্যেই আমার ছেলেরা যখন আপনার গলায় মালা পরিয়ে দিল তখন আমি খুশি হয়েছিলুম। কিন্তু ফীলডিংএর মতন আমিও অবাক হয়েছিলুম। অবাক বললে বোধহয় যথেষ্ট বলা হল না। বলা উচিত, আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম। কারণ আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধুকে আপনি অকারণে আহত করেছেন। তাকে নোংরামির মধ্যে টেনে এনেছেন। তার সুনাম নষ্ট করেছেন। তার কতবড় ক্ষতি আপনি করেছেন তা ভাবতেও পারবেন না, কারণ আমাদের ধর্ম বা সমাজ সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নেই। কিন্তু এত কাণ্ডের পর আপনি যা করলেন, তা শুধু অস্বাভাবিক নয়, রীতিমত নাটকীয়। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আপনি স্বীকারোক্তি করে বললেন ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক। কারণ ওর অভিযোগ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি।' হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হামিদ। বলল 'আপনার স্বীকারোক্তি শুনে আমার মনে হচ্ছিল আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি কিংবা স্বপ্ন দেখছি। যদি স্বপ্নই হয় তবে এর শুরু কখন আর শেষই বা কোথায়? আমি শুনেছি, আপনি এখনও আমাদের রেহাই দিতে চান না। আমার বন্ধুর সর্বনাশ করেছেন; এবার পালা ওই বুড়ো গরিব গাইডটার যে আপনাকে গুহাগুলো ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল।' রাগে কাঁপতে কাঁপতে কথা শেষ করল হামিদ। তাকে থামাতে ফীলডিং বলে উঠল, 'না না। তা নয়। আপনি ভুল বুঝবেন না। আমরা শুধু সম্ভাবনার কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম।'

'বটে! তা খেলাটা মন্দ নয়। যদিও খেলা শেষ করতে সময় লাগবে। শুনুন মিস্টার ফীলডিং! আমাদের এই উপমহাদেশে আমরা সতের কোটি মানুষ বাস করি এবং কেউ না কেউ মাড়াবার গুহার মধ্যে সেদিন ঢুকেছিল নিশ্চয়।

কিন্তু সে মানুষটি যে কে, তা খুঁজে বার করতে যখন অনেক সময় নেবে তখন আসুন না এই ফাঁকে নবাব বাহাদুর, মানে মিস্টার জুলফীকরের ওখান থেকে আমরা ঘুরে আসি।' হামিদ শেষের কথাটা বলল ফীলডিংএর দু কাঁধে হাত রেখে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে।

'সানন্দে! এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি আসছি।' একমুখ হেসে জবাব দিল ফীলডিং।

য়্যাডেলাও উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'আমিও ঠিক করে ফেলেছি কোথায় যাব।'

'কোথায়?'

'ডাকবাংলোয়।'

'কেন ডাকবাংলোয় কেন? আপনি তো টারটনদের অতিথি! সেখানে যাবেন না কেন?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল হামিদ।

চন্দ্রপুরের ডাকবাংলোটা খুবই খেলো মানের। বাংলোয় চাকরবাকরও নেই।

কোন মহিলার পক্ষে একা বাস করার উপযুক্ত জায়গা সেটা নয়। ফীলডিং অন্য কথা ভাবছিল। তার মনে হল য়্যাডেলাকে এখানে রাখলে কেমন হয়! সবদিক থেকেই নিরাপদ। বললোও সে কথা। 'শুনুন! আপনার থাকবার একটু ভাল জায়গার কথা আমি ভেবেছি।' য়্যাডেলা এবং হামিদ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল। ফীলডিং বলল, 'আপনি আমার এই কলেজে থাকুন। আমি দিন দুই এখানে থাকছি না। আমি ফিরে এলে সুবিধেমত অন্য জায়গায় বরং চলে যাবেন।'

'মোটেই না। কখনই তা হতে পারে না।' বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি করল হামিদ।

'কেন হতে পারে না?'

'আজ রাত্তিরে আবার জনসমাবেশ হতে পারে। ধরুন, তখন যদি ওরা কলেজে হামলা করে? সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। তাহলে কার জিম্মায় এ'কে রেখে যাবেন? তখন আপনিই দায়ী হয়ে পড়বেন।'

'হামলা তো ডাকবাংলোতেও হতে পারে?'

'পারে। কিন্তু আপনি তখন দায়ী হবেন না।'

অবাক হলেও ফীলডিং চুপ। অস্বস্তি কাটাতে য়্যাডেলাই বলল, 'ঠিক কথা। আমার জন্যে অনেক ঝঞ্ঝাট সয়েছেন আপনারা।'

হামিদ যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ফীলডিংকে বলল, 'শুনলেন তো? উনিও স্বীকার করলেন শেষ অব্দি। আসলে, ভয়টা জনতা থেকে নয়। হাসপাতালে আপনি নিজেই দেখেছেন, কত সুশৃংখল ওরা। হামলা করবে ম্যাকব্রাইডের পোষা গুণ্ডারা। আপনাকে অপমান করতে ম্যাকব্রাইডই হামলা করাবে তার পোষা লোক দিয়ে। এই সুযোগটাই সে খুঁজছে।'

'ঠিক আছে। উনি যেমন এখানে থাকছেন না, তেমনি ডাকবাংলোতেও যাবেন না।' বেশ জোর দিয়ে বলল ফীলডিং। পাকেচক্রে যারা চাকার তলায় পড়ে, তাদের ওপর সে চিরকালই সহানুভূতিশীল। তার এই মনোভাবের জন্যে আজিজের সঙ্গেও তার বিস্তর মতবিরোধ হয়েছে। তাই এই মুহূর্তে হতভাগ্য মেয়েটা সম্বন্ধে সে দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারল না। তাছাড়া এতক্ষণ কথাবার্তা বলে য়্যাডেলা সম্বন্ধে একটা নতুন শ্রদ্ধা জন্মেছে তার মনে। যদিও মাস্টারনীর মতন শক্ত তার ব্যবহার, তাহলেও এখন সে নিজের জীবনটা খুঁটিয়ে বিচার করছে না। বরং জীবনের রূঢ় বাস্তব আঘাত তার বোধকে বাস্তবমুখী করে গড়ে তুলেছে। আশ্চর্য রকমের খাঁটি হয়ে গেছে মেয়েটা।

কিন্তু যাবেই বা কোথায় সে? হামিদউল্লার দলবলের কাছে কৃপা চায় নি বলেই একপাশে ঠেলে দেবে ওরা? ফীলডিং জানে যে য়্যাডেলা যদি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কে'দে কেটে নাটক করত, ভগবানের দোহাই পাড়ত, তাহলে হয়ত হামিদ বা তার দলবল এতটা উদাসীন হতে পারত না। কারণ অনুগ্রহপ্রার্থীকে কৃপা করার মতন বদান্যতা হামিদেরও আছে। কিন্তু শক্ত মনের মেয়েটা একটুও হারল না। একবারও কারও অনুগ্রহ চাইল না। এখানকার নরম মাটির মতন তার মনটা থ্যাসথ্যাসে নয়, আর তাই হামিদরা তাকে বুঝল না। ভাবল,

মেয়েটার সবটুকুই ফাঁকি, ছলনা। কিন্তু য়্যাডেলার মধ্যে কোন ছলনা নেই। তার এই নিষ্প্রাণ কঠিন সততার আঁচ পাওয়া হামিদের মানসিকতায় সম্ভব নয়। য়্যাডেলার সততা নির্ভীক, নিরপেক্ষ। অনুগ্রহ চাওয়া বা ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না সেখানে। স্বীকারোক্তির সময় বিন্দুমাত্র অনুশোচনাও প্রকাশ পায় নি তার মধ্যে। সততার সঙ্গে দ্বিধাহীনভাবে সত্য উদ্ঘাটন করেছে। এদেশের মানুষ সত্যের শুদ্ধমূর্তি দেখতে চায় না। দয়ার খাদ না মেশালে এদের কাছে সত্য বিশ্বস্ত হয় না। ফলে য়্যাডেলার এতবড় ত্যাগ কোন মর্যাদাই পেল না। ছেলেদের দেওয়া কয়েকটা শুকনো ফুলের মালা ছাড়া ভারতবর্ষের মানুষ আর কিছুই দিতে পারল না য়্যাডেলাকে। তাই ফীলডিং তার অসম্পূর্ণ কথার জের টেনে বলল, 'শুনুন হামিদউল্লা! উনি কোথায় থাকবেন, কোথায় শোবেন, কি খাবেন, এ নিয়ে আপনার সংশয় হলেও আমার নেই। উনি এখানেই থাকবেন আমার এই কলেজে। এবং ওঁর ওপর সত্যিই যদি হামলা, হয় তো হবে। আমি জানবো আমিই দায়ী। মিস কোয়েস্টেড, কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ বলব। আপনি উদার মহৎ তাই অনুগ্রহ করলেন। কিন্তু আমার জন্যে আর আপনাকে বিপদে ফেলতে চাই না। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব, টারটন্‌রা আমায় আশ্রয় দেন কি না। যদি না দেন তবে ডাকবাংলোতেই গিয়ে উঠব।' য়্যাডেলা কথাগুলো বলল অত্যন্ত শান্তভাবে। এতটুকু তিক্ততা প্রকাশ হল না তার কথায়। প্রকাশ হল না এতটুকু আত্মম্ভরিতা। শেষ চেষ্টা করতে চাইল ফীলডিং। বলল, 'মিসেস টারটন্ একগুঁয়ে মহিলা। যুক্তির ধার ধারেন না। তাঁর কাছে যেচে অপমান হতে যাবেন কেন?'

ওরা দুজনে যখন কথা বলছিল হামিদউল্লা তখন জানলার কাছে চলে গিয়েছিল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল সে। হঠাৎ বলল, 'ফীলডিং! আমাদের সমস্যার সমাধান সশরীরে এসে পড়েছেন। যদিও ছদ্মবেশে আসছেন এবং লুকিয়ে আসছেন একটা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি চেপে। তাহলেও উনি আমাদের সিটি ম্যাজিস্ট্রেট। মিস্টার রনী হীস্‌লপ্।'

নামটা শুনেই মনে মনে কেঁপে উঠল য়্যাডেলা। তীক্ষ্ন স্বরে বলে উঠল 'কে আসছে?'

'রনী হীস্‌লপ্।

'একটু জেনে আসবেন কেন সে আসছে?'

'নিশ্চয়ই আপনার খোঁজে।' বলল ফীলডিং।

'কিন্তু সে জানল কি করে যে আমি এখানে?'

য়্যাডেলার অস্বস্তির ব্যাপারটা যেন বোঝবার চেষ্টা করছিল ফীলডিং। বলল, 'যদি বলেন আমিই না হয় আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করছি।'

এই বলে ফীলডিং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই হামিদ্‌উল্লা এগিয়ে এল য়্যাডেলার কাছে। তারপর হিংস্র স্বরে বলল বাঃ চমৎকার! সত্যিই আপনার বিবেচনাবোধের প্রশংসা করতে হয়। পরের

পর বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন মানুষটাকে। আর ভদ্রলোকটিরও বলিহারি বিবেচনাবোধ।' এ কথার জবাব দিল না য়্যাডেলা এবং ফীলডিং না ফেরা অব্দি একটা অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে বসে রইল দুজন। একটু পরেই ফীলডিং ফিরল। তারপর য়্যাডেলার কাছে গিয়ে ধীরস্বরে বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছেন উনি। বারান্দায় অপেক্ষা করছেন। ভেতরে ঢুকতে চাইছেন না।'

'ও কি আমায় বাইরে যেতে বলল?' বেশ অসহিষ্ণু শোনাল য়্যাডেলার কথাটা।

'উনি বলুন আর না বলুন, আপনার যাওয়াই উচিত।' বলল হামিদ্‌উল্লা।

'বেশ। তাই হোক।' একটু চুপ করে উত্তর দিল য়্যাডেলা। তারপর ফীলডিংকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। য়্যাডেলা একাই গেল কারণ রনী হীস্‌লপের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করার আগ্রহ ছিল না ফীলডিংএর। ঘরে তখন ফীলডিং আর হামিদ্‌উল্লা। হামিদই প্রথম কথা বলল। একটু খোঁচা দিয়ে বলল, 'তার মানে, ঘরে ঢুকতে ভদ্রলোক অপমান বোধ করলেন। তাই না ফীলডিং?'

'হয়ত তাই। সেদিন ক্লাবে ওঁর সঙ্গে আমি খুব শোভন ব্যবহার করি নি। তাছাড়া ভাগ্যও ওঁর প্রতি সদয় নয়। আজই সকালে টেলিগ্রাম পেয়েছেন। মিসেস মুরের মৃত্যু সংবাদ এসেছে। আহা! বুড়ো মানুষ!'

'তাই নাকি? ইস্‌! খুব দুঃখের কথা তো?' বলল বটে। তবে অত্যন্ত উদাসীন-ভাবে বলল হামিদ।

'হ্যাঁ। সমুদ্রের বুকের ওপরেই বৃদ্ধা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।'

'নিশ্চয়ই গরম লেগে।'

'হয়ত তাই।'

'মে মাসটা বুড়ো মানুষদের ঘোরাফেরার সময় নয়।'

'তা ঠিক। হীস্‌লপেরও উচিত হয় নি মা-কে এমনভাবে ছেড়ে দেওয়া। তা এবার কি আমরা যেতে পারি?'

'আর একটু অপেক্ষা করুন। ওই সুখী দম্পতি বিদেয় হোক তারপর।' বারান্দার দিকে চেয়ে ছিল হামিদ। চেয়ে থাকতে থাকতেই বলল, 'অসহ্য! কিরকম গড়িমসি করছে দেখুন ওরা!' হঠাৎ ফীলডিংএর দিকে চেয়ে হামিদ বলল, 'ফীলডিং! আমার মনে আছে, আপনি ভবিতব্যে বিশ্বাস করেন না বলেছিলেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি। লোকটা পাপের শাস্তি পেল। জোর করে আমাদের সাক্ষীকে সরিয়ে দিয়েছিল বলেই ওকে এর ফলভোগ করতে হচ্ছে।'

'আপনি একটু বেশি ভাবছেন হামিদ। ওই বৃদ্ধার এজাহারের কোনই মূল্য নেই। কারণ, উনি কাউয়া দোল দেখেন নি। সেখানে কি হয়েছিল তাও উনি জানতেন না। একমাত্র মিস কোয়েস্টেডই ইচ্ছে করলে আজিজকে বাঁচাতে পারতেন।'

হামিদ্‌উল্লা তর্কের খাতিরে বলল, 'কিন্তু আজিজকে উনি ছেলের মতন

ভালবাসতেন। আজিজও তাঁকে শ্রদ্ধা করত।'
'তাতে কি হল ! আপনি ব্যারিস্টার মানুষ। আপনার জানা উচিত যে সাক্ষীর এজাহারে ওসব ভালবাসা শ্রদ্ধার কোন দাম নেই। তবে আমি লক্ষ্য করেছি যে চন্দ্রপুরে ওই মহিলা কিংবদন্তীর নায়িকা হয়ে গেছেন। তা হন, ক্ষতি কি !'
হামিদ মৃদু একটু হাসল। ঘনঘন হাতঘড়ি দেখছিল সে। মিসেস মুরের হঠাৎ মৃত্যুসংবাদ শুনে আহত হয়েছে তারা দুজনেই। তবে ঘটা করে শোক করার বয়স তাদের নেই। কতটুকুই বা তাঁকে জানতেন? যাদের নেহাৎ আপনজন দুঃখ তারাই পাক। দুঃখবোধ এক মুহূর্তের জন্যেই আসে, আর তারপরেই মিলিয়ে যায়। একজন মানুষ কত দুঃখই বা সইতে পারে? শোকতাপে ভরা এই পৃথিবীর প্রতিটি জীবনের মধ্যেই দুঃখ আছে, কান্না আছে। শুধু মানুষ কেন, পশুপাখী কীটপতঙ্গ গাছপালা এমনকি পাষাণের বুকেও দুঃখ আছে। কত দুঃখভার সইতে পারে একটা হৃদয় ? তাই মন ফিরে যায় চেনা গণ্ডীর মধ্যে শোক করতে। নেহাৎ আপনজনের জন্যে মানুষ শোক করে, তাও অভ্যাস বশে এবং খানিকটা সংস্কারের প্রেরণায়। বৃদ্ধার সঙ্গে ফীলডিংএর আলাপ হয়েছে মাত্র দুবার কি তিনবার। আর হামিদ্উল্লা তাঁকে দেখেছে মাত্র একবারই, তাও দূর থেকে। সুতরাং দূরের এই মানুষটির জন্যে ঘটা করে শোক করার বদলে দিলখুসায় গিয়ে বিজয়োৎসবে যোগ দেবার কথাই তারা বেশি ভাবছিল। দেরি যেটুকু হয়েছে তা পুষিয়ে নেওয়া যায় কারণ ভোজের আসরে এটুকু দেরি নেহাৎ অবৈধ নয়। তবে তারা স্থির করল যে মিসেস্ মুরের মৃত্যুসংবাদটা আজিজের কাছে তখনই প্রকাশ করবে না ; কারণ তাতে ভোজের মেজাজটাই মাটি হবার সম্ভাবনা আছে।
বেরোবার মুখেই ওরা দেখল যে য়্যাডেলা ঘরের দিকে আসছে। বিরক্ত হামিদ বিড়বিড় করে বলল, 'উঃ ! জ্বালালে দেখছি !' য়্যাডেলা তখন ফীলডিংএর কাছে এসেছে। সরাসরি সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি দুঃসংবাদটা শুনেছেন ? রনী আপনাকে কিছু বলেছে ?'
সশ্রদ্ধভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে ফীলডিং মৃতের প্রতি সম্মান জানাল। ধপ করে বসে পড়ল য়্যাডেলা। কেমন যেন পাথরের মতন শক্ত হয়ে গেল তার শরীরটা।
'আপনার জন্যে হীস্লপ বাইরে অপেক্ষা করছেন।' শান্তভাবে বলল ফীলডিং।
য়্যাডেলা হঠাৎ প্রগল্‌ভ হয়ে উঠল যেন। অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলে বলল, 'আমি এখন একা থাকতে চাই মিস্টার ফীলডিং। আপনি জানেন না উনি আমার কতখানি ছিলেন। ওঁর ছেলেও বোধহয় ওঁর এত কাছের জন ছিল না। রনীর সঙ্গে আমি থাকতে পারব না। কিছুতেই নয়। আপনার এখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করতে পারেন না আপনি? এইটুকু অনুগ্রহ আমায় করুন !'
রাগে কি একটা গাল দিল হামিদ তার নিজের ভাষায়। ফীলডিং বলল,

স্বচ্ছন্দে আমার এখানে থাকতে পারেন। আমিও খুশি হব। কিন্তু মিস্টার হীস্লপ কি রাজি হবেন?'
'আমি তাকে কিছু বলি নি। ব্যাপারটা এত জটিল যে আমরা দুজনেই যেন কেমন হয়ে গেছি। কি করব ভেবে পাচ্ছি না। তবে, আমাদের এখন একা থাকাই দরকার। আসুন না, রনীকে একটু বলবেন!'
'বেশ বলবো। উনি আসুন এখানে।' ইচ্ছে করেই ফীলডিং যেতে চাইল না। বরং এমন ইঙ্গিত করল যাতে রনীকেই ঘরে আসতে হয়। য়্যাডেলা বাইরে গিয়ে রনীকে সঙ্গে করে আনল। ভীষণ দুঃখী দেখাচ্ছিল রনীকে। অথচ চরিত্রের সেই দাম্ভিক ভাবটাও পুরোপুরি বজায় আছে। দুটো মিলিয়ে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ঘরে ঢুকেই সে যা বলল তা সবটাই কেমন এলোমেলো যেন। রনী বলল, 'আমি য়্যাডেলাকে নিতে এসেছিলাম। টারটনদের ওখানে ওর যাওয়া উচিত নয়। অথচ অন্য কোন ব্যবস্থাও হয় নি। আমার কোয়ার্টারেও নিয়ে যেতে পারি না, কারণ আমার কোয়ার্টারে উপস্থিত আমি একা থাকি।'
রনীর উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা দেখে ফীলডিংএর মনে কষ্ট হচ্ছিল। তাকে আশ্বস্ত করতে সে বলল, ' এ নিয়ে আপনি আর দুশ্চিন্তা করবেন না। ব্যবস্থা একটা করে ফেলেছি। উনি এখন কয়েকটা দিন এখানেই থাকবেন। শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষা।' এক মুহূর্ত চুপ করে ফীলডিং ফের বলল, 'ওঁকে বলেছি যেন ওঁর চাকরকে আনিয়ে নেন। না হলেও অসুবিধে নেই। আমার চাকর থাকবে। সে-ই দেখাশোনা করবে। তাছাড়া কলেজ স্কাউটদের বলে যাব। তারা যেমন দেখছে তেমনি দেখবে। আমার মনে হয় অন্য জায়গার চেয়ে উনি এখানেই নিরাপদ হবেন। তারপর বেস্পতিবার নাগাদ আমি ফিরে এলে পরের ব্যবস্থার কথা ভাবা যাবে'খন।'
হামিদ্‌উল্লা ইতিমধ্যে মনে মনে স্থির করে নিয়েছিল যে রনীকে চট করে রেহাই দেবে না। অন্তত একটু মোচড় না দিলে মানুষটার শিক্ষা হবে না। তাই ভালমানুষের মতন খুব নিরীহভাবে সে জিজ্ঞেস করল। 'স্যার! শুনলাম আপনার মা দেহ রেখেছেন। তা কোথা থেকে খবরটা এল?'
'এডেন থেকে।'
'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। তখন আদালতে আপনি বড়াই করে বলছিলেন বটে যে আপনার মা এডেনে পৌঁছে গেছেন।'
হাটে হাঁড়ি ভাঙল য়্যাডেলা। বলল, 'উনি কিন্তু বোম্বাই ছাড়ার পরই মারা যান। আজ সকালে সবাই যখন ওঁকে ডাকাডাকি করছে তখন উনি বেঁচে নেই। যথার্থই সলিল সমাধি হয়েছে ওঁর।'
যে কোন কারণেই হোক হামিদ্‌উল্লার শুভবুদ্ধির উদয় হল। নতুন করে সংহারক্রিয়া চালাতে চাইল না সে। হামিদের নিষ্ঠুরতা দেখে সব থেকে বেশি আহত হয়েছিল ফীলডিং। তাই হামিদ চুপ করায় সে খানিকটা স্বস্তি পেল যেন। হামিদ্‌উল্লা এখন নীরব দর্শক। ওরা দুজনে তখন য়্যাডেলার কলেজে থাকার ব্যাপার নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করছে। অবশ্য এক ফাঁকে

সে রনীকে মনে করিয়ে দিল যে মহিলার নিরাপত্তা সম্বন্ধে ফীলডিং বা কলেজ কর্তৃপক্ষকে যেন দায়ী করা না হয়। রনী মেনে নিল তার কথাটা। ওদের দুজনের মধ্যে ফীলডিংকে অবিশ্বাস্য রকমের নির্বোধ আর দুর্বলচিত্ত মনে হচ্ছিল হামিদের। এমনকি ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে যেটুকু গর্ববোধ থাকা বাঞ্ছনীয় তাও যেন লোকটার নেই। ঘণ্টাখানেক পরে ওরা যখন অমৃত রাওকে নিয়ে দিলখুসায় যাচ্ছে, তখন গাড়ির মধ্যেই হামিদ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মিস্টার রাও! ক্ষতিপূরণ বাবদ আজিজ মিস কোয়েস্টেডের কাছে কতটাকা দাবি করতে পারে?'

'কুড়ি হাজার টাকা।'

আর কোন কথা হলো না। কিন্তু অমৃত রাওয়ের হিসেব শুনে আঁতকে উঠল ফীলডিং। হতভাগ্য মেয়েটা এত টাকা কোথায় পাবে? মেয়েটা সত্যিই হতভাগ্য। তার টাকাও যাবে এবং ভাগ্যাকাশ থেকে হয়ত রনীও উধাও হবে। অজান্তেই যেন অসহায় মেয়েটার ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল ফীলডিংএর মন। উঃ! দিনটা কি নিষ্ঠুর আর বিচ্ছিরি রকমের বড়! ভয়ানক ক্লান্ত লাগছিল তার। সেই মুহূর্তে মানুষে মানুষে সম্পর্কের সুস্থ ধারণা তার মন থেকে হারিয়ে গেছে। তার মনে হল আমাদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে অন্যদের মনে আমরা কি বেঁচে থাকব তার ওপর। সে জানে এই ধারণার পিছনে কোন যুক্তি নেই। মাত্র একবারই এই অপ্রকৃতিস্থ চিন্তায় বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল সে। মাত্র একবারই এই মনোভাব হয়েছিল। দুর্ঘটনার ঠিক পরের দিন সন্ধ্যে বেলায় যখন ক্লাবের বারান্দা থেকে সে মাড়াবার পাহাড়ের দিকে চেয়েছিল। দেখতে দেখতে তার মনে হয়েছিল মাড়াবারের হাতের মুঠি আর আঙুলগুলো বড় হতে হতে বুঝি সারা আকাশটা ছেয়ে ফেলবে।

২৭

নবাব বাহাদুর অর্থাৎ জুলফীকর সাহেবের প্রাসাদোপম বাড়িতে সে রাত্রের খানাপিনাটা বেশ জাঁকিয়ে অনুষ্ঠিত হল। বিজয়োৎসবের খানাপিনা, সুতরাং আয়োজন বেশ ভালই ছিল। খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ির ছাতে মশারির মধ্যে সবাই শুয়ে। চিত হয়ে শুয়ে নেটের মশারির ভেতর দিয়ে তারা আকাশ দেখছে। কেউ ঘুমিয়েও পড়েছে। ঠিক মাথার ওপরেই জ্বলজ্বল করছে সিংহ রাশি। রেগুলাস তারার আলোর ছটা এত বড় আর ঝকঝকে যে, মনে হচ্ছে যেন আকাশের বুকে একটা টানেল তৈরি হয়েছে। সুড়ঙ্গের কল্পনাটা মাথায় আসতে আকাশের বুকে সব তারাগুলোই সুড়ঙ্গের মত মনে হতে লাগল। ফীলডিএর বাঁ দিকেই আজিজের চারপায়া। আকাশ দেখতে দেখতে আজিজ হঠাৎ বলল, 'সিরিল! আজ সারাদিন ধরে যা হলো তা তোমাদের ভাল

লেগেছে ?'
'তোমার লেগেছে ?'
'লেগেছে। ভূরিভোজ ছাড়া।'
'চন্দ্রপুরের প্রশাসনে একটা নাড়াচাড়া হবে। তুমি প্রমোশন পাবে।' বলল ফীলডিং।
'অন্তত ফেলতে পারবে না আমায়। মনে যা-ই থাক।' বলল আজিজ।
'হ্যাঁ। তোমার খুব বড় একটা জয় হল।'
আজিজ অস্বীকার করল না। আবার আবেগের তোড়ে গলেও গেল না। বলল, 'তুমি এবার কি বলবে তা জানি। অন্তত তোমার গলার স্বর থেকেই তা বুঝতে পারছি।' আজিজ একটু থামল। ফীলডিং চুপ। আজিজ ফের বলল, 'মিস কোয়েস্টেডকে ক্ষতিপূরণ দেবার দায় থেকে রেহাই দিতে চাও তুমি। সেই অনুরোধটাই করবে। তাতে ইংরেজরা খুশি হবে। তারা বলে বেড়াবে নেটীভদের মধ্যে ভদ্রলোক একজনই আছে। নেহাৎ গায়ের রঙ কাল, তাই ক্লাবে সভ্যপদ দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু বন্ধু ' তোমার দেশবাসীর কৃপা পেয়ে কৃতার্থ হবার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই। আমি পুরোপুরি ইংরেজবিরোধী হয়ে গেছি এখন। কিছুদিন আগে হলে অনেকগুলো দুর্ভাগ্য এড়াতে পারতাম।'
'যেমন আমার সঙ্গে আলাপ ?' বলল ফীলডিং।
প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল আজিজ। কথা ঘুরিয়ে বলল, 'মহম্মদ লতিফটা কেমন হাঁ করে ঘুমুচ্ছে দ্যাখ ! ওর হাঁ করা মুখের মধ্যে জল ঢাললে কেমন হয় ?' ফীলডিং বুঝল আলোচনায় আর যেতে চাইছে না আজিজ। তাই দাঁড়ি টেনে দিল। ফীলডিংএরও খুব আগ্রহ নেই। সুতরাং দুজনেই চুপচাপ। ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মশারির মধ্যে শুয়েও সবাই বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছিল। শরীরটা যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। খাওয়াটা খুবই জোরদার হয়েছে। এখন পুরোপুরি আরাম চাইছে শরীর। পাশ্চাত্যদেশে ঠিক এমনভাবে আরাম করার রেওয়াজ নেই। হয় তারা খাটে নয়ত বিশ্রাম নেয়। ছাতের ওপর এক বিচিত্র জাতি ও বর্ণ সমাবেশ হয়েছে যেন। পূর্ব ও পশ্চিমের মানুষগুলো যেন এক পরিবারবদ্ধ হয়ে শুয়ে আছে। ফীলডিংএর হঠাৎ মনে এল এ এক অদ্ভুত দেশ। সভ্যতা এখানে পথভোলা হয়ে সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ বা ভাঙা-চোরা ইমারতের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। রাজা, মহারাজা, নবাব বেগমরা কি পরতেন, কি খেতেন এইসব গালগপ্প নিয়েই এখানকার সভ্যতা। শিল্প-সংস্কৃতির জগতে অবিস্মরণীয় কীর্তির মধ্যে এখানকার সভ্যতার নিদর্শন ছড়িয়ে নেই। ফীলডিংএর পরনে খাঁটি ভারতীয় পোশাক। সেগুলো পরে আনাড়ির মতন ভারতীয় আদবকায়দা রপ্ত করবার চেষ্টা করছিল ফীলডিং। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই যে স্রেফ কাজ চালানোর মতন একটা অক্ষম প্রয়াসে পরিণত হচ্ছে তা বুঝতে পেরেছে সে। অথচ কেমন স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন আচরণ নবাব আর তাঁর নাতির। হয়ত সামান্য একটা ভঙ্গি করলেন। তাতেই কাজ হল। অর্থবহ হয়ে উঠল ভঙ্গিটা। কেমন প্রসন্ন একটা শান্তি বিরাজ করছে তাদের এই শুয়ে থাকার মধ্যে। যেন ভারতীয় যোগধ্যানের একটা

আদ্যন্ত চিত্র, এই ধ্যানস্থ ভঙ্গির মধ্যে বিরাজ করছে একটা বিস্ময়কর স্তব্ধতা। যেন সব কোলাহল থেমে গেছে—থেমে গেছে সব চাঞ্চল্য। কিন্তু এই স্তব্ধতা নিষ্প্রাণ নয়। ইউরোপের মানুষ এই সমাধিমগ্নতার অনুভব করতে পারবে না কোনদিন। দুটো হাত দুপাশে ছড়িয়ে, হাঁটু দুটো তুলে আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকার মধ্যে যে নির্লিপ্ততার প্রকাশ হয়েছে তা নিষ্প্রাণ নয়; যেন একটা সন্ন্যাসীভাব। আজিজকেও এই সন্ধ্যায় উদাসী অথচ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের মতন মনে হচ্ছিল। ফীলডিং তাই একটু যেন কুণ্ঠিত হয়েই বলল, 'ঠিক বলেছ আজিজ। মিস কোয়েস্টেডকে ক্ষতিপূরণ দেবার দায় থেকে তুমি মুক্তি দাও ভাই। যা হয়েছে ঢের হয়েছে। তোমার খরচপত্তর যা হয়েছে সে তা নিশ্চয়ই মিটিয়ে দেবে। কিন্তু সরাসরি শত্রুপক্ষের মতন ব্যবহার তার সঙ্গে করো না। প্লিজ !'

'কেন, ওর কি টাকা পয়সা নেই ? খোঁজ নাও না ?'

'তুমি যা দাবি করছ তা দিতে হলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে ও। তাছাড়া দাবিটাও কি খুব সঙ্গত ? তুমিই বল...'

'আমি একটা ছবি দেখছি। একটু অন্ধকার একটা ছবি।'

'কি রকম ?'

'আমার মনে হচ্ছে সিরিল ফীলডিং নামে চমৎকার মানুষটি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারেন কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ তিনি নন।'

'তার মানে ?' ফীলডিংএর প্রশ্নে আজিজ সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার ধারণা, মিস কোয়েস্টেডকে দায়মুক্ত করলে তোমাদের সমাজে আমার খুব সুখ্যাতি হবে। চাই কি, ভারতীয়দেরও নেকনজরে দেখতে পার তোমরা। কিন্তু ভুল বন্ধু। তোমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তোমরা মোটেই খুশি হবে না। বরং বলে বেড়াবে চাকরিতে প্রমোশন পেতে আজিজ এই কাজ করেছে। এটা উদারতা নয়, দুর্বলতা। তাই মনে মনে ঠিক করেছি এ ব্যাপারে কোন-রকম আপোস করব না। ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি ঠিক করেছি এ চাকরি ছেড়ে ভূপাল বা হায়দ্রাবাদের মতন কোন মুসলিম স্টেটে গিয়ে চাকরি করব। যেখানে অন্তত স্বাধীনভাবে চাকরি করতে পারব। কথায় কথায় সাদা চামড়ার মানুষদের হাতে অপমানিত হতে হবে না। অতএব আর আমায় কোনরকম উপদেশ দিতে এস না।'

'উপদেশ নয় আজিজ, পরামর্শ। এতক্ষণ মিস কোয়েস্টেডের সঙ্গে এই নিয়েই আলোচনা করছিলুম। দীর্ঘ আলোচনা...'

'মাপ কর ভাই ফীলডিং। তোমার ওই দীর্ঘ আলোচনা শোনবার মতন মনের অবস্থা আমার নেই।'

ফীলডিং তবুও বোঝাবার চেষ্টা করছিল। বলল, 'চুপ কর আজিজ। আমায় একটু বলতে দাও।' একটু থেমে ফীলডিং ফের বলল. 'আলাপ করে যেটুকু বুঝেছি তাই বলছি। অবশ্য পুরোপুরি বুঝেছি কিনা জানি না। কারণ মেয়েটা ভীষণ চাপা।'

'তা কি বুঝলে ?'

'মেয়েটা খাঁটি। ওর মধ্যে কোন ছলনা নেই। আর ভীষণ তেজী। যে মুহূর্তে ও বুঝতে পারল যে ভুল করেছে তখনই শুধরে নিল নিজেকে। আশা করি বুঝতে পারছ এটা কতখানি সাহসের ব্যাপার। একদিকে তার নিজের সমাজ আর রাজশক্তির প্রতি আনুগত্যবোধ আর একদিকে বিবেক। কিন্তু সব বাধা তুচ্ছ করে সে সত্যের রাস্তাই বেছে নিল। এমন নির্ভীকভাবে আমিও ঠিক পথ চিনে নিতে পারতুম না। কিন্তু য়্যাডেলা পেরেছে, আর সেইজন্যেই আমার কলেজের ছেলেরা তাকে নেত্রীর মতন সম্মান দিয়েছে। আমার অনুরোধ, এদের কথায়,' ছাতের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক মানুষ-গুলোকে দেখিয়ে ফীলডিং বলল, 'মেয়েটাকে তুমি ভুল বুঝ না। লোকের কথায় নিষ্ঠুর হয়ো না ওর ওপর। যে সব মোগল বাদশা তোমার জীবনের আদর্শ তাদের মতন মহান হবার চেষ্টা কর।'

'ক্ষমা করতে বলছ? কিন্তু ক্ষমা না চাইলে মোগল বাদশারাও কাউকে ক্ষমা করতেন না।'

উত্তেজনায় উঠে বসল ফীলডিং। বলল, 'বেশ ক্ষমাই চাইবে। কি লিখতে হবে বল, তারপর সই করিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল ঠিক এমন সময় ওর সইকরা অঙ্গীকার পত্রটা তুমি পাবে। বল কি লিখব?'

একটুও না ভেবে তীক্ষ্ণস্বরে আজিজ বলল, 'যা বলব তাই লিখবে তো? তাহলে লেখ। "প্রিয় ডাক্তার আজিজ, আমার খুব ইচ্ছে যে গুহার মধ্যে আপনার সঙ্গে আমার একলা দেখা হোক। আমার যৌবন নেই কিন্তু কামনা আছে। এই-ই আমার শেষ সুযোগ।" উনি কি এটা সই করে দিতে পারবেন?'

ফীলডিং স্তব্ধ। খানিকক্ষণ সে আজিজের দিকে চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'গুড নাইট আজিজ। আমার মনে হয় এবার বোধহয় আমাদের শুয়ে পড়া দরকার।'

'গুড নাইট ফীলডিং। তাই ভাল।' এই বলে আজিজ চাদর ঢাকা দিল। কিন্তু ফীলডিং উসখুস করছিল। কিছুতেই যেন স্বস্তি পাচ্ছে না সে। তাই একটু পরে বলল, 'আজ তুমি আমায় ভীষণ আঘাত দিলে আজিজ। কথাটা ওভাবে না বললেও পারতে। যাক, গুড নাইট।'

আর কথা বাড়াল না ফীলডিং। ধীরে ধীরে চোখ বুজল। সত্যিই আহত হয়েছে সে। তার চুপ করে যাওয়া দেখে আজিজ বুঝতে পারছিল বন্ধুর মনের খবর। একটু পরে স্বপ্নের ঘোরে কথা বলার মতন সে বলে উঠল, 'শোন বন্ধু। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার স্পর্শকাতর মন আমার কথায় কতটা উতলা হয়েছে। তাই বলি শোন। আমি ঠিক করেছি একবার মিসেস মুরের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব। উনি যা বলবেন তাই হবে।'

ফীলডিং চোখ বুজে শুয়েছিল। আজিজের কথায় ধীরে ধীরে চোখ খুলল। চোখের সামনে ঝলমল করছে তারা-ভরা উদার আকাশখানা। স্তব্ধ বিস্ময়ে ফীলডিং তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। আজিজই প্রথম কথা বলল। 'আমি জানি ওঁর পরামর্শ শুনে কাজ করলে আমার আর কোন সমস্যা থাকবে না। উনি যদি ক্ষমা করতে বলেন তো ক্ষমা করব। আমায়

উনি এমন কোন পরামর্শ দেবেন না যাতে আমার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়, যেমনটি তুমি দিলে।'
ফীলডিং শুনল। কিন্তু এ আলোচনা আর যেন ভাল লাগছে না তার। তাই বলল, 'বেশ, কাল সকালে এ নিয়ে কথা বলা যাবে'খন।'
আজিজ শুনল, তারপর আপন মনেই বলে উঠল, 'কি আশ্চর্য! উনি যে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেছেন তা ভুলেই গেছি। আদালতে সবাই যখন ওঁর নাম ধরে কথা বলছিল তখন ভাবছিলুম এই বুঝি উনি এলেন। ওঁর অপেক্ষায় চোখ বুজে বসেছিলুম। সেই ভুল আবার করছি। অথচ এখন উনি কতদূরে চলে গেছেন র‍্যালফ্‌ আর স্টেলাকে দেখতে।'
'কাকে দেখতে?'
'কেন? ওঁর এ পক্ষের ছেলেমেয়েদের?'
'জানা ছিল না তো?' বলল ফীলডিং।
'মসজিদের ভেতরে বসে মিসেস মূর আমায় সব কথা বলেছেন। আমার মতন ওঁর দুই ছেলে এক মেয়ে।'
'তা হবে। আমার সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না ওঁর।' বলল ফীলডিং।
'আমার সঙ্গে তো ওঁর মোটে তিনবার দেখা হয়েছে। কিন্তু আমায় উনি নিজের কথা সব বলেছেন ঠিক নিজের লোকের মতন।'
আজিজের ভাবাবেগটা ফীলডিংএর কানে বেসুরো লাগল। একটু অবাক হয়ে ফীলডিং বলল, 'তুমি একটা আশ্চর্য মানুষ আজিজ। মিস কোয়েস্টেডকে সামান্য উদারতা দেখাতেও তোমার কার্পণ্য, অথচ যিনি সাতসমুদ্র পেরিয়ে গেছেন তার জন্যে তোমার যত দুর্বলতা। এখানে থাকলে ওই বৃদ্ধা তোমার কি উপকার করতেন তা তুমিই জান। ব্যাপারটা স্রেফ তোমার কল্পনা। চাকর-বাকরদের মুখের কথায় তুমি ওই বৃদ্ধার ওপর বরাত দিয়ে বসে আছ। আদৌ জান না তিনি তোমার কোন উপকার করতেন কি না। সত্যি, তোমার এই ভাবাবেগের আমি কোন থই পাই না আজিজ।'
ফীলডিংএর অভিযোগ শুনে আজিজও ক্ষুব্ধ হলো। বলল, 'আবেগ কি আলুর বস্তা যে দাঁড়িপাল্লায় মাপতে হবে? আমি কি একটা যন্ত্র যে মেপে মেপে আবেগ জানাতে হবে?'
'সেটাই নিয়ম। সাধারণ বুদ্ধির মানুষরাও তাই করে থাকে।'
ফীলডিংএর কথা শুনে আজিজ ধীরে ধীরে বলল, 'যদি তোমার কথাই মানতে হয় তাহলে বলি যে জগতে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই। সবটাই শুধু দেওয়া-নেওয়া। যেমনটি দেবে ঠিক ততটাই পাবে। উঃ! কী স্বার্থপর এই মনোবৃত্তি! তার চেয়ে ঢের ভাল হত যদি সবাই মিলে ছাত থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতুম। আজ সন্ধ্যে থেকে তোমার কি হয়েছে বল তো ফীলডিং? এত স্বার্থপর হয়ে উঠলে কি করে?'
'তোমার অন্যায়বোধ আমার স্বার্থপরতার চেয়েও জঘন্য, আজিজ।'
'তাই নাকি? তার মানে আরও নতুন কিছু নালিশ আছে। সেটা কি শুনি?'
আজিজের গলার স্বর বেশ উদ্ধত শোনাল। মানুষটা সাধারণভাবে হাসিখুশি।

কিন্তু গ্রেফতার হবার পর থেকেই একটু অন্যরকম হয়ে গেছে সে। মেজাজটা যখন তখন দিক পাল্টায়। হঠাৎ হঠাৎ রেগে ওঠে। উদ্ধত হয়ে ওঠে। আগে এমনটি ছিল না। ফীলডিংকে লক্ষ্য করে আজিজ বলল, 'তোমার নালিশটা সরাসরি বললে আমার সুবিধে হত ফীলডিং। আর তোমার কাছ থেকে আমি সেটাই আশা করি।' একটু থেমে আজিজ ফের বলল, 'আমি জানি, মিসেস মুরকে তুমি ঠিক পছন্দ কর না। আমার ওপর বিরক্ত হও কারণ তাঁকে আমার ভাল লাগে। তবে আমি জানি একদিন না একদিন তোমারও তাঁকে ভাল লাগবে।'

যে মানুষ মরে গেছে তাকে জ্যান্ত মনে করে যখন আলোচনা করতে হয় তখন সেটা বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ব্যাপারটা ঠিক সুস্থও নয়। কোন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষেই তা সইতে পারা শক্ত। ফীলডিংও তাই সইতে পারল না আর হঠাৎই বলে ফেলল, 'আমি খুবই দুঃখিত আজিজ। মিসেস মুর আর ইহলোকে নেই।'

পাশের বিছানায় শুয়ে হামিদ্উল্লা এতক্ষণ এদের দুজনের কথাবার্তা শুনছিল। একটিবারও জানায় নি যে সে শুনছে। কিন্তু এবার আর সে চুপ করে রইল না। আনন্দটা মাটি হয়ে যাচ্ছে দেখে সে বলে উঠল, 'আজিজ! ওর কথা মোটেই বিশ্বাস করিস না। ও তোকে ভাঁওতা দিচ্ছে।'

'আমি বিশ্বাস করছি না। হামিদ।' বলল আজিজ। কারণ সে জানে যে কিছু লোকের অভ্যেস আছে এসব নিয়ে মারাত্মক ঠাট্টা করার।

ফীলডিং আর কিছু বলল না। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। যা সত্য তা কেউ ঢেকে রাখতে পারবে না। কাল সকালেই সবাই জানবে তাঁর মৃত্যুর কথা। তখন অস্বীকার করলেও ঘটনা মিথ্যে হয়ে যাবে না। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল যে, যতক্ষণ মানুষের মনে কেউ বেঁচে থাকে ততক্ষণ অব্দি তার যথার্থ মৃত্যু হয় না। যতক্ষণ সামান্য সংশয়ও থাকে ততক্ষণ সে অমর। এ ব্যাপারে তার নিজেরই একটা জীবন্ত অভিজ্ঞতা আছে। অনেকদিন আগের কথা। তার এক বান্ধবীর কথা। ঈশ্বর বিশ্বাসী মেয়েটা গভীরভাবে দেহাতীত প্রেমে বিশ্বাস করত। পাপপুণ্যে মানত। মেয়েটা সরল মনে বিশ্বাস করত যে মৃত্যুর পর ওপারে গিয়ে তাদের মিলন হবে। ঘোর নাস্তিক ফীলডিংও অনেকদিন অব্দি বিশ্বাসটা মনে মনে পোষণ করেছিল। তখন মাঝে মাঝে তার মনে হত যে সে বোধহয় পরলোকে তার জন্যে সত্যি সত্যি অপেক্ষা করছে। পরে যখন মোহ ভেঙে গেল তখন সব ফাঁকা। আর কখনও সে তার মানস-লোকে এসে দাঁড়ায় নি। তার মানসলোক থেকে মেয়েটা চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল। তখনই তার যথার্থ মৃত্যু হল। মিসেস মুরকেও একইভাবে নবাব বাহাদুরের প্রাসাদভবনের ছাতের ওপর সে হত্যা করতে গিয়েছিল। তাঁর স্মৃতিটুকু পর্যন্ত সযত্নে মুছে ফেলতে চেয়েছিল সে। কিন্তু তা হল না। বৃদ্ধা তার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন, আজিজের মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে বেঁচে থেকে। চাঁদ উঠেছে। পূর্ণরূপে নয়, অর্ধরূপে। অবসন্ন মৃতপ্রায় ফালি চাঁদটা যেন মহাতেজা সূর্যের আগমনবার্তা ঘোষণা করছে। খানিক পরেই আলোর

ক্লে পৃথিবী জেগে উঠবে। শুরু হবে মানুষের ক্লান্তিহীন জীবনসংগ্রাম। আর এই জীবনসংগ্রামের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাত্রির যে অবসরটুকু সে ছোট করতে চাইছিল, আপনা থেকেই তার ইতি হয়ে গেল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

২৮

জাহাজের গতি তখন দক্ষিণমুখো কারণ বোম্বাই থেকে ইউরোপ যেতে হলে এডেন বন্দর ছুঁতেই হয়। সেই চলা অবস্থাতেই মিসেস মুরের মৃত্যু হয়েছে। জাহাজ যখন বন্দরে পৌঁছল তখন তিনি মৃত। তাঁর শবদেহটা নিয়েই জাহাজ এডেন বন্দরে পৌঁছল। শবদেহের সলিল সমাধি দেওয়া হল ভারত মহাসাগরে।
শেষবারের মতন সূর্যালোকের উত্তাপ তাঁর শবদেহ স্পর্শ করল। কিন্তু কে এই মিসেস মুর? যিনিই হন, তাঁর এই হঠাৎ মৃত্যু জাহাজ যাত্রীদের কাছে মোটেই পছন্দ হয় নি। জাহাজ কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছেও ব্যাপারটা অবাঞ্ছিত, কারণ এমন হঠাৎ মৃত্যুতে কোম্পানির দুর্নাম হয়। এডেন বন্দরে পৌঁছে খবর পাঠানর ব্যাপারে করণীয় যা সবই করলেন লেডি মেল্যানবী। কিন্তু ঠিক এমন একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে তাঁর কোন আকাঙ্ক্ষাই ছিল না। জনে জনেই বলে বেড়াচ্ছিলেন সে কথা। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয় তাঁর সঙ্গে, অথচ কি নিদারুণ এর স্মৃতি! দেশে ফেরার আনন্দটাই মাটি করে দিল এই মৃত্যু। লোহিত সাগর অব্দি এই দুর্ঘটনার স্মৃতিটা ভূতের মতন জাহাজ-টাকে তাড়া করে এসেছে। তারপর জাহাজ যখন ভূমধ্যসাগরে পড়ল তখন যেন সবাই রাহুমুক্ত হল। সুয়েজের কাছাকাছি এলেই একটা পরিবর্তন চোখে পড়ে। প্রাচ্যের ছোঁয়াচমুক্ত হয়ে পরিবেশ পাশ্চাত্যমুখী হয়ে ওঠে। এই বদলের সময়টুকুর মধ্যেই যাত্রীদের মন থেকে মিসেস মুর হারিয়ে গেলেন। জাহাজ এসে পৌঁছল পোর্ট সৈয়দে। শুরু হল উত্তর গোলার্ধের শুকনো ধূসর উদ্ধত অহঙ্কারী চেহারা। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়া পেয়ে ঝলমল করে উঠল যাত্রীদের মন। অবশেষে পরিচিত পরিবেশে পৌঁছে গেছে তারা। স্বভাবতই খুশি হয়ে উঠল যাত্রীরা।
মিসেস মুরের মৃত্যুর খবরটা চন্দ্রপুরে অন্যরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। যে যেমন পেরেছে মনোমত করে ঘটনাটা সাজিয়ে নিয়েছে। তবে লোকের মুখে মুখে যে গল্পটা সবচেয়ে বেশি চালু হল সেটাই দারুণ চাঞ্চল্যকর। সবাই জানল যে একজন ভারতীয়কে বাঁচাতে গিয়েছিলেন বলে এক বৃদ্ধা ইংরেজ তাঁর ছেলের হাতে নিহত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষের মনে উদ্বেগ ছড়াবার মতন উপাদান গুজবের মধ্যে ছিল। এরকম গুজব নিত্য ছড়ায় না বলেই কর্তৃপক্ষ চিন্তিত। পরিপূর্ণ মিথ্যা মসৃণ এবং গোলাকার। তাকে আয়ত্তে

আনা যায়। কিন্তু যে গুজব অর্ধসত্য তা অমসৃণ লোষ্ট্রখণ্ডের মতন আবর্জনার স্তূপের মধ্যে সকলের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকে। এইরকমই একটা অর্ধসত্য গুজবকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষ চিন্তিত। খবর এসেছে নেটীভরা মৃত মিসেস মুরের আত্মার কল্যাণে দুটো সমাধিস্তম্ভ তৈরি করেছে। পুলিশ প্রধান হিসেবে ম্যাকব্রাইডকে তদন্তে যেতে হল। মাটির তৈরি কিছু পাত্র আর অন্যান্য আনুষ্ঠানিক জিনিস ছাড়া আর কিছু তার নজরে এল না। ব্যাপারটা নেহাৎই মামুলী এবং উত্তেজিত হবার মতন কোন উপাদান না থাকায় সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই এর আঁচ নিভে গেল। ম্যাকব্রাইড অবশ্য বুঝেছিল যে মিসেস মুরকে ঘিরে একটা নতুন উদ্দীপনা এসেছে নেটীভদের মনে। তাঁকে প্রায় দেবতা করে ফেলেছে তারা। তাই তদন্ত শেষ করেই সে প্রচার করে দিল যে এসব হল নেটীভদের অপকৌশল। কিন্তু ম্যাকব্রাইড বোধহয় জানত না যে একশ বছর আগে ইওরোপীয়ানরা যখন এদেশের মানুষের কল্পনার মানুষ হয়ে ধরা দিয়েছিল তখন তাদের ঘিরেও এইরকম উদ্দীপনা সৃষ্টি হত। স্থানীয় মানুষ তাদের প্রায় দেবতার মতন সম্ভ্রমের চোখে দেখত। আস্ত দেবতা না হলেও লৌকিক দেবতার স্থান করে নিত তারা। তারপর ধাপে ধাপে লৌকিক দেবতারা যেমন নির্গুণ ব্রহ্মে উন্নীত হয়, তেমনি এদেরও পদোন্নতি হত ক্রমে ক্রমে।

রনী নিজেকে বুঝিয়েছিল যে তার মা স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু এতে তার বিবেক শুদ্ধ হল না। শেষের দিকে মিসেস মুরের সঙ্গে রনী অত্যন্ত অশোভন ব্যবহার করেছিল। ফলে, হয় তাকে অনুতাপ করতে হবে (যা অসম্ভব কারণ এত তাড়াতাড়ি নিজেকে সে বদলাতে পারবে না) কিংবা মা'র সম্বন্ধে সেই শক্ত মনোভাবটাই বজায় রাখতে হবে। শেষেরটাই বেছে নিল রনী। তার মনে হল সে ঠিক কাজই করেছে। এইভাবেই বিবেক শুদ্ধ করল রনী। শেষের দিকে মা যেন আজিজকে নিয়ে অকারণ বাড়াবাড়ি করতেন। তাছাড়া য়্যাডেলাকেও এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যে তার নিজের কর্তৃত্বই ছিল না মেয়েটার ওপর। বেঁচে থাকতে যা করেছেন তার চেয়েও মন্দ হল মৃত্যুর পরের অবস্থাটা। নেটীভদের হৃদয়াসনে এখন তাঁর দেবীর আসন। তার সামাজিক মান-সম্মানের ওপর এটা যে কতবড় আঘাত রনী তা অনুভব করতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য যে মা তা বুঝলেন না এবং এই জন্যেই রনী কোনদিন তাঁকে মেনে নিতে পারল না। রনীর জীবনে আজ অনেক দুশ্চিন্তা। সামনেই পড়ে আছে লম্বা গ্রীষ্মকাল, আছে য়্যাডেলার সমস্যা। সে শুনেছে লেফটেন্যান্ট-গভর্নর চন্দ্রপুরে পরিদর্শনে আসছেন। ব্যাপারটা খুব নিরীহ নয়। আসলে উনি আসছেন ঘটনার কারণ খুঁজতে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই রনী একটু বেশি চিন্তিত। আলাদা করে দেখলে এগুলোর কোনটাই হয়ত কঠিন সমস্যা নয়। কিন্তু মিসেস মুরের এই বিচিত্র ভারতপ্রীতির ব্যাপারটা যেন সব সমস্যাগুলো একত্র করে একটা মালা তৈরি করেছে। তবুও স্বর্গগতা মা'র ওপর বিতৃষ্ণ হতে পারল না সে। এটা যে শুধু তার ধর্মবোধ তা নয়, খানিকটা অভ্যাসগত সংস্কারও। এই অভ্যাস একদিনে হয় নি। পাবলিক

স্কুলে পড়ার প্রথম দিনটি থেকেই এই সংস্কারটাই সে পালন করে এসেছে। এমনকি এই পাপের দেশে এসেও তার সংস্কারটা জীর্ণ হয়ে যায় নি। তাই মন্দির, মসজিদ বা গির্জা যেখানেই সে গেছে মনটা অভ্যাসবশে পবিত্র হয়ে গেছে এবং একটা শুদ্ধ অধ্যাত্ম অনুভূতি হয়েছে। তিনি যখন মা তখন সন্তান হিসেবে কিছু কৃত্যকর্ম তাকেও পালন করতে হবে। সে ঠিক করল যে তারা তিন ভাইবোন মিলে নর্দাম্পটন শায়ারের গির্জায় মায়ের নামে একটা স্মৃতি-ফলক উপহার দেবে। জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ছাড়াও সলিল সমাধির কথাও লেখা থাকবে ফলকের গায়ে। মায়ের আত্মার কল্যাণে এটুকু তাকে করতেই হবে।

আর য়্যাডেলা? তাকেও ফিরে যেতে হবে। রনী ভেবেছিল হয়ত য়্যাডেলাই আগে ফিরে যাবার প্রস্তাবটা দেবে। কারণ, এত ঘটনার পর রনীর পক্ষে আর তাকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। এতে তার নিজেরই ক্ষতি। কিন্তু হতভাগ্য য়্যাডেলা? কি করবে সে এখন? ফীলডিংএর অনুগ্রহে আত্মসম্মান খুইয়ে কলেজের একটা ঘরে সে দিন কাটাচ্ছে। কোন মহিলার পক্ষে থাকবার উপযুক্ত বাসস্থান সেটা নয়। কিন্তু উপায়ই বা কি? অন্তত সিভিল লাইন্স্এর ওরা কেউ তাকে ডেকে নেবে না। আজিজ নাকি ক্ষতিপূরণের মামলা আনবে মেয়েটার নামে। এখন য়্যাডেলারই উচিত তাকে মুক্তি দেওয়া কারণ তার প্রণয়কে সে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু রনী কি সত্যিই তাকে ভাল-বাসত? সেদিন নবাব বাহাদুরের গাড়ির য়্যাকসিডেন্টটা না হলে তারা কি ঘটা করে বিয়ের কথা লোক জানাজানি করে ঘোষণা করতে পারত? এ হল তার কাঁচা বয়সের প্রেম। যখন সে কলেজে পড়ত, গ্রাস্মীয়ারের লেকের ধারে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে বেড়াতে যখন তারা ভালবাসার কথা বলতো, তখনকার কথা। কিন্তু প্রথম প্রেমের সেই অনভিজ্ঞ দিনগুলো অনেকদিন আগেই পেরিয়ে এসেছে রনী।

২৯

মাড়াবার অধ্যায়ের পরবর্তী আকর্ষণ হল লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার গিলবার্টের চন্দ্রপুর সফর। তেমন আলোকপ্রাপ্ত না হলেও কথাবার্তায় বুদ্ধিদীপ্ত এবং মার্জিত রুচির এই আমলাটি সরকারী সচিবালয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। ফলে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার তেমন সুযোগ তাঁর হয় নি। তাই শহুরে একটা মাজাঘষা এবং অপক্ষপাত তাঁর চরিত্রে ছিল এবং জাতিবিদ্বেষ বা বৈরীতা তিনি অপছন্দ করতেন। মামলার ফলাফল তাঁর পছন্দ হয়েছে এবং চন্দ্রপুরে এসে প্রথমেই ফীলডিংকে ডেকে পাঠালেন। তার উদার নির্ভীক ভূমিকার প্রশংসা করলেন। একসময় তার

কাঁধে হাত দিয়ে 'একটা গোপন কথা বলি' গোছের ভাবও দেখালেন। তাঁর কথার মর্মার্থ হল যে সিভিল লাইন্‌স্‌এর কিছু আত্মম্ভরি মানুষের খেয়াল খুশির দরুন মামলাটা উল্টো হয়ে যাচ্ছিল। ফীলডিংএর সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলেই মামলাটা আয়ত্তের বাইরে চলে যায় নি। সুতরাং এর সবটুকু কৃতিত্ব ফীলডিংএর। স্যার গিলবার্ট নিঃসঙ্কোচে জানালেন যে সিভিল লাইন্‌স্‌এর মানুষগুলো শুধু জেদী বা অহঙ্কারী নয় তারা নির্বোধও। তারা জানেই না যে ঘড়ির কাঁটা সামনের দিকেই চলে। তাকে পিছন দিকে ফেরানো যায় না। সবশেষে অনুরোধ করলেন ফীলডিং যেন চন্দ্রপুর ক্লাবের সদস্য হয়। এটা তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধ এবং আদেশ নয়। কিন্তু ফীলডিং বুঝতে পারছিল যে এ অনুরোধ আদেশেরই নামান্তর। এইভাবে সমস্ত ব্যাপারটার একটা সন্তোষজনক সমাধান করে স্যার গিলবার্ট ফিরে গেলেন তাঁর শৈলনিবাসে। বলা বাহুল্য, মামলার খুঁটিনাটি বিষয়-গুলো, যেমন মিস কোয়েস্টেডের নামে ক্ষতিপূরণের মামলা বা গুহার মধ্যের ঘটনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিয়ে তিনি কোন মন্তব্য করতে চাইলেন না। এগুলো প্রধানত স্থানীয় প্রশাসনিক সমস্যা এবং এর সমাধান করবে প্রশাসন। কিন্তু মিস কোয়েস্টেডের ব্যাপারে ফীলডিং যেন ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছিল। কলেজে এখনও গ্রীষ্মের ছুটি চলেছে। সুতরাং যত দিন খুশি য়্যাডেলাও সেখানে থাকতে পারে। ফীলডিংএর খাওয়া থাকা চলছে হামিদ্‌উল্লার বাড়িতে। বর্নীর মাপাজোপা শিষ্টাচার আর লোকদেখানো সামাজিকতার বদলে কলেজের এই শান্ত ঠাণ্ডা পরিবেশে তার কয়েকদিনের প্রবাস জীবন য়্যাডেলার কাছে অনেক প্রীতিপ্রদ। মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই আর খুশিমত বাগানে খানিক ঘোরাফেরা, এইটুকুই তার কাছে যথেষ্ট। ফীলডিংও সাধ্যমত সেটুকু তাকে দিয়েছে। আকস্মিক মানসিক ধাক্কায় মেয়েটা যেন থমকে গেছে। সে এখন বুঝতে পারে কতটুকু তার প্রাপ্য। ফীলডিংও এই ক'দিনের সামান্য আলাপে বুঝতে পেরেছে য়্যাডেলা কতটা খাঁটি। তার শিষ্টাচার তার ভদ্রতাবোধ মনকে স্পর্শ না করে পারে না। দুদিকের সমাজই তাকে মর্যাদাহীন করেছে। কিন্তু তার জন্যে য়্যাডেলার মনে কোন ক্ষোভ নেই। বরং নিজের নির্বুদ্ধিতাই দায়ী করেছে। তাই ফীলডিং যখন তাকে আজিজের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিতে বলল তখন সরল মনেই সে রাজি হল। বিষণ্ণ স্বরে বলল, 'ঠিক বলেছেন, কথাটা আমারই আগে ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু আমার কর্তব্যের কথাটা নিজে থেকে বুঝতে পারি নি। এখন মনে হচ্ছে মামলা শেষ হবার পর ভদ্রলোকের কাছে যাই নি কেন? আপনি মনে করিয়ে দেবার পর মনে হল এটা আমার করা উচিত ছিল। যাক, বলুন কি লিখতে হবে? নিশ্চয়ই আমি লিখব।' দুজনে অনেক যত্ন করে চিঠির যে মুসাবিদা করল, তাতে অনেক ভাল ভাল কথা থাকলেও মনকে স্পর্শ করার মতন আন্তরিকতা ছিল না। ফলে দুজনের কারোরই মনঃপূত হল না। য়্যাডেলা বিষণ্ণ স্বরে বলল বরং আর একবার চেষ্টা করি। ওঁর চরিত্রে কলঙ্ক দিয়ে যে ক্ষতি করেছি তার জন্যে যা করণীয় সব করব। আমার স্বভাবের কি দোষ জানেন? আমি

ভাবি বোধহয় ঠিক কাজ করছি। কিন্তু একটা দুটো ঠিক কাজ করার পর বুঝতে পারি সব ভুল হয়ে গেছে। আমার এই দোষটা আমি আগে বুঝতাম না।' ফীলডিং বলল, 'আমি কিন্তু ধরে ফেলেছি আমাদের ত্রুটি কোথায় এবং সেটা মেনে নেওয়াই ভাল।'

'কোথায় ?'

'আজিজ বা ভারতীয়দের সম্বন্ধে আপনার মনে যথার্থ শ্রদ্ধা নেই।' য়্যাডেলা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। ফীলডিং আরও বলল, 'যেদিন প্রথম আপনার সঙ্গে আলাপ হল, সেদিন আপনি ভারতবর্ষ নামে দেশটা দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভারতবাসীদের নয়। সেদিনই আমার মনে হয়েছিল এই দেশ দেখাটা আপনার আটপৌরে শখ। কারণ মানুষ বাদ দিয়ে দেশ জানা হয় না। এখানকার মানুষ-জন ঠিকই বুঝতে পারে আপনারা তাদের ভালবাসেন কি না। এদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আপনি ওদের বোকা ঠাওরাবেন না। আর এইভাবেই আমরা ওদের ঠকিয়ে যাচ্ছি, মায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও এমনি করে ওদের ঠকাচ্ছে। এটা জানবেন যে, শুধু ন্যায়বিচার করলেই মানুষকে আপনার করা যায় না। তাদের ভালবাসতে হয়। তাই এক একবার মনে হয় বোধহয় সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটাই এইরকম ভুসভুসে বালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।'

মামলায় জয়ী হয়ে ফীলডিংএর ভারতীয় বন্ধুরা একটু বেশি আত্মসচেতন হয়ে উঠল। যা নয় তাই ভাবতে শুরু করল নিজেদের। মামলায় জিতলে ইংরেজরা কপট সাধু হত। কিন্তু ভারতীয়রা হয়ে উঠল উগ্র। গায়ে পড়ে তারা বিবাদ করতে চাইল। এমন বিষয় নিয়ে অভিযোগ করতে লাগল যার কোন অস্তিত্বই নেই। যুদ্ধের মাঝখানে না গেলে যুদ্ধ সম্বন্ধে স্বাভাবিক মোহ কাটে না। এদেরও সেই অবস্থা। মোহ কেটে গেছে কিন্তু উদ্দেশ্যহীন হয়ে গেছে তারা। যুদ্ধের লক্ষ্য আর জয়-গৌরব এক জিনিস নয়। যুদ্ধজয়ের মধ্যে একটা অতিরিক্ত গৌরব আছে। একমাত্র সাধু চরিত্রের মানুষরাই এই গৌরবের মোহ ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু মানুষ যখন জয়ের গৌরব নিজে ভোগ করতে যায় তখন তার অমরত্ব থাকে না। স্যার গিলবার্ট খুব ভদ্র এবং অমায়িক ব্যবহার করে গেছেন ঠিকই। কিন্তু প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মাথা নত হতে দেন নি। ব্রিটিশ প্রশাসনের কাঠামোটি আগের মতই প্রতি-পত্তিশালী হয়ে রয়েছে এবং গ্রীষ্মের অবাঞ্ছিত সূর্যালোকের মতন বিরাজ করছে। এমন শক্ত প্রশাসনকে বাগে আনতে এদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তা খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল না। এমনকি মহম্মদ আলির মতন উগ্র ইংরেজ-বিদ্বেষী মানুষও তা জানত না। এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ আওয়াজ তুলেছে, ছোটখাট আইন অমান্যের ঘটনার কথাও শোনা গেছে, কিন্তু যথার্থই তারা কি চায় তা বোঝা যাচ্ছিল না। তবে যে অভাববোধটা সবাইকে সর্বক্ষণ পীড়া দিচ্ছিল তা হল তাদের অশিক্ষা। তারা বুঝেছে যে সবাইকে যথেষ্ট শিক্ষিত হতে হবে। তাই ফীলডিংকে সেই অনুরোধই তারা করল।

বন্ধু হিসেবে আজিজ ভাল কিন্তু মানুষটা ক্ষমতাপ্রিয়। তার মনের বাসনা ফীলডিংও তাদের মতন হয়ে উঠুক। কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? হয়ত নিজের

সমাজের মানুষের মধ্যে তার শিকড় নেই, কিন্তু সে তো মহম্মদ লতিফ হতে পারে না ? অন্য তফাত ছেড়ে দিলেও চামড়ার রঙের তফাতটা ঘোচাবে কি করে ? কথাটা বলল ফীলডিং। কিন্তু আজিজ আবেগভরে বলে উঠল, 'কিন্তু তোমার এই আত্মদান আমরা কখনও ভুলব না। তোমায় আমরা পুরস্কার দিতে চাই। বল কি পুরস্কার নেবে !'

আবেগহীন স্বরে ফীলডিং বলল, 'যদি পুরস্কার দিতেই চাও তবে মিস কোয়েস্টেডকে রেহাই দাও। সেটাই আমার পুরস্কার।'

সত্যি, য়্যাডেলা সম্বন্ধে আজিজ কেমন যেন নিষ্প্রাণ, অনুভূতিহীন। কিন্তু তেমনটি হওয়া উচিত নয়। মেয়েটাকে আরও উদারভাবে বোঝা উচিত নইলে বেচারার প্রতি অবিচার করা হবে। এইসব ভেবে ফীলডিং একদিন মিসেস মুরের কথা তুলল। মিসেস মুরও যে য়্যাডেলার ওপর নির্দয় ছিলেন না আজিজকে তা বুঝিয়ে দেবার জন্যেই সে মিসেস মুরের কথা তুলল। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। মিসেস মুরকে এত ভালবাসত আজিজ যে তাঁর কথা উঠতেই সে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। বাবার কান্না দেখে ছেলে-মেয়েরাও কাঁদতে বসল। ফীলডিং অপ্রস্তুত। কান্নার বেগ একটু কমলে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে আজিজ বলল, 'বন্ধু !' তোমার চালাকি আমি বুঝতে পেরেছি। মিসেস মুরের নাম করে তুমি আমার মন নরম করতে চাও। কিন্তু তা হবে না। প্রতিশোধ আমি নেবই। ওরা কেন আমায় অপমান করল ? আমার ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়েছে। আমার চিঠির ছবি থানায় নিয়ে গেছে। কেন ? তাছাড়া আমার এখন টাকার দরকার। আমার ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়ার জন্যে অনেক টাকার দরকার। য়্যাডেলা তা জানে। আমিই তাকে বলেছি।' কিন্তু মুখে সে যা-ই বলুক না কেন, যত দিন যেতে লাগল ততই সে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। খানিকটা যেন অসহায়ও। ফীলডিং তা বুঝতে পারত। তাই সুযোগ পেলেই আজিজের মনের উপর মিসেস মুরের স্মৃতির চাপ ফেলবার চেষ্টা করত। আর সবাই যেমন কাজ গোছাতে মিসেস মুরের স্মৃতিটা ব্যবহার করছিল ফীলডিংও সেইরকম করতে চাইছিল। বৃদ্ধার স্মৃতিটুকু জীইয়ে রাখবার জন্যে ওরা তাঁর নামে স্মৃতি-স্তম্ভ করেছে। সে-ও তেমনি তাঁর একটা ভাবরূপ আজিজের মনে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিল। এইভাবে দিনের পর দিন চেষ্টা করতে করতে ফীলডিং সহসা আবিষ্কার করল যে আজিজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। পুরোপুরি আত্ম-সমর্পণ করেছে সে। আজিজের ধারণা হল যেন সে বৃদ্ধার নির্দেশ পেয়েছে। য়্যাডেলা যে তাঁরই ভাবী পুত্রবধূ আজিজ যেন ভুলেই গিয়েছিল। তাই হঠাৎই এক আশ্চর্য সকালে ক্ষতিপূরণের সব টাকাটা ছেড়ে দেবার কথা জানিয়ে দিল ফীলডিংকে। সত্যি, এক অসাধারণ উদারতা দেখাল আজিজ। কিন্তু ইংরেজদের মনে এর কোন প্রতিক্রিয়া হল না। আজিজ তা জানত তাই মনঃক্ষুণ্ণ হয় নি। সে জানত, ইংরেজরা তাদের চাকরির শেষ দিন অব্দি তাকেই দোষী মনে করে যাবে। তারপর চাকরির শেষে যখন টানব্রিজ ওয়েল্‌স্‌ বা চেল্‌তেনহ্যাম অঞ্চলে অবসর কাটাবে তখনও নিজেদের মধ্যে এই কথাই

বলাবলি করবে। তাদের ধারণা যে, প্রতিপক্ষের জেরার মুখে পাছে ভেঙে পড়ে এই ভয়েই মেয়েটা সেদিন কেস তুলে নিয়েছিল। নইলে মাড়াবারের জঘন্য ঘটনার জন্যে দায়ী শুধু আজিজই।

ব্যাপারটা মিটে যাবার পর রনী একদিন ফীলডিংএর কাছে এল। তখন তার বদলির হুকুম হয়ে গেছে। কিন্তু তার অহঙ্কারী উদ্ধত ভাবটা একটুও বদলায় নি। সেইভাবেই সে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি মিস্টার ফীলডিং। মিস কোয়েস্টেডকে আপনি যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। তবে কথা দিচ্ছি তার তরফ থেকে আর কোন উৎপাত হবে না।' ফীলডিং চুপ। রনী ফের বলল, 'মিস কোয়েস্টেড ইংল্যান্ড ফিরে যেতে চান। আমি ওঁর ফেরার সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। শুনলাম আপনার সঙ্গে উনি একটু দেখা করতে চাইছেন।'

ফীলডিং মনে মনে ছটফট করছিল। বলল, 'আমি এখুনি যাচ্ছি।'

কলেজে পৌঁছে ফীলডিং দেখল য়্যাডেলা একটু যেন অস্থির। শুনল বিয়ের সম্বন্ধ রনী নিজেই ভেঙে দিয়েছে। করুণ একটু হেসে য়্যাডেলা বলল, 'ভালই। হল। বুদ্ধিমানের মতন কাজ করেছে রনী। আমারই এই প্রস্তাব দেওয়া উচিত ছিল। মাঝে মাঝে ভাবি বিয়ে হলে না জানি কি হতো। ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করে হয়ত রনীর সারা জীবনটাই নষ্ট করে দিতাম। কাজটা করে ফেললে আর তো ফেরা যায় না, তখন সংসারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যেতুম।' ফীলডিং স্তব্ধ হয়ে শুনছে। তাকে আশ্বস্ত করতে য়্যাডেলা ফের বলল, 'আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না। ভারতবর্ষকে ভালবাসি বলে ভাববেন না যে, ইংল্যান্ডে আমি অবহেলিত। ওখানেও ঠিক মানিয়ে নিতে পারব। যা হোক একটা জীবিকা ঠিকই বেছে নেব। তাছাড়া যা টাকা পয়সা আছে তাও যথেষ্ট। বন্ধুবান্ধবও অনেক আছে। সুতরাং ভাবনার কিছু নেই। অসুবিধেও হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।' একটু চুপ করে য়্যাডেলা আরও বলল, 'কিন্তু আমার জন্যে আপনারা সবাই অনেকে দুর্ভোগ পেয়েছেন। আমি সত্যিই দুঃখিত। অনেক ভেবেচিন্তে বিয়ের ব্যাপারে আমরা এগিয়েছিলুম। শেষ পর্যন্ত দুজনে আলাদা হয়ে গেলুম। নিশ্চয়ই ভাবছেন এরা কি নির্লজ্জ। সত্যি. আমাদের বিয়ের কথা চিন্তা করা উচিত হয় নি। আচ্ছা বলুন তো, যখন শুনলেন আমাদের বিয়ে হবে তখন অবাক হন নি আপনি?'

'না। এ বয়সে চট করে অবাক হই না।' মৃদু হেসে বলল ফীলডিং। আরও বলল, 'তাছাড়া বিয়ে ব্যাপারটাই আমার কাছে হাস্যকর। খুব তুচ্ছ দরকারে মানুষ বিয়ে করে। হয় সামাজিক না হয় ধর্মীয়। কিন্তু কোনটাই যথার্থ বিয়ে নয়। আপনি কি বলেন?' কিন্তু য়্যাডেলার উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করে না ফীলডিং। বলে, 'আমার ধারণা যে সব বিয়েই এইরকম দৈবাৎ ঘটনা। আমার বন্ধুবান্ধবদের জিজ্ঞেস করেছি, তাদের স্ত্রীদেরও জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু কেউ-ই ঠিকমতন বলতে পারে না কেন তারা বিয়ে করেছে। বিয়ে করার পর নানারকম মহৎ কারণ খুঁজে বার করার চেষ্টা করে যাতে বাঁধনটা আলগা না হয়। আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ভণ্ডামি। তাই বিয়ে

নামক এই প্রথার আমি ঘোর বিরোধী। নাস্তিকও বলতে পারেন।'

'আমি কিন্তু বিরোধী নই। নাস্তিকও নই।' খুব বিশ্বাস করে কথাটা বলল য়্যাডেলা। আরও বলল, 'ভুলটা আমিই করেছিলুম। আমারই দোষ সেটা। কি দিতে পারতুম রনীকে ? কিছুই না। তাই রনী যখন আমায় মুক্তি দিল তখন মনের ভার নেবে গেল। আপনাকে একটা কথা বলি নি আমি।' ফীলডিং তাকাল। য়্যাডেলা বলল, 'সেদিন গুহার মধ্যে ঢোকবার আগেও ভাবছিলাম রনীকে সত্যিই ভালবাসি কি না। আমায় রেহাই দিয়ে ভালই করেছে রনী। কারণ মনের দিক থেকে তেমন কোন সমর্থন পাচ্ছিলাম না। সম্বন্ধটা কি দিয়ে তৈরি হবে ? শ্রদ্ধা, ভক্তি, বন্ধুত্ব, এসব দিয়ে তো ভালবাসার জোর তৈরি হয় না ! তাহলে ? যেখানে...' কথা বলতে বলতে য়্যাডেলা যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলল। কি বলবে বুঝতে পারছিল না। ফীলডিং কথাটা জুগিয়ে দিল। বলল, 'যেখানে ভালবাসার জোর নেই।'

'ঠিক তাই মিস্টার ফীলডিং। ওই জোরটুকু আজও আমি অর্জন করতে পারি নি।'

এ আলোচনা আর যেন ভাল লাগছিল না ফীলডিংএর। তাই ঘুরিয়ে নিল আলোচনার ধারাটা। বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করে নি। কারণ, আর বোধহয় আমাদের দেখা হবে না। সেদিন গুহার মধ্যে সত্যিই কি কেউ আপনার পিছু নিয়েছিল। সে কে ?'

'ধরুন সেই গাইডটা।' খুবই উদাসীন ভাবে বলল য়্যাডেলা। আরও বলল, 'কোনদিনই তা সঠিক ভাবে জানা যাবে না। তবে মিসেস মুর জানতেন।'

'তিনি কেমন করে তা জানবেন ?'

'বোধহয় টেলিপ্যাথিতে।'

কথাটা ফীলডিংএর কানে অত্যন্ত খেলো লাগল। এটা কি কোন কারণ হল ? বুঝিয়ে বলতেই য়্যাডেলা বুঝল। আসলে, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের বাঁধন দুজনের মন থেকে ঢিলে হয়ে গেছে তখন। সেটা আর মোহ সৃষ্টি করছে না। বস্তুত তেমন কোন ভাবলোকের অস্তিত্ব কি সত্যিই আছে যা স্পর্শ করা যায় না ? দুজনেরই কেউ-ই তা জানে না। তবে দুজনেই অনুভব করতে পারল যে তাদের দুজনেরই ভাবনা একই রকম। কে জানে. হয়ত জীবনটা সত্যিই একটা রহস্য। হয়ত কলহ বিবাদে লিপ্ত এতগুলো ভারতবর্ষের একটাই আত্মা। একটাই সত্তা এই ব্রহ্মাণ্ডের যার দর্পণে তারা নিজেদের দেখছে। কিন্তু এই সত্যটা নির্ণয় করার যন্ত্রটা তাদের হাতে নেই।

'ইংল্যাণ্ডে গিয়ে চিঠি লিখবেন তো ?' জিজ্ঞেস করল ফীলডিং।

'নিশ্চয়ই। প্রায়ই লিখব। লিখতে আমায় হবেই। আমার অনেক উপকার করেছেন আপনি। এখন যাবার বেলায় তা বুঝছি। ইচ্ছে হচ্ছে আপনার জন্যে কিছু করি। কিন্তু আপনাকে তো দেবার কিছু নেই।'

'ঠিক তাই।' খানিক চুপ করে ফীলডিং ফের বলল, 'সত্যি বলতে কি এমন আনন্দ জীবনে পাই নি যা এখানে এসে পেলুম। এখানকার মানুষরা আমায় শ্রদ্ধা করে. ভালবাসে। আমিও ওদের ভালবাসি শ্রদ্ধা করি। আমার আনন্দ

হচ্ছে যে এদেশ ছেড়ে আমায় যেতে হবে না। স্যার গিলবার্ট আমার এই উপকারটুকু করে গেছেন। অন্তত কোন দৈব দুর্বিপাক যদ্দিন না হচ্ছে তদ্দিন আমি এদেশে এই চাকরিতেই বহাল থাকছি।'

একটু অন্যমনস্ক ছিল য়্যাডেলা। বলল, 'মিসেস মুরের এই হঠাৎ মৃত্যুটাই আমার বড় খারাপ লাগছে।'

'আজিজও ওঁকে খুব ভালবাসত।'

আজিজের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল য়্যাডেলা। গভীর স্বরে বলল, 'এখন বুঝছি আমাদের সবাইকেই একদিন মরতে হবে, কারণ ওটাই পরিণতি। আগে উপন্যাস পড়তে গিয়ে মনে হত মৃত্যু বেছে বেছে মানুষকে নেয়। কারণ, শেষ কথা বলবার জন্যে কিছু চরিত্রকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতেই হয়। এখন বুঝছি যে মৃত্যু কাউকে রেহাই দেয় না। মরতে সবাইকে হবেই।'

পরিহাসতরল স্বরে ফীলডিং বলল, 'উহুঃ! এই নির্মম সত্যটা অত গভীর-ভাবে উপলব্ধি করবেন না। তাতে শেষের দিনটা এগিয়ে আসবে। মৃত্যুচিন্তা মানে হেরে যাওয়া। আমার আপত্তি সেখানেই। মাঝে মধ্যে আমিও এর ফাঁদে পড়ি। তখন জীবনটা বিস্বাদ লাগে। মনে হয় কোথায় যেন ডুবে যাচ্ছি। তখন অনেক চেষ্টায় সেই অতলান্ত গহ্বর থেকে নিজেকে টেনে তুলি। এখনো বাঁচবার শখ আমার আছে। আরও কিছুদিন আমি বেঁচে থাকতে চাই।'

'আমিও চাই।'

এদের অন্তরঙ্গ কথাবার্তা এবং গভীর বন্ধুত্বটা যেন শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। দুজন মানব মানবী যেন ক্ষমতা আর প্রতিষ্ঠার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত। দুজনেই বিচক্ষণ, সৎ। দুজনের যেন একই রকম ভাবনা, একই ভাষায় তারা কথা বলছে। অথচ তারা আলাদা সত্তা। একজন পুরুষ অন্যজন রমণী। বয়সেও তারা ভিন্ন। তবুও কেউ যেন পরিপূর্ণ সুখী নয়, তৃপ্ত নয়। পরিপূর্ণ বিশ্বাস আর মতৈক্য নিয়ে যখন দুজনেই বলছে, 'আমি আরও কিছুকাল বাঁচতে চাই' কিংবা 'আমি ঈশ্বর মানি না.' তখন যেন অবিশ্বাসের জলোচ্ছ্বাসে তাদের বিশ্বাসটা ভেসে গেল। কিংবা অনেক উঁচু থেকে নিজেদের অন্তরঙ্গ এবং ঘনিষ্ঠ ভাবভঙ্গিগুলো দেখে কেমন অদ্ভুত মনে হতে লাগল। তারা কথা বলছে হাত ধরাধরি করে. পরস্পরকে অভয় দিচ্ছে—কিন্তু কত হাস্যকর কত তুচ্ছ এই স্পর্ধা! তাদের ধারণা তারা যা করছে সততার সঙ্গেই করছে। এর মধ্যে ছলনা নেই। তাদের বিশ্বাস এই জগতটাই সত্য। কল্পনার সেই কল্পলোক যেন অধরা লক্ষ্য. যা তাদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। কিন্তু না চাইলেও কল্পলোকের সেই অপার্থিব অধরা লক্ষ্যে পৌঁছতেই তাদের সাধ হচ্ছিল।

ছাড়াছাড়ির সময় এগিয়ে আসছে। দুজনেই অভিভূত। আবার দেখা হবে তো? নিশ্চয়ই দেখা হবে। ফীলডিং বলল. 'আপনাকে আজ খুব ভাল লাগছে আমার।'

'আমারও। আবার দেখা হবে।'

'হবে। তবে যদি কখনও ইংল্যান্ডে ফিরি।'

'তা কি সম্ভব হবে? আপনি তো ফিরবেন না।'

'তা কি বলা যায়? ফিরতেও পারি।'

'তাহলে তো চমৎকার হয়।'

এর ঠিক দশদিন পরেই ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে পাড়ি দিল য়্যাডেলা। মিসেস মুর যে পথে গিয়েছিলেন সেই পথেই। বর্ষার একটু আগেই যাত্রা করল য়্যাডেলা। গ্রীষ্ম তার শেষ রোষ ছড়িয়ে দিচ্ছে তখন। সারা দেশ ধুকছে। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি, গাছপালা, মাঠঘাট। গ্রীষ্ম যেন তাদের শরীরে কলঙ্ককালিমা লেপে দিয়েছে। য়্যাডেলার নামেও কলঙ্ক রটেছে। সে নাকি ফীলডিংএর রক্ষিতা হয়ে কলেজে বাস করছিল। কলঙ্ক রটিয়েছে এ্যাণ্টনি নামে সেই গোয়ানীজ চাকরটা। লোকটা বোম্বাই অব্দি ধাওয়া করেছিল। তার উদ্দেশ্য ভয় দেখিয়ে য়্যাডেলার কাছ থেকে কিছু বাগিয়ে নেওয়া। লোকটাকে জাহাজ থেকে তাড়িয়ে দিল য়্যাডেলা। কিন্তু তার নামে কুৎসাটা চন্দ্রপুরের মানুষের মন থেকে তাড়ান গেল না। চন্দ্রপুরের মানুষ তাকে নির্বিবাদে ভুলে গেল। জাহাজ যখন ভারত মহাসাগরের বুকে ভেসে চলেছে, তখন য়্যাডেলা নামে মেয়েটা ভারতবাসীর মন থেকে পুরোপুরি হারিয়ে গেল। সে তখন সম্পূর্ণ একা।

মিশরে পৌঁছবার পর মনের এই একাকীত্ব অনেকখানি কেটে গেল য়্যাডেলার। সুয়েজ খালের দুপাশে স্তূপাকার করা ঝকঝকে বালির বাঁধ। সেই বালুকারাশির দিকে তাকিয়েছিল য়্যাডেলা। মনের যেটুকু সংশয় দ্বন্দ্ব ছিল সব পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সকালের নরম সোনালী সূর্যালোকে পোর্ট সৈয়দটা কী মনোহর দেখাচ্ছে। একজন মার্কিন মিশনারীর সঙ্গে সে শহর দেখতে বেরিয়েছে। লেসেপ্স্এর স্ট্যাচু অব্দি ওরা দুজনে হেঁটে এল। সকালের স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শ পেয়ে শরীর মন যেন জুড়িয়ে গেছে। স্ট্যাচুর নিচে দাঁড়িয়ে মার্কিন সন্ন্যাসী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রাচ্যদেশ থেকে ফিরে যাচ্ছেন কেন? কোন বিশেষ কর্তব্য পালন করতে চলেছেন কি?' একটু থেমে সন্ন্যাসী বললেন, 'আমার কৌতূহল মাপ করবেন। শুধু জানতে চাই কেন যাচ্ছেন? প্রাচ্যদেশ আপনার ভাল লাগল না? নাকি কোন বাণী নিয়ে যাচ্ছেন? প্রত্যেক মানুষের জীবনেই দুটো দিক আছে। একটা দিক মোহমুগ্ধ হয়ে থাকা, অন্যটা হল সেই মোহ-আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা। এই বিখ্যাত মানুষটির স্ট্যাচুর দিকে তাকান। উনি তাকিয়ে আছেন প্রাচ্যের দিকে। কিন্তু মোহজাল ছিন্ন করে আবার ফিরে যাচ্ছেন পশ্চিমে।' য়্যাডেলা তাকিয়েছিল সন্ন্যাসীর দিকে। সন্ন্যাসীও স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে আছেন তার দিকে। এই দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহারে কোন বিশেষ তাৎপর্য কি আছে? হয়ত আছে। মানুষের ন্যায়বোধকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এ'রা হয়ত এমনি করেই কথা বলেন। য়্যাডেলা কিছু বলল না। সে তাকিয়েছিল উদার পরিব্যক্ত আকাশের দিকে। কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই। তার পরবর্তী কর্তব্যের রূপরেখা তখনই স্থির করে ফেলল সে। ইংল্যাণ্ডে ফিরে তার প্রথম কাজ হবে মিসেস মুরের অন্য দুজন ছেলেমেয়ের সন্ধান করা। র‍্যাল্ফ্ এবং স্টেলার কথা সে অনেক শুনেছে আজিজের মুখে। তারা মিসেস মুরের এ পক্ষের ছেলেমেয়ে। অত্যন্ত

যন্ত্রের সঙ্গে বৃদ্ধা যেন তাঁর দুই বিবাহের ছেলেমেয়েদের দু টুকরো করে রেখেছেন। র‍্যাল্ফ্ এবং স্টেলা এযুগের ছেলেমেয়ে এবং এই নবীন প্রজন্মকে র‍্যাডেলা এখনও চেনে না।

৩০

মামলার ফল বার হবার পর চন্দ্রপুরে একটা সাম্প্রদায়িক প্রীতির পরিবেশ গড়ে উঠল। স্থানীয় মানুষের কাছে এটা এক উপরি পাওনা। শহরবাসীরা একমত হয়ে বুঝতে পারছিল যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি দরকার। তাই এ ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাব হল না, ভুল বোঝাবুঝিও হল না। একদিন আজিজের সঙ্গে একজন নতুন মানুষ হাসপাতালে দেখা করতে এলেন। তাঁকে দেখে আজিজ অবাক। অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে এসেছেন স্বয়ং মিস্টার দাস। চর্মরোগের ওষুধ নিতে এসেছেন আজিজ ডাক্তারের কাছে। সেই সঙ্গে আর একটা নিবেদনও রাখলেন। ভদ্রলোকের শ্যালক একটা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। সেই পত্রিকার জন্যে একটি কবিতা চাই। তিনি শুনেছেন যে আজিজ ভাল কবিতা লেখে, সুতরাং এই সামান্য দুটি অনুরোধ তাকে রাখতেই হবে। আজিজ তাঁকে নিরাশ করল না। তবে একটু খোঁচা দিয়ে বলল.

'দাস সাহেব! যাকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার কাছে কবিতা চাইতে এসেছেন? সে যদি না দেয়?' ম্যাজিস্ট্রেট দাস চুপ। আজিজ হেসে বলল 'না না। আমি দেব। একটা ভাল কবিতাই দেব। এটা স্রেফ ঠাট্টা।' একটু চুপ করে আজিজ বলল, 'কিন্তু শুনেছি পত্রিকাটা নাকি হিন্দুদের?'

'মোটেই না। সাধারণ ভারতবাসীর স্বার্থেই এই পত্রিকার প্রকাশ।'

'সাধারণ ভারতবাসী? ওই পরিচয়ে এখানে কেউ থাকেন বলে শুনি নি।'

'না থাকলেও এখন থাকবেন। তাই তো আপনার কবিতা চাইছি। এখন আপনিই আমাদের নেতা। আমরা সবাই জাতিধর্ম নির্বিশেষে আপনার পেছনে আছি।'

দাসের কথা শুনে আজিজ অবাক। বলল, 'খুব ভাল। এক জাতি এক প্রাণ একতা। কিন্তু এই একতা টিকবে তো?'

দাস তাকিয়েছিলেন আজিজের দিকে। বললেন, 'না। টিকবে না।' আজিজ বলল, 'তাহলে?'

দাস কিন্তু একটুও মুষড়ে পড়লেন না। লোকটির মানসিকতায় কোন দুর্বোধ্যতা নেই। সরল মনেই বললেন, 'তাই বলছিলুম আপনার কবিতায় ফার্শী কথা বেশি ব্যবহার করবেন না। এমনকি বুলবুল ইত্যাদির উল্লেখ যত কম থাকে ততই ভাল।'

পেন্সিলটা দাঁতে কামড়ে ধরে আজিজ তাকিয়েছিল দাসের দিকে। হঠাৎ

প্যাডের কাগজ টেনে খসখস করে একটা প্রীস্ক্রিপশন লিখে ফেলল সে। তারপর দাসের হাতে দিয়ে বলল, 'এটা কবিতা নয়। কিন্তু কবিতার চেয়েও এটা ভাল নয় কি ?'

দাসের কোন ভাবান্তর হল না। কাগজটা হাতে নিয়ে বললেন, 'আপনি ভাগ্যবান। দুরকম রচনাই আপনার হাতে কত স্বচ্ছন্দ।'

'আপনি কি শুধু প্রশংসাই করবেন আমার ?'

আজিজের কথায় খোঁচা ছিল। সেটুকু অগোচর হলো না দাসের। করমর্দনের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে দাস বললেন, 'আমি জানি আমার ওপর আপনার আক্রোশ আছে। অবশ্য কথায় বা ব্যবহারে তা ধরা না পড়লেও আমি বুঝতে পারি। কারণ আপনার সব কথাতেই কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ থাকে।'

আজিজ তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে নিল। তারপর আবেগে জড়িয়ে ধরল দাসকে। দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের এই সম্প্রীতির ছবিটি দেখতে বেশ। কিন্তু নীরস গদ্যময় এই প্রেমালিঙ্গনে একটুও রোমাণ্টিকতা ছিল না। ভারতবর্ষের এক সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ এত বেশি পরিচিত যে তার কিছুই অজানা থাকে না। তাই সম্পর্কের মধ্যে রোমাণ্টিক হবার সম্ভাবনা বড় বিরল। দুজনেই দুজনের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়েছিল বটে. কিন্তু মনে মনে দুজনের মনের কথা চুরি করে জানবার চেষ্টা করছিল। তবে দাস অনেক ধূর্ত। তাই সে-ই প্রথমে বলল, 'যদি অসৌজন্য কিছু প্রকাশ করে থাকি তার জন্যে মার্জনা চাইছি আপনার কাছে।'

'ছি ছি ওসব কি বলছেন ? আমাদের সবারই দোষত্রুটি আছে। এই নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। ওসব কথা বাদ দিন। এখন বলুন কি করে জানলেন যে আমি একটু আধটু লিখি ?' মানুষটা যেমনই হোক সে যে তার কাছ থেকে লেখা চাইতে এসেছে তাতেই আজিজ কৃতার্থ। একমাত্র সাহিত্যের মধ্যেই সে যা কিছু সান্ত্বনা পায়। মানসিক পীড়নের অভিজ্ঞতা থেকেও সাময়িক মুক্তি লাভ করে যখন সে সাহিত্যকর্ম করে। সুতরাং সেই মুহূর্তে দাসকে অসহ্য মনে হচ্ছিল না তার। দাস বললেন, 'আপনি যে লেখেন টেখেন সে তো আমার অজানা নয় ! প্রফেসর গড়বোলেই আমায় বলেছেন সে কথা।'

'কিন্তু তিনি কি করে জানলেন ?'

'কেন ? তিনিও তো লেখেন। তিনিও কবি। আপনারা দুজনের সত্যদ্রষ্টা, ঋষিপ্রতিম।'

দাসের চাটুবাদে যথার্থই বিধ্বস্ত হয়ে সন্ধ্যে না হতেই কাব্যচর্চায় বসে গেল আজিজ। কিন্তু ঝরনাধারার মতন অনায়াসে যা নির্গত হল তা বুলবুলের গান। যে কবিতাটি সে লিখল তার প্রতিপাদ্য বিষয় হল ইসলামের অবক্ষয় এবং প্রেমের অনিত্যতা। যথাসম্ভব করুণ আর মধুর করে সে কবিতাটা লিখল। কিন্তু এ রচনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত নয়। তার নিজের জীবনের সঙ্গেও এর কোন যোগ নেই। সব থেকে বড় কথা হল, হিন্দু পাঠকদের কাছে এ রচনার একটুও দাম হবে না। অতৃপ্ত মনে আজিজ তখন

ব্যঙ্গ রচনা লিখতে বসল। কিন্তু সে রচনা এত তীক্ষ্ণ ও শ্লেষাত্মক হল যে তার অশংকা হলো হয়ত তা ছাপা হবে না। আজিজের রচনার এটাই ত্রুটি। তীব্র দুঃখবোধ নয়ত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। এর মাঝামাঝি কোন ভাবনার কথা সে লিখতে পারে না কারণ এর কোনটাই তার জীবনের ঘটনা বা অভিজ্ঞতা নয়। কবিতাই তার জীবনের নিত্যবস্তু। তাকে ঘিরেই তার প্রেরণা। জীবন-ধারণের প্রয়োজনে সে বিজ্ঞান পড়েছে মাত্র। এ তার অধীত জ্ঞান। তাই দরকার ফুরিয়ে গেলে সাহেবদের পোশাকটার মতন তাকে একপাশে সরিয়ে রাখে। সে ভেবেছিল আজ সন্ধ্যায় এমন কিছু রচনা করবে যা উন্মোচিত করবে এক নতুন দিগন্ত। এমন গান লিখবে যা নিত্য গীত হবে মাঠে ঘাটে সর্বত্র। লক্ষ মানুষের গলায় উদাত্ত হবে সেই গান। কিন্তু কোন্ ভাষায় সেই গান লেখা হবে? কোন্ বাণী সে প্রচার করবে? এই প্রথম সে উপলব্ধি করল যে কেবল মুসলমান নয়, সমগ্রভাবে ভারতীয়দের কথা লিখবে সে। আর পিছন ফিরে চাইবে না। ভারতবর্ষের সেই অতীত ঐতিহ্যের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সুতরাং যা নেই তার জন্যে বিলাপ করে কি লাভ? দিল্লী তো এখন বিদেশী শক্তির অধিকারভুক্ত? ইসলাম হয়ত সত্য কিন্তু মুক্তিসাধনার পথটি তাঁর প্রচারিত ধর্ম পুরোপুরি আলোকিত করতে পারে নি। আগামী দিনের গানকে তাই ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

কবিতা লেখা হলো না বটে কিন্তু অনর‍্যকম একটা অনুভূতি হলো। দেশমাতা নামে এক শরীরী অস্তিত্বের রূপরেখা যেন অস্পষ্টভাবে তার মনে আঁকা হয়ে গেল। এতদিন জন্মভূমির প্রতি তেমন কোন টান তার ছিল না। কিন্তু মাড়াবারের ঘটনার পর থেকেই ভারতবর্ষকে সে দেশ-জননী বলে ভালবাসতে শুরু করেছে। অর্ধনিমীলিত চোখে আজিজ তখন দেশজননীর কথাই ভাবছিল। তার মনে হতে লাগল প্রতিটি মানুষ যদি জাপানীদের মতন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয় তবে ভারতবর্ষও মহান হবে। তারপব একদিন হয়ত তারাও বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পাবে! তার ভুল হয়েছিল কারণ ইংরেজদের সে ছোট করে দেখেছিল। তাদের উপেক্ষা করেছিল। পরের দিনই হামিদ্উল্লাকে সে তার মনের কথাটা গুছিয়ে বলল। আজিজ বলল, 'হামিদ্ভাই, আমরা একটা ব্যাপারে ভুল করেছিলাম। ইংরেজদের আমরা খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছিলাম। কিন্তু ওরা তো শাসক!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হামিদ বলল, 'তাতেও কি রেহাই পেতিস? যে কোনদিন এমনি একটা বিপত্তি ঘটতে পারত। তখনই ওদের মনের কথাটা বেরিয়ে পড়ত। শোন্ আজিজ! স্বয়ং ঈশ্বর ওদের ক্লাবে এসে বললেও ওরা তোকে নিরপরাধ মনে করতো না। ঈশ্বরের কথাও অবিশ্বাস করতো। আমাদের সম্বন্ধে এটাই ওদের মনের ধারণা। আর সেইজন্যে আত্মরক্ষা করতেই আমাদের উপায় খুঁজতে হচ্ছে। এমনকি রামচাঁদের মতন বাজে লোকদের সঙ্গেও বসে শলা করতে হচ্ছে।'

'কিন্তু তোমাদের এই দলবাজির মধ্যে আমি নেই। এখান থেকে আমি চলে

যাব ঠিক করেছি।' বলল আজিজ।

'কোথায় যাবি? এক টার্‌টন্‌ থেকে আর এক বার্‌টন্‌দের খপ্পরে গিয়ে পড়বি।'

'না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার কোথাও যাব না। যেখানে ব্রিটিশ শাসন নেই সেইরকম কোন দেশীয় রাজ্যে যে কোন চাকরি নিয়ে চলে যাব। অবসর সময়ে কবিতা লিখব। উঃ! এখন যদি বাবরের কাল হত! কোথায় হারিয়ে গেল সেই দিনগুলো! যখনই ভাবি মন দুর্বল হয়ে যায়। যাই বল হামিদ-ভাই, আমাদের এখন একজন শক্ত রাজার শাসন দরকার। বেঁচে থাকা অনেক সহজ হবে তাতে। আর একটা কথা। অন্যরকম মানসিকতা হলেও আমাদের উচিত হিন্দুদের বোঝবার চেষ্টা করা। তাই ভাবছি কোন হিন্দু স্টেটে ডাক্তারের চাকরি নিয়ে চলে যাব।'

'ও! অনেক দূর ভেবে ফেলেছিস দেখছি! কিন্তু টাকা? কত টাকা তোকে মাইনে দিতে পারবে ওই বর্বর হিন্দু রাজারা?'

'যাই দিক। আমি তো ধনী হতে চাই না! ও আমার ঠিক চলে যাবে।'

'একটু যদি বুদ্ধিমান হতিস—অন্তত মিস কোয়েস্টেডের কাছ থেকে যদি ক্ষতিপূরণের টাকাটা আদায় করতে পারতিস!'

'ওসব কথা থাক হামিদভাই। যা অতীত তা না তোলাই ভাল।' একটু থেমে আজিজ বেশ দৃঢ়ভাবে বলল, 'আমি তা চাই নি হামিদভাই। আমি চেয়েছি উনি ইংল্যাণ্ড ফিরে যান। বিয়ে থা করুন। তখন টাকাটা ওঁর দরকার হবে। ওকথা আর তুলো না ভাই।'

'বেশ তুলব না। কিন্তু তোর কি হবে? সারাটা জীবন কি সাধারণ গরিব মানুষ হয়েই কাটিয়ে দিবি? জীবনে কোন শখ থাকবে না—একবারও কি ছুটি ভোগ করতে কাশ্মীরে বেড়াতে যাবার সংস্থান রাখবি না? একটা জংলী স্টেটের ডাক্তার হয়ে জীবনটা নষ্ট না করে তোর উচিত আরও বড় ডাক্তার হবার চেষ্টা করা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের একেবারে আধুনিক আবিষ্কার-গুলোর খোঁজ করা। নিয়মিত মেডিক্যাল বুলেটিন পড়া। ছেলেমেয়েদের ভাল করে মানুষ করাও তোর কর্তব্য। এমনভাবে নিজেকে তৈরি করে ফেল যাতে সাহেবরা তোকে খাতির করতে বাধ্য হয়। মানুষের মতন মানুষ হবার চেষ্টা কর আজিজ। তোর কাজের ফল তুই নিজেই ভোগ করবি।'

আজিজ এতক্ষণ চেয়েছিল হামিদ্‌উল্লার দিকে। ওর কথা শেষ হতেই চোখ ইসারা করে বলল, 'বাঃ! চোখ বুজে তোমার কথা শুনতে শুনতে ভাবছিলুম বুঝি আদালতে দাঁড়িয়ে তোমার বক্তৃতা শুনছি। শোন হামিদভাই! মানুষের মতন মানুষ অনেক ভাবেই হওয়া যায়। অনেক ভাবেই মানুষের কর্তব্য পালন করা যায়। আমি বুঝি হৃদয়ের কথা যথার্থভাবে প্রকাশ করাটাই আমার বড় কর্তব্য।'

হামিদ্‌উল্লা অবাক হয়ে চেয়েছিল। বলল, 'এর ওপর আর কথা চলে না।' খানিক পরে আত্মস্থ ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে হামিদ্‌উল্লা বলল, 'তোকে একটা কথা বলা হয় নি।'

আজিজ তাকিয়েছিল। হামিদ্‌উল্লা বলল, 'মহম্মদ লতিফ একটা গুজব শুনেছে। একটা নোংরা গুজব।'
'কি গুজব ?'
'মিস কোয়েস্টেড যখন কলেজে থাকতেন তখন ফীলডিং প্রায় রোজই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেত। ফীলডিং যেত একটু রাত করেই। চাকরবাকররাও তাই বলছে।'
আজিজের মুখখানা কেমন যেন এক দুর্লভ কৌতুকের আলোয় ঝলমল করে উঠল। বলল, 'ভালই তো! মহিলার বিষণ্ণ একঘেয়ে মুহূর্তগুলো ওরই মধ্যে একটু আধটু মনোরম হত।'
'এর মানেটা কি দাঁড়ায় তা বুঝেছিস ?'
হামিদ্‌উল্লার দিকে তেমনি করে চেয়ে আজিজ বলল, 'এখন বুঝলাম। কিন্তু বুঝলেও আমার কোন লাভ হবে না। চন্দ্রপুর আমায় ছেড়ে যেতে হবেই। কিন্তু কোথায়? আমার সেটাই সমস্যা। কবিতাও আমায় লিখতে হবে। কিন্তু কি নিয়ে লিখব? সুতরাং যে ইঙ্গিতই তুমি কর না কেন, আমার সিদ্ধান্ত বদলাবে না।' হঠাৎ তার কি হলো কে জানে। বজ্রগর্ভ মনের ভাবনাগুলো যেন সশব্দে ফেটে পড়ল। হামিদ্ তো বটেই তার নিজের ক্ষ্যাপামিতে আজিজ নিজেও তখন সচকিত। চীৎকার করে বলে উঠল সে, 'কেউ আমার বন্ধু নয়। কেউ নয়। সবাই বিশ্বাসঘাতক। কেউ আমায় একটুকু সাহায্যও করে নি। আমার ছেলেমেয়েরাও নয়। ঢের হয়েছে বন্ধুত্বের। এখন রেহাই পেলে বাঁচি।'
হামিদ্‌উল্লা স্থির, অবিচল। শান্ত স্বরে বলল, 'ভেতরের ঘরে গিয়ে বসবি চল।'
আজিজও ততক্ষণে নিজের ক্ষ্যাপামিতে লজ্জিত। বলল, 'আমায় মার্জনা কর হামিদভাই। কদিন কয়েদখানায় থেকে আমার স্বভাবটা এমনি বদ হয়ে গেছে। তাই চল। ভেতরে গিয়েই বসি।'
'নুরুদ্দীনের মা আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ওঁরা ভেতরের ঘরেই বসে আছেন। তা হোক। ভেতরেই চল।'
আজিজ একটু যেন ঠাট্টা করতে চাইল। বলল, 'আলাদা ভাবে ওঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু একসঙ্গে কখনও আমায় দেখেন নি। তুমি বরং বলে এস। একটু মানসিক প্রস্তুতি হোক ওঁদের। নইলে হয়ত ভূত দেখার মতন আঁতকে উঠবেন।'
'উহুঃ!' হামিদ্‌ও হালকা স্বরেই বলল, 'মন তৈরি হবার কোন সুযোগই দেব না আমরা। না জানিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে যাব। ওদের একটু নাড়া দেওয়া দরকার। বুঝলি আজিজ! এটা দরকার। আমাদের সমাজের মেয়েদের সংস্কার মজ্জাগত হয়ে আছে। পায়ে পায়ে সংস্কারের বাধা। যখন তোর বিচার চলেছে তখন ওরা ঠিক করল যে পরদাপ্রথা তোলার আন্দোলন করবে। বোরখার আড়ালে নিজেদের আর ঢেকে রাখবে না। এই নিয়ে গরম আর ঝাঁঝাল ইস্তাহারও লেখা হয়ে গেল। কিন্তু ওই অব্দি।

বাকীটুকু আর এগোল না। সে সব এখন ধামা চাপা পড়েছে' ফীলডিংকে এরা সবাই কেমন শ্রদ্ধাভক্তি করে তা তো জানিস! কিন্তু এত বলেও আমার বেগমকে আর সামনে বার করতে পারলাম না। যখনই সে আসে কোন না কোন ছল করে আমার বেগম চলে যাবেই। হয় বলবে ঘরদোর অগোছাল, নয় বলবে ঘরে খাবার-দাবার তৈরি নেই। মোটকথা অজুহাত একটা থাকবেই। পনের বছর ধরে এইভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি। এক নাগাড়ে বুঝিয়ে চলেছি। কিন্তু একটা প্লাস পয়েন্টও এতদিনে জোটাতে পারলুম না। কিন্তু তবুও সায়েব সন্ন্যাসীগুলো বলে বেড়াচ্ছে যে আমাদের সমাজ নাকি পুরুষ শাসিত। আমরা নাকি মেয়েদের দাসী করে রেখেছি। তাদের মুক্তি দিচ্ছি না।' হঠাৎ চুপ করল হামিদ্‌উল্লা। তারপর আজিজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজিজ! তুই কবিতার বিষয় খুঁজছিলি। তাই না?' আজিজ চুপ করে তাকিয়ে আছে হামিদ্‌উল্লার দিকে। হামিদ্‌উল্লা বলল, 'এইরকম একটা ভাব নিয়ে কবিতা লেখা যায় না? ভারতের নারী—যাহা হইয়াছেন এবং যাহা হইতে পারিতেন।' আজিজ তখনও চুপ।

৩১

আজিজের স্বভাব ভাবপ্রবণ। কোন একটা গুজব সত্যি বলে মেনে নিতে তার কাছে কোন সাক্ষীপ্রমাণের দরকার হয় না। ফীলডিংএর সঙ্গে এই নিয়ে কোন আলাপ-সালাপ না হলেও, দুজনের মধ্যে একটা আশ্চর্য নীরবতা নেবে এল যেন। ফীলডিং তখন চন্দ্রপুরে ছিল না। বাজার গরম করা গুজবটা কিছুদিন তার মনের মধ্যেই ঘুরঘুর করার পর আজিজ ধরেই নিল যে গুজবটা নেহাৎই মিথ্যে নয়। মেয়েদের সঙ্গে সামান্য ফষ্টিনষ্টি করলেই যে পুরুষের চরিত্রহানি হবে তা সে মনে করে না। তাছাড়া মধ্যবয়সী ফীলডিংকে মনের মানুষ করবে না কোন মেয়ে। দুশ্চিন্তাটা সেখানে নয়। আজিজ ক্ষুব্ধ কারণ গুজবটা রটেছে ওই মিস কোয়েস্টেডকে নিয়ে। তাছাড়া ফীলডিং তার কাছে গোপন করল কেন ব্যাপারটা? তবে কিসের বন্ধুত্ব? বিশ্বাস ছাড়া বন্ধুত্ব হয়? সে নিজেও তো তার কত গোপন কথা বলেছে? সেসব কথা শুনলে স্তম্ভিত হতে হয়। তবুও বিশ্বাস করে আজিজ তা বলেছে। ফীলডিং শুধু শুনেছে কিন্তু নিজের কথা কখনও বলে নি।
ফীলডিংএর ফেরার অপেক্ষা করছিল আজিজ। যেদিন সে ফিরল সেদিনই স্টেশনে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করল। ফেরার পথেই আজিজ কথাটা তুলল। একটু ঘুরিয়ে কথাটা পাড়ল সে। বলল, 'চন্দ্রপুরের বাজার এখন ম্যাকব্রাইড আর ডেরেককে নিয়ে খুব গরম। ওদের দুজনকে নাকি একঘরে দেখা গেছে। শুনছি মিসেস ম্যাকব্রাইড নাকি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনছেন।' ঘটনাটা বলে আজিজ সকৌতুকে মন্তব্য করল, 'অবশ্য ম্যাকব্রাইড এর জন্যে এই

হতভাগা দেশটাকেই দায়ী করবেন। বলবেন আমরাই দায়ী। এখানকার পরিবেশেই পাপ আছে। তা বল বন্ধু, তুমি আমার জন্যে কি সন্দেশ নিয়ে এসেছ। বিস্ময়কর কিছু খবর কি আছে?'

'কিছুই না।' হালকা স্বরেই বলল ফীলডিং। আরও বলল, 'আমাদের কনফারেন্সে ঠিক হল...'

'তোমার কেতাবী আলোচনা এখন থাক। আমায় এখনই মিণ্টো হাসপাতালে যেতে হবে। কলেরা রুগীর সংখ্যা বাড়ছে। চন্দ্রপুরের বাইরে থেকেও রুগী আসছে। অথচ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তেমন গা নেই। নতুন সিভিল সার্জনও যেন আগের মানুষের মতন। এত যে প্রশাসনিক রদবদল হলো তার যোগফল হচ্ছে শূন্য। কিন্তু সে কথা থাক। তোমায় বলি, ম্যাকব্রাইডের মতন তোমায়, নিয়েও গুজব ছড়িয়েছে। মিস কোয়েস্টেড আর তুমি।' তোমরা দুজনে নাকি অত্যন্ত গর্হিতভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলে। সাদা কথা হলো যে লোকে তোমাদের আচরণ অশালীন মনে করেছে এবং বলে বেড়াচ্ছে সে কথা।'

'তা বলুক।' অত্যন্ত উদাসীনভাবে জবাব দিল ফীলডিং।

'কিন্তু তোমার সুনাম নষ্ট হচ্ছে না? আমি তো সকলের মুখ বন্ধ করতে পারি না! তাছাড়া আমার কথা তারা শুনবেই বা কেন? সবাই তো তোমার সমর্থক নয়!'

ফীলডিং তেমনি অবিচল। বলল, 'এ নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তার কি আছে? মিস কোয়েস্টেড তো সব দেনা মিটিয়েই চলে গেছেন! আর তাঁকে নিয়ে টানাটানি কেন?'

আজিজ অবাক। বলল, 'সিরিল! অপযশের আঁচ তাদেরই গায়ে লাগে যারা থেকে যায়। আমার কথাটা একটু ভাব! কী উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তা নিয়ে আমার দিন কাটছে বলো তো? দুচোখের পাতা এক করতে পারি নি কটা দিন। মেয়েটার অপযশের ভাগ্য। তাই প্রথমে আমি পরে তুমি এর শিকার হয়েছ।'

ফীলডিং ক্ষুব্ধ হলো। বলল, 'একজন মহিলা সম্বন্ধে তুমি একটু বাড়াবাড়ি করছ আজিজ।'

'না। করছি না। এদেশে আমার জন্মকর্ম। এখানকার লোকদের আমি ভাল করে চিনি। একবার বদনাম হলে চট করে তার দাগ মুছে যায় না।'

'বুঝলাম। আমার বক্তব্য তা নয়। একটা গুজব হয়ত রটেছে তা ঠিক। কিন্তু অত বড় করে দেখার কি দরকার? আমরা ইচ্ছে করলেই তো ব্যাপারটা অস্বীকার করতে পারি! অন্য কথা আলোচনা করতে পারি।'

আজিজ তখনও অবাক। বলল, 'বুঝতে পারছি তমি মিস কোয়েস্টেডের কথাই ভাবছ।'

ফীলডিং নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'ভুল কথা। আমি কারো দায় বয়ে বেড়াই না আজিজ। আগের মতই আমার মন হালকা। কোন দাগই পড়ে নি তার গায়ে।'

'ওই দম্ভই তোমার বিপদ ডেকে আনবে সিরিল। ওই আত্মম্ভরিতার জন্যেই

চারদিকে শত্রু তৈরি হচ্ছে।'
'মানে ? কে শত্রু ? কারা শত্রু ?'
ফীলডিংএর প্রশ্নের সোজা জবাব দিতে পারল না আজিজ। এতক্ষণ সে শুধু নিজের মনের কথাই বলে এসেছে। অপরের মনের কথা সে জানে না। তাই রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে। বলল, 'এটাও বুঝিয়ে বলতে হবে ? এই শহরে এমনি হাজারটা মানুষ আছে যাদের বিশ্বাস করা যায় না। তাদের কথা তোমায় আমি বলেছি। তোমার জায়গায় থাকলে অনেক আগেই তাদের চিনে নিতাম।' তারপর গলার স্বর নাবিয়ে বলল, 'তোমার চারপাশেই শত্রু। যারা তোমার কাজ করে তাদের প্রত্যেক তিনজনের মধ্যে একজন গুপ্তচর।'
ফীলডিং হেসে ফেলল। বলল, 'গুপ্তচরের সংখ্যা মশার মতন অগুন্তি হোক না! আমার তাতে কি ? আমার অনিষ্ট করতে তাদের অনেক দিন লাগবে। কিন্তু তুমি অন্য কিছু বলতে চাইছিলে। বলছ না।'
'মোটেই না।' তীব্র আপত্তি করল আজিজ।
'হ্যাঁ। তাই। নিশ্চয়ই অন্য একটা ব্যাপার আছে যা নিয়ে তুমি ঝগড়া করতে এসেছ।'
এমন সরাসরি অভিযোগ এড়িয়ে যেতে পারল না আজিজ। কিন্তু জবাবও দিতে পারল না। তাই ঘুরিয়ে একটা অশ্লীল উক্তি করে বসল। বলল, 'তাহলে মাদাম কোয়েস্টেডের সঙ্গ দস্যিপনা করে সন্ধ্যেগুলো তোমার ভালই কেটেছে।'
সাধারণত রুচিসম্পন্ন মানুষেরা এ রকম নোংরা আলোচনা বেশিক্ষণ করতে চায় না। কিন্তু আজিজের জেদ দেখে স্তম্ভিত ফীলডিংএর মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল। চেঁচিয়ে বলে উঠল সে, 'ইতর—জঘন্য! একজন মহিলা সম্বন্ধে, যিনি এখনও আর একজনের বাগদত্তা, ওইরকম নোংরা ইঙ্গিত করতে তোমার বাধল না ? তাছাড়া আমি নিজেও ভাবতে পারছি না এত নেবে গেলে কি করে ?'
আজিজ নিজেও অপ্রস্তুত। নিজের কথার ছুরিতে সে নিজেও ক্ষতবিক্ষত। মনটা তার রক্তাক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই ক্ষতবিক্ষত মনটা সে তো দেখাতে পারবে না! সে বুঝতে পারল এদেশের মানুষদের মতন তার মনটাও পচা গলা হয়ে গেছে। আকুল হয়ে সে ফীলডিংএর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। বার বার বলতে লাগল, 'আমায় মার্জনা কর সিরিল। কিন্তু তুমিও তো একটিবারের জন্যেও প্রতিবাদ কর নি! তা যদি করতে হয়ত এতটা নিচে আমি নাবতে পারতুম না।'
নিজের ব্যবহারে ফীলডিংও অনুতপ্ত। বলল, 'তুমি কিছু মনে কর নি তো ?'
'নিশ্চয়ই না।'
'যদি সত্যিই মনে করে থাক তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।'
'আমার কাছে ব্যাপারটা এখন দিনের আলোর মতন স্পষ্ট হয়ে গেছে। তুমি

যা বললে তার প্রতিটি কথা আমি বিশ্বাস করেছি। আমার মনে আর কোন সংশয় নেই।'

'কিন্তু কথাগুলো আমি শক্ত করে বলেছিলাম। তার জন্যে আমি দুঃখিত।'

আজিজ তখন অভিভূত। বলল, 'দোষটা সম্পূর্ণ আমার।'

তবে ওদের কথাবার্তার জট তখনই খুলে গেল না। সহজ হয়ে উঠল না ওদের আলোচনা। যুক্তির টানাপোড়েনে প্রায়ই খেই হারিয়ে যেতে লাগল তাদের। ভুল বোঝাবুঝির মাত্রা বেড়ে যেতে লাগল। আজিজের কথায় ফীলডিং আহত হয় নি। তবে স্তম্ভিত হয়েছিল। কিন্তু এ তফাত সে বোঝাবে কি করে? স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে দুজন পুরুষ মানুষের মনোভাব যতক্ষণ না একই রকম হচ্ছে, ততক্ষণ একজন সম্বন্ধে অন্যজনের আক্রোশ অসহিষ্ণুতা থাকবেই। তাই ফীলডিং যখন য়্যাডেলা সম্বন্ধে তার মনোভাব গুছিয়ে বলতে গেল, তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে আজিজ বলল, 'থাক ফীলডিং। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি। এখন মনে হচ্ছে এর জন্যে দায়ী মহম্মদ লতিফ। তাকে উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে।'

'কেন? গুজব ছড়াবার জন্যে? বেঁচে থাকতে হলে অপযশের কলুষ গায়ে লাগবেই। তাছাড়া গুজব কখনও পুরোপুরি সত্য হয় না। তাই টিকেও থাকে না। দেখলে না মিসেস মুরের সমাধি নিয়ে কত কি রটনা হলো! কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে থাকল কি?'

আজিজ যেন কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারছিল না' বলল, 'তবুও লতিফকে শাস্তি পেতেই হবে। ও এখন চক্রান্তকারীদের দলে ভিড়েছে। ওকে আমি চন্দ্রপুর থেকে তাড়াবই।'

তাকে আশ্বস্ত করতে ফীলডিং বলল, 'ঠিক আছে ওর ব্যাপারটা আমরা ডিনারের সময় আলোচনা করব'খন।'

কিন্তু ডিনারের কথায় আজিজের মনে পড়ে গেল যে দাসের সঙ্গে ডিনার খেতে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। কিন্ত ফীলডিং শুনল না। জোর দিয়ে বলল, 'ওসব শুনছি না। আজ তোমায় আমার সঙ্গে ডিনার খেতেই হবে।'

ইতিমধ্যে ওরা মিণ্টো হাসপাতালে পৌঁছে গেছে। টমটম থেকে নেবে আজিজ হাসপাতালের ভেতরে চলে গেল। ফীলডিং ময়দানের দিকে গেল। ডাকঘরের কাছে এসে কালেক্টর মিস্টার টার্টন্‌কে দেখতে পেল সে। ওদের গাড়ি দুটো পাশাপাশি রাখা হলো। টার্টন্‌কে দেখে ফীলডিং বলল, 'গুড মর্ণিং।'

'তাহলে আপনি ফিরে এসেছেন?' ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল টার্টন্‌। ফীলডিং চুপ। টার্টন্‌ ফের বলল, 'আজ সন্ধ্যে নাগাদ যদি ক্লাবের দিকে আসেন তো বাধিত হব।'

ফীলডিং মনে মনে প্রমাদ গনল। সে বুঝতে পেরেছে মনে মনে কালেক্টর সাহেব রীতিমত ক্ষুব্ধ। তাই যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'স্যার! আমি তো রাজি হয়ে চিঠি দিয়েছি! আর কি আমার যাবার দরকার আছে? যদি মার্জনা করেন তো ভাল হয়। আজ সন্ধ্যেতে একজনের সঙ্গে ডিনারের নেমন্তন্ন আছে।'

আপনার ভাল-মন্দের ব্যাপার এটা নয় মিস্টার ফীলডিং। স্যর গিলবার্ট চান যে আপনি আজ ক্লাবে আসুন। সুতরাং এটা আদেশ বলেই ভাবতে পারেন। আজ সন্ধ্যে ছ'টার সময় ক্লাবে আসুন। তারপর যেখানে খুশি যান কেউ বাধা দেবে না।' বেশ কর্তৃত্বের সঙ্গেই কথাগুলো বলে টারটন্ চলে গেল।

অগত্যা ঠিক সময়েই ক্লাবে পেঁছতে হল ফীলডিংকে। ছোট্ট সাদামাটা অনুষ্ঠান। কিন্তু ভীষণভাবে সরকারী। এইরকম নিষ্প্রাণ একটা অনুষ্ঠানে আসার অভিজ্ঞতা ফীলডিংএর আগে হয় নি। আতিথেয়তার অভাব নেই। অভাব ছিল না পানীয়ের। কিন্তু সারা অনুষ্ঠানটাই যেন মেদ মজ্জাহীন একটা কংকাল। মহিলাদের মধ্যে হাজির ছিল শুধু মিসেস ব্যাকিস্টন্। মিনিট পাঁচেক তার সঙ্গে কথা বলল ফীলডিং। কথা বলল ম্যাকব্রাইডের সঙ্গেও। লোকটা দুকান কাটা হয়ে গেছে যেন। নির্লজ্জের মতন বড়াই করে নতুন প্রণয়ের কথা বলছিল। তার ধারণা পাপ করতে হলে সাহেবদের মতন নির্ভীকভাবে পাপ করাই উচিত। আলাপ হল নতুন সিভিল সার্জন মেজর্ রবার্টস আর ছোকরা সিটি ম্যাজিস্ট্রেট মীলনারের সঙ্গে। কিন্তু এত বদল সত্ত্বেও ফীলডিংএর মনে হল যেন কিছুই বদলায় নি। সেই পুরনো শাসক কাঠামোই থেকে গেছে। তাই মসজিদের পাশ দিয়ে ফিরে আসার সময় তার কেবলই মনে হতে লাগল সমস্ত ব্যাপারটাই যেন বালির ওপর ইমারত বানানোর মতন হাস্যকর। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই প্রাচীনকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। আধুনিকতার জোয়ার এলে সে ধাক্কা সামলাতে পারবে না এই ইমারত। ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়বে। আঠারো শতকের সেই নিষ্ঠুরতা আর অবিচারকে যেন অবিকল এই শতাব্দীতেও প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন হচ্ছে। সে যুগে অবিচারের তাণ্ডবে সভ্যতার যে সংকট তৈরি হয়েছিল তাকে রুখেছিল এক অদৃশ্য শক্তি। সেই শক্তি এখন কোথায়? এখন শুধু অন্ধ অনুকরণ। শুধু প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনির চিন্তায় মন যে কখন নিবিষ্ট হয়ে গেছে জানতে পারে নি ফীলডিং। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির ঐকতান। সেই বিশ্বতানের সঙ্গে ফীলডিং তার জীবন মেলাতে পারে নি। মেলাতে পারে নি এই মসজিদটাও। যদি তা পারত তাহলে এই মসজিদ হয়ে উঠত ভক্তের বৈঠকখানা। কত শোকাতাপা মানুষের প্রাণ জুড়িয়ে যেত এখানে এসে। 'ঈশ্বর ছাড়া গতি নেই' এই পরমার্থ ভাবটি মানুষকে পার্থিব গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে তুলে নিয়ে যেতে পারে না। এটা যেন শুধুই কথার কথা। কোন পরম সত্যের উপলব্ধি এ থেকে হয় না।

আজিজকে ভীষণ ক্লান্ত আর হতাশ দেখাচ্ছিল। ফীলডিং মনে মনে ঠিক করল যে ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে আর কথা তুলবে না। ক্লাবে যাওয়ার কারণটা খোলাখুলিই বলল ফীলডিং। এ কথাও বলল আর কোনদিনই সে ক্লাবে যাবে না। আজিজের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে ফীলডিং বলল 'বোধহয় খুব শীগগিরই আমি ইংল্যান্ড ফিরে যাচ্ছি।'

আজিজ তাকিয়েছিল। শান্তভাবে বলল, 'আমার ধারণা ছিল বোধহয় জীবনের

শেষটাই ইংল্যাণ্ডে কাটাবে।'

আর কোন কথা হলো না। ডিনারের সময়ও কেউ কথা বলল না। অত্যন্ত এলোমেলোভাবে খাওয়া শেষ করে ওরা বাগানবাড়িতে এসে বসল। ফীলডিং প্রথম কথাটা তুলল বলল, 'চাকরির সূত্রেই যাচ্ছি। খুব অল্পদিনের জন্যেই যাচ্ছি। মানে চন্দ্রপুর থেকে কিছুদিনের জন্যে সরে থাকা। এতে আমার দাম নাকি বাড়বে। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ মজাদার।'

'কিরকম কাজ হবে তোমার ? হাতে সময় পাবে ?'

'অঢেল সময় পাব আড্ডা মারার।'

'আমিও তাই আশা করছিলুম।' আজিজ বলল। তার গলার স্বর বেশ বিমর্ষ। একটু পরে সে আবার বলল, 'আমরা ববং অন্য কথা বলি।'

'কি কথা ?'

'কবিতার কথা।' ফীলডিং দেখল আজিজের চোখে জল। ফীলডিং স্তব্ধ। আজিজ বলল, 'একদিন কবিতা মানুষকে উদ্যমী সাহসী করেছে। আজ কবিরা যেন হৃতসর্বস্ব নিষ্প্রাণ। আমার দাদামশাইও কবি ছিলেন। কিন্তু মিউটিনির সময় তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এখন যদি আর একটা মিউটিনি হত আমিও হয়ত তাঁর মতন বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। কিন্তু বর্তমানের আমি লোকটা একজন চাকুরে ডাক্তার। ভীষণরকমের সংসারী মানুষটাকে এখনও তিন ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হবে। আপিস ছাড়া তার কথা বলার আর কোন বিষয় নেই।'

ফীলডিং সকৌতুকে চেয়েছিল আজিজের দিকে। বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ যে কবিতা জীবনধর্মী হওয়া চাই। কিন্তু তোমাদের এই বিলাপ সাজে না আজিজ। তোমরা কবিরা মানে ভারতবর্ষের কবিরা বাস্তব সত্য মানতে চাও না। কি নিয়ে কবিতা লিখবে সেটাই তোমরা স্থির করতে পার না। সেটাই সবচেয়ে দুঃখের। জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের ওপব কোন কবিতা লেখার যোগ্যতা তোমাদের নেই কারণ তোমরা কেউ তোমাদের জন্মভূমিকে ভালবাস না। তোমরা সবাই ভাবছ যে দেশটা বোধহয় তোমার নয় অন্য কারোর।'

আজিজ উৎসাহ বোধ করল ফীলডিং এর কথায়। ফীলডিং ফের বলল, 'তোমার সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হলো, মনে আছে, তুমি বলেছিলে যে কঠিন বাস্তব থেকে পালাবার জন্যেই তুমি কবিতার আশ্রয়ে থাকতে চাও। সেই ভুল স্বর্গেই বাস করতে চাও।'

'তখন নেহাৎই কাঁচা ছিলাম তাই সবাইকেই প্রাণের দোসর মনে হত। ফাসীরা যেমন ঈশ্বরকে সখা মনে করে আমিও তেমনটি ভাবতাম। কিন্তু আমি তো অধ্যাত্মবাদী কবি হতে চাই না।'

'কিন্তু আমি জানতাম তুমি তাই-ই।" বলল ফীলডিং।

ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়েও তুমি একথা বলছ ?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল আজিজ।

'শোন আজিজ। ধর্মের এমন একটা কিছু আছে যা হয়ত সত্য নয়। কিন্তু তেমনভাবে সেটা বলা হয় নি।'

'খুলে বল।'
'বোধহয় হিন্দুরা সেটা খুঁজে পেয়েছে।'
'তাহলে তারাই বলুক।'
'তারা অক্ষম।'
'সিরিল! তোমার এই বিজ্ঞ কথাবার্তা শুনতে বেশ লাগছে। অন্তত এখনকার কাব্য আলোচনার বদলে। কিন্তু এসব কথা থাক। এখন বল ইংল্যান্ডে ফিরে কি করবে।'
হেসে বলল ফীলডিং। বলল, 'সেকি? এর মধ্যেই কাব্যালোচনা শেষ? দুদণ্ডও তো হয় নি!'
কিন্তু আজিজ তখন গভীরভাবে মৃতা স্ত্রীর কথা ভাবছিল। স্মৃতি যখন তীব্র হয় তখন অতীত যেন সামনে এসে দাঁড়ায়। তার মনে হলো দুজনে হাত ধরাধরি করে এক নির্জন বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপাপবিদ্ধ এই বনভূমি যেন কোন বিজাতীয় পদস্পার্শে কলুষিত হয় নি। হঠাৎ সে বলল, 'মিস কোয়েস্টেডের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করবে?'
'যদি সময় পাই।' আরও বলল, 'হ্যাম্পস্টীডে দেখা হওয়াটা আশ্চর্যের হবে।'
'হ্যাম্পস্টীড কি?'
'লণ্ডনের ছোট্ট শহরতলী। ছবির মতন সুন্দর। কল্পনার রাজ্যও বলতে পার।' বলল ফীলডিং।
'ওই সুন্দর পরিবেশে মিস কোয়েস্টেড থাকবেন? ওঁকে দেখে নিশ্চয়ই তুমি খুশি হবে?'
ফীলডিং মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল। বলল. 'আজিজ আজ সন্ধ্যে থেকে আমার ভীষণ মাথা ধরেছে। মনে হচ্ছে কলেরা হবে। যদি বল, একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই।'
'গাড়িটা লাগবে?'
'কিচ্ছু দরকার নেই। সাইকেলেই যাব।'
'কিন্তু তোমার তো সাইকেল নেই? তাছাড়া আমার গাড়ি চড়ে যখন আসতে পারলে তখন সেটা নিতে আপত্তি করছ কেন?'
'তার মানে রামচাঁদরা দেখুক যে তোমার গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেখুক, তুমি কত উদার।' ফীলডিং যেন ঠিকমতন সহজ হতে পারছিল না। এটা ওটা নানা বিষয় নিয়ে খানিকক্ষণ কথা বলল ওরা। কিন্তু কোন কিছুতেই যেন ঠিক মানিয়ে নিতে পারল না। শেষমেশ ফীলডিং বলেই ফেলল। আজিজের দিকে গভীরভাবে চেয়ে বলল. 'আজিজ, তখন অর্বাচীনের মতন তোমায় যা-তা বলেছিলুম। মার্জনা কর আমায়।'
'কখন বল তো? যখন আমায় জঘন্য বললে?'
'হ্যাঁ। খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে বলে ফেলেছি। কিন্তু তুমি জান যা বলেছি তা আমার মনের কথা নয়।'
'নিশ্চয়ই জানি। এও জানি যে এরকম ভুল আমরা সবাই করে ফেলি। তবে

তাতে বন্ধুত্বের অমর্যাদা হয় না। আমি কিছুই মনে করি নি ভাই।' আজিজের কথায় অনেকখানি আশ্বস্ত হলো ফীলডিং। নইলে যাবার বেলায় মনটা ভার হয়ে থাকত।

আজিজ ভারমুক্ত হতে পারত। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক দেহমন যেন বেদনাবোধে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। চাপা যন্ত্রণাটা যেন ওপরে উঠে আসতে চাইছে। বাংলোয় পৌঁছেও সেই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল না। সহিসটাকে উদারভাবে বকশিস দিল। কিন্তু দাক্ষিণ্য বিতরণ করেও মনের গ্লানি যেন কাটছিল না। গুম হয়ে বিছানার ওপর বসে এদিক ওদিক দেখছিল সে। আলমারির মাথায় দলা পাকান মাছিরা চাক বেঁধেছে, মেঝের ওপর পাতা সতরঞ্চির গায়ে পানের ছোপ। টেবিলের টানা তছনছ করে গেছে পুলিশ। দেখতে দেখতে তার মনে হলো চন্দ্রপুরের সবকিছু জীর্ণ হয়ে গেছে। আকাশ বাতাস সবকিছু দূষিত হয়ে গেছে। এতক্ষণে তার মনের চাপা যন্ত্রণাটা প্রকাশ হয়েছে। সে বুঝতে পারল যে ঈর্ষাবিষে তার মন জরজর হয়ে গেছে। ফীলডিংকে সে সন্দেহ করছে। কে জানে হয়ত য়্যাডেলাকে বিয়ে করতেই সে ইংল্যান্ড যাচ্ছে! মেয়েটার আজ অনেক টাকা। কিন্তু টাকার ওপর এত লোভ ফীলডিংএর ? ছি !

'হুজুর !' হাসানের ডাকে আজিজের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। লোকটা যেন তার নিবিষ্ট ভাবনার অন্তরঙ্গ জগতে অলক্ষ্যে ঢুকে পড়েছে। বিতৃষ্ণার সঙ্গে আজিজ তাকাল। তারপর আলমারির মাথার দিকে ইঙ্গিত করল। বলল, 'ওপর দিকে চেয়ে দ্যাখ্! ওগুলো তাড়াস নি কেন ?'

'তাড়িয়েছিলুম হুজুর। আবার ফিরে এসেছে।'

'সব খারাপ জিনিসই বার বার ফিরে আসে।'

'হুজুর !' আজিজ তাকিয়েছিল। হাসান অন্য কথা বলল। বলল, 'রসুই ঘরের ছেলেটা একটা সাপ মেরে দুটুকরো করে রেখেছে। ছিল একটা, এখন দুটো সাপ হয়ে গেল।'

আজিজ অন্যমনস্ক ছিল। বলল 'ছেলেটা তো প্রায়ই কাঁচের প্লেট ভাঙে। সেগুলো কি দুটো হয়ে যায় ?'

হাসান চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'হুজুর ! নতুন গেলাস লাগবে। আর একটা টী-পট।' একটু থেমে হাসান ফের বলল, 'আমায় একটা কোট দেবেন হুজুর ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আজিজ। সবাই নিজের কথা ভাবছে। একজন চাইছে কোট। আর একজন চাইছে বড়লোক বউ। লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইছে সবাই। তাই চালাকি করে বাঁকা পথ ধরেছে। চতুরতার সঙ্গে মেয়েটার বিশ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিল ফীলডিং। এবার সে টাকাটা নিজে ভোগ করতে চায়। বিয়ে হলেই ব্যাপারটা দিনের আলোর মতন স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নিজের মনের সন্দেহটা ঠিকমতন বিশ্বাস করতে পারছিল না আজিজ। তাই মানসিক কষ্ট পাচ্ছিল। যদি তা পারত তাহলে মনের ধোঁয়া কেটে যেত। মনের মধ্যে বিশ্বাস আর অবিশ্বাস পাশাপাশিই থাকে। কারণ তাদের উৎসমূল আলাদা এবং

কখনও তারা মিশে যায় না। সে জানে ঈর্ষাভাব এদেশে দুষ্ট ক্ষতের মতন ক্রমবর্ধমান। ক্রমেই তা বাড়তে থাকে। একধরনের মনের অসুখ এই ভাবটা। ওই অসুখ যখন হয় তখন মানুষ সম্বন্ধে বিশ্বাস অবিশ্বাস একই সঙ্গে বেড়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে এই বিচিত্র মনের ভাবটা একেবারে অলৌকিক। কল্পনাও করতে পারবে না তারা। যেমন এদেশের মানুষ তাদের মনের ছলা-কলার কথা কল্পনা করতে পারে না। এই ঈর্ষারোগেই আক্রান্ত হয়েছে আজিজ। ইতিমধ্যেই মনের মধ্যে মিথ্যে আর কূটিল সন্দেহ দিয়ে প্রাসাদ বানানো শুরু হয়ে গেছে। মহম্মদ লতিফ যা রটনা করেছে তা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। য়্যাডেলাকে ভোগ করবে বলেই ফীলডিং তাকে কলেজে রেখেছিল। কিন্তু শুধু কি তাই? মাড়াবার গুহার মধ্যে সেদিন সিরিল ঢোকে নি তো? না। তা অসম্ভব। সিরিল কাউয়া দোল অব্দি যায় নি। তাহলে? কলুষের কালিমায় কালো হয়ে গেছে আজিজের মন। কিছুতেই যেন মুক্তি পাচ্ছিল না সে। কেবলই তার মনে হতে লাগল এ বিশ্বাসঘাতকতা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। ইতিহাসে এর কোন নজির নেই। এমনকি শিবাজীর হাতে আফজল খাঁর হত্যাও এর কাছে ম্লান হয়ে গেছে। সত্যের হঠাৎ প্রকাশে মানুষের অন্তরাত্মা যেমন কেঁপে ওঠে তেমনি কেঁপে উঠল আজিজ। যেন যথার্থ সত্য আবিষ্কার করেছে সে।

পরদিনই আজিজ ঠিক করল যে ফীলডিংএর ফেরার দিন সে এখানে থাকবে না। মামলা চলার সময় ছেলেমেয়েদের সে চন্দ্রপুরে নিয়ে এসেছিল। ওরা এখন হামিদ্‌উল্লার বাড়িতে থাকে। সে ঠিক করল সবাইকে নিয়ে মুসৌরী পাহাড়ে বেড়াতে যাবে। সিদ্ধান্তটা নেবার পর মনটা অনেকখানি হালকা হয়ে গেল। সন্দেহটা আদৌ সত্য কি না ঘটনাই প্রমাণ করবে। সুতরাং যা অবাঞ্ছিত সেখান থেকে দূরে সরে থাকাই মঙ্গল।

ফীলডিংও সন্দেহ করল যে একটা অবাঞ্ছিত কিছু ঘটতে চলেছে। তবে আজিজের ব্যাপারে তার মনে কোন কপটতা ছিল না বলে সন্দেহটাকে সে তেমন আমল দিল না। কাউকে যখন যথার্থ ভালবাসা যায় তখন মনের ভার আপনা থেকেই লঘু হয়ে যায়। আজিজকেও যথার্থ ভালবাসত ফীলডিং। তাই জটিলতামুক্ত হতে আজিজকে সে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখল। ফীলডিং লিখল, 'আমার সম্বন্ধে তুমি কি ভাব জানি না। তবে মেয়েদের ব্যাপারে আমার কোনরকম কপট সাধুতা নেই। বরং আমি চাই যে আমার সম্বন্ধে তুমি অন্যরকম কিছু ভাব। আমি যে নির্দোষ নারীসঙ্গহীন জীবন যাপন করছি তার কারণ আমার বয়স। আমি চল্লিশ অতিক্রান্ত। মেয়েদের সঙ্গে প্রগল্‌ভ জীবন যাপনের বয়স এটা নয়। এ বয়সে মানুষ নিজেকে বদলাতে শুরু করে। আমিও নিজেকে ভেঙে ভেঙে গড়ছি। আশীতে আর একবার বদলাব। তারপর নব্বুইতে পৌঁছবার আগেই নিজেকে পুরোপুরি বদলে ফেলব। দয়া করে এটুকু মনে রেখ অকারণ নীতিবাগীশ আমি নই।' মুসৌরীতে বসেই আজিজ চিঠিটা পেল বটে কিন্তু তেমন অভিভূত হল না। চিঠিটা তার নীতিবোধ আহত করেছে। জীবন তার কাছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের হ্যাণ্ডবুক

নয়। জীবন কখনও চুলচেরা নিখুঁত হয় না। বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যেই জীবনের তত্ত্ব নিহিত থাকে। তাই ফীলডিংএর নির্লজ্জ চিঠিটা তাকে বেশ আহত করল। নিতান্ত নিয়ম রক্ষার জন্যেই নিষ্প্রাণ একটা উত্তর দিল। আজিজ লিখল, 'আমি দুঃখিত যে তোমার যাবার দিন আমি থাকতে পারছি না। ব্যয়বহুল কাশ্মীরে অবসর কাটানোর সুযোগ আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। তাই এই ছোট্ট শৈলশহরে যে ক'টা দিন সম্ভব কাটিয়ে যেতে চাই।' সব শেষে লিখল, 'ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আর বোধহয় আমায় তুমি দেখতে পাবে না। নতুন চাকরি নিয়ে আমি তখন অনেক দূরে চলে গেছি।'
শেষমেশ ফীলডিং চলেই গেল। তার শুভানুধ্যায়ীরা উৎসাহের সঙ্গেই তাকে বিদায় জানাল। তারা যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। অধ্যক্ষ হিসেবে যত খাতির সম্মানই তারা করুক না কেন বিদেশী ফীলডিং তাদের ঘরের খবর জানুক এ তারা চায় নি। যেটুকু সে জেনেছিল সেটুকুও অনেকের মনঃপূত হয় নি। তাই সে চলে যেতেই বিরুদ্ধ প্রচার শুরু হয়ে গেল শহরে। মহম্মদ আলি বলে বেড়াতে লাগল যে ষড়যন্ত্র ধোঁয়াচ্ছে। হামিদ্উল্লা বলল যে মানুষটার ব্যবহার যত স্বচ্ছন্দই হোক না কেন সে আর আগের মতন সরল ভাবে মিশত না। আজিজকে সাবধান করে দিয়ে বলল সে যেন ওদের দুজনের কাছ থেকে বেশি কিছু আশা না করে। কারণ তারা বিজাতি। আজিজ কিন্তু কুড়ি হাজার টাকার শোক ভুলতে পারছিল না কিছুতেই। টাকা-পয়সার ব্যাপারে তার তেমন স্পৃহা না থাকলেও হাত খুলে সে দানধ্যান করতে পারত। ইচ্ছামত বকেয়া দেনা শোধ করতে পারত। কিন্তু তা হলো না। হাতছাড়া হয়ে গেল এতগুলো টাকা। সাগর পেরিয়ে বিদেশে চলে গেল তার ন্যায্য পাওনা। এমনি করেই ভারতবর্ষের অনেক ঐশ্বর্য হাতছাড়া হয়ে বিদেশে চালান হয়েছিল। সিরিল যে য়্যাডেলা কোয়েস্টেডকে বিয়ে করতেই ইংল্যান্ড গেছে সে বিষয়ে আজিজের কোন সন্দেহ ছিল না। মাড়াবার রহস্যের যে অংশটুকুর কিনারা হয় নি সেগুলোই তার এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করছে। সেদিনের সেই অর্থহীন বীভৎস পিকনিকের এটাই স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু এমনও হতে পারে যে বিয়ে তাদের হয়ে গেছে এবং ঘটনাটা তারা গোপন করেছে? অনতিবিলম্বেই এই নতুন ভাবনায় আবিষ্ট হয়ে গেল আজিজ।

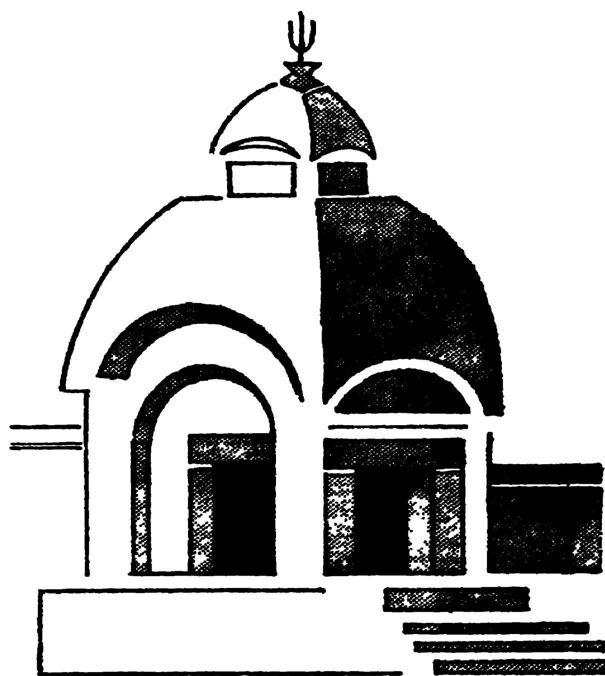
৩২

ফীলডিংকে মুগ্ধ করল মিশর দেশ—যেন একখানি সবুজ কার্পেট সারা দেশটা জুড়ে পাতা। কয়েকদিনের জন্যে তাকে আসতে হয়েছে এখানে। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে নেবেই তার ভাললাগা শুরু হলো। ঝকঝকে নীল আকাশ, দামাল বাতাস আর পরিচ্ছন্ন সমুদ্রতীর যেন এলোমেলো করে দিল

ফীলডিংএর মন। এই বন্ধনহীন দুর্বার পরিবেশের তুলনায় বোম্বাই বন্দর শহরের পরিবেশ কত জটিল। সেখান থেকে ক্রীট এবং পরে ভেনিস। ইতালির খোলা চকবাজারে দাঁড়িয়ে ফীলডিংএর মনে হলো সে যেন পাত্রভরে প্রকৃতির রূপসুধা পান করছে। ক্রীটের উর্ধ্বশির শৈলমালা আর মিশরের পরিব্যাপ্ত সমভূমির মতন ভেনিসের অট্টালিকাও যেন যথাযথ স্থাপিত আছে মনে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সব কিছুই অগোছাল। যেখানে যেটি থাকা উচিত সেখানে তা নেই। ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মন্দির মসজিদ দেবালয়। কিন্তু কোথাও তার শিল্প গঠনে সৌন্দর্য নেই। অথচ ইতালির চার্চের শিল্পময়তা যেন অবিস্মরণীয়। সমুদ্রোত্থিত জর্জীয়ার মর্মর মূর্তির অবস্থান বিস্ময়কর। গ্র্যান্ড ক্যানালের মুখে তার অভিবাদনরত ভঙ্গি যেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে। ছাত্রাবস্থায় যখন সে এসেছিল তখন মার্বেল এবং মোজেকের কারুকর্মে সে মুগ্ধ হয়েছিল। এখন তাকে যা আকৃষ্ট করল তা আরও মহার্ঘ্য। মানুষ ও প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে যেন ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে—সব বিহ্বলতা অতিক্রম করে সভ্যতা যেন কালজয়ী হয়েছে। রক্ত-মাংসের অস্তিত্ব নিয়ে আত্মা যেন নিত্যকালব্যাপী অমরত্ব অর্জন করেছে। পোস্টকার্ডের ছবি দেখে এই প্রাণময়তার স্পর্শ পাওয়া যায় না। ওরা মুগ্ধ হবে ভেনিসের বিলাসবহুল অঙ্গসজ্জা দেখে। কিন্তু এ তো বহিরঙ্গের রূপ। কোথায় সেই অন্তরঙ্গ ঐক্যের রূপ যা পূর্ব ও পশ্চিমকে একসূত্রে আবদ্ধ করেছে ? পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনসেতু এই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। এ যেন মানবাদর্শের প্রতীক। যাত্রীরা যখন বস্ফোরাস প্রণালী বা হারকিউলিস স্তম্ভের পাশ দিয়ে নির্গমন করে, তখন এক অস্বাভাবিক অঞ্চলে তারা প্রবেশ করে। ফীলডিংএরও সেই অনুভূতি হলো। ট্রেনে চড়ে যখন সে আরও উত্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন পিছন পানে তাকাল সে। জুন মাসের হলুদ সোনা ফুলের সমাহার দেখে মুগ্ধ মন আবার যেন রোমান্টিক কল্পনা জগতের মধ্যে নতুন করে বেঁচে উঠল।

মন্দির

তৃতীয় অধ্যায়



৩৩

দুবছর পরের ঘটনা। মাড়াবার শৈলশ্রেণী থেকে কয়েক শ' মাইল পশ্চিমে পরবর্তী ঘটনার উন্মোচন হলো। ছোট্ট হিন্দু সামন্ত রাজ্য 'মউ'। রাজ-প্রাসাদ আজ উৎসবমুখর। মধ্যরাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হবেন। মউ রাজপরিবারের গৃহদেবতা তিনি। প্রতিবছর এই দিনটিতে তাঁর অভিষেক হয়। মউ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী নারায়ণ গড়বোলে তন্গত চিত্তে এই পরম করুণাঘন মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর আবির্ভাব মুহূর্তটি এখন আসে নি। তাই ধর্মনিষ্ঠ গড়বোলে সাগ্রহে অপেক্ষারত। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কয়েক শতাব্দী আগেই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি জন্মাবেন না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি নিয়ন্তা, তিনি নিত্য। তিনিই সর্ব-কালব্যাপী। তিনি সর্বত্র আর সর্বক্ষণই সত্য হয়ে বিরাজ করছেন, তাঁর আদি নেই, অবসানও নেই। তিনি শুধু পুনরাগমন করেন। কার্পেটের একধারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ অন্যধারে ভক্তিগদগদচিত্তে নারায়ণ গড়বোলে।

লম্বা ঢাকা বারান্দা জুড়ে সরু গালিচা পাতা। ঢাকা বারান্দা পেরিয়ে প্রাসাদের অলিন্দ, তারপর অঙ্গন। অঙ্গনের দুধারে কারুকার্য করা থাম। থামের গায়ে মসৃণ পঙ্খের কাজ। বারান্দা থেকে থামগুলি পুরোপুরি দেখা যায় না। ঘষা কাঁচের ঝাড়বাতি, আলম্বিত রঙিন ঝালর আর ফ্রেমে বাঁধান রাজপরিবারের গতায়ু পূর্বপুরুষদের ছবির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে সুদৃশ্য খিলানগুলো। অলিন্দের শেষ প্রান্তে গৃহদেবতার সিংহাসন। সিংহাসনে আসীন গৃহদেবতার মূর্তি। রুপার তৈরি মূর্তির আকার চায়ের চামচের মতন। গালিচার দুপাশে ভক্তদের আসন। ভক্তজনেরা সবাই হিন্দু। স্বভাবনম্র মানুষগুলো সবাই গ্রামবাসী। গ্রামের চেনা পরিমণ্ডলের বাইরের কোন খবরই তারা রাখে না। পেশায় এরা কৃষিজীবী। যথার্থ ভারতবর্ষ নাকি এরাই। ভক্তদের মধ্যে আছে কিছু বিপণনজীবী, রাজকর্মচারী এবং রাজ-পরিবারের বংশধর। কিছু অর্বাচীন বালকও ভিড় করে বসে আছে। অগো-ছালো ভাবে তারা বসেছে গালিচার দ্বিতীয় সারিতে। ভক্তজনের এই সমাবেশ বাইরে থেকে শান্ত দেখালেও মনে মনে একটা চাপা উত্তেজনায় সবাই অশান্ত। উদ্গ্রীব হয়ে সবাই অপেক্ষারত। তখন আসবে সেই পরমক্ষণ যখন ভগবান জন্মাবেন তাদের সকলের চোখের সামনে। একসময় বেষ্টনী ভেঙে ভক্তেরা এগিয়ে গেল সেই আনন্দস্বরূপকে দেখতে। নয়ন সার্থক করে তারা দেখল সেই ছোট্ট মূর্তি। অপার্থিব প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে গেল তাদের শীর্ণ মুখ-

গুলো। এ কোন ঐহিক সুখ নয়। যতক্ষণ তিনি অধিষ্ঠিত আছেন ততক্ষণ ব্যক্তিসুখের কোন অনুভব থাকবে না। যখন তিনি অবসৃত হবেন তখনই ফিরে আসবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। প্রাসাদের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য সুরমূর্ছনা। অনেক পার্থিব সুরের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে এই অপার্থিব নির্জন সুর। এই সুর অবাধ, মুক্ত। কোন বাধানিচয় দ্বারা এ সুর দমিত হয় না। অবশেষে শৃঙ্খলমুক্ত এই সুর আকাশের মেঘগর্জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে গগনে গগনে ছড়িয়ে পড়ল। মেঘ গর্জনের সঙ্গে সে রাতটা প্রায় সবক্ষণই থেমে থেমে বৃষ্টি পড়ছিল।

সমবেত নামগান একসময় থামল। কিন্তু রেশটুকু হারিয়ে যাবার আগেই স্বয়ং নারায়ণ গড়বোলে গানের ধুয়া তুললেন। এই সামন্ত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তিনি। স্বয়ং রাজামশাই তাঁকে এই অধিকারটুকু দিয়েছেন। উচ্চকণ্ঠে নামগান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছিলেন গড়বোলে। তার পরনে ধপধপে সাদা কুর্তা। খালি পা আর মাথায় ফিকে নীল রঙের উষ্ণীষ। চোখে সোনার ফ্রেম বাঁধান বাহারি চশমা। গলার দুপাশ দিয়ে ঝুলছে জুঁই ফুলের মোটা মালা। তাঁর সঙ্গে আরও ছ'জন ধুয়াদার। ঝমঝম শব্দে বেজে উঠল ঝাঁপ আর করতাল। একজন ঘা মারল খোলে। আর একজন হারমনিয়মে পোঁ ধরল। শুরু হয়ে গেল নাম সঙ্কীর্তন।

তুকারাম তুকারাম
তুমি পিতা তুমি মাতা
তুমি মোর সর্বস্ব...
তুকারাম তুকারাম...'

তুকারাম সাধক। তাঁর নামেই এই নামকীর্তন। স্বয়ং ভগবানের নামে কেন নাম সঙ্কীর্তন হচ্ছে না? যিনি স্বয়ং অধিপতি রাজার রাজা, যিনি নিত্য, তিনি কেন তুচ্ছ? তাঁর অভিষেক উৎসবে তিনি কেন অলক্ষ্য? মন্দিরের মূল দেবতা ফুলের চাপে ঢাকা পড়ে আছেন। তুচ্ছ হয়ে গেছেন অন্য বিগ্রহের ভিড়ে। রাজপরিবারের পূর্বপুরুষদের তৈলচিত্রগুলি বিগ্রহের সামনে বিসদৃশভাবে ঝুলছে। চোখ ধাঁধানো সোনার জলে লেখা ফলকগুলো নিষ্প্রভ করে দিয়েছে মূল বিগ্রহকে। বাতাসে আন্দোলিত নবপত্রের শুকনো পত্রগুচ্ছের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলেছেন তিনি। আজকের এই উৎসবে কয়েক শ' বিজলী বাতি জ্বলছে। ডায়নামো চালিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে। যন্ত্রের ঘড়ঘড় শব্দে স্তোত্রগানের ছন্দ ভেঙেচুরে যাচ্ছে। মন্দির অঙ্গন ঝলমল করছে আলোর রোশনাইতে। কিন্তু এত আলো সত্ত্বেও শ্রীভগবানের মুখখানি অন্ধকারাচ্ছন্ন। লিপিস্তোত্রগুলি এমনভাবে লেখা যে পড়া যাচ্ছে না। একটি লিপি লেখা হয়েছে ইংরিজিতে। (সম্ভবত হিন্দু ভগবানের বিশ্বজনীন মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই লিপিটি বিদেশী ভাষায় লেখা) কিন্তু অনবধানতাবশত অশুদ্ধভাবে লিপিটি লিখিত। গড্ ইজ লাভএর বদলে লেখা হয়েছে গড্ সি লাভ (God Si Love)। এটাই কি ভারতের শাশ্বত বাণী?

খোল করতাল সহযোগে সমবেত নামগান চলছে। তুকারাম। তুকারাম। চিকের আড়ালে বসে আছে পর্দানশীন জেনানারা। হঠাৎ সেখান থেকে নামগান ছাপিয়ে বামা কণ্ঠের তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ক্রুদ্ধা দুই নারী ঘোমটা সরিয়ে ঝাঁঝাল কলহে মেতে উঠেছে। দুজনেই তাদের শিশুদের সামনের সারিতে বসাতে চায়। একটা বাচ্চা মেয়ের বান মাছের মতন সরু লিকলিকে পা প্রতিপক্ষের দিকে বিদ্যুৎ বেগে ধাবিত হলো। বিলিতি বাদ্যকারেরা বৃষ্টির মধ্যে তারস্বরে নাইট্স্ অব গ্ল্যাড্‌নেসের সুর বাজিয়ে চলেছে। স্খলিত পায়ে তারা চক্রাকারে ঘুরছে আর নাচছে। পালাগায়করা এই দামামা নির্ঘোষে একটুও কুণ্ঠিত নয়। সব কোলাহল ছাপিয়ে উঠেছে তাদের বেসুরো নামগান। অনেকক্ষণ থেকেই গড়বোলের চশমার ডাঁটি ফুলের মালার মধ্যে আটকে গিয়েছিল। এটা না খোলা অব্দি তিনি নতুন গান বাছতে পারছিলেন না। তাঁর একহাতে করতাল, অন্য হাত দিয়ে অক্ষম চেষ্টা করছেন জট খুলতে। একজন ধুয়াদার ছুটে এসে জট খুলে দিল। নতুন গান বাছলেন গড়বোলে। ধ্বনিত হলো নতুন সুর। এ সুর আরও ব্যাপক উদার। অনির্বচনীয় যা, মনের গভীরে যা অসংলগ্ন তা যেন ভাবরূপ পেল এই সঙ্গীতমূর্ছনায়। নতুন ভাবের বন্যায় সবাই অভিভূত, প্লাবিত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেতন অচেতন সৃষ্টির প্রতিটি অণু পরমাণুর মধ্যে যেন প্রেমের জোয়ার লেগেছে। বিশ্ব-জুড়ে যে তান ছড়িয়ে আছে তার সঙ্গে মিলিত হলো এই নামগান। নারায়ণ গড়বোলে ভাবের ঘোরে যেন সমাধিস্থ। এই চৈতন্যহীনতার মধ্যে কখন যেন মনে পড়ে গেল সেই বৃদ্ধার কথা। যখন চন্দ্রপুরে ছিলেন তখন আলাপ হয়েছিল বৃদ্ধার সঙ্গে। বিদেশিনী বৃদ্ধা। কিন্তু কি আশ্চর্য ! আজ তাঁকেই মনে পড়ল তাঁর। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে তাঁর মুখখানাও ভেসে উঠেছে গড়বোলের মনে। অথচ কোনভাবেই তো এই বিদেশিনী বৃদ্ধাকে মনে পড়ার কথা নয়। গড়বোলের মনে হচ্ছিল সৃষ্টির কোথাও বিচ্ছেদ নেই। সবটাই অখণ্ড, পরিপূর্ণ। গড়বোলের অধ্যাত্ম অনুভূতি যেন আরও তীব্র হলো। মন পৌঁছে গেছে সেই পূর্ণলোকে যেখানে কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়। সবাইকে ভালবাসতে চাইছে মন। শুধু মানুষ নয়। পশুপাখি কীট-পতঙ্গ সবাইকে। মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগের সেই তুচ্ছ দৃশ্যটার কথা। ছোট্ট প্রাণী, বোলতা। একটা পাথরের গায়ের ওপর বসেছিল বোলতাটা। কবে বা কোথায় তা মনে পড়ল না। কল্পনাকে বিপথচালিত করার চেষ্টা করছিল তাঁর যুক্তিবাদী মন। আবার মন ফিরে এল যুক্তিবাদী জগতে। তিনি আবিষ্কার করলেন ভাবের ঘোরে লাল গালিচার উপরে তিনি এতক্ষণ নৃত্য করছিলেন। নাচতে নাচতে একবার এগিয়ে যাচ্ছেন আবার পিছিয়ে আসছেন। থরথর করে কাঁপছে তাঁর দুটি অক্ষম পা। ঝমঝম শব্দে খোল করতাল বাজছে। চতুর্দিকে কোলাহল। ধূপের গন্ধ, বাসি ফুল আর চটকান পাতার গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে ঘামের গন্ধ। শব্দ আলো গন্ধ—যেন মাখামাখি হয়ে গেছে পরিবেশে। যেন তুফান উঠেছে সেখানে। ক্রমেই তীব্র হচ্ছে কোলাহল। কোথায় যেন বাজ পড়ল। তীব্র আলোর ঝলকানি আর

সেই সঙ্গে কর্ণবধির করা বজ্রপাত। হাতঘড়ি দেখলেন গড়বোলে। রাত এগারোটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট। হঠাৎ কোলাহল উঠল দর্শকদের মধ্যে। ভিড় করে বসে থাকা ভক্তজনদের দুপাশে সরিয়ে দেওয়া হলো। জোর করে জনতা-মুক্ত করে দেওয়া হলো পায়ে চলার পথ। দেখা গেল শিবিকারোহী হয়ে মউএর বৃদ্ধ স্থবির রাজা উৎসবলগ্নে আসছেন। ডাক্তার বদ্যির নির্দেশ উপেক্ষা করেই তিনি এসেছেন। কারণ আবির্ভাবলগ্নটি যেন বয়ে না যায়। তিনি যেন বঞ্চিত না হন।

রাজামশাই এলেন কিন্তু কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা করল না। তিনিও তা আশা করেন নি। মনুষের জয়গানের সময় এটা নয়। শিবিকা থেকে বাহকদের কণ্ঠলগ্ন হয়ে তিনি ঝুলন্ত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন। শিবিকা ভূমি স্পর্শ করলে মন্দির অঙ্গন কলুষিত হবে। তাই এই ব্যবস্থা। ওরা তাঁকে বিগ্রহের সামনে বসিয়ে দিল। পা জুড়ে বসে লম্বা দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন রাজামশাই। একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে চুপ করে বসেছিলেন তিনি। এই সামান্য পথটুকু আসতেই তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। অবসাদে চোখ ফেটে জল আসার উপক্রম। কিন্তু অশ্রুপাত হলো না। তাই চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড় দেখাচ্ছিল।

রাজামশাইকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। আবির্ভাবলগ্ন আগতপ্রায়। যে দেশে কোন কিছুই সময় মেনে চলে না সে দেশে জন্মসময়ের মুহূর্তটি কাঁটা ধরে নথিভুক্ত করা হয়। জন্মলগ্নের ঠিক তিন মিনিট আগে একজন ব্রাহ্মণ এলেন। তাঁর হাতে কৃষ্ণের জন্মস্থান গোকুলের (বেথলেহেম) একটা মডেল। চৌকো একখণ্ড কাঠের বারকোশের উপর মাটির তৈরি গ্রামের প্রতিরূপটা হাতে নিয়ে ব্রাহ্মণ এলেন। মডেলটি ঝকঝকে নীলবর্ণ। একপাশে রাজা কংসের বিশাল মূর্তির মধ্যে তার নিষ্ঠুর রূপটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। তাই কৃষ্ণের জনক জননীর মূর্তি দুটি অপেক্ষাকৃত নিরীহ এবং ম্লান। রাজা কংস নিষ্ঠুর এবং পরাক্রমশালী। তাঁর নির্দেশে নিরীহ দেশ-বাসীদের হত্যা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে মডেলটি বেশ আকর্ষণীয়। সবাই তাকিয়ে আছে এই মাটির খেলনার দিকে হতবাক হয়ে। কেউ কেউ ভাবছিল শ্রীভগবান নিশ্চয়ই ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। তাই তাঁকে তারা দেখতে পাচ্ছে না। অবশেষে সেই বাঞ্ছিত মুহূর্তটি এল। তখন ঠিক মধ্যরাত। কম্বুধ্বনিতে জেগে উঠল পৃথিবী। ধূপ ধুনার গন্ধ আর ভক্তজনের উল্লসিত হর্ষধ্বনির মধ্যে সেই পরম প্রেমময়ের আবির্ভাব হলো ধরাধামে। শ্রীহরি আবির্ভূত হলেন ধর্মসংস্থাপন করতে। ধন্য হলো ধরণী তাঁর আবির্ভাবে। সবাই আনন্দাপ্লুত। পৃথিবীতে দুঃখ ক্লেশ থাকবে না, নিষ্ঠুরতা থাকবে না। সবাই ভালবাসবে সবাইকে। শুধু মানুষ নয়, শুধু ভারতীয় নয়। এই প্রেমময়তা বিশ্বজনীন। পশুপাখী কীটপতঙ্গ সবাইকে নিয়ে প্রেমের ছড়াছড়ি। সবাই হাসছে, গাইছে, আনন্দে নৃত্য করছে। কেউ আর্ত নয়, জীর্ণ স্খলিত নয়। সবাই পূর্ণ। ভক্তদের মধ্যে তখন হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। শ্রীহরির পাদ-পদ্মের উপর আছড়ে পড়তে চাইছে সবাই। ভক্তদের ভক্তির চাপে দেব বিগ্রহটির

তখন গুরুতর সঙ্কট। চিকের আড়ালেও ভক্তির জোয়ার এসেছে। হর্ষধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল মেয়েরা। একটি কিশোরী মেয়ে মায়ের হাত ছাড়িয়ে চিকের বাইরে এসে নাচছে। নাচের তালে দুলছে তার মাথার লম্বা বেণী। কিন্তু এই আনন্দোল্লাস নিছক আনুষ্ঠানিক নয়। দেহ ছাড়িয়ে এই আনন্দোল্লাস সেই দুর্জ্ঞেয়কে স্পর্শ করতে চাইছে যেন। যিনি পরম প্রেমময় তিনি কেমন? সেই অনির্বচনীয়কে জানার আকুলতা মানুষকে কাণ্ডজ্ঞানহীন করে তোলে। যুক্তি, জ্ঞান, তর্ক তুচ্ছ করে মরিয়ার মতন সে তাঁকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়। মানুষ কি তাঁকে পেয়ে ধন্য হয়? মানুষের এই আকুলতা কি সফল হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে। পরবর্তীকালের মানুষ সে কথা লিখেছে। কিন্তু যে তাঁকে পেয়েছে সে কি তা স্বরণ করতে পারে? কখনও কি তাঁকে যথার্থভাবে প্রকাশ করা যায়? অবিশ্বাসীরা বলে সবটাই ভ্রম, মিথ্যা। যারা তাঁকে পেয়েছে তারা বলে তিনি বাক্য মনের অতীত। তাঁকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যখন তারা সেই উপলব্ধির কথা বলে তখনই তা কিংবদন্তী হয়ে যায় এবং কালের নিরিখে তার বিচার হয়।

অতঃপর দেখা গেল গালিচার একধারে কাঠের ফ্রেমে একটা দোলনা রয়েছে। গড়বোলে ধীরে ধীরে দোলনার দিকে এগিয়ে গেলেন। বাহুর মধ্যে সযত্নে একটি লাল টুকটুকে বস্ত্রখণ্ড লালন করছেন তিনি। যেন এটি নবজাতক এবং শিশুজ্ঞানে সেটিকে তিনি রাজামশাইয়ের হাতে তুলে দিলেন। শিবিকায় চড়ে এই পথটুকু আসতেই রাজামশাই কাতর হয়ে পড়েছেন। তাঁর ক্লান্তি কাটে নি। অনেক কষ্টে গড়বোলের হাত থেকে তিনি বস্ত্রখণ্ডটি গ্রহণ করলেন, তারপর প্রায় অশ্রুত শব্দে বললেন, 'আমি এই শিশুর নামকরণ করলাম কৃষ্ণ।' অনুষ্ঠান শেষ। এরপর রাজামশাই নবজাতককে দোলনার মধ্যে শুইয়ে দিলেন। রাজামশাইয়ের দুচোখ দিয়ে তখন আনন্দাশ্রু বইছে। তিনি শ্রীভগবানের নবজীবনলাভ প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি ধন্য। বাহকেরা এরপর তাঁকে তুলে ধরল এবং শিবিকার মধ্যে বসিয়ে দিল। তারপর অন্য পথ দিয়ে বাহকেরা তাঁর শিবিকা নিয়ে গেল। প্রাসাদের যে অংশে রাজামশাইয়ের চিকিৎসা হয় সেটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তাঁর দুজন চিকিৎসকের মধ্যে একজন হলো ডাক্তার আজিজ। আজিজ পাশ করা ডাক্তার এবং মুসলমান। সুতরাং প্রাসাদের মধ্যে তার আসা যাওয়ার পথ আলাদা। রাজামশাইকে যেখানে আনা হলো সেখানেই অপেক্ষা করছিল আজিজ। প্রায় সংজ্ঞাহীন রাজামশাইকে সে পরীক্ষা করল। রাজামশাইয়ের হিন্দু চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ করে ব্যবস্থাপত্র লিখল। দেবস্থান থেকে তখনও আনন্দোল্লাস ভেসে আসছে।

ভেসে আসছে বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রের ঘড়ঘড় শব্দ। রাজামশাই দারুণ বিরক্ত। শব্দের কারণ জানতে চাইলেন তিনি। তখনই আজিজের নির্দেশে তাঁকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হলো।

মন্দিরের সামনের দরদালানে তখন খুশির মত্ততা শুরু হয়ে গেছে। নবজাতকের মনোরঞ্জনের জন্যে নানারকম ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছিল। বৃন্দাবনে

গোপিনীদের নিয়ে তিনি লীলা করতেন। এরাও লীলাখেলায় মেতেছে। এই রঙ্গক্রীড়ায় ননী মাখনের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাজকর্মচারীরা পাগড়ি খুলে নাচছে। তাদের মাথার তালুতে একতাল মাখন। মাখন গলে তাদের মুখে পড়ছে। তারা সবাই ভাবছিল এই নিছক আনন্দানুষ্ঠানে ভগবানও খুশি হচ্ছেন। তিনি নিজের সঙ্গেও রঙ্গব্যঙ্গ করেন। কখনও মাথার পাগড়ি খুলে আগুনে দেন, কখনও লজ্জাবস্ত্র লুকিয়ে রেখে স্নান করতে যান। হয়ত এই রঙ্গব্যঙ্গের সবটাই শোভন নয়। কিন্তু খ্রীশ্চানদের আনন্দানুষ্ঠানের মতন নিষ্প্রাণ নয়। আত্মিক মুক্তির প্রয়াসটি যাতে কঠিন না হয় তাই হয়ত এই কেলিকৌতুকের ব্যবস্থা। এরপর নতুন একটি রঙ্গক্রীড়ায় মাতল সবাই। একটা সুদৃশ্য স্বর্ণগোলক একজনের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হলো। যে সেটি পেল সে একজন শিশুকে কোলে তুলে নিল। সেই শিশুই তখন শিশুভগবানরূপে সকলের আরাধ্য হয়ে উঠল। এইভাবে একের পর এক শিশুভগবানের আরাধনা হতে লাগল। যতক্ষণ না সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ততক্ষণ অব্দি এই খেলা চলল। হাতে লাঠি নিয়ে কৃষ্ণকে সারথি করে এরপর শুরু হল কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ। অতঃপর শুরু হল আর একটি প্রমত্ত ক্রীড়া। ঘরের ছাত থেকে একটা মাটির হাঁড়ি ঝুলছে। হাঁড়ির গায়ে নানারকম নকশা। কয়েকজন লাফিয়ে উঠে হাতের ডাণ্ডা দিয়ে মাটির হাঁড়ি ভেঙে দিল। হাঁড়ি ফেটে গলগল করে বেরিয়ে এল পায়সান্ন। এ করুণাধারা পান করতে সবাই উদ্গ্রীব। ছেলের দলও জুটে গেছে। পায়সান্ন তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ঢাকা দালান, উঠান, ঘরের মেঝে থকথক করছে পায়সান্ন। শুধু মানুষ নয়, মাছিরাও জুটে গেল এই আনন্দভোজে। কোথাও হানাহানি কাড়াকাড়ি নেই। অন্নভোগ ভাগ করে খেতে হয়, তাই সবাই অন্ন বিতরণের মাহাত্ম্য অর্জন করছে। অনেকক্ষণ ধরে এই আনন্দভোজ চলল। এক মহান ভাবনায় ভরে উঠেছে ভক্তজনের মন। সবাই নিজেকে ভগবানের অংশস্বরূপ মনে করছে। তাঁর অপার মহিমায় সবাই মহিমান্বিত। তিনি নিরাকার। শুধু বিগ্রহ বা বস্ত্রখণ্ডের মধ্যেই তিনি আবদ্ধ নন। তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। লীলা করার জন্যই তিনি দেহাশ্রিত হন। তাই জন্মোৎসব এক প্রতীক মাত্র। এক বিস্ময়কর ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন নারায়ণ গড়বোলে। ধুলায় আর পয়সান্ন মাখামাখি হয়ে যখন তিনি মন্দির থেকে বেরোলেন, তখন এক অন্য মানুষ তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে অতীন্দ্রিয় কল্পলোকের ছায়া। আরও প্রত্যক্ষ হয়ে তাঁর কল্পদৃষ্টিতে ফুটে উঠেছেন মিসেস মুর। কি চান এই বিধর্মী বৃদ্ধা? এ কি শুধুই দৃষ্টির ছলনা? নিজেকে একবার ভগবান একবার ভক্তরূপে তিনি কল্পনা করলেন। যখন ভগবান তখন বৃদ্ধার মন পরম প্রেমময়ের অংশস্বরূপিণী। আবার যখন ভক্ত তখন বৃদ্ধার হয়ে ভগবানের সমীপে আকুল নিবেদন করে বলেছেন, 'ঠাকুর দেখা দাও।' এ ছাড়া কিভাবে বৃদ্ধাকে তিনি সাহায্য করতে পারেন? একজন বৃদ্ধা ইংরেজ আর ছোট্ট একটি অকিঞ্চিৎকর প্রাণী, বোলতা। পরম করুণাময়ের কৃপাপ্রার্থী এরা দুজনেই। তাঁর মনে হলো 'আমার কাছে এরা দুজনেই সমান।' তবুও নিজেকে কত তুচ্ছ মনে

হচ্ছিল তাঁর। তখন সবে ভোর হয়েছে। ভিজে ভিজে সকালটা দেখেই বোঝা যায় যে সারারাত ধরেই বৃষ্টি পড়ছিল।

৩৪

গড়বোলে যখন মন্দির ছেড়ে বেরোলেন তখন আজিজও বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেল গড়বোলের সঙ্গে। বাংলোর দিকে ফিরছিল আজিজ। আজিজের বাংলোর সঙ্গে লাগোয়া একটা ছোট্ট বাগান। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছবির মতন সুন্দর একটা নদী। বর্ষার সময় দারুণ খরস্রোতা হয়ে ওঠে নদীটা। শহরের প্রধান রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে আজিজের বাংলো। গড়বোলেকে একটু যেন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। সামনের কাদাওলা জায়গাটা লাফ দিয়ে পেরিয়ে আজিজের উদ্দেশে হাত নাড়লেন। তারপর অদ্ভুত স্বরে বললেন, 'উনি এসেছেন। খুব সম্ভব ইওরোপীয়ান গেস্ট হাউসে এসে উঠেছেন।'

'তাই নাকি? কবে এলেন?'

কিন্তু গড়বোলের উত্তর শোনা গেল না। ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। আজিজ জানে 'উনি' কে। মানুষটা ফীলডিং। আর সেইজন্যেই তার সম্বন্ধে আজিজের মনে কোন আগ্রহ নেই। তার জীবনে ফীলডিং এখন বাড়তি উপদ্রব। সে চায় না তার সঙ্গে ফীলডিংএর দেখা হোক। সে খুশি হবে যদি বর্ষায় সব ডুবে যায়। তাহলে নদী পেরিয়ে ফীলডিং তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। ফীলডিং যে সরকারী কাজে এখানে এসেছে তা সে জানে। চন্দ্রপুর থেকে বদলি নিয়ে সে এখন মধ্যভারত সফর করে বেড়াচ্ছে। সে যে বিয়ে করেছে সে খবরও তার অজানা নয়। এও জানে যে য়্যাডেলাই তার ঘরনী আর তাই সে ফীলডিংএর সঙ্গে দেখা করতে চায় না।

গড়বোলের কথা মনে হলো। বেশ মানুষটি। একটু বেশি রকমের ধর্মপ্রাণ। তবে ওঁর ধর্মজিজ্ঞাসা নিয়ে আজিজের মনে কোন কৌতূহল নেই। ফি বছর ঘটা করে কৃষ্ণের জন্মদিন পালনের উদ্দেশ্য কি তা সে বোঝে না। তবুও এই প্রায় বৃদ্ধ মানুষটাকে তার ভাল লাগে। বলতে গেলে এঁরই অনুগ্রহে আজিজ এখানে এসেছে। এই ছোট্ট সামন্ত রাজ্যের সমস্যাগুলো সম্বন্ধে তার কোন ধারণা ছিল না। চন্দ্রপুরের সঙ্গে এদের কোন মিল নেই। মউতে খ্রীশ্চান বা মুসলমান নেই বললেই হয়। তাদের ঘিরে কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যা নেই। এখানকার স্থানীয় সমস্যা ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নিয়ে। ভারতবর্ষের মাটিতে অনেক ফাটল। এত অসংখ্য দল উপদল অন্য কোন দেশে নেই। জাত-পাঁত নিয়ে হিন্দুধর্মেও অনেক সমস্যা। বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। মনে হয় হিন্দুধর্মের ভিতটা বেশ পাকাপোক্ত। কিন্তু অনেক দল উপদলের বোঝা নিয়ে হিন্দুধর্ম আড়ষ্ট হয়ে আছে। সে শুনেছে এদের আলাদা বৈশিষ্ট্য আলাদা অস্তিত্ব। কিন্তু যথার্থই যদি এটা নিয়ে কেউ

গবেষণা করে তবে যা শুনেছে তার কিছুই সে পাবে না। কিন্তু এত জটিলতার মধ্যে আজিজ যেতে চায় না। সে পরধর্মসহিষ্ণু। পরধর্ম নিয়ে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করতে সে চায় নি। তাই যেদিন সে প্রথম এল সেদিনই সাড়ম্বরে বলে দিয়েছিল, 'আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি। মানুষ রূপে শ্রদ্ধা করি। তাই এর বেশি কিছু জানবার আগ্রহ আমার নেই।' আজিজের কথাটায় খুব কাজ হয়েছিল। ওকে নিয়ে এখানকার অধিবাসীদের মনে কোনরকম সংস্কার গড়ে ওঠে নি। নইলে হিন্দু ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও রাজদরবারের প্রধান চিকিৎসক হয়ে দাঁড়াল আজিজই। অবশ্য এর দরুন তাকে কিছু কিছু চিকিৎসাপ্রকরণ বদলাতে হয়েছে। পারতপক্ষে সে অস্ত্র ব্যবহার করে না। প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার বিলিতি পদ্ধতি সে অনুসরণ করে না। ফলে অপারেশনের যন্ত্রপাতি অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। হাসপাতালটাও শীর্ণ-প্রাণ। তবুও আজিজ খুশি। কারণ এই ছোট্ট অরণ্যরাজ্যের হিন্দু অধিবাসীদের মনে সে কোন ধর্মভয় সৃষ্টি করে নি।

ইংরেজদের প্রতিপত্তির শাসানি থেকে চলে এসে আজিজ অনেক নিশ্চিন্ত। এই শাসানির ভয় তাকে অহরহ পীড়ন করত। হয়ত এই রক্তচক্ষুর শাসন সে উপেক্ষা করতে পারত যদি ফীলডিং তার সঙ্গে প্রতারণা না করত। হয়ত চন্দ্রপুরেই সে থেকে যেত এবং প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করত ইংরেজদের সঙ্গে। তার উকিল বন্ধুরাও সেই পরামর্শই তাকে দিয়েছিল। কিন্তু ফীলডিংএর বিশ্বাসঘাতকতা তাকে ভীষণভাবে দুর্বল করে দেয়। সেই যেদিন বিজয়োৎসবের মিছিল বেরোয় সেদিনই তার সূচনা হয়। ফীলডিং সেদিন মিছিলে যোগ দেয় নি। ফীলডিংএর মনোভাব আরও স্পষ্ট হলো যখন সে য়্যাডেলার পক্ষ নিয়ে তার অনুগ্রহ চাইতে এল। সর্বশেষ আঘাত এল যখন হ্যাম্প্স্টেড্ থেকে ফীলডিং চিঠি লিখে জানাল যে সে বিয়ে করেছে। ফীলডিং লিখেছিল, 'তুমি নিশ্চয়ই শুনে অবাক হবে যে আমি বিয়ে করেছি। কারণ যাকে বিয়ে করেছি তাকে তুমি চেন।' চিঠির বাকী অংশটুকু পড়ার ইচ্ছে তার হল না। পাশেই দাঁড়িয়েছিল মহম্মদ আলি। তার দিকে চিঠিটা অবহেলায় ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, 'একটা জবাব দিয়ে দেবেন আমার হয়ে।' এর পরেও ফীলডিং-এর চিঠি সে পেয়েছে। কিন্তু কোনটাই খুলে পড়ার প্রবৃত্তি তার হয় নি। বরং সেগুলো সে নষ্ট করে দিয়েছে। ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছে তার তখন শেষ হয়ে গেছে। হয়ত কখনও কখনও ফীলডিংএর জন্যে দুর্বলতা বোধ করলেও সে ভাবটুকু স্থায়ী হয় নি। কারণ সাধারণভাবে ইংরেজদের সে তখন ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। বস্তুত সেই ঘৃণাটাই আজও তার মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। কোন মেকী ঘৃণা এটা নয়। আর তাই নিজেকে ভারতীয় বলে ভাবতে আজকাল তার ভাল লাগে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আজও সে মনে মনে এই সংকল্পটাই করল।

মউতে তার দিনগুলো বেশ ভালই কাটছে। এখানকার জলবাতাস ভাল। পরিবেশও পরিচ্ছন্ন। ছেলেমেয়েরাও সারা বছর কাছে থাকতে পারছে। যেমন সে সংসার করছে, তেমনি পড়াশুনা সাহিত্যচর্চাও করছে। যখন এক-

ঘেয়ে লাগে তখন ঘোড়ায় চড়ে এদিক ওদিক ঘুরে আসে। মাঝে মাঝে রাজা বাদশাদের মতন মৃগয়ায় যায়। মোটকথা জীবনধারণ অনেক সহজ অনেক জটিলতামুক্ত করে ফেলেছে সে। আজিজের কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস এখন ভারতীয় নারী সমাজকে নিয়ে। আজিজ ইদানিং গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে মেয়েদের ঘোমটা খুলে সমাজের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তার সব কবিতার মূল বিষয়ই হলো এটা। আজকাল সে সকলের কাছে বলে বেড়ায় যে মেয়েরাও যদি পুরুষের পাশে থাকত তাহলে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ কখন জয়ী হতে পারত না। সুতরাং মেয়েদের পরদা তুলে দিতে হবে নইলে তারা স্বাধীন হবে না। সে ক্ষোভ করে বলত 'মেয়েদের আমরা বিদেশীদের সামনে বার করি না।' কিন্তু কি করে তা সম্ভব তা জানত না। সামাজিক অন্যায়াচরণের কথা সে যেমন লিখত তেমনি ফুল আর পাখির গান নিয়েও লিখতে ইচ্ছে হতো তার। ইচ্ছে হতো ইসলামের কথা বলতে। হয়ত মানুষটার মতন তার কাব্যচিন্তাগুলোও অসঙ্গত। তবুও তার কাব্যপ্রেরণার মধ্যে একটা সততা ছিল। মানুষ বাদ দিয়ে সে দেশজননীর কথা ভাবত না। শুধু একটি কবিতাতেই সে একটা বিশ্বজনীন ভাবের কথা বলেছিল। আশ্চর্য! সেই কবিতাটাই ভাল লেগেছিল বৃদ্ধ গড়বোলের। বিচিত্র এই মানুষটার ভাল লাগা। উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি তাঁর ভাললাগার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'হ্যাঁ। এরই নাম ভক্তি। আমাদের ভারতবর্ষ এই বিশ্বজনীন ভক্তির মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করবে। আপনার এই কবিতাটা আমি হিন্দিতে অনুবাদ করব। আরও প্রচার হবে এই ভাবের। আপনার অন্য কবিতা ভাল। কিন্তু এই কবিতাটা সর্বোত্তম। আপনি আমাদের গর্ব ডাক্তার আজিজ। আমাদের সকলের গর্ব। রাজামশাইও সে কথা কর্নেল ম্যাগ্‌স্‌কে বলছিলেন সেদিন।'

এখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এই কর্নেল ম্যাগ্‌স্‌। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রশাসক। পোলিটিক্যাল এজেন্ট। মহামান্য ইংরেজ সরকারের কর্তৃত্বাধীন এই রাজকর্মচারী মউ এবং প্রতিবেশী কয়েকটি সামন্ত রাজ্যের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের উপর নজর রাখেন। এক দিক দিয়ে তাঁকে আজিজের প্রতিদ্বন্দ্বীও বলা যায় যা আজিজের মনঃপূত নয়। মামলা শেষ হবার পর থেকেই আজিজের উপর গোয়েন্দা বিভাগের গোপন নজর ছিল। সন্দেহ করার মতন প্রমাণ না থাকলেও সাধারণভাবে সব ভাগ্যহীন ভারতীয়দের উপরেই গোয়েন্দা বিভাগ নজর রাখত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আজিজকেও ওরা নজরবন্দী করে রেখেছিল। মউ রাজদরবারে তাই আজিজের নিয়োগটি কর্নেল ম্যাগ্‌স্‌-এর যথেষ্ট মনঃপূত হয় নি। ইংরেজ সরকারের চোখে ব্যাপারটা খুব নিরীহ ছিল ন। তাই কিছুটা আবর্তও সৃষ্টি হয়েছিল আজিজের নিয়োগ নিয়ে। এ ধরনের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার সাধারণভাবে নিরীহ ভারতবাসীরাই হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। এই নিয়োগ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের অসন্তুষ্টির কথা কর্নেল সাহেব রাজামশাইকে সরাসরি বলেছিলেন। কিন্তু ইদানিং দিনকাল বদলে গেছে। মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধির আর তেমন প্রতাপ প্রতিপত্তি নেই। পোলিটিক্যাল এজেন্টের

দৌরাত্ম্য অনেক ক্ষুন্ন হয়ে গেছে এখন। কিছুদিন আগেও এইসব রাজ-কর্মচারীরা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিল। তারা যখন তখন রাজদরবারে এসে নানা অসৈরণ দাবি করত। অনেক সময় দাবির বহর এত স্ফীত হত যে রাজ-অন্তঃপুর অব্দি তার পরিণাম পেঁৗছে যেত। সম্প্রতি ব্রিটিশ শাসনের দিগ্বিজয়ী প্রভাব কমতে শুরু করেছে। উচ্চকোটির রাজকর্মচারীরা এখন অনেক সন্ত্রস্ত কারণ শাসননীতিতে ভারতবিরোধী মনোভাবের সংস্কার হচ্ছে। এই সংস্কারের খবর মউ বা প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কাছে অজানা ছিল না। তাই কর্নেল ম্যাগ্‌স্‌এর চোখ রাঙানির উৎপাতটা তাচ্ছিল্য করার দুঃসাহস রাজামশাই অর্জন করেছিলেন। বাকি ছিল কর্নেল ম্যাগ্‌স্‌ কত-টুকু সইতে পারেন তা দেখার। তাই হিন্দু রাজার দরবারে মুসলমান চিকিৎসক নিয়োগের ব্যাপারটা পোলিটিক্যাল এজেন্টকে মেনে নিতে হলো। শুধু তাই নয়, একজন কৃতবিদ্য ডাক্তার নিয়োগ করার অধিকার পেলেন বলে রাজামশাই বড়লাট বাহাদুরকে ধন্যবাদ জানালেন। হিন্দুরা যে সমাজ কাঠামোর বাইরের জাতি নয় সেটাও প্রমাণ হয়ে গেল এই নিয়োগের মাধ্যমে।

হ্যাঁ, মউতে এসে অব্দি আজিজের কিছু মন্দ হয় নি। তবে দিন দুই হলো তার মনে একটা দুশ্চিন্তা হয়েছে। রাজ্যের সবাই যখন উৎসবে মেতে আছে, তখনই সেই দুঃসময়টা তার জীবনে এল। বলা বাহুল্য দুঃসময়টা এল ফীলডিংকে কেন্দ্র করে। নারায়ণ গড়বোলের উদ্দেশে লেখা ফীলডিংএর একটা ছোট্ট নোট তার হাতে এসেছে। চিঠিটা গড়বোলে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন একটা মন্তব্য করে। গড়বোলে লিখেছেন, 'খবরটা পেয়ে আপনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন। ফীলডিং এসেছেন কিন্তু কাজের পাকে এমনভাবে আমি জড়িয়ে গেছি যে তাঁর দেখাশোনা করতে পারছি না।' ফীলডিং লিখেছে যে মউতে দিন দুই থাকার বাসনা আছে। সেই সময় গড়বোলে প্রবর্তিত নতুন শিক্ষাপদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখবে। আরও লিখেছে যে সে সস্ত্রীক এসেছে এবং সঙ্গে আছে তার সম্বন্ধী। এ ছাড়া কিছু কিছু অভিযোগের কথাও লিখেছে সে। যেমন গেস্ট হাউসে তাদের যথেষ্ট পরিচর্যা হচ্ছে না। খাবারদাবার অপ্রতুল। শয়ন ব্যবস্থা মনোমত নয়। ডিম নেই, মশারির জাল ছেঁড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আর লিখেছে রাজসমীপে তারা কবে আসবে? মশাল মিছিল দেখবার অধিকার তাদের আছে কি? ইত্যাদি। আজিজ আর পড়ল না। ছিঁড়ে ফেলল চিঠিটা। ফীলডিংএরও ভারতপ্রেমী হবার শখ হয়েছে। মিস য়্যাডেলা কোয়েস্টেডেরও এমনি শখ হয়েছিল। এদেশের মানুষের জীবনযাত্রা দেখতে চেয়েছিল সে। আজিজ তাকে দেখিয়েছিল। কিন্তু কি পুরস্কার সে পেল? অবিশ্বাসিনী নোংরা মেয়েটা তার নামে কলঙ্ক দিয়ে চলে গেছে। এরা কেউ ভাল নয়। সবাই একরকম। আজিজ তাই কিছুতেই ফীলডিংয়ের সঙ্গে দেখা করবে না। কিন্তু তা কি সম্ভব? শোনা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই বন্যার তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। আশীরগড় স্টেশনের দিকের পথঘাট সব জলমগ্ন। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও ফীলডিং মউ ছেড়ে যেতে পারবে না।

৩৫

আজিজের মউ আসার অনেক আগে আর একজন মুসলমান যুবক এখানে এসেছিল। সেই যুবক ফকির এসেছিল মায়ের আদেশ পালন করতে। অনেকদিন আগের কথা। ফকির এখন কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে গেছে। তার মা আদেশ দিয়েছিলেন, 'বন্দীদেব মুক্তি দিস।' যুবক তাই খোলা তলোয়ার নিয়ে দুর্গদ্বার খুলে দেয়। মুক্তি পেয়ে জলস্রোতের মতন দুর্গ থেকে বাইরে চলে আসে বন্দীরা। বন্দীরা মুক্তি পেল বটে কিন্তু ক্রুদ্ধ দুর্গ রক্ষীরা যুবকের গলা কেটে দিল। মুণ্ডহীন দেহ নিয়েই যুবক তখন রক্ষীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে গেল পাহাড়ের দিকে। তার হাতে অনেক রক্ষী নিহত হলো। অবশেষে মায়ের ঘরের কাছে এসে যুবক মারা গেল। উপাখ্যান এইটুকু। কিন্তু যুবকের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা মহৎ আদর্শ, একটা মহান আত্মত্যাগের কাহিনী। তাই যুবকের দেহাবশেষের উপর স্থানীয় অধিবাসীরা দুটি স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করেছে। যুবক তার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মাতৃ আদেশ পালন করেছিল। অসংখ্য অবরুদ্ধ প্রাণের মুক্তি দিয়েছিল। যুবকের আত্মার কল্যাণেই এই দুটি স্মৃতিসৌধ উপসর্গ করা হয়েছে। হিন্দু মুসলমান ভক্তেরা সপ্তাহে একবার স্মৃতিস্তম্ভে মালা দেয়, প্রদীপ জ্বালায়। আজিজের বাংলোর বাগানেই একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে। অন্যটি আছে খানিক দূরে পাহাড়ের মাথায়। যুবকের আত্মত্যাগের কথা শুনে আজিজ মুগ্ধ হয়েছে। তার মনে হয়েছে এ আত্মত্যাগের তুলনা নেই। কিন্তু ইসলামকেও পৌত্তলিক করে ফেলা হয়েছে দেখে সে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল এর প্রতিবাদ করা দরকার। আলমগীরের মতন সেও বিদ্রোহ করবে। স্থানীয় মুসলমানদের বিবেক শুদ্ধ করবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আকবরের মতন সে উদার হয়ে গেল। সব কিছু মেনে নিতে শিখল।

জন্মাষ্টমীর পরের দিন ছুটি। সেদিন সকালে তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে আজিজ গেল দ্বিতীয় স্মৃতিস্তম্ভটা দেখতে। জমিলা তার হাত ধরে হাঁটছে। আহম্মদ আর কবিম চলেছে আগে আগে। কবন্ধ দেহটার আকার নিয়ে ওরা দারুণ চিন্তিত। কেমন দেখতে হয় মানুষের নির্মস্তক দেহ? হঠাৎ তেমন একটা চেহারার সামনাসামনি হলে তারা নিশ্চয়ই ভয় পেত। হাঁটতে হাঁটতে ওরা এইসব বলাবলি করছিল। ওদের আলোচনা শুনে আজিজ ধমক দিল। এসব কুসংস্কার সে বিশ্বাস করে না। বিজ্ঞান পড়া মন তার আধুনিক। ছেলে-মেয়েদেরও এইভাবে সংস্কারমুক্ত করে গড়ে তুলতে চায় সে। কিন্তু ওরা যেন ঠিক তার বিপরীত। ওদের সংস্কাব ঠাসা নিরেট মনে যুক্তির আলো ঢোকে না। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর ওরা নিজেদের মধ্যে

মতই আলাপ করতে লাগল।

উচ্চভূমি যেখানে ঢালু হয়েছে সেখানেই ঘন ঝোপের মধ্যে স্মৃতিসৌধটা দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা ছিপছিপে একটা অট্টালিকা। এটাই স্মৃতিসৌধ। মাথায় ছাত নেই। স্মৃতিভবনের মধ্যে একটা গোল গম্বুজ। গম্বুজের মধ্যে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা সমাধিপ্রস্তরটি লম্বাভাবে শোয়ান। সমাধিপ্রস্তরটা সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। ঘরের কোণাগুলিতে অসংখ্য মৌমাছির বাসা। ছিন্ন ডানা এবং কতকিছু ছাত থেকে ঝুরঝুর করে পড়ে চলেছে, সর্বক্ষণ। মৌমাছিদের স্বভাবের কথা আহম্মদকে বলে দিয়েছিল লতিফ। আহম্মদ জানত যে উত্তেজিত না হলে ওরা আক্রমণ করে না। আহম্মদ তাই সাহস করে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'যারা ভাল তাদের ওরা কামড়ায় না।' জমিলা সাবধানী। তাই চট করে সে ভেতরে ঢুকল না। স্মৃতিভবন দেখে ওরা মসজিদ দেখতে গেল। চন্দ্রপুরের মসজিদের চেয়ে এর ভাস্কর্য আলাদা। এর গম্বুজগুলো খাড়া নয়। একটু যেন হেলান। সম্ভবত ঢালু পথের উপর তৈরি বলেই এইরকম হেলে আছে মনে হয়।

সবাই তখন পুরনো কেল্লার মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জায়গাটা এখন পরিত্যক্ত হলেও পরিবেশটি চমৎকার। নিসর্গ শোভাও দেখবার মতন। আকাশের রঙ শ্লেটের মতন ধূসর। বুকে জমানো অশ্রু নিয়ে জলবন্দী মেঘেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশময়। পায়ের তলার মাটি জলে কাদায় স্যাঁতস্যাঁতে। এবার দারুণ বর্ষা হয়েছে। গত তিনবছরে এমন বর্ষা হয় নি। সবাই আশা করছে চমৎকার ফসল হবে। পুকুর নালা ডোবা সব জল থৈ থৈ। নদীর ওপাশে বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেশি হয়েছে। বনের মধ্যে বড় বড় গাছের পাশ দিয়ে ঝিরঝির করে জল গড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়ের গায়ে চিকচিক করছে জলের ধারা, যেন হীরকখনি। ঠিক নিচেই ছোট রানীর উদ্যান প্রাসাদ। ছোট রানী পর্দানশীন নন। কিঙ্করীদের সঙ্গে তিনি প্রগল্ভা। কিন্তু ওদিকে না তাকানই ভাল। গেস্ট হাউসের দিকেও তাকাবার দরকার নেই। গেস্ট হাউস ছাড়িয়ে একটা খাড়া পাহাড় দাঁড়িয়ে। ঘন সবুজ পাহাড়ের মাথায় অনেকগুলো ছোট ছোট মন্দির। মন্দিরের দেওয়ালের সাদা পাঁচিল যেন প্রদীপের শিখার মতন জ্বলজ্বল করছে। শতাধিক হিন্দু দেবতা ওখানে থাকেন। অনেক দেবতাই এখন প্রাসাদে চলে এসেছেন। অভিজাত দেবতারা আসেন নি। পদমর্যাদার মতন গায়গতরেও তাঁরা ভারি। তাই নিজেরা না এসে তাঁরা প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। মউএর বাতাস বৃষ্টি এবং ধর্মবিশ্বাসে সিক্ত হয়ে উঠেছে আজ।

কেল্লার মাঠে ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে খেলছে। আজিজ দাঁড়িয়ে ক্রীড়ারত ছেলেমেয়েদের দেখছিল। জেল ফটকের কাছে ওরা একদল বন্দীদের দেখল। অনির্দিষ্ট দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে আছে একটা ব্রোঞ্জের কামানের দিকে। ওদের মধ্যে একজন আজ মুক্তি পাবে। কিন্তু কে সে? আজ রাত্রে প্রধান দেবতাকে নিয়ে মিছিল বেরোবে। মস্ত মিছিল এই পথ দিয়েই মউএর দীঘি পর্যন্ত যাবে। সেখানে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর শ্রীভগবান মহা-

নিদ্রায় নিমজ্জিত হবেন। আজিজের পরিবারের কাছে এই হিন্দু অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটির আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই। ওদের কৌতূহল বাস্তব সত্যঘটনাটির প্রতি। কোন্ বন্দী মুক্তি পাবে? ওরা জানে যে রাজাদেশে আজ একজন বন্দী মুক্তি পাবে। কিন্তু কে সেই ভাগ্যবান? ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আজিজ এই কথাই আলোচনা করছিল। বন্দীরাও উৎকণ্ঠিত। তাদের কাছে রাজা বা ভগবান আলাদা নন। রাজাদেশ তাদের কাছে ঈশ্বরাদেশের মতন। কিন্তু যেন প্রহরীরা বন্দীদের মতন মূর্খ নয়। তারা এর তফাৎ বোঝে। অসুস্থ রাজামশাইয়ের বর্তমান শারীরিক অবস্থার কথা জানতে চাইছিল তারা।

ওদের কৌতূহল নিবারণ করতে হলো আজিজকে। সংক্ষেপে বলল, 'ভালর দিকে।' কিন্তু আজিজ সত্য গোপন করল। গত রাত্রেই রাজামশাই ইহজগৎ ত্যাগ করে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। রাজনীতির স্বার্থেই খবরটি গোপন রাখা হয়েছে। রাজামশাইয়ের দুই একান্ত চিকিৎসক এবং সচিব ছাড়া অন্য যে লোকটি এই দুঃসংবাদ জানে সে হল রাজামশাইয়ের খাস ভৃত্য। প্রাসাদের এক গোপন ঘরে এই লোকটি তাঁর মড়া পাহারা দিচ্ছে। এই ক'টি মানুষ ছাড়া সারা রাজ্যের আর কেউ তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানে না। আজিজের কাজ হলো জনে জনে মানুষকে বলে বেড়ান যে তিনি বেঁচে আছেন। রাজ্যের স্বার্থের দিকে চেয়েই আজিজকে এই কাজ করতে হচ্ছে। সদ্য প্রয়াত রাজামশাইয়ের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল। পরবর্তী উত্তরাধিকারীর সঙ্গে কেমন বনিবনা হবে তা সে জানে না। তবুও মিথ্যাকেই আশ্রয় করে রইল আজিজ এবং বিশ্বাস্যভাবে তা প্রচার করতে লাগল। সত্য প্রকাশ করল না। ছেলেমেয়েরা তখনও দৌড়ঝাঁপ করে খেলে বেড়াচ্ছে। কেল্লার মাঠ থেকে তারা একটা ব্যাঙ ধরে নিয়ে যাবে এবং লতিফ চাচার বিছানার তলায় রেখে মজা করবে। এমন সময় তারা ফীলডিংকে দেখতে পেল। সম্বন্ধীকে সঙ্গে নিয়ে সে উল্টো দিক দিয়ে ওপরে উঠছিল। ফীলডিংকে দেখেই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল করিম। তারপর আজিজের কাছে খবরটা দিয়ে বলল, 'ওদের দিকে ঢিল ছুঁড়ব বাবা?'

আজিজ ওদের ধমক দিল। বলল, 'ছি! তোমরা কি দুষ্টু ছেলে? ওঁরা হলেন রাজার অতিথি। ওঁদের সঙ্গে অসভ্যতা করতে নেই।' তবে শুধু ধমক নয়। আদরও করল। তার ভাল লাগছিল যে এই মুহূর্তে ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গেই আছে।

সম্বন্ধীকে নিয়ে ফীলডিং প্রথমেই সমাধিভবনে ঢুকল। কিন্তু মৌমাছির তাড়া খেয়ে তখুনি বেরিয়ে এল। গায়ে মুখে মাথায় অজস্র মৌমাছি। বিপর্যস্ত হয়ে ওরা মাঠময় ছুটোছুটি করছিল। ওদের দুরবস্থা দেখে আজিজের ছেলেমেয়েরা হাততালি দিচ্ছে আর হাসাহাসি করছে। হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। আজিজও দেখছিল ওদের বিপর্যস্ত অবস্থা। প্রথম প্রথম তেমন আগ্রহ দেখায় নি। কিন্তু ওদের অপদস্থ হতে দেখে চুপ করে থাকতে পারল না। চেঁচিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার মশাই? ছুটোছুটি করছেন কেন? বিপদে পড়েছেন?'

ফীলডিংএর সম্বন্ধী বলল, 'ওঁকে মৌমাছি তাড়া করেছে।'

'জলে ডুবতে বলুন ওঁকে। নইলে মুক্তি নেই। আমার কিছু করার নেই। ওরা হলো রাজার পোষা মৌমাছি। ওদের বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে রাজ-দরবারে আর্জি জানাতে হবে।'

ঠাট্টা করলেও নেহাৎ চুপ করেও থাকল না আজিজ। ততক্ষণে বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। জলের ধারায় মৌমাছিরা উড়ে গেল। আজিজ ওদের কাছে গিয়ে গা থেকে হুল বার করতে লাগল। ফীলডিং তাকিয়েছিল আজিজের দিকে। বলল, 'আমি শুনেছি তুমি আজকাল এখানেই স্থায়িভাবে বাস করছ।' আজিজ জবাব দিল না। তার মনে হচ্ছিল ফীলডিং যেন কেমন বদলে গেছে। ফীলডিং আবার বলল 'গায়ে মুখে কিছু হুল লেগে আছে। আশা করি ক্ষতি হবে না।'

'তেমন কিছু নয়। আমি ওষুধ পাঠিয়ে দেব। তুমি তো গেস্ট হাউসে উঠেছ।'

ফীলডিং হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আমার একটা চিঠিরও জবাব দাও নি কেন ?' আজিজ এবারও চুপ। ফীলডিংয়ের সম্বন্ধী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তার আশঙ্কা আবার হয়ত আক্রমণ হবে। তাই ঘটনাস্থল থেকে সে এখুনি চলে যেতে চায়। ফীলডিং বলল, 'তাড়াতাড়ি নাবার রাস্তা কিছু আছে ?' আজিজ হাত দিয়ে পথটা দেখাল। ফীলডিং বলল, 'তুমিও আসছ তো ?' আজিজ একবার ফীলডিংএর দিকে তাকাল। তারপর পরিহাস তরল কণ্ঠে বলল, 'যো হুকুম স্যার।' আভূমি নত হয়ে আজিজ সেলাম করল। ফীলডিংও পরিহাস বিমুখ নয়। মৃদু হেসে সেও প্রত্যভিবাদন করল।

ভাঙাচোরা পায়ে চলা পথ দিয়ে সবাই নামছে। আগে আগে চলেছে ফীলডিং আর আজিজ। মধ্যে ফীলডিংএর সম্বন্ধী। আর সবশেষে আজিজের তিন দস্যি ছেলেমেয়ে। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। ওরা সবাই ভিজতে ভিজতে নামছিল। ফীলডিংই প্রথম কথা বলল, 'আজকাল কেমন আছ আজিজ ?'

'ভালই আছি।'

এই ক'মাসের ব্যবধানে ফীলডিংকে আরও একটু বয়স্ক দেখাচ্ছে। মানুষটাও অনেক যেন কঠিন হয়ে গেছে আগের চেয়ে। আজিজের সঙ্গে সেই পুরনো অন্তরঙ্গতা ঝালিয়ে নেবার কোন আয়োজন সে করল না। বরং হুকুম দেবার সুরে জিজ্ঞেস করল, 'এখানকার গেস্ট হাউসের ইনচার্জ কে জান ?'

'ঠিক জানি না। তবে মনে হয় রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী।'

'উনি থাকেন কোথায় ?'

'জানি না।'

'আমরা আসার পর থেকে একটা লোকও খোঁজ করতে আসে নি।' বেশ অসহিষ্ণু শোনাচ্ছিল ফীলডিংএর গলার স্বর।

ফীলডিং ফের বলল, 'দরবারে চিঠি লিখে আমি আগেই আমার আসার কথা জানিয়েছিলাম। এঁরাও বলেছিলেন যে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে রাখবেন।

কিন্তু কোথায় কি ? গেস্ট হাউসে একটা চাকর পর্যন্ত নেই। যারা আছে তারাও আমাদের আসার খবর পায় নি। ডিম নেই, মশারি নেই। আমার স্ত্রী নদীতে বেড়াতে চাইছিলেন।'

'অসুবিধে কিসের ? দুটো নৌকো আছে।' বলল আজিজ।

'তা আছে। তবে দাঁড় নেই।'

'তাই নাকি ? তাহলে ম্যাগ্‌স্‌ দাঁড়কটা ভেঙে গেছেন।'

'চারটেই ?'

'নিশ্চয়ই। মানুষটা তো দুর্বল নয় !' ছোট্ট একটু ব্যঙ্গ করল আজিজ।

ফীলডিং চুপ। একটু পরে বলল, 'বর্ষাটা কেটে গেলে নদীর ওপর থেকে মশাল মিছিল দেখতাম। গড়বোলেকে সব কথা জানিয়ে একটা নোট পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু দেখছি কোন ব্যবস্থাই ও করে নি।'

'হয়ত তোমার চিঠি মন্ত্রী পান নি।'

ফীলডিং অন্যমনস্ক ছিল। বলল, 'আমরা যদি মিছিল দেখতে চাই আপত্তি হবে না তো তোমাদের ?'

'কিসের আপত্তি ?'

'আমরা ইংরেজ।'

'আমিও হিন্দু নই। তাই এখানকার ব্যাপার ঠিক বলতে পারব না কারণ উৎসবটা হিন্দুদের। অবশ্য আমার কোন আগ্রহ নেই।'

'মুদুকুল আর দেওড়া স্টেটের মহারাজা মহারানী দুজনেই খুব অতিথিপরায়ণ। আমাদের কোন অসুবিধেই হতে দেন নি।' ফীলডিং বলল। ইতিমধ্যে ওরা গন্তব্যস্থলে পেঁাছে গেছে। সামনেই ফীলডিংএর ঘোড়ার গাড়িটা দাঁড়িয়ে। আজিজ বলল, 'উঠে পড় ফীলডিং। আপনিও উঠুন মিস্টার কোয়েস্টেড।'

'মিস্টার কোয়েস্টেড কাকে বলছ ?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ফীলডিং।

'কেন ? এঁকে ? ইনি তোমার স্ত্রীর ভাই নন ?'

'অবশ্যই উনি আমার স্ত্রীর সহোদর। কিন্তু কাকে বিয়ে করেছি বলে তোমার মনে হয় ?' আজিজের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে ফীলডিং জিজ্ঞেস করল। ছেলেটিও লজ্জায় থতমত। ফর্সা মুখখানা লজ্জায় রাঙা। কোনরকমে বলল, 'আমার নাম র‍্যাল্‌ফ্‌ মুর।'

খানিকক্ষণের জন্যে বৃষ্টিটা ধরেছিল। এখন আবার ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। জলের ছাটে আশপাশ ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। সব কিছু অস্পষ্ট। আজিজও লজ্জিত। কিন্তু যা বলেছে তা আর ফেরাবার উপায় নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে। ফীলডিংই শুধু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। মাটিতে পা ঠুকে বলল, 'কোয়েস্টেড ? কোয়েস্টেড ? তুমি কি জানতে না যে মিসেস মুরের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে ?'

আজিজ চমকে উঠল মনে মনে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখে এসে জমেছে তার। কিছু একটা বলতে চাইছিল সে। কিন্তু সঙ্কোচ এসে বাধা দিল।

মিসেস মুরের নামটাও যেন অসহ্য মনে হচ্ছিল তার। ফীলডিং ফের বলল, 'এখন বুঝতে পারছি কেন তুমি আমার সঙ্গে ওইরকম অদ্ভুত ব্যবহার করেছিলে।'

'অদ্ভুত ব্যবহার?' হতাশ আজিজ কোনরকমে কথাটা বলল।

'মহম্মদ আলিকে দিয়ে আমায় তুমি একটা অসঙ্গত জবাব পাঠিয়েছিলে।'

'ও আলোচনা এখন থাক ফীলডিং।' আহত আজিজ কোনরকমে বলল।

'থাকবে কেন? তুমি কি সত্যিই ভুল করেছিলে? কেন করেছিলে বলবে?' ফীলডিংএর গলার স্বর তীক্ষ্ন হলেও বোঝা যায় যে বন্ধুত্বের দাবি নিয়েই সে কথাগুলো বলছে। ফীলডিং বলল, 'আমার বিশ্বাস অন্তত আধডজন চিঠি তোমায় আমি লিখেছিলাম। সব চিঠিতেই আমার স্ত্রীর কথা ছিল। অথচ কি করে তোমার মনে হল যে আমি মিস কোয়েস্টেডকে বিয়ে করেছি? সত্যিই আমার অবাক লাগছে ভাবতে।' কথাটা বলে ছোট্ট একটু হাসল ফীলডিং। তার হাসির ধরন দেখেই আজিজ বুঝতে পারল যে স্টেলা সুন্দরী। ফীলডিং আরও বলল, 'অবশ্য মিস কোয়েস্টেড আমায় সাহায্য করেছেন। আমাদের দুজনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। দূতির কাজ করেছেন তিনি।' আজিজ চুপ। ফীলডিং তার দিকেই চেয়েছিল। বলল, 'আজিজ, আমাদের উচিত এই ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলা। এর সবটাই মহম্মদ আলির শয়তানি তা নিশ্চয়ই বুঝেছ। সে জানত যে আমি মিসেস মুরের মেয়েকেই বিয়ে করেছি। কারণ সব চিঠিতেই হীস্‌লপের বোন বলে তাকে উল্লেখ করত।'

হীস্‌লপের নাম শুনেই আজিজ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তখন জোরে বৃষ্টি নেবেছে। পিস্তলের গুলির মতন বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে বিঁধছে যেন। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় আজিজ চিৎকার করে বলল, 'কিছু এসে যায় না তুমি কাকে বিয়ে করেছ বা কে তোমার শ্যালক। আমার জীবনে তোমাদের কোন দরকার নেই। দয়া করে আমাকে আমার মতন থাকতে দাও। আমি মেনে নিচ্ছি যে আমি ভুল করেছিলুম। ভীষণ ভুল। আলিকে আমি বিশ্বাস করে-ছিলুম। তার জন্যে তুমি আমায় ঘৃণা করতে পার। ব্যাপারটা মিটে যাক। আমি ভেবেছিলাম আমার যিনি শত্রু তাঁকেই তুমি বিয়ে করেছ। তাই তোমার কোন চিঠিই আমি পড়ি নি। আমার মনে হয়েছিল আমার ন্যায্য টাকা তুমি চুরি করে নিয়ে গেছ। তুমি আমায় ঠকিয়েছ।' বলতে বলতে হাত দুটো মুড়ে কেমন একটা অসহায় ভঙ্গি করল আজিজ। ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আজিজ তার আবেগটাকে সংযত করতে চেষ্টা করছিল। বলল, 'কিন্তু আলিকে আমি ক্ষমা করেছি। কারণ সে আমায় ভালবাসে। ওরাই আমার আপন লোক সিরিল। তুমি নও। তোমরা কেউ নও। তুমি বিদেশী। তোমার স্ত্রীও বিদেশিনী। দয়া করে তোমরা আমায় রেহাই দাও। তোমাদের কাছে এটাই আমার শেষ অনুরোধ।' জলে ভিজে জবুথবু হয়ে গেছে আজিজ আর তার ছেলেমেয়ে। তাদের নড়া ধরে টানতে টানতে এগিয়ে চলল আজিজ। ফীলডিং একবার শেষ চেষ্টা করল। জলে

কাদায় সেও মাখামাখি হয়ে গেছে। সেই অবস্থাতেই আজিজের উদ্দেশে চে'চিয়ে বলল, 'শোন আজিজ। একটিবার শোন। আমি যাঁকে বিয়ে করেছি তিনি হীস্‌লপের ভগ্নী, তার বাগদত্তা নন।' কিন্তু এই মুহূর্তে এই তফাত-টুকুর কি দাম? যে ভুল সে করেছে সেটা তার নিজেরই তৈরি। আর ফেরা যায় না সেখান থেকে। ফীলডিং তবুও আজিজের দিকে এগোল। কিন্তু আজিজ অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মতন তার সঙ্গে ব্যবহার করল। ছেলেমেয়েদের শুনিয়ে উর্দুতে বলে উঠল, 'প্লিজ সিরিল, আমার দিকে এস না। যাকে খুশি তুমি বিয়ে কর না কেন, আজ থেকে আমার কোন ইংরেজ বন্ধু রইল না।' কথাটা বলে আজিজ চলে গেল। অপ্রস্তুত ফীলডিং চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল গাড়িটার সামনে।

বাংলোয় ফিরেও আজিজের মনে মৃদু উত্তেজনা ছিল। কিন্তু মনটায় তেমন ভার নেই। ফীলডিং যখন মিসেস মুরের কথা বলছিল তখন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল মনে। একটা পীড়াদায়ক স্মৃতি। মনে হচ্ছিল বৃদ্ধা যেন তার সমস্যা-গুলো মিটিয়ে দিতে আসছেন। বে'চে থেকে ঠিক যেমনটি করেছেন। কি ভালই তাকে বাসতেন তিনি। অথচ কি কঠিন নিষ্প্রাণ ব্যবহার সে আজ র‍্যাল্‌ফ্‌ মুরের সঙ্গে করল! ছেলেটার দিকে ভাল করে চেয়েও দেখে নি সে। স্টেলা আর র‍্যাল্‌ফ্‌ তাঁর দুই আদরের ছেলেমেয়ে। আজিজের কাছেও নাম দুটো কত প্রিয়। বৃদ্ধার কাছেও সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে। তিনিও তা জানতেন। সেই স্টেলা আজ সিরিলের বউ।

৩৬

প্রাসাদের অন্তঃপুরে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও উৎসবহীন হয়ে পড়ে নি। সর্বক্ষণই গীত বাদ্য হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। যদিও অনেকেই ভাবছিল যে বোধহয় তিনি তখনও জন্মান নি। তারা তাই আশা নিয়ে বসে আছে কখন তিনি জন্মাবেন। তাদের অনেকের ধারণা বোধ-হয় মিছিলের সময় তিনি আবির্ভূত হবেন। অন্যান্যবার এই সময়টা খুব ধুমধাম হয়। দুপুরের দিকে রাজামশাই তাঁর সভাসদদের নিয়ে খাস মহলে বসেন। তাঁর সামনে তখন জন্মাষ্টমী পালাগান অভিনয় হয়। জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে অনুষ্ঠানের সব পর্যায়গুলো যখন অভিনয় হত, তখন রাজামশাই বাকরুদ্ধ হয়ে তা দেখতেন এবং আত্মস্থ হয়ে যেতেন। সবশেষে যখন গোপিনী-দের সঙ্গে ক্রীড়ারঙ্গে মেতে উঠতেন কৃষ্ণ, তখন রাজামশাইয়েরও ভাবসমাধি হত। কৃতার্থ রাজামশাই একবারও ভাবতেন না যে তিনি অভিনয় দেখছেন। তাঁর মনে হত স্বয়ং ভগবান তাঁর প্রাসাদে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং লীলা করছেন। ভাবের বন্যায় রাজঅন্তঃপুর তখন আকুলিবিকুলি করত। সবাই যেন ভাবলোকে চলে যেত। এবার সেরকম কোন অনুষ্ঠানই হলো না। কারণ

স্বয়ং রাজামশাই অনুপস্থিত। মৃত্যু তাঁকে এই উৎসব থেকে পৃথক করে দিয়েছে। অবশ্য প্রাসাদ জুড়েই একটা কানাকানি শুরু হয়ে গেছে। সবাই সন্দিগ্ধ, কিছু একটা ঘটেছে। উত্তরাধিকারের দাবিদারও এই কানাকানি থেকে মুক্ত নয়। তবুও কোনরকম বিশৃঙ্খলা হলো না। কারণ হিন্দুদের জীবনের মুখ্য অবলম্বন ধর্ম। হিন্দুদের ধর্মবোধ এমন এক প্রেরণা যা সাময়িক ভাবে মানুষের সব বাস্তব প্রয়োজনকে তুচ্ছ করে দিতে পারে। সুতরাং উৎসব চলল যেমনটি চলছিল তেমনি। আয়োজন কোলাহলেও কোথাও কোন অনুপপত্তিও দেখা দিল না।

অবশ্য আজিজের কাছে সমস্ত আড়ম্বরটাই বাহ্য মনে হচ্ছিল। মউবাসীদের মধ্যে এই ব্যাকুলতা দেখে সে কিছুটা অবাক হয়ে গেছে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল কেমন করে এরা সব কিছু ভুলে এমন আত্মস্থ হয়ে যায় কে জানে। তবে উৎসবের এই ক'টা দিন আজিজকে ওরা বিধর্মী বলে বর্জন করে নি। রাজপ্রাসাদ থেকে এই ক'দিনে নিয়মিত ভেট এসেছে। আজ সকাল থেকেই তার বিশেষ কাজকর্ম নেই। গেস্ট হাউসে একটা মালিশ পাঠান ছাড়া তার অন্য কাজ ছিল না। কিন্তু বিকালের আগে মালিশের কথা মনেও পড়ে নি তাব। যখন মনে পড়ল তখন ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। অগত্যা মহম্মদ লতিফের তৈরি করা একটা হেকিমি মলম নিয়ে যাবে স্থির করল। কিন্তু মলমটা যেহেতু মন্ত্রঃপূত তাই ফেরত আনার প্রতিশ্রুতি দিতে হলো লতিফকে। আসলে ঘোড়ায় চড়ে খানিকটা ঘুরে আসার একটা অজুহাত খুঁজছিল আজিজ।

ঘোড়ায় চড়ে আজিজ যখন প্রাসাদের কাছে এসে পৌছল তখন মিছিলে যোগ দিতে লোকজন জড়ো হচ্ছে। পালকি সাজান হচ্ছে। অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে দেখছে। এক এক করে দেবতাদের পালকির মধ্যে অধিষ্ঠিত করা হলো। পালকির মূল দণ্ডটি রূপা দিয়ে বাঁধান। পালকির আধখোলা দরজার ভিতর থেকে দন্তেব মুখটি বার করা। খানিকক্ষণ দেখার পর আজিজ চোখ সরিয়ে নিল। এত কাছ থেকে হিন্দু ধর্মানুষ্ঠান দেখার অধিকার তার আছে কিনা জানা নেই। সুতরাং তাড়াতাড়ি সরে আসতে গিয়ে গড়বোলের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল। বিরক্ত গড়বোলে বলে উঠলেন, 'দিলেন তো দেরি করে!' অর্থাৎ বিধর্মীর সঙ্গে অঙ্গসংঘাত হয়েছে, সুতরাং তাঁকে স্নানশুদ্ধ হতে হবে। আজিজ সত্যিই দুঃখিত। জানালও তা। গড়বোলে মৃদু হাসলেন। গেস্ট হাউসের অতিথিদের কথা তুললেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'ওঁরা সবাই এসেছেন?' আজিজ বলল, 'হ্যাঁ। ফীলডিং সস্ত্রীক এসেছে। তবে ওর স্ত্রী য়্যাডেলা নয়। ওর স্ত্রীর নাম স্টেলা। মিসেস মুরের মেয়ে। হীস্‌লপের বোন।'

'জানি তো।' অম্লান বদনে বললেন গড়বোলে।

আজিজ অবাক। বলল, 'সেকি? আপনি জানেন অথচ আমায় বলেন নি?'

আজিজের গলার স্বরে বেশ তিক্ততা। কিন্তু গড়বোলে তখনও হাসছেন। বললেন, 'আমায় ভুল বুঝবেন না ডাক্তার আজিজ। রাগ করবেন না। জানবেন আমি

যথার্থই আপনার বন্ধু। আমার ক্ষমতার মধ্যে থেকে আমি বন্ধুত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করি। তবে অনেক কথাই অনেক সময় বলা হয় না। তাছাড়া আজ আমাদের উৎসব।'

উৎসবের কথায় আজিজের মনের উষ্মা কেটে গেল। বস্তুত এই মানুষটার সামনে আজিজ যেন শিশু হয়ে যায়। অল্প পেয়েই মন ভরে ওঠে। সুতরাং গড়বোলের কথায় সেও হাসল। ইতিমধ্যে ভিড় বাড়ছিল। আজিজ তাই পাশের একটা গলির মধ্যে ঘোড়াটাকে এনে রাখল। ধাঙড়দের ব্যান্ডপার্টি এসে পৌঁছেছে। ওদের ঢাকের বাদ্যি শুরু হলো। বিজয়ী সেনাবাহিনীর মতন ওরা প্রাসাদের মধ্যে ঢুকল। তখন আব সব সঙ্গীত থেমে গেছে। এটাই রীতি। যারা অস্পৃশ্য, অসুচী তাদের বাদ্যধ্বনি শুনে দেবতা মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তখন অন্য বাদ্য থেমে যায়। এই রীতি পালনের পর মন্দিরের দরজা হাট করে খুলে দেওয়া হলো। ঝলমল করে উঠল মন্দিরের অভ্যন্তর। সোনার ঝালর মোড়া এবং দুপাশে চামব ঝোলান স্বর্ণ সিংহাসন থেকে দেবতাকে বহন করে নিয়ে চলল শুভ্রবাস পূজারীরা। বর্ষার সূর্য তখন মেঘের আড়াল থেকে পূর্ণদীপ্তি নিয়ে বিকশিত। বিকেলের হলুদ রোদের আভায় পৃথিবী যেন স্বর্ণময় হয়ে উঠেছে। প্রাসাদের দেওয়ালের গায়ে আঁকা হলুদ রঙের শার্দূল মূর্তিগুলো মনে হচ্ছিল যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের উপর। পালকি চলেছে...তাকে অনুসরণ করছে গজবাহিনী। হাতীর পিঠে মাহুত নেই। দেবতার প্রতি পাছে অসৌজন্য প্রকাশ হয় তাই এই ব্যবস্থা। এই ধরনের ধর্মানুষ্ঠান দেখতে আজিজের ভাল লাগছিল না। তার ধর্মের সঙ্গে এর যেন কোন মিল নেই। কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল সে। তার শরীরে বইছে সম্রাট বাবরের রক্ত। হিন্দুস্থান সম্বন্ধে বাবরের কোন মোহ ছিল না। তারও নেই। এ দেশটা বন্ধ্যা। এখানকার বাতাস দূষিত। এখানকার মাটিতে সুপক্ক ফল জন্মায় না। এখানকার মানুষগুলো অসদালাপী। বান্ধবহীন এই দেশে নিজেকে তাই অত্যন্ত একা মনে হচ্ছিল আজিজের।

গলিপথ দিয়ে আজিজ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শহরের বাইরে গিয়ে পৌঁছল। এদিকটা খোলামেলা। উঁচু উঁচু পাহাড় আর জঙ্গল। মউএর সবচেয়ে বড় দীঘিটা এদিকেই। দীঘির পাশে গিয়ে আজিজ ঘোড়া থামাল। দীঘিটা অনেক দূর অব্দি দেখা যায়—যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই অব্দি। জলের বুকে বিকেলের ছায়া পড়েছে। জলের তল পর্যন্ত ছায়াবৃত। মনে হয় আকাশ আর মাটি এক হয়ে গেছে। একে অপরকে আলিঙ্গন করতে চাইছে আনন্দে। দীঘির জলের দিকে চেয়েছিল আজিজ। দীঘির ঠিক মাঝ বরাবর একটা কালো বিন্দু। বিন্দুটা ক্রমে বড় হচ্ছে। আজিজ বুঝতে পারল ওটা গেস্ট হাউসের নৌকা। ফীলডিং সপরিবারে নৌকাবিহার করছে। মনটা বিষিয়ে উঠল তার। ফীলডিং বা তার পরিবারের কাউকে আর যেন সইতে পারছে না সে। আজিজ চোখ সরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। দুগ্ধধবল রাজপ্রাসাদটা মাটির ওপর কুব্জপৃষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওখান থেকে এখুনি মিছিল বেরোবে ভগবান

কৃষ্ণকে নিয়ে। শুরু হবে ধর্মের নামে কোলাহল। তবুও ওদের সওয়া যায়। কারণ অপরের জীবনযাত্রা নিয়ে ওরা অনুসন্ধিৎসু নয়। কিন্তু ইংরেজদের এই দেশ দেখার আগ্রহটা একেবারেই পোষাকি। আসলে দেশ দেখার নাম করে ওরা দেশ শাসন করতে চায়। আজিজও একদিন এই ফাঁদে পা দিয়েছিল যেদিন মিস কোয়েস্টেড দেশ দেখার আবদার করেছিল। সেদিন সে অভিভূত হয়েছিল। কিন্তু আজ বুঝেছে এটা ওদের খেলা। এদেশের মানুষের জন্যে কোন ভালবাসা বা সহানুভূতি ওদের নেই। ওরা শুধু শুকনো নিয়ম পালন করে। এই মুহূর্তে নৌকায় বসে ওরা কি আলোচনা করছে আজিজ তা বলতে পারে। ঘাটে মূর্তি নামবে এখুনি। তারপর বিসর্জন হবে ঠাকুরের। ওরা নিশ্চয়ই বলাবলি করছে যে কতটা কাছাকাছি গিয়ে ওরা অনুষ্ঠান দেখতে পারবে।

আজিজ ঘোড়া থামায় নি। ওকে এখুনি একবার গেস্ট হাউসে যেতে হবে। মলমটা দিয়ে আসবে। গেস্ট হাউসের পরিচারকরা নিশ্চয়ই আছে। তাদের কাছেও জানতে পারবে সে কিছু কিছু। দীঘির মধ্যে খানিকটা অংশ দ্বীপের মতন। এখানেই রাজপরিবারের গতায়ু পূর্বপুরুষদের স্মৃতিবেদীগুলো প্রতিষ্ঠিত আছে। জায়গাটা নিষ্প্রাণ এবং গম্ভীর। পাশ দিয়ে যেতে যেতে আজিজের মনে একটা অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছিল। রাজপ্রাসাদের মতন স্মৃতিমন্দিরে দেওয়ালগুলিও তুষারশুভ্র। ক্ষীণ আলো জ্বলছে ভিতরে। তার কিরণরশ্মি বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আসন্ন রাত্রির কালো অন্ধকারের মধ্যে এই কিরণচ্ছটা একটা রহস্যময় পরিবেশ যেন সৃষ্টি করেছে। উঁচু উঁচু গাছের ভিড়ে জায়গাটা অন্ধকার। গাছের ডাল থেকে ঝুলে থাকা চামচিকাগুলো ঝুপঝুপ করে জলের বুকে নাবছে আর জল খেয়ে যাচ্ছে। শব্দ হচ্ছে হিস হিস। সারাটা বেলা ওরা মুখ নিচু করে গাছের ডালের সঙ্গে ঝুলে আছে। সবাই তাই তৃষ্ণার্ত। ভারতবর্ষের সন্ধ্যাকালীন প্রশান্তির ছবিটি সর্বত্র পরিস্ফুট। নিঃশঙ্কিত ভেকের দল লাফালাফি করছে। অনন্তকাল ধরে পুড়ে চলেছে গোময়। নীড়ে ফেরা এক ঝাঁক বক্রচঞ্চু পাখি ব্যস্ত হয়ে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। এখানকার বাতাস নিষ্প্রাণ কিন্তু বিষণ্ণ নয়। ভাগ্য মানুষকে যতটুকু দিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি তার কামনা। তাই একটা রফা করে নিয়েছে মানুষ এবং তাতেই সে খুশি।

গেস্ট হাউসটা দীঘির বুক থেকে প্রায় দুশো ফুট উঁচুতে একটা পাথরের খাঁজের উপর অবস্থিত। আজিজ যখন পৌঁছল তখন জলের রঙ হালকা বেগুনি রঙ ধারণ করেছে। এখান থেকে নৌকাটা তখন দেখা যাচ্ছিল না। সন্ধ্যার ফিকে আঁধারে হারিয়ে গেছে সেটা। গেস্ট হাউসের চৌকিদার বসে, বসে ঢুলছে। তার পাশ দিয়ে নিঃসঙ্কোচে ঘরের মধ্যে ঢুকল আজিজ। শূন্য ঘরে কেউ কোথাও নেই। শুধু প্রদীপ জ্বলছে। এ ঘর ও ঘর করল সে। মনে হয় কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে সে হিংস্রের মতন। হঠাৎ দেখল পিয়ানোর ওপর দুটো খোলা চিঠি পড়ে আছে। ছোঁ মেরে চিঠি দুটো সে তুলে নিল তারপর এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলল। অপরের চিঠি পড়তে তার

সঙ্কোচ হলো না। ব্যক্তিগত চিঠি যে পরম নিভৃত এবং গোপন প্রাচ্যদেশের মানুষ তা মানতে চায় না। অপরের গোপনতা জানতে তার আগ্রহ খুব বেশি এবং সেটুকু প্রকাশ্য করে না দেওয়া অব্দি তার শান্তি নেই। তাছাড়া খানিকটা প্রতিহিংসাবশেই চিঠিগুলো সে পড়েছে। ইংরেজ ম্যাকব্রাইডও একদিন তার ড্রয়ার খুলে চিঠির গোপন কথাগুলো প্রকাশ্য করে দিয়েছিল। চিঠি দুটোর মধ্যে যেটা সব থেকে কৌতূহলোদ্দীপক সেটা হীস্‌লপের লেখা। ফীলডিংকে লেখা চিঠিটা পড়ে বন্ধু সম্বন্ধে তার মন আরও শক্ত হয়ে উঠল। র‍্যাল্‌ফ্‌ মূর সম্বন্ধেও অনেক কিছু লিখেছে হীস্‌লপ। চিঠি পড়ে মনে হয় ছেলেটার কোন ব্যক্তিত্ব নেই, ভীষণ পরমুখাপেক্ষী। হীস্‌লপ লিখেছে, 'সময় পেলেই ভাইটাকে একটু নাড়া দেবেন। ওর ওপর নজর রাখবেন। নইলে ও ঠিক সুযোগ সন্ধানীদের দলে ভিড়ে যাবে।' এরপর লিখেছে, 'আপনার সঙ্গে আমি একমত যে অভিযোগ পুষে রেখে লাভ নেই কারণ জীবনটা খুব ছোট। আমি অনেকখানি নিশ্চিন্ত যে অবশেষে আপনি শাসকদের বোঝবার চেষ্টা করেছেন। যতখানি সম্ভব সকলের সহায়তা আমাদের দরকার। আমি আশা করব স্টেলা যখন এরপর এখানে আসবে তখন আপনাকেও সে নিয়ে আসবে। তখন আপনার সুখ সুবিধে দেখার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। সত্যি, আমাদের এখন দেখা হওয়া বিশেষ দরকার। মা'র মৃত্যুর পর আমার বোনের সঙ্গে যখন আপনার বিয়ে পাকা হয়ে গেল তখন আমার অসময় চলছে। তাই একটু অবুঝ হয়ে পড়েছিলাম। এখন সে সব ভুল বোঝা-বুঝি মিটিয়ে নেবার সময় এসেছে। আপনি ঠিকই বলেছেন, যার যা দোষ ত্রুটি থাক। য়্যাডেলার সঙ্গেও বিবাদ জীইয়ে রাখতে চাই না। যদি পারেন আমার মনের কথা তাঁকে জানাবেন। আপনার অনেক সৌভাগ্য যে এইসময় আপনি ভারতবর্ষে নেই। একটার পর একটা ঘটনা হচ্ছে এখানে। সবই অপপ্রচার। কিন্তু আমাদের হাত পা বাঁধা। যোগসূত্রটা ছিঁড়ে দেবার ক্ষমতাও নেই। এদেশে একটু বেশিদিন থাকলেই বোঝা যায় যে এদেশে সব কিছুই একসঙ্গে জড়িয়ে আছে।'

লাল নেকো হীস্‌লপের চিঠিটা এই অব্দি পড়ার পর একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল আজিজ। পাড়ের দিক থেকে অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে। বুঝতে পারল যে মিছিল এগিয়ে আসছে। এবার দ্বিতীয় চিঠিটা পড়ল। এটা লিখেছে মিস কোয়েস্টেড। লিখেছে ফীলডিংএর বউকে। এ চিঠিরও দু একটা জায়গা বেশ মনোযোগ আকর্ষণ করে। য়্যাডেলার আশা 'র‍্যাল্‌ফ্‌ এই দেশটাকে আরও পছন্দ করবে। আমার চেয়েও ভাল লাগবে তার।' মনে হলো য়্যাডেলা তাকে কিছু টাকা দিয়েছে কারণ তার ধারণা নিজে এসে সে তার ঋণ শোধ করতে পারবে না। কোন্‌ ঋণের কথা বলতে চাইছে য়্যাডেলা? আজিজ মনে করবার চেষ্টা করছিল। সে বেশ বুঝতে পারল যে এরা পাঁচজন এখন এক হয়ে গেছে। হীস্‌লপও এদের দলের মধ্যে এসে গেছে। যেটুকু বিবাদ বিসম্বাদ ছিল তা মিটিয়ে ফেলেছে। হতভাগ্য ভারতীয়রা এখন এদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইংল্যান্ডের শক্তির যথার্থ উৎস এই অশুভ মিলনের মধ্যে। কথাটা মনে হতেই

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল আজিজ। আর উত্তেজনার বশে পিয়ানোর ওপরেই আঘাত করল। সব সুর কটা একত্র হয়ে আচমকা একটা কোলাহল সৃষ্টি করল। গেস্ট হাউসের শান্ত পরিবেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সেই কোলাহলে।

'কে? কে ওখানে?' অপেক্ষাকৃত একটা ভীতু স্বর কানে এল আজিজের। গলার স্বর চেনা চেনা লাগছে। কে হতে পারে মানুষটা? কিছুতেই মনে করতে পারল না আজিজ। গোধূলির ক্ষীণ আলোয় দেখল পাশের ঘরে কে যেন নড়েচড়ে উঠেছে। আজিজ চেঁচিয়ে বলল, 'আমি স্টেটের ডাক্তার। আপনাদের শরীর স্বাস্থ্য ভাল কি না দেখতে এসেছি। ঘোড়ায় চড়ে আসতে হয়েছে আমায়।' জবাবটা দিতে দিতেই চিঠি দুটো পকেটের মধ্যে পুরে নিল আজিজ। গেস্ট হাউসে যে তার অবারিতদ্বার তা বোঝাতে পিয়ানোর ওপর সে আবার আঘাত করল। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আলোয় এসে দাঁড়াল র‍্যাল্ফ্ মুর।

কাঁচা যৌবন ছেলেটার। বড় বড় নীল চোখ, একমাথা এলোমেলো চুল। আশ্চর্য সুন্দর দেখতে তো ছেলেটাকে। তবে দুশ্চিন্তায় চোখ দুটি একটু যেন নিষ্প্রভ। সাধারণত বিলেত থেকে সদ্য আমদানি হওয়া যুবকদের মতন দাম্ভিক চেহারা নয় ছেলেটার। আজিজের অভিজ্ঞ চিকিৎসক চোখ একবার চেয়েই বুঝতে পারল যে মায়ের বেশি বয়সের সন্তান। কিন্তু তার কবিমন অনুভব করল যে ছেলেটা অসাধারণ সুশ্রী। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আজিজ বলল, 'সারাদিন কাজের চাপে আসতে পারি নি। মৌমাছির কামড় কি বলছে?'

'ভাল নয়। আমায় ওরা বিশ্রাম করতে বলল। তাই শুয়েছিলাম।' ছেলেটা একে ভীতু তায় এদেশে নতুন। ঘটনার জটিলতায় কেমন যেন থমকে গেছে। ছেলেটাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে আজিজ বেশ কড়া স্বরে বলল, 'এদিকে এস তো দেখি তোমার ঘা কেমন?' সম্বোধনটা ততক্ষণে 'তুমি'তে নামিয়ে এনেছে আজিজ। অতবড় গেস্ট হাউসে ওরা তখন দুজন মাত্র। এখন ইচ্ছে করলে র‍্যাল্ফ্এর ওপর সেও নিষ্ঠুর হতে পারে। যেমন নুরুদ্দীনের ওপর মেজর ক্যালেণ্ডার হয়েছিল। র‍্যাল্ফ এবার খুব সন্তর্পণে বলল, 'সকালে বলেছিলেন...'

'বড় ডাক্তারদেরও ভুল হয়। আলোর কাছে এসে দাঁড়াও। দেখি তোমার ঘা কেমন।'

আজিজ ঘা পরীক্ষা করছিল। হঠাৎ ককিয়ে উঠল ছেলেটা।

'কি হলো?'

'আপনি লাগিয়ে দিলেন?' প্রায় কান্নার স্বরে বলল র‍্যাল্ফ্।

'লাগিয়ে দিলুম? আমি? তুমি জান যে আমি একজন পাশ করা ডাক্তার? এরকম অদ্ভুত কথা আমি এই প্রথম শুনলুম।'

'আমি যন্ত্রণার কথা বলছি না। যন্ত্রণা আমার নেই। কোন কষ্টও নেই।'

'বাঃ! তাহলে তো চমৎকার!'

'কিন্তু আপনি, মানে আপনার হাত দুটো ভয়ানক নিষ্ঠুর।'

আজিজ একমুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'ও। তাহলে মলমটা আর লাগিয়ে দেওয়া যাবে না।'

'আপনি ওটা রেখে যেতে পারেন না?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল র‍্যাল্ফ।

'মোটেই না। এটা আমার ডিস্পেন্স্যারির ওষুধ। কাজ হয়ে গেলেই ফেরত নিয়ে যেতে হবে।' এই বলে হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে ধরতে গেল আজিজ। র‍্যাল্ফ্ চকিতে টেবিলের অন্যদিকে ঘুরে গেল। আজিজ রীতিমত ক্রুদ্ধ। ডাক্তার রুগীর লুকোচুরি কার পছন্দ হয়। বেশ শক্ত করে আজিজ এবার বলল, 'দ্যাখো ছোকরা! আমার চিকিৎসা যদি পছন্দ না হয় তাহলে একজন ইংরেজ ডাক্তারকে দেখাতে পার। আমার কোন আপত্তি নেই। তবে হাতের কাছে সাহেব ডাক্তার পাবে না। একজনই আছেন এখানে। তিনি আশীরগড়ে থাকেন। কিন্তু চল্লিশ মাইল রাস্তা পেরিয়ে সেখানে যাবে কি করে বন্যায় বাঁধ ভেঙে গেছে। এখন কি করবে বল। ফীলডিংএর সঙ্গে দেখা হলে ভাল হতো। কোথায় সে?'

'ওঁরা নৌকো নিয়ে বেরিয়েছেন।'

আজিজ যেন দারুণ অবাক হয়েছে এমনি ভাব করে বলল

'সেকি? মউএর দিকে যায় নি তো? সাধারণত পুজো পার্বণে রাত্রির দিকে ওরা উগ্র হয়ে যায়।' আর তখনই আজিজের আশঙ্কার সমর্থনে জেলের দিক থেকে একটা চাপা শব্দ ভেসে এল। মনে হলো বুঝি বা কোন বিশালকায় দৈত্য দু'ঠোঁট ফাঁক করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

র‍্যাল্ফ্ হঠাৎ বলে উঠল, 'আমাদের সঙ্গে আপনার এরকম ব্যবহার করা উচিত হয় নি।'

আজিজ লক্ষ্য করল যে র‍্যাল্ফ্এর স্বর ভয় পাওয়া হলেও ক্ষীণ নয়। অর্থাৎ ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে ছেলেটা। আজিজ বলল,

'কি রকম?'

'আমরা তো আপনার কোন ক্ষতি করি নি ডাক্তার আজিজ।'

'দেখছি আমার নামটা তুমি জান। হ্যাঁ, আমিই ডাক্তার আজিজ।' একটু চুপ করে আজিজ ফের বলল, 'না। আমার কোন ক্ষতি তুমি কর নি। তোমার বান্ধবী মিস কোয়েস্টেডও করেন নি। কিন্তু '

আজিজের শেষ কথাটা বলা হলো না। স্টেটের সব কটা কামান একসঙ্গে গর্জে উঠল আর আজিজের বাকি কথাটা ডুবে গেল সেই গম্ভীর শব্দে। একটা হাউই ছাড়া হলো জেলের বাগান থেকে। এটাই নির্দেশ। অর্থাৎ মুক্তি দেওয়া হয়েছে একজন বন্দীকে। সদ্য মুক্তি পাওয়া বন্দীটা তখন সকলের পায়ের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছিল। বাড়ির ছাত থেকে পুষ্প বর্ষণ হচ্ছে—আনা হয়েছে নারকোল আর গন্ধদ্রব্য। ভগবানের মহামুক্তির যাত্রাপথটি হর্ষোৎফুল্ল। সারা শহরটি যেন পবিত্র মন্দিরে পরিণত হয়েছে। গেস্ট হাউসেও এ খবর পৌঁছেছে। আলোর রোশনাইতে ঝলমল করছে সব কিছু। ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল। দুর্গের ছাত থেকে মুহুর্মুহুঃ কামান ঝলসে উঠছে। সারা শহর আলোর বন্যায় মাখামাখি। বড় বড় বাড়িগুলো যেন আলোর ছোঁয়ায় নাচছে, প্রাসাদটা

ডানা মেলে আকাশে উড়তে চাইছে। অহরহ নামগান চলছে। 'রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণকৃষ্ণ রাধা রাধা।' নামগানের সুরমূর্ছনা আকাশপথে ঠেলে উঠতে চাইছে। ছড়িয়ে পড়া নামগানের শব্দ গেস্ট হাউসেও পেঁছে গেছে। ঘুমন্ত পাহারাদারের ঘুম ভেঙে গেল। মাটিতে গাঁথা বর্শার ডাণ্ডাটা ধরে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল লোকটা। আজিজও ততক্ষণে লাফ দিয়ে উঠেছে। তাকেও এবার ফিরতে হবে। 'গুড নাইট' বলে র‍্যাল্‌ফ্‌ এর দিকে করমর্দনের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। তার মনেই নেই যে এই মানুষগুলোকে কিছুক্ষণ আগেই সে শত্রু মনে করেছে। এরা যে তার বন্ধু নয় একথাটা ভুলেই গেছে সে। তার মন আরও দূরে একটা সুন্দর পৃথিবীতে চলে গেছে তখন। মাড়াবার গুহার সেই ভয়াবহ স্মৃতিটা আর যেন মনে পড়ছে না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল কত হীন হয়ে গেছে সে। র‍্যাল্‌ফ্‌ও অবাক। আজিজ তার দিকে চেয়ে আছে দেখে সেও হাত বাড়িয়ে দিল। আজিজ শান্তভাবে জিজেস করল, 'আমায় কি আর অমানুষ মনে হচ্ছে তোমার?'

'না।'

'কি করে বললে একথা?'

'কেন? এটা কি খুব শক্ত?'

'তুমি কি যে কোন বিদেশীকে বন্ধু করে নিতে পার?'

'পারি।'

'তুমি ঠিক আমাদের প্রাচ্য দেশের মানুষের মতন।' কথাটা বলে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে র‍্যাল্‌ফ্‌এর হতাটা ছেড়ে দিল আজিজ। তার তখন মনে পড়ে গেছে যে ঠিক এই কথাগুলোই সে মিসেস মুরকেও মসজিদের মধ্যে বলেছিল। সেদিনই গাঁথা হয়ে গিয়েছিল মিলনের মালাটি। তারপর অনেক যাতনা সয়ে মালার ফাঁস থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিল। মনে মনে তখন বলেছে কখনও ইংরেজদের বন্ধু মনে করবে না। মসজিদ, গুহা, গুহা, মসজিদ—ঘটনা ঘটল কত কি! সবকিছু ভেঙে চুরে গেল। আজ বোধহয় সেই ছেঁড়া সুতোটা জোড়া লাগতে চলেছে। র‍্যাল্‌ফের হাতে মলমটা দিতে দিতে আজিজ গাঢ় স্বরে বলল, 'মলমটা রাখ। এটা ব্যবহার কর। যখন ব্যবহার করবে আমার কথা মনে পড়বে তোমার। এটা আর আমায় ফেরত দিতে হবে না।' হাঁ করে তাকিয়ে ছিল র‍্যাল্‌ফ্‌। আজিজ ফের বলল, 'তুমি মিসেস মুরের ছেলে। তোমায় একটা ছোট্ট উপহার দিতে চাই। আমার তো আর কিছুই নেই। তাই এটাই তোমায় দিলাম।'

র‍্যাল্‌ফ্‌। হাত বাড়িয়ে ওষুধটা নিল। আজিজের যে মনটা লুকানো ছিল তার একটা ভগ্নাংশ যেন অনুভব করল র‍্যাল্‌ফ্‌।

আজিজ কিন্তু তখনই পুরোপুরি আত্মবিস্মৃত হয় নি। র‍্যাল্‌ফের দিকে চেয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি হীস্‌লপের ভাই। আর তাই এই দুই জাতি কখনও পরস্পরের বন্ধু হবে না।'

'তা জানি। অন্তত এখনও তা হয় নি।' বলল র‍্যাল্‌ফ্‌।

'তোমার মা আমার কথা কিছু বলেন নি তোমায়?'

'বলেছেন। চিঠিতে বলেছেন। অনেকবার। তিনি আপনাকে স্নেহ করতেন।'

আজিজ স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। বলল, 'হ্যাঁ এই সংসারে তিনিই আমার সব থেকে আপনজন ছিলেন।' কথাটা বলেই হতবুদ্ধি হয়ে গেল আজিজ। কেন এই কৃতজ্ঞতাটুকু জানাল সে? মিসেস মুর যথার্থ ভালমানুষ। কিন্তু কেন তার প্রতি তাঁর এই সদাশয়তা? এর কি কোন প্রমাণ আছে? না নেই। কারণ কোন প্রমাণ রেখে তিনি স্নেহমমতা দেখান নি। সে যখন হাজতে ছিল তখন একদিনও তাকে দেখতে যান নি। এমনকি তার হয়ে সাক্ষীও দেন নি। তবুও তার হৃদয়ের ভালবাসা আর কৃতজ্ঞতাবোধ চুরি করে নিয়ে গেছেন তিনি। এবং সে নিজেও কৃতার্থ হয়েছে তাঁর স্নেহ পেয়ে। আজিজের হঠাৎ ভীষণ ভাল লাগতে শুরু করল। আকাশময় জলভরা মেঘেরা খেলা করছে। মিছিলের আলোগুলো চোখে পড়ল। আন্দোলিত পর্দার বুকে যেন ছবি এঁকে যাচ্ছে আলোগুলো। সেদিকে চেয়ে আজিজ বলল, 'এটা আমাদের বর্ষাকাল। বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋতু। আমার খুব সাধ ছিল উনি এখানকার একটা বর্ষা দেখুন। এই সময় সব কিছুই নতুন জীবন পায়। ধুলো লাগা মলিন চেহারা ধুয়েমুছে যায়। সবাই আনন্দে খুশিতে ভরপুর হয়ে ওঠে। নবীন প্রবীণ সবাই। দ্যাখ না সবাই কত খুশি! হিন্দুরাও আজ কত খুশি হয়ে উঠেছে। হয়ত আমরা ঠিক অনুভব করতে পারছি না। নদীনালা সব খুশিতে ভরপুর। এই আমাদের ভারতবর্ষ। তুমি যদি স্রেফ সরকারী কাজের লোকের সঙ্গে না আসতে তাহলে তোমায় আমাদের দেশ দেখাতে পারতাম। তবুও কিছুটা দেখাব আজ। চল আমার সঙ্গে একটু নৌকোবিহার করে আসি। অন্তত আধ ঘণ্টার জন্যে এস।'

আজিজ কি আবার জীবনে জীবন মেলাতে চলেছে? আজিজ আর পিছু হটবে না। এই অন্ধকারের মধ্যেই র‍্যাল্ফ্‌কে নিয়ে সে বেবোবে। তার কাছে মিসেস মুরের ছেলে র‍্যাল্ফ মুর এটুকু কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারে। দাঁড় দুজোড়া যে লুকানো আছে আজিজ তা জানত। সুতরাং সে চারটে দাঁড়ই বার করে আনল। দুটো তারা ব্যবহার করবে আর অন্য দুটো ফীলডিংকে দেবে। দাঁড়ের বদলে ফীলডিং যে লগি ব্যবহার করছে তা সে বুঝেছে। কিন্তু বাতাসের বেগ যেভাবে বাড়ছে তাতে ওরা বিপদে পড়তে পারে। সুতরাং ওদের হাতে দাঁড় দুটো দেওয়া দরকার।

জলে নৌকা ভাসানর পর অনেক সহজ হয়ে গেল আজিজ। সব অস্বস্তি কেটে গেল যেন। সে দেখেছে একটা সৎ কাজ থেকে আর একটায় যাওয়া খুব সহজ হয়। এবারও তাই হলো। র‍্যাল্‌ফের জন্যে তার আতিথেয়তা উজাড় করে দিতে চাইল আজিজ। আজকের এই হিন্দু উৎসব সম্বন্ধে সে যত অজ্ঞই হোক, এমন ভাব দেখাল যেন এর আচার বিচারের খুঁটিনাটি কিছুই তার অজানা নয়। মিছিলের উন্মত্ততা, শব্দ এবং আলোর হুড়োহুড়ি সবই এখন তার কাছে সহজ হয়ে গেছে। কোন কিছুই তাকে অশান্ত করতে পারল না। নৌকা বাইতে হচ্ছিল না। অনুকূল বাতাস পেয়ে জলের বুকে নৌকা তরতর করে ভেসে যাচ্ছে। একসময় চরায় গিয়ে ঠেকল নৌকাটা।

ধড়ফড় করে উঠল কয়েকটা বক। ভাদ্রের বন্যায় ডুবে যাওয়া এই চরায় ওরা সাময়িক বাসা করেছিল। ভেবেছিল বোধহয় এটাই ওদের পাকা আস্তানা হবে। কিন্তু তা হলো না। ওদের উড়ে যেতে হলো।

এটা আসলে একটা ডিঙি। গলুইয়ের কাছে হাতে দাঁড় নিয়ে জড়সড় হয়ে বসেছিল র‍্যাল্ফ্। এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। হঠাৎ থেমে গেল নৌকো। সে পিছন ফিরে তাকাল। তখন পরপর দুবার বিদ্যুৎ চমকাল। ভারি আকাশ-টার গায়ে যেন লাল আঁচড় কাটা হলো। বিদ্যুতের চকিত আলোয় র‍্যাল্ফ হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে মনে মনে চমকে উঠল যেন। আজিজের দিকে চেয়ে বলল, 'উনি কি রাজা ?'

'রাজা ? কোথায় ?' আজিজও চমকিত।

'একটু পিছনে দাঁড় টানুন।'

'অসম্ভব। রাজা কোথায় ? রাজাটাজা নেই...'

'একটু ঘোরান না নৌকাটা ?'

আজিজ চেষ্টা করল। কিন্তু উল্টো হাওয়ার দাপটে এক দাঁড়ও এগোতে পারল না। তবুও গেস্ট হাউসের আলোর বিন্দুটার দিকে নজর স্থির রেখে দু'এক দাঁড় পিছু হটবার চেষ্টা করল আজিজ। আর তখনই র‍্যাল্ফ্ বলে উঠল,

'ওই তো !'

এবার রাজাকে স্পষ্ট দেখতে পেল আজিজ। অন্ধকারের বুকে রাজার শরীরটা ভাসছে। পরনে উজ্জ্বল রাজপোশাক। মাথার উপরে চাঁদোয়া। আজিজও তখন বিমূঢ় হয়ে গেছে। ফিসফিস করে বলল, 'ওটা যে কি বলতে পারব না। তবে রাজামশাই বেঁচে নেই। তিনি দেহ রেখেছেন। চল আমরা ফিরে যাই।'

ওরা যেখানে থেমেছে তার খুব কাছেই জলবেষ্টিত অন্তরীপ। এখানেই মউ রাজপরিবারের মৃত মানুষদের স্মৃতিবেদীগুলো প্রতিষ্ঠা করা আছে। রাজার পিতৃদেবের স্মৃতিসৌধও আছে। গাছের ফাঁক দিয়ে সেই মৃত রাজপুরুষের একটা মর্মর মূর্তি চোখে পড়ল আজিজের। আজিজ শুনেছে অনেক খরচ করে এই মর্মর মূর্তিটা বানানো হয়েছিল। মূর্তিটা নাকি প্রায় জীবন্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হবে তিনি সিংহাসনে বসে আছেন। এর আগে এই মূর্তি সে কখনও দেখে নি, যদিও অনেকবার দীঘিতে নৌকাবিহার করেছে। আজ র‍্যাল্ফ্ই তাকে মূর্তিটা দেখাল। র‍্যাল্ফ্ যেন আগন্তুক নয়। সেই তার পথপ্রদর্শক। আজিজ জিজ্ঞেস করল, 'এবার কি আমরা ফিরে যাব ?'

'কিন্তু মিছিল এখনও আছে।'

'তাহলে কাছে যাবার দরকার নেই। ওদের অনেক রকম অভিনব ক্রিয়াকর্মাদি আছে। সে সব দেখে তোমার খারাপ লাগতে পারে।'

'তা হোক। আর একটু কাছে যাই চলুন। 'র‍্যাল্ফ্ বলল।

ছেলেটার অনুরোধ আজিজ ঠেলতে পারল না। মনে মনে সে নিজেও জানত যে মিসেস মুরের সন্তানের কোন অনুরোধ সে উপেক্ষা করতে পারবে না।

'রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণকৃষ্ণ, রাধারাধা', জলের বুকের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে নামগান। হঠাৎ নামগান পরিণত হলো মুক্তির বাণীতে। পরিষ্কার শুনতে পেল আজিজ। ঠিক যেমনটি সে মামলার দিন শুনতে পেয়েছিল। আজিজ ফিসফিস করে বলল, 'রাজা যে মারা গেছেন এ কথাটা কাউকে জানিও না। খবরটা গোপন, আমারও বলা উচিত হয় নি! উৎসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত খবরটা গোপনই থাকবে। আরও কাছে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ।' বলল র‍্যাল্‌ফ্‌ মুর।

আজিজ চেষ্টা করছিল যাতে আলোর বৃত্তের বাইরে নৌকাটা রাখতে পারে। তখন দীঘির অপর পাড়ও মশালের আলোয় ঝলমল করছে। ঘন ঘন কামান দাগা হচ্ছে এবং হাউই ছাড়া হচ্ছে। হঠাৎ একটা ভাঙা দেওয়ালের আড়াল থেকে শ্রীকৃষ্ণের শিবিকা আবির্ভূত হলো। দীঘির ঘাটে শিবিকা নামানো হলো। শিবিকার দুপাশেই ভক্তেরা প্রবল আবেগে আকুলিবিকুলি করছে। এদের মধ্যে একজন সাধিকাও আছে। মেয়েটা সুন্দরী এবং যুবতী। মাথায় ফুল গোঁজা এই সুন্দরী মেয়েটি কৃষ্ণ ভজনা করে চলেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে তার ভাবারোপ হচ্ছে। ভক্তেরা এবার জলে নামল এবং জলে দাঁড়িয়েই মণ্ড প্রস্তুত করে ভক্ষণ করল। বৃদ্ধ গড়বোলে আজিজের নৌকাটি দেখেছিলেন। ঘাটে দাঁড়িয়েই তিনি হাত নাড়লেন আজিজের উদ্দেশে। আজিজের উপস্থিতিতে তিনি বিরক্ত হয়েছেন, না খুশি হয়েছেন বোঝা গেল না। পাড়ের উপর সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাতীর পাল। রাজার গোলন্দাজ সৈন্যবাহিনী কামান, গোলা, বারুদ নিয়ে অপেক্ষারত। একটু দূরে সাধারণ মানুষ নিঃশব্দে, অপেক্ষা করছে পরম মুহূর্তটির জন্য। এমন সময় ঝড় উঠল। বাত্যাবিক্ষুব্ধ দীঘির জলে দোলা লাগল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো বর্ষণ। হঠাৎ বর্ষণে ভক্তেরা বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। নামগান থেমে গেছে। এবার ভগবানের মৃন্ময় মূর্তির বিসর্জন হবে। অনুষ্ঠানাদি ক্রিয়াকর্ম সমাধা করে ভগবানকে জলে বিসর্জন দেওয়া হলো। প্রতি বছরেই তাঁর মূর্তি জলে ভাসান হয়। তারপর একে একে বিসর্জন দেওয়া হলো নৈবেদ্যাদি, কুলা, পঞ্চশস্য আরও কত উপচার এবং গণপতি মূর্তি। অনন্তলোকে যাবার পথটি স্বয়ং শ্রীভগবান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ভক্তদের তিনিই পথের সন্ধান দেন। অগম্য এই পথের দিশা তিনি ছাড়া কে দেবে? তিনি সাধারণ বুদ্ধির অগম্য বলেই এ পথ কঠিন বলে ভাবি আমরা।

অবশেষে গোকুলের মৃন্ময় মডেলটি নিয়ে আসা হলো। মন্দিরের মধ্যে এরই একটি প্রতিরূপ রক্ষিত আছে। সেই আসল মডেলটি রৌপ্যনির্মিত। এই মৃন্ময় মূর্তিটিরও বিসর্জন হবে। একজন নিম্নকুলোদ্ভব পুরুষ মৃত্তিকা-নির্মিত মডেলটি বুকের কাছে নিয়ে জলে নামল। লোকটার পরনে একটা নেংটি। অনাবৃত শরীর স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ঝলমল করছে। ক্ষীণ কটিদেশ আর বৃষস্কন্ধের এই পুরুষ মানুষটির মুখে কোন ভাববিকার নেই। অথচ সমস্ত অনুষ্ঠানটির বিজয়কেতন এই লোকটাই ধারণ করে আছে। বংশ-পরম্পরায় এই অধিকারটি সে ভোগ করে আসছে। গোকুলের মডেলটি জলে

ভাসিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলোকের তোরণটি সে বন্ধ করে দেয় যেন। লোকটা আরও গভীর জলে নামল। জল বাড়ছে। ছোট ছোট ঢেউয়ের ধাক্কায় মাটির পুতুলগুলো খসে যাচ্ছে। এইভাবে রাজা কংস সিংহাসনচ্যুত হলেন। জলমগ্ন হলেন শ্রীভগবানের জনকজননী। এমন সময় ক্রুদ্ধ বাতাসের ধাক্কায় দীঘির বুকে তুফান উঠল। একটা ভয়ার্ত চীৎকার শোনা গেল, 'সামাল'! তারপরই প্রবল একটা শব্দ। নৌকা দুটোয় পরস্পর সংঘর্ষ লাগল।
দুই নৌকার চারজন আরোহীই তখন ছিটকে পড়েছে জলে। ওদের হাতে ধরা দাঁড়কটা হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং ঘূর্ণিবাত্যায় আবর্তিত হয়েছে ওদের দেহগুলো। তীরে দাঁড়িয়ে ভক্তেরা চেঁচিয়ে উঠল। জলের টানে অসহায়ের মতন ওরা তখন ভেসে যাচ্ছে মডেল হাতে লোকটার দিকে। লোকটার মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। হাতে ধরা কাঠের ট্রের ওপর রক্ষিত পুতুলগুলো একে একে জলে ধুয়ে যাচ্ছে। অবশেষে লোকটা জলে ভাসিয়ে দিল কাঠের ট্রেনখানা।
কাঠের তক্তার প্রথম ধাক্কা পেল স্টেলা। মৃদু আঘাত। কিন্তু তাতেই সংজ্ঞাহীন হয়ে গেল স্টেলা এবং স্বামীর দুই বাহুর মধ্যে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু ফীলডিংয়ের বাহুর আড়ালে আটকে রইল না স্টেলা। জলের ধাক্কায় তার অচৈতন্য শরীরটা তখন আজিজের দিকে ভেসে যাচ্ছিল। সবাই বিপর্যস্ত। পরিশ্রান্ত দেহগুলো তখন তীরের কাছে অগভীর জলে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। অবশেষে অনেক পরিশ্রমে ওরা নিজেদের বিপদমুক্ত করে দাঁড়িয়ে উঠল। জনতা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। অন্ধকার জলের বুকে তখন ভাসছে দাঁড়, কাঠের বারকোশ আর আজিজের পকেটের দুখানা চুরি করা চিঠি। ওরা শুনতে পেল অনেক মানুষের হর্ষধ্বনি। আতসবাজি এবং কামান দাগার শব্দ। কিন্তু সব শব্দ ছাপিয়ে আকাশের বুক চিরে বেরিয়ে এল মুগুরের ঘা মারার মতন গম্ভীর মেঘগর্জন।
নাটকের ক্লাইম্যাক্স হলো এই মেঘগর্জনে। তখন অজস্র ধারায় শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি। দেখতে দেখতে সবাই ভিজে গেল। ভিজে গেছে পাল্কির ঢাকা। জ্বলন্ত মশাল নিভে গেছে। আতসবাজি জ্বলল না। কাঠের রেকাবখানা জল থেকে তুলে এনেছেন গড়বোলে। রেকাবের গায়ে লেগে থাকা খানিকটা মাটি নিয়ে তিনি কপালে মাখলেন। পালাগান থেমে গেছে। যা ঘটবার ঘটেছে। নিমজ্জমান চারটে মানুষ তখন কোনক্রমে জল থেকে উঠে এসেছে। এই উৎসবে ওরা সবাই অনাহূত। ওদের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। ভক্তেরা ক্লান্ত পায়ে শহরমুখো হাঁটতে শুরু করেছে। আগামীকাল মূল বিগ্রহের নিরঞ্জন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবে। তারপর অনন্তশায়িত হবেন শ্রীভগবান। আবার তাঁকে লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু নামকীর্তন বন্ধ হবে না। চলবে অন্য অনুষ্ঠানও। ধর্মের বহিরঙ্গের দিক এই অনুষ্ঠানগুলি। কিন্তু গত চব্বিশ ঘণ্টার এত কোলাহল আর আয়োজনের মধ্যে প্রাণের উৎসটি যে কোথায় লুকিয়েছিল তা কেউ জানে না। বজ্রগর্ভ মেঘের অন্তস্তলটি খুঁজে বার করার চেয়েও যেন দুঃসাধ্য এই অন্বেষণ।

৩৭

দুজনে আবার বন্ধু হয়ে উঠেছে—আজিজ আর ফীলডিং। অবশ্য ওরা জানত যে এটাই ওদের শেষ সাক্ষাৎ। এরপর দুজনে দুদিকে চলে যাবে, হয়ত জীবনে দ্বিতীয়বার দেখা হবে না। সেদিন মউএর বনপথ দিয়ে ঘটা করে দুই বন্ধু চলেছে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে। ইতিমধ্যে বন্যার জল সরে যাওয়ায় পথঘাট খুলেছে। গেস্ট হাউসের অতিথিদেরও ফিরতে হবে এবার। পরের দিন সকালেই ফীলডিংরা রওনা হচ্ছে। রাজার মৃত্যুর খবরটা সরকারীভাবে জানানো হয়ে গেছে। মোটকথা ফীলডিংএর এই সফর পুরো-পুরিভাবে নিষ্ফল হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে তার আসা তা মেটে নি। গড়বোলে কথা রাখে নি। প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিষ্ঠিত রাজা পঞ্চম জর্জ হাইস্কুল পরিদর্শনের ব্যবস্থা সে করে নি। কোন না কোন ছল ছুতায় এড়িয়ে গেছে। কিন্তু কেন সেটাই জানত না ফীলডিং। এখন জানল। পাশাপাশি চলতে চলতে আজিজ হাটে হাঁড়ি ভাঙল। ইস্কুলভবন নাকি এখন গুদামে পরিণত হয়েছে। গতবছর অভিষেক অনুষ্ঠানের পর থেকেই এই বেহাল অবস্থা চলছে। বড়লাট বাহাদুর প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বেশ আড়ম্বর করে উদ্বোধন হলো। কিন্তু তারপরই সব উৎসাহ থেমে গেল। ছাত্র যোগাড় হলো না এবং ইস্কুলের বাড়বাড়ন্তের ছবিটা ফাইলের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল। এসব লজ্জার কথা গড়বোলে কি করে বলেন! তাই নানা ছুতা করে ব্যাপারটা আটকে দিয়েছিলেন। অবশ্য গড়বোলে আবার উদ্যোগ নিয়ে-ছেন। তাঁর আশা নতুন ছাত্র নিয়ে ইস্কুল আবার খুলবে। গড়বোলের আশার কথা শুনে ফীলডিং হেসে উঠল। তার ধারণা এতে শুধু পরিশ্রমই সার হবে, কাজের কাজ হবেনা। এদেশে শিক্ষা নিয়ে কেউ ভাবে না। তবে কেউ না ভাবলেও ফীলডিংকে এখন ভাবতে হয়। কারণ এটাই তার চাকরি। তার এবং পরিবারের ভাতের যোগাড় এখান থেকেই হয়। আজকাল তাই দায়শূন্য হয়ে আগের মতন হালকা হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে না ফীলডিং। শিক্ষা নিয়ে ভাবতে হয় বলেই নেটীভ স্টেটগুলোর এই অবহেলা অত্যন্ত মর্মন্তুদ মনে হয়। সে ঠিক করল ব্যাপারটা নিয়ে গভীর কোন কথা বলবে। কিন্তু আজিজের উচ্ছ্বাস তাকে অন্যমনস্ক করে দিল। সেদিন রাত্রের নৌকাডুবির পর থেকেই ওদের দুজনের বন্ধুত্ব যেন নতুন হয়ে উঠেছে। আবার বন্ধু হয়ে গেছে দুজনে। হাসতে হাসতে সেই পুরনো সম্পর্কেই ফিরে গেছে তারা। দুই বন্ধু এখন খোলা মনে চলেছে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে। দুজনের চোখে মুগ্ধতা। প্রকৃতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে তারা। মুগ্ধ হয়ে দেখছে আর

প্রকৃতির অনন্য রূপসুধা পান করছে। হঠাৎ বনপথ উন্মুক্ত হয়ে গেল খোলা মাঠের মধ্যে। সূর্যালোকে ঝকঝক করছে প্রান্তর। ঘাসে ঢাকা ঢালু জমিতে বহুবর্ণের প্রজাপতি নেচে বেড়াচ্ছে। ওদের সামনে দিয়ে দৃকপাতহীন অবহেলায় একটা অজগর সাপ এঁকেবেঁকে চলে গেল এবং আতা গাছের ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হলো। নীল আকাশের বুকে মাঝে মাঝে সাদা মেঘ গোল হয়ে জমে আছে। ভরন্ত ডোবায় ছায়া পড়েছে মেঘের। দূরের পাহাড়টার গায়ের রঙ মেটে মেটে। মন ভর ওঠে এই প্রাকৃতিক পরিবেশে। ইংল্যাণ্ডের পার্কের কথা মনে পড়ে গেল ফীলডিংএর। ওরা একসময় ঘোড়া থামাল। আজিজ তখন সন্তর্পণে একটা চিঠি বার করেছে। মিস কোয়েস্টেড়কে লেখা চিঠিটা সে পাঠাতে চায়। ফীলডিংকে পড়তে দিল চিঠিটা। চমৎকার চিঠি। দু বছর আগে য়্যাডেলার সরল নিরহঙ্কার ব্যবহারের জন্যে আজিজ তাকে ধন্যবাদ দিয়েছে। আজিজ লিখেছে, 'হঠাৎ দীঘির জলে পড়ে গেলুম। কেন পড়লুম কি করে পড়লুম, সে আর এক গল্প। ফীলডিংএর কাছে জেনে নেবেন সে কথা। জলের মধ্যে পড়ে যাবার পরেই আপনার কথা মনে হয়েছিল আমার। মনে হয়েছিল সত্যিই আপনি সৎ এবং সাহসী মহিলা। সেদিন আপনার সাহায্য না পেলে আজ এমনভাবে ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর সংসার করতে পারতুম না। জেলে পচে মরতাম। আপনার এই সাহস এবং স্বার্থ-ত্যাগের কথা আমি ছেলেমেয়েদেরও বলে যাব, যাতে আপনার যোগ্য মর্যাদা তারা দিতে পারে।'

চিঠিটা পড়ে ফীলডিং বলল 'মিস কোয়েস্টেড খুব খুশি হবেন তোমার চিঠি পড়ে। ওঁকে যে ঠিকমতন চিনতে পেরেছ তার জন্যে আমি খুশি।'

আজিজ চুপ করে শুনছিল। বলল, 'আমি নিজেও এমন দু একটা কাজ করে দিতে চাই যাতে মাড়াবারের সেই দুঃসহ স্মৃতিটা মন থেকে মুছে যায়।' একটু থেমে আজিজ ফের বলল, 'সেদিন তোমার সম্বন্ধে অত্যন্ত হটকারী একটা মন্তব্য করেছিলুম। ভেবেছিলুম আমার পাওনা টাকাটা তুমি ভোগা দিয়ে নিতে যাচ্ছ। কিন্তু এটা যে কতবড় ভুল ! ঠিক মাড়াবারের গুহার মতন একটা ভ্রমের মধ্যে তখন ছিলাম যেন।'

'ভাল কথা। আমার স্ত্রী স্টেলা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'কেন ?'

'সেও বিশ্বাস করে যে মাড়াবার মুছে গেছে।'

'কি করে ?'

'জানি না। হয়ত সেই কথাটাই তোমায় বলবে। আমায় বলে নি। বস্তুত ওর মতের সঙ্গে আমার মত মেলে না। তাই বলে নি। যখন দূরে থাকি তখন ওর মতগুলো আমার কাছে খুব ছেলেমানুষি মনে হয়। আবার যখন কাছে থাকি, তখন মানুষটাকে ভালবাসি বলে, তার মতামতগুলো মেনে নিতে ইচ্ছে করে। যখন ওর কাছে থাকি তখন দৃষ্টি বুদ্ধি সব যেন লোপ পেয়ে যায়। আমার স্ত্রী একটু অন্য ধরনের মানুষ। তোমার আমার মতো নয় ও। আমার ধারণা ও একটা গভীর কিছু পেতে চায়। সেটা কি জানি না। তবে আমাদের

দলে ও পড়ে না।'

আজিজ অবাক। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ফীলডিংয়ের দিকে চেয়ে বলল 'কি বলছ তুমি সিরিল ? স্টেলা তোমার অনুরক্ত নয় ? আমি তো ভাবতেই পারছি না ব্যাপারটা।'

ফীলডিং ইতস্তত করছিল। বিয়ে করে সে যে খুব সুখী হয় নি তা ঠিক। কিন্তু ঘটা করে এখনই তা বলা উচিত হবে কি ? সে জানে স্টেলা তাকে মনের মতন করে ভালবাসে না। অন্তত সে তার স্ত্রীকে যতটুকু ভালবাসে ততটুকু স্টেলা তাকে ভালবাসে না। কিন্তু ভালবাসা নিয়ে জোর চলে না। তাই কোনরকম দাবিও সে করে নি তার স্ত্রীর কাছে। অবশ্য মউতে আসার পর থেকেই যেন অনেক সহজ হয়ে গেছে ওদের সম্পর্কটা। জায়গার গুণ বলা যেতে পারে। এখন দুজনে দুজনকে বেশ বুঝতে পারে। একটা চমৎকার বোঝাবুঝি—মধুর একটা মনের মিল। সম্পর্ক রাখতে হলে যেটা দরকার। দুপক্ষেই যেটা মেনে নিতে হয়। হয়ত এখানকার এই নৈর্ব্যক্তিক আধ্যাত্মিক পরিবেশের দরুন ওদের মধ্যের সম্পর্কটা পবিত্র হয়ে উঠেছে। এখন সে বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারে স্টেলা যে শুধু ভালবাসে তা নয় সে আরও বড় কিছু দিতে চায় তাকে। কিন্তু সেটা যে ঠিক কি তা জানা না থাকায় ফীলডিংএর ভাবনা এলোমেলো হয়ে গেল। তার মনে হলো আজিজ যদি স্টেলার সঙ্গে কথা বলতে না চায়, তবে ওর ভায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে। র‍্যাল্‌ফ্‌ও চালাক ছেলে। তবে বোনের মতন গভীর নয়। বললও সে কথা আজিজকে। কিন্তু আজিজ রাজি হলো না। সরাসরি বলে দিল সে কথা। বলল, 'না। আমি কারো সঙ্গেই এ নিয়ে কথা বলতে চাই না। র‍্যাল্‌ফ্‌কে আমার খানিকটা ভাল লেগেছে কারণ ছেলেটা বুদ্ধিমান। অন্তত এদেশে এসে একজন ভারতীয় বন্ধু সে ঠিক যোগাড় করে নিয়েছে। তাছাড়া সেই-ই আমায় তোমার কাছে এনেছে। আমাদের যোগাযোগ করে দিয়েছে। অন্তত যাবার আগে আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে পারছি। কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য কথা ভেবে লাভ কি যখন দুজনেই জানি যে কালই আমরা আলাদা হয়ে যাব ? ওসব কথা থাক। একসঙ্গে বেড়ানর আনন্দটা আজ আর নষ্ট করতে চাই না সিরিল।'

'ঠিক বলেছ আজিজ। আমিও তা চাই না।' বলল ফীলডিংও। বস্তুত এটাই তাদের শেষ সাক্ষাৎ। তাই বিকালের এই মুহূর্তটা বিষণ্ণ করতে মন চাইছিল না। নির্বোধ ভুল বোঝাবুঝিগুলো মিটে গেছে ঠিকই, কিন্তু সামাজিক বাধা পেরিয়ে ওদের মিলিত হবার জায়গা নেই। ভাগ্যই তাদের পৃথক করে দিয়েছে যেন। যাঁকে সে বিয়ে করেছে তিনি তাদেরই ইঙ্গভারতীয় সমাজের একজন। তাই বিয়ের পর থেকে সামাজিক কিছু কিছু বাধাবিপত্তি তাকেও মেনে নিতে হচ্ছে। তার অবাক লাগছে যে বিয়ের আগে সে এত উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়েছিল কেন? একজন অজ্ঞাতকুলশীল ভারতীয়ের স্বার্থ দেখতে গিয়ে সে নিজের সমাজের মানুষদের ওপর অবিচার করেছিলই বা কেন ? এটা এক ধরনের বীরত্ব প্রদর্শন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অসার আবেগের কতটুকু দাম ?

আজিজ তার আবিষ্কার, তার জীবনের স্মারক। তাকে নিয়ে গৌরবের অন্ত নেই তার। কিন্তু তবুও স্মৃতির মধ্যেই তাকে লালন করতে হবে। কারণ, আলাদা সমাজের মানুষ সে এবং পৃথকই থাকতে হবে তাদের। এটাই ভবিতব্য। সুতরাং যারা তার যথার্থ আপন তাদের কথাই ভাববে সে এবং এই মুহূর্তে স্ত্রীর কথাই শুধু মনে পড়তে লাগল ফীলডিংএর, কারণ সেই-ই সবচেয়ে প্রিয়জন তার কাছে। বনের পথে নিঃশব্দে চলেছে দুই সওয়ার। ফীলডিংই প্রথম কথা শুরু করল। বলল, 'মউতে এসে আমার স্ত্রীর খুব উপকার হয়েছে। শান্ত হয়ে গেছে ওর মন। দুই ভাইবোনই মনের অশান্তিতে ভুগছিল। বিশেষ আমার স্ত্রী। একটা অদ্ভুত মানসিক কষ্ট পাচ্ছিল সে। এখানকার উদাসীন বাতাস আব মাটিব স্পর্শ পেয়ে সেই কষ্টটা ভুলেছে স্টেলা।' একটু চুপ করল ফীলডিং। তারপর বলল, 'সহস্র চুম্বনের বিহ্বলতা ঘিরে আছে ওদের। বাতাসে তারই মদিরতা। রেতঃধারার মতন আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে এবং মাটি তা শুষে নেয় এবং গর্ভবতী হয়। তুমি জান আজিজ কি আছে এখানকার বাতাসে? এই কৃষ্ণপ্রেমের ভাবটাই বা কি?'

আজিজ অবাক। ফীলডিংকে সে এমন আবেগপ্রবণ কখনও দেখে নি। তাই অত্যন্ত সাদামাটা গলায় সে বলল, 'তুমি উৎসবটা সম্বন্ধে জানতে চাও? হিন্দুরা বলে গোকুল অষ্টমী। এদিনটা সরকারী ছুটির দিন। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?'

'গোকুল! গোকুল! অর্থাৎ কৃষ্ণ যে গ্রামে জন্মেছিলেন। কিংবা অন্য একটা গ্রামে। শুনেছি এই নিয়ে কিছু সংশয় আছে। যেমন বেথলেহেম আর নাজারেথ নিয়ে সংশয় আছে। কিন্তু তা নয়। আমি যা জানতে চাই তা আধ্যাত্মিক দিক। তেমন কোন আধ্যাত্মপ্রেরণা কি এখানে আছে?'

'জানি না।' অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে জবাব দিল আজিজ। আরও বলল 'হিন্দুদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করে লাভ নেই। কারণ ওদের সঙ্গে কথা বলে কিছু জানা যায় না। তাছাড়া ওরা অত্যন্ত গোঁড়া। কিসে যে ওদের আচার ক্ষুণ্ণ হয় আমি বুঝি না। যেমন ধর, ওদের মন্দিরের কাছে গেছি হয়ত এর দরুন আমার চাকরি যেতে পারে কিংবা মাইনেও বাড়তে পারে। কোন্‌টা হবে তা পরে জানব। সুতরাং ওদের সম্বন্ধে তোমার এত কৌতূহল কেন?'

'কেন তা বোঝান মুশকিল। আমিও নিজে ওদের ঠিকমতন বুঝি না। এবং গড়বোলে ছাড়া আর কাউকে ভালও লাগে না। তাও গড়বোলের সবটুকু নয়।' একটু চুপ করে ফীলডিং হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা! মানুষটা কি এখন তেমনি "দেখা দাও, দেখা দাও" বলে চেঁচায়?'

'ধরে নাও তাই।'

আজিজের কথা শুনে ফীলডিং অবাক হয়ে গেছে। বিস্ময়ে ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে তার। ঠোঁট দুটো বন্ধ করে এবার হাসল ফীলডিং। তারপর বলল, 'সত্যিই তোমায় আমি বোঝাতে পারব না কেন আমার স্ত্রী হিন্দুধর্মকে এত ভালবেসে ফেলল? একা নয় ভাইকেও টেনেছে দলে। তবে ধর্মের কাঠামো

নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই। অবশ্য এ নিয়ে স্টেলা আমার সঙ্গে কথা বলবে না। আমার মনে হয় ওরা ধরেই নিয়েছে যে কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে ওদের জীবনে। আর তাই এই সঙ্কোচ। যা হোক আজিজ! আমি চাই তুমি ওদের সঙ্গে কথা বল। তুমিই ওদের ঠিকমতন বুঝতে পারবে। কারণ তুমি এই গোলার্ধের মানুষ।'

আজিজ কোন জবাব দিল না। তবে এও ঠিক যে স্টেলা বা র‍্যাল্‌ফের সঙ্গে সে যেচে আবার দেখা করবে না। কেন করবে? ওরা তো দেখা করতে চাইছে না? ওদের মনের গোপন ভাবনার কথা জেনে তার কি লাভ? ইদানিং সিরিল কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ওর চিন্তাগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে এখন। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সে সচেতন হয়ে উঠল। মিস কোয়েস্টেডকে লেখা চিঠিটার কথা মনে পড়ে গেল। পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে পড়ল একবার। তার মনে হলো চিঠিখানা ঠিকমতন লেখা হয় নি। সে আরও কিছু বলতে চায়। তাড়াতাড়ি কলম বার করে সে লিখল, 'এখন থেকে আপনাকে আমি একজন মহৎপ্রাণা মহিলার সঙ্গে স্মরণ করব। তিনি কে আপনি জানেন। তাঁর নাম মিসেস মুর।' চিঠির শেষে কথাগুলো জুড়ে দিয়ে আজিজ যখন তাকাল তখন প্রকৃতির সেই সুন্দর ছবিটা ভেঙেচুরে গেছে। সবুজ ঘাসে ঢাকা তৃণভূমিটাকে মনে হচ্ছে অসংখ্য প্রজাপতি। মনে পড়ছিল মক্কায় অবস্থিত পবিত্রতম প্রার্থনাগৃহ যাবার কথা। সেই আল্লাহর গৃহ, যেখানে সবাই সমবেত হয়ে প্রার্থনা করে। সেই কাঁটা গাছের ঝোপ এবং তীর্থযাত্রীদের সেই আকুল আক্ষেপ। ছবিগুলো যেন একের পর এক তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। চকিতে মনে পড়ে গেল তার বিবির কথা। কিন্তু অর্ধতন্ময় অতীন্দ্রিয় ভাবলোকের মধ্যে আচ্ছন্ন মনটার হঠাৎই যেন স্খলন হলো। আজিজ আবার ফিরে এল তার বর্তমান বাস্তব জগতে। বনপথ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সে তখন চলেছে ফীলডিংএর পাশা-পাশি। পূর্বাপর মোহ তখন কেটে গেছে। ফীলডিংএর শেষ কথার জবাবে বেশ উত্তেজিত হয়েই আজিজ বলল, 'ওসব অর্বাচীন আলোচনা বন্ধ কর ফীলডিং। কৃষ্ণকে ছাড়। ওটা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার। বরং স্থূল বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝতে পারি সেইরকম কিছু বল।'

শেষ পর্যন্ত তাই-ই হলো। ফেরার পথে রাজনীতি নিয়ে ঝগড়া করতে করতে ওরা নামল। চন্দ্রপুর ছাড়ার পর থেকে ওরা দুজনেই অন্তঃসারশূন্য নির্দয় মানুষ হয়ে গেছে। একসময় পরস্পরকে বিশ্বাস করত। এখনও করে, কারণ ওরা জানে যে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা আলাদা হয়ে যাবে। এই ছাড়াছাড়ির মুহূর্তে শিষ্টাচার দেখানো অর্থহীন। ফীলডিং সে চেষ্টাও করল না। তাছাড়া এখন সে বিশ্বাস করে যে শুধু কঠোর বলেই ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চলে যেতে পারে না। ভারতবর্ষে এই সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের দরকার আছে। কথাগুলো বেশ পোড় খাওয়া আমলাদের মতন সে বলল। কিন্তু শুনেই ফোঁস করে উঠল আজিজ। বলল, 'না। দরকার নেই। এ দেশে তোমাদের আর দরকার হবে না। তোমরা এখান থেকে চলে যেতে পার।'

হা হা করে হেসে উঠল ফীলডিং। বলল, !আমরা চলে গেলে তোমরা টিকে থাকতে পারবে? চোখেই দেখছ কি দুরবস্থা তোমাদের এখনই হয়েছে। গড়বোলের ইস্কুলটা হয়ে উঠেছে গুদাম। তুমি ডাক্তারি ছেড়ে হেকিমি ধরেছ। মিষ্টি মিষ্টি মন ভোলান কবিতা লিখছ। কি আছে তোমার কবিতায়? অন্তঃপুর থেকে মুক্তি দিয়ে মেয়েদের তুমি বাইরে আনতে চাইছ। কিন্তু বন্ধু, ঘর গেরস্থালী থেকে মেয়েদের সরিয়ে দিলে সংসার চলবে? তোমার বিবি বাইরে বেরিয়ে পড়লে তোমার আহম্মদ, করিম বা জামিলার মুখ ধুইয়ে দেবার কেউ থাকবে কি?'

ফীলডিংএর ব্যঙ্গের খোঁচা খেয়ে ক্রমেই উত্তেজিত হচ্ছিল আজিজ। এক-সময় অসহ্য হয়ে উঠল এই ব্যঙ্গ। রেকাবে পা দিয়ে সে খাড়া হয়ে উঠল। তারপর লাগাম টেনে ঘোড়াটা থামাল। সামনের দু পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়া। উত্তেজিত আজিজ চেঁচিয়ে বলে উঠল 'না থাকুক। তবু তোমরা থাকবে না। এটা আমাদের দেশ। দূর হটো এখান থেকে। টার্‌টন্ বার্‌টন্‌দের নিয়ে মানে মানে সরে পড। দশ বছর আগে তোমাদের বোঝবার চেষ্টা করতুম। কিন্তু এখন তোমরা অসহ্য হয়ে উঠেছ আমাদের কাছে। মাঝে মাঝে তোমাদের সঙ্গে ওঠা বসা করি। ভেব না যে তোমাদের সহ্য করি। এটা স্রেফ রাজনৈতিক কারণ।' আজিজের ঘোড়া এবার উত্তেজিত হয়ে হ্রেষাধ্বনি করল। আজিজও উত্তেজিত। বলল 'দয়া করে তোমরা বিদেয় হও। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। আমরা এখন পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি।' কিন্তু এমন মুখ বুজে আমরা থাকব না। যেদিন তোমাদের দুঃখের দিন আসবে সেদিন আমরা তোমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াব না। সে দিনটা খুব দূরে নয়। ইওরোপে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল বলে। খুব দেরি নেই সেই দিনটার। সুদিন আমরাও পাব।' আজিজ থামল। ওরা তখন দ্রুত পায়ে ভগবান শ্রীহনুমানের মন্দিরের পাশ দিয়ে চলেছে। দুজনেই নিঃশব্দ। ভগবান যেন মানুষকে ভাল-বাসতেই হনুমানজীর মূর্তি ধারণ করেছেন। একটু এগিয়ে শিবমন্দির। মন্দিরের বিগ্রহ লিঙ্গমূর্তি মহাসৃষ্টির প্রতীক। যা নিত্য তা অশ্লীল নয়। তাই দেহজ কামনার সঙ্গে এই প্রতীক মূর্তির কোন সম্পর্ক নেই। ঝোপের অভ্যন্তর থেকে মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে বড় বড় গাছগুলো।। আবার ফিরে আসছে জীবনধারণের দৈনন্দিনতা। ফীলডিংই প্রথম কথা বলল। আগের কথার জের টেনেই সে জিজ্ঞেস করল, 'বেশ। আমাদের না চাও কিন্তু তার বদলে কাদের চাও? জাপানীদের?'

'না। আমার পূর্বপুরুষ আফগানদেব।'

'কিন্তু তোমার হিন্দু বন্ধুরা কি মেনে নেবে তাদের?' ফীলডিংএর স্বরে আবার ব্যঙ্গ।

'যাতে মেনে নেয় সেই ব্যবস্থাই করা হবে।' আজিজ বলল।

'তা বটে। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।'

'সে দায় আমাদের। তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই, সিরিল। আমরা জানি প্রত্যেক সপ্তাহে পাইওনীয়ার কাগজে তোমরা আমাদের কথা লিখবে। লিখবে,

"পেশোয়ার থেকে কলকাতা অব্দি প্রত্যেক পুরুষকে লুণ্ঠন করা হয়েছে। প্রতিটি নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে।" কিন্তু বস্তাপচা পুরনো গল্প দিয়ে আর আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না। তোমাদের আর আমরা ডেকে আনব না।'

আজিজ যা বলল তার সঙ্গে এখানকার এই উদাসীন পরিবেশের কোন মিল নেই। বিদেশী আফগানদেরও যেন এখানে মানায় না। মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল আজিজ। উত্তেজনায় ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল সে। ঘোড়া আবার পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আজিজের মনও খাড়া হয়ে উঠল। তার মনে হচ্ছিল তাদেরও একটা স্বাধীন দেশ থাকা দরকার। তার মাতৃভূমি। যেখানে সে জন্মেছে, যেখানে বড় হয়েছে। কথাটা মনে হতেই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল আজিজ। বলল, 'ভারতবর্ষ আলাদা রাষ্ট্র হবে। আমাদের সকলের আবাসভূমি হবে এই দেশ। তোমাদের এখানে স্থান নেই। এটা আমাদের দেশ। হিন্দু, মুসলমান, শিখ নিয়ে আমরা এক জাতি। তোমরা বিদেশী। তোমরা যাও। ভারতবর্ষ তোমাদের চায় না। হুররে ফর ইণ্ডিয়া! হুররে!'

ফীলডিং অবজ্ঞা ভরে আজিজের উচ্ছ্বাস দেখছিল। হায়! কি অপরিণত এদের ভাবনা! ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা পাবে! এই দেবত্বারোপের প্রয়াস কি হাস্যকর! কিন্তু সে মর্যদা কি এই দেশ অর্জন করেছে? রাষ্ট্র-পুঞ্জের দরবারে সে কোন্ গর্ব নিয়ে প্রবেশ করবে? ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্য আর গরিমাবোধ? মহাজাতি সম্মেলনে ভারতের স্থান হবে গুয়াতেমালা কিংবা বেলজিয়ামের মতন অজ্ঞাত দেশের সঙ্গে, শেষ সারিতে। হায় রে! না জানি আরও কত অবিশ্বাস তাকে মেনে নিতে হবে! নিষ্ঠুরের মতন আজিজের স্বপ্নকে উপহাস করল ফীলডিং। কিন্তু ফীলডিংএর ব্যঙ্গ আর যেন সইতে পারছিল না আজিজ। ভয়ঙ্কর ক্রোধ আর ঘৃণায় মাখামাখি হয়ে গেল তার গলার স্বর। কেমন করে প্রতিবাদ করবে ভেবে পাচ্ছিল না সে। শেষমেশ চীৎকার করে উঠল আজিজ। বলল, 'দূর হয়ে যাও তোমরা এদেশ থেকে। তোমরা ইংরেজরা নীচ, ভণ্ড, প্রতারক। যত তাড়াতাড়ি তোমাদের সংস্রব ত্যাগ করা যায় ততই ভারতের মঙ্গল। হ্যাঁ তোমাদের আমরা ঘৃণা করি। যতদিন বাঁচব ঘৃণা করব। বংশপরম্পরায় ছড়িয়ে যাব ঘৃণার বিষ। যদি এখনই তাড়াতে না পারি তবে পরবর্তী কালের জন্যে এই ক্রোধ রেখে যাব। আমরা না পারলেও, আহমেদ আর করিমরা না পারলেও, কোন একদিন তোমাদের যেতেই হবে। পাঁচহাজার বছর ধরে তোমাদের সঙ্গে লড়াই করব। আপস করব না। যখন সুদিন আসবে প্রতিটি অভিশপ্ত ইংরেজকে তখন সমুদ্রের জলে বিসর্জন দেব।' বলতে বলতে ক্ষিপ্ত আজিজ ছুটে গেল ফীলডিংএর দিকে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফীলডিংএর বুকের ওপর। এরপর সে যা করল তা যেন অবিশ্বাস্য। আলিঙ্গনাবদ্ধ ফীলডিংকে চুম্বন করে কোনরকমে বলে উঠল, 'কিন্তু আমরা বন্ধুই থাকব সিরিল। কখনও আলাদা হব না।' ফীলডিং-এর দুই হাতের মধ্যে আজিজের দেহটা ধরা। আলিঙ্গন ঘনতর করে ফীলডিং বলল, 'কিন্তু আমরা কি এখনই বন্ধু নই? বল, আজিজ বল! আমরা তো

বন্ধুই হতে চাই! তুমি আমি দুজনেই তা চাই।'

কিন্তু ওরা চাইলেও ঘোড়া দুটো বন্ধু হতে চাইল না। দুপাশে দু টুকরো হয়ে সরে গেল তারা। কিছুতেই পাশাপাশি চলল না। প্রকৃতিও পাশাপাশি চলতে দিল না ঘোড়া দুটোকে। সরু গিরিপথ ধরে দুই সওয়ার তখন আলাদা হয়ে আগে পিছে চলেছে। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে মউ। দেখা যাচ্ছে রাজপ্রাসাদ, গেস্ট হাউস, আর দীঘি। দেখা যাচ্ছে কারাগার আর মন্দির। নীল আকাশের বুকে স্বচ্ছন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে পাখিরা। ওরা কেউ দুই বন্ধুর মিলন চাইছে না। বরং কান পাতলে শোনা যাচ্ছিল চাপা অস্ফুট একটা বিলাপধ্বনি। যেন সহস্র নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বর ফিসফিস করে বলছিল, 'না এখনও সময় হয় নি।' আকাশের উদার পরিব্যাপ্তির মধ্যেও বন্ধুত্বের কোন আশ্বাস শুনতে পেল না কেউ। সেখানেও একই উত্তর, 'না।'